কুরআন-সুন্নাহর আলোকে

ঈমান-আকীদা

দ্বিতীয় খণ্ড

মাওলানা সাঈদ আহমদ
উস্তাদ, দারুল উলূম হাটহাজারী

কুরআন-সুন্নাহর আলোকে

ঈমান-আকীদা

দ্বিতীয় খণ্ড

ঈমান-আকীদার ক্ষেত্রে অজ্ঞতা, অস্পষ্টতা, অসচ্ছতা, শিথিলতা, অসাবধানতা, সিদ্ধান্তহীনতা ও বিচ্ছিন্নতার কোনো অবকাশ নেই

মাওলানা সাঈদ আহমদ

উস্তাদ : দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক : জামিআতুল কাউসার, চট্টগ্রাম

দারুল ফিকর
জযবা | ইলম | ইত্তেবা

লেখকের ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ, প্রশংসা কেবলই আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আমাদেরকে ঈমানের মতো নেয়ামত দান করেছেন। অগণিত দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, যিনি আমাদেরকে ইসলামী আকীদা শিক্ষা দিয়েছেন।

দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ ও নাজাতের একমাত্র ঠিকানা 'ইসলাম' নামক ঘরে প্রবেশদ্বারের নাম হলো 'ঈমান', আর এখান থেকে বের হওয়ার সদর দরজার নাম 'কুফর'। প্রথম খণ্ডে এ দুই বিষয় নিয়ে আলোচনা ছিল। এখন আলোচনা করা হবে ইসলামী 'আকীদা' নিয়ে। কেননা, ঈমানের উপাদান হলো আকীদা-বিশ্বাস। অর্থাৎ সকল আকীদা-বিশ্বাসের সমষ্টিতে 'ঈমান' জন্মলাভ করে। কাজেই আকীদা-বিশ্বাস যদি পরিশুদ্ধ না হয়, তাহলে 'ঈমান' বিশুদ্ধ হবে না। সুতরাং বিশুদ্ধ ঈমানের জন্য পরিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস থাকতে হবে।

তবে পরিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস বুঝেশুনে ও পরিপূর্ণ উপলব্ধির সাথে হাসিলের জন্য কিছু মূলনীতি জানতে হবে এবং আকীদা-বিশ্বাসে ভ্রষ্টতা ও ভ্রান্ত পথ থেকে বাঁচতে হলে এ বিষয়ে ধারণা নিতে হবে। তাই প্রথমে এ সম্পর্কে আলোচনা করছি। এরপর আকীদা-বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করা হবে।

প্রিয় পাঠক, প্রথম খণ্ডে আমরা পড়েছি ঈমানের শর্তাবলি, কুফরের ভয়াবহতা, তাকফীরে সতর্কতা, ঈমান ভঙ্গের প্রচলিত ত্রিশটি কারণ, আহলে কিবলার কুফর, মুনকিরে হাদীস (আহলে কুরআন), ওয়ালা-বারা, শাতেম, মুরতাদ, গণতন্ত্র, সংবিধানের কতিপয় ধারা, সেকুলারিজম, হিউম্যানিজম, লিবারেলিজম, ফেমিনিজম, ওয়াহদাতুল আদয়ান, ইন্টারফেইথ, লাকুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়া দ্বীন, ধর্ম যার যার উৎসব সবার, বিধর্মীদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ ও তাদের খাবার গ্রহণসহ প্রচলিত অনেক বিষয়।

দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা পড়ব আকীদা বিষয়ে মৌলিক কথা, আশআরী, মাতুরীদী ও আছারীসহ আকীদার বিভিন্ন ধারার ইমাম ও তাদের কিতাব পরিচিতি, ইমাম আবু

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
আকীদা বিষয়ে মৌলিক কিছু কথা

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইলাহিয়্যাত : আল্লাহ তাআলা-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা

প্রথম অধ্যায়
আকীদা বিষয়ে মৌলিক কিছু কথা

দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ ও নাজাতের একমাত্র ঠিকানা 'ইসলাম' নামক ঘরে প্রবেশদ্বারের নাম হলো 'ঈমান', আর এখান থেকে বের হওয়ার সদর দরজার নাম 'কুফর'। এতক্ষণ এ দুই বিষয় নিয়ে আলোচনা ছিল। এখন আলোচনা করা হবে 'আকীদা' নিয়ে। কেননা, ঈমানের উপাদান হলো আকীদা-বিশ্বাস তথা সকল আকীদা-বিশ্বাসের সমষ্টিতে 'ঈমান' জন্মলাভ করে। কাজেই আকীদা-বিশ্বাস যদি পরিশুদ্ধ না হয়, তাহলে 'ঈমান' বিশুদ্ধ হবে না। সুতরাং বিশুদ্ধ ঈমানের জন্য পরিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস থাকতে হবে।

তবে পরিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস হাসিলের জন্য কিছু মূলনীতি জানতে হবে এবং ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস থেকে বাঁচতে হলে এ বিষয়ে ধারণা নিতে হবে। তাই প্রথমে এ সম্পর্কে আলোচনা করছি। এরপর আকীদা-বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করা হবে।

কোন ধরনের আকীদা জানা জরুরি

ইমাম সুয়ূতী রাহ. (মৃ. ৯১১ হি.) বলেন,

أصول الدين علم يبحث فيه عما يجب اعتقاده، وهو قسمان: قسم يقدح الجهل به في الإيمان كمعرفة الله تعالى وصفاته الثبوتية والسلبية والرسالة والنبوة وأمور المعاد، وقسم لا يضر كتفضيل الأنبياء على الملائكة.

'আকীদার মাসআলাসমূহের মধ্যে কিছু বিষয় আছে জানা জরুরি এবং এ ক্ষেত্রে অজ্ঞতার সুযোগ নেই। যেমন : আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর সিফাতের পরিচয়, রিসালাত ও পরকাল-সংক্রান্ত বিষয়সমূহ।

আর কিছু বিষয় আছে এমন, যা না জানলেও কোনো অসুবিধা নেই। যেমন : ফেরেশতাদের ওপর নবীগণের শ্রেষ্ঠত্ব।'[১]

---

১. ইতমামুদ দিরায়াহ, পৃষ্ঠা ৫

প্রখ্যাত ফকীহ ইবনে আবেদীন শামী রাহ. (মৃ. ১২৫২ হি.) বলেন, 'এ বিষয়ে ঝগড়া করা অপছন্দনীয় যে, লুকমান, জুলকারনাইন ও জুলকিফল—তাঁরা নবী ছিলেন কি না। অতঃপর বলেন, অপ্রয়োজনীয় কোনো বিষয়ে কারও প্রশ্ন করা উচিত নয়। যেমন : জিবরাঈল আ. কীভাবে অবতরণ করতেন, কোন আকৃতিতে তাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখেছেন এবং তাকে যখন মানবীয় আকৃতিতে দেখেছেন তখন তিনি ফেরেশতা ছিলেন কি না।

জান্নাত-জাহান্নাম কোথায় অবস্থিত, কিয়ামত কখন হবে, ঈসা আ. কখন অবতরণ করবেন, ইসমাঈল আ. উত্তম নাকি ইসহাক আ., এই দুইজনের মধ্যে যাবীহুল্লাহ কে,[২] ফাতেমা রাযি. আয়েশা রাযি. থেকে উত্তম কি না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতা-মাতা কোন ধর্মের অনুসারী ছিলেন, আবু তালেবের ধর্ম কী ছিল ইত্যাদি এ-জাতীয় প্রশ্ন—যা জানা ওয়াজিব নয় এবং এগুলোর ব্যাপারে আদেশও আসেনি।'[৩]

ইমাম গাযালী রাহ. (মৃ. ৫০৫ হি.) বলেন,

وأما الخوض في أن كلامه تعالى حرف وصوت أو ليس كذلك فهو «بدعة»، وكل من يدعو العوام إلى الخوض في هذا فليس من «أئمة الدين»، وإنما هو من «المضلين»، ومثاله مَن يدعو الصبيان الذين لا يحسنون السباحة إلى الخوض في البحر.

'আল্লাহ তাআলার কালামে হরফ ও স্বর ছিল কি না, এ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা বিদআত। আর যে ব্যক্তি সাধারণ লোকদের এ বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে আহ্বান করে, সে দ্বীনের ইমাম নয়; বরং সে পথভ্রষ্টকারীদের অন্তর্ভুক্ত। ওই ব্যক্তির উদাহরণ হচ্ছে, সাঁতার জানে না এমন ছোট বাচ্চাদের সমুদ্রে নামার জন্য আহ্বানকারীর মতো।'[৪]

সুতরাং ঈমান-আকীদার মৌলিক বিষয় কিংবা জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ দিয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ও শাখাগত বিষয় নিয়ে মাতামাতি করা বা ব্যস্ত থাকা কোনো বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে না। যেমন : নবীর পিতা-মাতা জান্নাতী না জাহান্নামী, নবী মাটির তৈরি না নূরের তৈরি, 'আয়নাল্লাহ'[৫] তথা আল্লাহ কোথায়, ইমাম

---

২. তবে যাবীহুল্লাহর বিষয়টা এত হালকা নয়। এ বিষয়ে জানতে দেখুন, নির্বাচিত প্রবন্ধ, মাওলানা আবদুল মালেক, ২/৩০৫-৩১৬

৩. ফাতাওয়া শামী, ১০/৪৮৫

৪. মুকাদ্দামাতুল মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব, নববী, পৃষ্ঠা ৫৩

৫. হাদীসে যে 'আয়নাল্লাহ' বলে প্রশ্ন করা হয়েছে তা আলামতে ঈমান হিসেবে করা হয়েছে, মূল ঈমান হিসেবে নয়। সবিস্তারে আলোচনা 'ইলাহিয়্যাতে' আসবে।

ইমাম খাত্তাবী রাহ. (মৃ. ৩৮৮ হি.) বলেন,

في معالم السنن ١/٢٢٢: (أَيْنَ اللهُ؟ قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ)... فَإِنَّ هَذَا السُّؤَال عَنْ أَمَارَةِ الإِيْمَان وَسِمَة أَهْله، وَلَيْسَ بِسُؤَالٍ عَنْ أَصْل

মাহদী[৬] কখন আসবেন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পড়ে থাকার কোনো মানে হয় না।

একটি জরুরি মাসআলা

ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর নামে প্রচলিত 'আল-ফিকহুল আকবার' গ্রন্থে আছে,

وإذا أشكل على الإنسان شيءٌ من دقائق علم التوحيد: فإنه ينبغي له أن يعتَقِد في الحال ما هو الصواب عند الله تعالى، إلى أن يجد عالما فيسأله، ولا يسعه تأخير الطلب، ولا يُعذَر بالتوقف فيه، ويكفُر إن وقف.

'যদি কারও মনে তাওহীদের (মৌলিক) কোনো সূক্ষ্ম বিষয়ে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়, তৎক্ষণাৎ (করণীয় হচ্ছে,) এ বিষয়ে আল্লাহ তাআলার কাছে যা সত্য-সঠিক, সেটার ওপর তাকে আকীদা পোষণ করতে হবে। এরপর দ্রুত কোনো অভিজ্ঞ আলেম থেকে তা জেনে নেবে। এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করার ক্ষেত্রে দেরি করা যাবে না। আর এতে (তৎক্ষণাৎ করণীয়টা না করে) নীরব বসে থাকা বা কোনো কিছু বিশ্বাস না করার অপারগতা গৃহীত হবে না; বরং এরূপ করা কুফর বলে গণ্য হবে।'[৭]

কেননা, ঈমানের বিষয়গুলোতে ঈমান আনা ও বিশ্বাস করা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ঈমানের পথে অন্তরায়; সত্যায়ন ও বিশ্বাসের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। ফলে এসব বিষয়ে কেউ নিরপেক্ষ থাকলে সেটা কুফর বলে গণ্য হবে।

সদরুল ইসলাম আবুল ইউসর বাযদাবী হানাফী রাহ. (মৃ. ৪৯৩ হি.) বলেন,

قال أهل السنّة والجماعة: الإيمان بالجملة واجب، ولا يجب الإيمان على التفصيل إلا أن يقع الإشكال في فصل من الفصول فحينئذ يجب التعلّم والتدبّر والتفكّر حتى أن من أقرّ أن الله تعالى واحد لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن ما أخبر به عن الله تعالى كلّه حقّ واعتقد ذلك؛ يصحّ إسلامه.

'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর মতে ইজমালী (সংক্ষিপ্তভাবে) ঈমান আনা যথেষ্ট, তফসীলী (বিস্তারিত) ঈমান আবশ্যক নয়। তবে যদি কোনো বিষয়ে সন্দেহ-

---

الْإِيمَان وَحَقِيقَته. وَلَوْ أَنَّ كَافِرًا جَاءَنَا يُرِيد الِانْتِقَال مِنْ الْكُفْر إِلَى دِين الْإِسْلَام فَوَصَفَ مِنْ الْإِيمَان هَذَا الْقَدْر الَّذِي تَكَلَّمَتْ الْجَارِيَة: لَمْ يَصِرْ بِهِ مُسْلِمًا، حَتَّى يَشْهَد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول الله، وَيَتَبَرَّأ مِنْ دِينه الَّذِي كَانَ يَعْتَقِدهُ.

'আয়নাল্লাহ বলে ঈমানের আলামত ও আহলে ঈমানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে, এটা আসল ঈমান ও হাকীকতে ঈমান সম্পর্কে প্রশ্ন নয়। যদি কোনো কাফের আমাদের কাছে এসে কুফর থেকে ইসলামে প্রবেশ করতে চায় আর ওই দাসী মেয়ের মতো ঈমানের বিবরণ দেয়, তাহলে সে কখনো মুসলমান হবে না, যতক্ষণ না লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর সাক্ষ্য দেবে এবং পূর্বের ধর্ম থেকে সম্পর্কহীন হবে।'

৬. হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী মাহদীকে 'ইমাম' বলার সুযোগ আছে। আর তাঁর নামের শেষে (আ.) কিংবা (রাযি.) বলার প্রয়োজন নেই। সবিস্তারে আলোচনা সামনে আসবে।

৭. আল-ফিকহুল আকবার, বি-রিওয়াতি হাম্মাদ, আকীদা নং ৫৮-সূত্রে মাজমুউ কুতুব ওয়া রাসায়িল ওয়া ওসায়াল ইমামিল আযম, পৃষ্ঠা ২৮৩, মাকতাবাতুল গানিম

প্রশ্ন দেখা দেয়, তখন সে সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা এবং চিন্তা-ফিকির (করে সন্দেহ দূরীভূত) করা আবশ্যক।

সুতরাং কেউ যদি আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল, আর তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে (দ্বীন হিসেবে) যা কিছুর সংবাদ দিয়েছেন তা সবই সত্য বলে বিশ্বাস করে ও স্বীকৃতি প্রদান করে, তাতেই যথেষ্ট।'[৮]

অর্থাৎ কারও মনে যদি ঈমানের কোনো বিষয়ে সন্দেহ-প্রশ্ন দেখা না দেয়, তাহলে তার জন্য ইজমালী তথা সংক্ষিপ্তভাবে ঈমান আনাই যথেষ্ট।

ঈমান-আকীদার মাসআলাসমূহের প্রকার ও হুকুম

ঈমান-আকীদার মাসআলাসমূহ সাধারণত তিন প্রকার হয়ে থাকে। তাই প্রত্যেক প্রকারের হুকুম ও বিধান জানা থাকা জরুরি। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা জানা থাকলে আকীদার কিতাবসমূহে আলোচিত প্রতিটি মাসআলার বিধান ও গুরুত্ব বুঝে আসবে।

১. মুমিন ও কাফেরের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টিকারী আকীদা

ঈমান-আকীদার প্রথম ও প্রধানতম স্তর হলো এমন কিছু আকীদা-বিশ্বাস, যা লালন করলে একজন ব্যক্তি ঈমান ও ইসলামের দৌলতে সৌভাগ্যমণ্ডিত হয়; এর বিপরীত হলে হতভাগা অমুসলিম হিসেবে গণ্য হয়। এ সমস্ত আকীদাকে পরিভাষায় বলা হয়, 'উসূলুল ঈমান' (أصول الإيمان) বা 'উসূলু আহলিল কিবলা'।

এগুলো ইসলামের মৌলিক পর্যায়ের আকীদা, যা ইসলাম ও কুফরের মাঝে পার্থক্যকারী। যেমন : ঈমানের আরকান তথা আল্লাহ, নবী-রাসূল, ফেরেশতা, কিতাব, আখিরাত ও তাকদীর।

এভাবে ইসলামে যত অকাট্য ও অকাট্যভাবে প্রমাণিত এবং জরুরিয়াতে দ্বীন তথা দ্বীনের স্বতঃসিদ্ধ ও পরিচিত বিষয় রয়েছে, সবই এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। যেমন : কুরআন ও হাদীসের হুজ্জিয়াত (প্রামাণ্যতা), খতমে নবুওয়াত (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষ নবী হওয়া), নুযূলে ঈসা (কিয়ামতের আগে ঈসা আলাইহিস সালাম আসমান থেকে অবতরণ করা), ইসরা (মক্কা মুকাররমা থেকে বায়তুল মাকদিস পর্যন্ত),[৯] জিন-জাতির অস্তিত্ব, ইসলামই একমাত্র ধর্ম ও জীবনের সব ক্ষেত্রে বিস্তৃত, আল্লাহ তাআলাই বিধানদাতা এবং নামাজ, যাকাত, পর্দা ও

---

৮. উসূলুদ্দীন, বাযদাবী, পৃষ্ঠা ১৫৪

৯. বায়তুল মাকদিস থেকে সাত আসমানসহ ঊর্ধ্বজগতের মেরাজকে অস্বীকার করলে কাফের না হওয়ার কথা যদিও প্রসিদ্ধ, তবে কেউ কেউ কাফেরও বলেছেন। মেরাজের আলোচনায় সবিস্তারে বলা হবে ইনশাআল্লাহ।

জিহাদ ফরজ আর সুদ, মদ, যিনা ও প্রাণী/মানবভাস্কর্য হারাম হওয়া ইত্যাদি। সামনে ঈমানের আলোচনায় এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর একটি তালিকা আসবে।

ঈমান-আকীদার এ প্রকারের কোনো কিছু জেনে-বুঝে অস্বীকারকারীর হুকুম হচ্ছে, সে ইসলাম থেকে খারেজ হয়ে কাফের হয়ে যাবে। এভাবে ঈমান ভঙ্গকারী যত বিষয় রয়েছে, এগুলোর কোনো একটা পাওয়া গেলেও কাফের হয়ে যাবে।

জরুরি জ্ঞাতব্য

কাউকে কাফের বলা বেশ জটিল ও অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। একজন মুসলমানকে অকাট্য উপযুক্ত কারণ ছাড়া কাফের বলার ওপর যেমন কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হয়েছে, তেমনই একজন নিশ্চিত কাফেরকে সুস্পষ্ট কারণ থাকার পরও মুসলমান মনে করলে বড় ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। তবে প্রথমটার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি।

ইমামুল হারামাইন জুয়াইনী রাহ. (মৃ. ৪৭৮ হি.) বলেন,

إنَّ إِدْخَالَ كَافِرٍ فِي الْمِلَّةِ، وَإِخْرَاجَ مُسْلِمٍ عَنْهَا: عَظِيمٌ فِي الدِّينِ.

'কোনো কাফেরকে ইসলামে প্রবেশ করানো (তথা মুসলিম বলা) অথবা কোনো মুসলিমকে ইসলাম থেকে বের করে দেওয়া (তথা কাফের বলা) দ্বীনের মধ্যে খুব কঠিন ও গুরুতর বিষয়।'[১০]

অর্থাৎ কাউকে তাকফীর করা ও না করা সাধারণ কোনো বিষয় নয়।

মোল্লা আলী কারী রাহ. (মৃ. ১০১৪ হি.) এটা নকল করার পর বলেন,

والثاني أصعب من الأول، فتأمل.

'প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টি বেশি খতরনাক। অর্থাৎ কোনো কাফেরকে মুসলিম বলার চেয়ে মুসলমানকে কাফের আখ্যা দেওয়া কঠিন বিষয়।'[১১]

এ বিষয়ে সবিস্তারে কথা কুফরের আলোচনায় গেছে।

২. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ ও আহলুল বিদআহ বা বিদআতপন্থীদের মাঝে পার্থক্যকারী আকীদা

ইসলামে কিছু আকীদা রয়েছে দ্বিতীয় স্তরের, যা বিশ্বাস করা-না করার ওপর মুমিন হওয়া-না হওয়া নির্ভর করে না; বরং একজন ব্যক্তি মুমিন হওয়ার পর সে 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ'র অন্তর্ভুক্ত হওয়া-না হওয়া নির্ভর করে। এ-জাতীয়

---

১০. আশ-শিফা বি তা'রীফি হুকুকিল মুস্তাফা, কাযী ইয়ায, ২/৫৯৫; শারহে মুসলিম, নববী, ৭/১৬০
১১. শারহুশ শিফা, ২/৪৯৯

আকীদাকে পরিভাষায় 'উসূলু আহলিস সুন্নাহ' (أصول أهل السنة) বলা হয়। যেমন : নবীগণ কবরে জীবিত, কবরে মুনকার-নাকীর নামের দুই ফেরেশতার প্রশ্ন এবং সাদকায়ে ফিতর (তথা ফিতরা) ইত্যাদি বিশ্বাস করা।

ইসলামের এ দ্বিতীয় স্তরের আকীদা-বিশ্বাসও অস্বীকার করা যাবে না; বরং এ-জাতীয় আকীদার ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর বিপরীত বিশ্বাস কেউ রাখলে তার হুকুম হচ্ছে, সে ফাসেক ও গোমরাহ বলে বিবেচিত হবে। অর্থাৎ সে আহলুল বিদআহ তথা বিদআতপন্থীদের মধ্যে গণ্য হয়ে পথভ্রষ্ট ও গুনাহগার এবং বাহাত্তর দলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে জাহান্নামী।[১২]

উল্লেখ্য, আকীদার কিছু বিষয় এমন রয়েছে, যা প্রথম প্রকারে অন্তর্ভুক্ত হবে না দ্বিতীয় প্রকারে হবে, এ নিয়ে ইমামদের মাঝে মতভেদ হয়েছে। এ ক্ষেত্রে করণীয় হলো, সতর্কতা অবলম্বন করা। অর্থাৎ উক্ত বিষয় (উদাহরণস্বরূপ, মোজার ওপর মাসেহ করার বৈধতা) যদি কারও মতে প্রথম প্রকারে অন্তর্ভুক্ত হয়, আর কারও মতে দ্বিতীয় প্রকারে হয় তাহলে সতর্কতা হলো, প্রথম প্রকারে অন্তর্ভুক্ত মনে করে আকীদা পোষণ করা, যাতে কুফর থেকে সম্পূর্ণরূপে বাঁচা যায় এবং কারও মতেই কুফরে পড়তে না হয়।

জরুরি জ্ঞাতব্য

কাউকে বিদআতী বলার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত সতর্কতা কাম্য।

ইমাম আহমদ রাহ. বলেন,

إِخْرَاجُ النَّاسِ مِنَ السُّنَّةِ شَدِيدٌ.

'মানুষকে আহলুস সুন্নাহ থেকে খারেজ করে দেওয়া গুরুতর ব্যাপার।'[১৩]

তাই এ বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আর সতর্কতার একটি দিক হলো,

---

১২. দেখুন, আত-তাহরীর, ইবনুল হুমাম মাআ তাইসীরুত তাহরীর, আমীর বাদশাহ, ৪/১৯৫-৯৭; রওযাতুত তালিবীন, নববী, ১০/৬৪; শারহুল মাওয়াকিফ, ৮/৪০০

قال ابن الهمام ٦ (ت: ٨٦١هـ) في «التحرير» مع «تيسير التحرير»: (والمخطئ إن) أخطأ (فيما ينفي ملةَ الإسلام) كُلا أو بعضا (فكافر آثم)... (وإن) كان ما أخطأ فيه (غيرَها) أي: غيرَ ملة الإسلام (كخلق القرآن)، فعُلم أن المراد من ملة الإسلام: ما يتوقَّف عليه الإيمانُ من العقائد إجماعا... (فمبتدع آثم)... (لا كافر)... (وأما) الأحكام (الفقهية فمنكر الضروري) منها، (كالأركان) أي: فرضيةِ الصلاة (وحرمةِ الزنا والشرب كذلك) أي كافر آثم؛ لأن إنكار ما هو من ضروريات ملة الإسلام يستلزم إنكارَها باجتهاد باطل (لانتفاء شرط الاجتهاد).

(و) منكر (غيرها) أي الضرورية (الأصلية) [القطعية من الفقهية]، والمراد بها: الأحكام التي يتفَرَّع عليها مسائلُ فرعية (ككون الإجماع حجة، والخبر) أي: خبر الواحد حجة. (والقياس) حجة (آثم)...

(بخلاف حجية القرآن) والسنة (فإنه) أي: إنكارها (كفر) فإنه من ضروريات ملة الإسلام. انتهى.

১৩. আস-সুন্নাহ, আবু বকর খাল্লাল, বর্ণনা নং ৫১৩

পুরোপুরি বিদআতী এবং কিছু ক্ষেত্রে বিদআতের শিকার ব্যক্তির মাঝে তারতম্য করা।

মনে রাখতে হবে, বিদআত অনেকের মধ্যেই আছে। কিন্তু আকীদা ও দ্বীনী বিষয়ে ভুল ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যা করা যাদের শিআর ও বৈশিষ্ট্য, বিদআতের প্রতি আনুকূল্য যাদের আকীদাগত মানহাজ, বিদআতের প্রতি পক্ষপাতই যাদের মেজায, বিদআতই যাদের স্বতন্ত্র ফেরকা হওয়ার ভিত্তি, বিদআতের কারণে যাদের আলাদা পরিচিতি, যাদের আকীদা-আমলে বিদআতের ছড়াছড়ি, বিদআতের এশায়াত যাদের ঐতিহ্য, তারা নিশ্চিত আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর পথ থেকে বিচ্যুত এবং বিদআতী হিসেবে আখ্যায়িত। যেমন : অতীতে মুতাযিলা, কাররামিয়া, জাহমিয়া ফেরকার লোকেরা এবং বর্তমানেরও বিভিন্ন বিদআতী ফেরকার লোকেরা, যারা আল্লাহ বা আল্লাহর রাসূলের বিভিন্ন সিফাত ও বৈশিষ্ট্যের ভুল ব্যাখ্যা এবং দ্বীনী বিধানের অপব্যাখ্যা করে থাকে।

কিন্তু যারা/যিনি তাকওয়া ও ইখলাসের অধিকারী বিজ্ঞ আলেম, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর কাছে মোটামুটিভাবে অনুসৃত এবং ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর যার অবদান স্বীকৃত, এমন ব্যক্তি যদি মুতাশাবিহ তথা দ্ব্যর্থবোধক অথবা এ-জাতীয় কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যায় ভুলের শিকার হন, তো সেটাও অবশ্যই ভুল মানতে হবে। কিন্তু সেই ভুলের কারণে ওই মুখলিস ও বিজ্ঞ আলেমকে গোমরাহ বা বিদআতী বলা হবে না, তবে তার সেই ভুল ব্যাখ্যা অনুসরণ করা যাবে না; বরং সম্ভব হলে তাবীল বা ব্যাখ্যা করে এর থেকে দূরে থাকতে হবে।[১৪]

৩. এমন কিছু শাখাগত আকীদা, যাতে পরস্পরবিরোধী দলীল রয়েছে এবং সাহাবায়ে কেরামসহ পরবর্তী ইমামগণের মাঝে ইখতিলাফ ও মতপার্থক্য হয়েছে

যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজে আল্লাহ তাআলাকে দেখেছেন কি না এবং মৃত ব্যক্তি শ্রবণ করে কি না।

---

১৪. কোনো একটি মাসআলায় শায়খুল ইসলাম হযরত মাদানী রাহ.-এর অভিমতের ওপর দলীলসহ পর্যালোচনা করার পর মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ যা লিখেছেন তা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো,

آخر میں یہ گزارش ہے کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی قدس اللہ سرہ کی عظمت شان، جلالت قدر اور علمی تبحر کے پیش نظر تو اس مسئلہ پر قلم اٹھانے کی جرات کسی بڑے عالم کو بھی نہیں ہونی چاہئے، چہ جائے کہ مجھ جیسا طفل مکتب اس پر کچھ لکھے، لیکن جماعت دیوبند کی خصوصیت اور انہیں بزرگوں کی تعلیم و تلقین نے ہمیں یہ صراط مستقیم دکھائی کہ مسائل شرعیہ میں آزادانہ اظہار رائے ترک ادب نہیں، اس لئے بنام خدا تعالی جو کچھ اس میں تحقیق سے مجھے واضح ہوا وہ لکھ دیا، اور اللہ تعالی سے پناہ مانگتا ہوں کہ بزرگوں کی شان میں ادنی ترک ادب سے بھی مجھے محفوظ رکھے، آمین۔

ফিকহী মাকালাত, ২/৫৫-৫৬

তেমনই কোনো কোনো আকাবির থেকে যে সমস্ত আপত্তিকর বা অস্পষ্ট কথা পাওয়া যায়, সেগুলোর সম্ভব হলে তাবীল করা আর না হয় তা বর্জন করা উলামায়ে দেওবন্দের বৈশিষ্ট্য। ফলে দেখা যায়, উলামায়ে দেওবন্দ ইবনে তাইমিয়া রাহ.-কে যেমন গ্রহণ করেছেন, তেমনই ইবনে আরাবী রাহ.-এর প্রতিও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। ভালো ধারণা এবং তাবীলের মুআমালা উভয়ের সঙ্গেই করেছেন। আর দুজনের কারোরই ভুল গ্রহণ করেননি।

এ প্রকার আকীদার ক্ষেত্রে কোনো পক্ষকে কাফের তো দূরের কথা, বিদআতপন্থী বা পথভ্রষ্টদের মধ্যেও গণ্য করা যাবে না; এমনকি গুনাহগারও বলা যাবে না। কারণ, এতে কোন পক্ষ সঠিক আর কোন পক্ষ বেঠিক, তা সুনিশ্চিত করে বলা যায় না; বরং এগুলো মাযহাবের শাখাগত মাসআলার মতো ইজতিহাদী বিষয়, যাতে ভুল হলেও ক্ষমা পাবে এবং একটা প্রতিদান পাবে আর সঠিক হলে তো দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছেই।[১৫]

ইমাম আবুল বারাকাত নাসাফী মাতুরীদী হানাফী রাহ. (মৃ. ৭১০ হি.) 'আল-মুসাফফা' কিতাবের শেষে বলেন,

إذَا سُئِلْنَا عَنْ مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِ مُخَالِفِينَا فِي الْفُرُوعِ: يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نُجِيبَ بِأَنَّ مَذْهَبَنَا صَوَابٌ يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ، وَمَذْهَبَ مُخَالِفِينَا خَطأٌ يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ؛ لِأَنَّ لَوْ قَطَعْت الْقَوْلَ لَمَا صَحَّ قَوْلُنَا: إنَّ الْمُجْتَهِدَ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ. وَإِذَا سُئِلْنَا عَنْ مُعْتَقَدِنَا وَمُعْتَقَدِ خُصُومِنَا فِي الْعَقَائِدِ: يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَقُولَ: الْحَقُّ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ، وَالْبَاطِلُ مَا عَلَيْهِ خُصُومُنَا. هَكَذَا نُقِلَ عَنْ الْمَشَايِخِ رَحِمَهُمْ اللهُ تَعَالَى.

'শাখাগত ফিকহী মাসআলায় যদি আমাদের মাযহাব ও অন্য মাযহাব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, তাহলে এর উত্তরে আমরা এ কথা বলতে বাধ্য যে, আমাদের মাযহাব সঠিক, তবে ভুল হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। আর অন্য মাযহাব ভুল, তবে সঠিক হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। কারণ, এ ক্ষেত্রে তুমি যদি কোনোটাকে সুনিশ্চিত করে সঠিক বা ভুল বলো, তাহলে এ কথা বলার সুযোগ থাকে না যে, "মুজতাহিদ (কখনো) ভুল ও (কখনো) সঠিক করেন।"

আর যদি আমাদের আকীদা ও আমাদের প্রতিপক্ষের আকীদা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, তাহলে অবশ্যই আমাদের উত্তর হচ্ছে, হক ও সত্য সেটাই, যেটার ওপর আমরা আছি। আর যেটার ওপর আমাদের প্রতিপক্ষ রয়েছে, তা বাতিল। মাশায়েখ থেকে এমনটিই বর্ণিত হয়েছে।'[১৬]

এখানে আকীদা হক হওয়ার বিধানটি উল্লিখিত ঈমান-আকীদার মাসায়েলের প্রথম দুই প্রকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থাৎ উসূলুল ঈমান ও উসূলু আহলিস সুন্নাহই হক ও গ্রহণযোগ্য, উভয় ক্ষেত্রে এর বিপরীত কুফর ও বিদআতই বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য। আর শাখাগত ফিকহী মাসআলার বিধানটি মাসায়েলের তৃতীয় প্রকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়, যা পারস্পরিক মতভেদের ক্ষেত্রেও করণীয়

---

১৫. মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া, ১২/৪৯২, ৪৯৪, ২৪/১৭২; মাজমুআতুর রাসায়িল ওয়াল মাসায়িল, ৩/৩৪৭; সিয়ারু আলামিন নুবালা, যাহাবী, ১০/১১৪

১৬. আল-মুসাফফা (মাখতূত), ফয়যুল্লাহ আফেন্দীর নুসখা, লাওহা ২৭৫-২৭৬; আরও দেখুন, আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়ির, ইবনে নুজাইম, ৩৮১; ফাতাওয়া শামী, ১/১৪০

ঠিক করে দেবে। এর আলোকেই মতভেদকারী প্রতিপক্ষের প্রতি আমাদের আচরণ ও কর্ম-পদ্ধতি ঠিক করতে হবে। কিন্তু অনেকেই তা লক্ষ করেন না। ফলে বিভিন্ন সময় অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং প্রয়োজনের সময় ঐক্য গড়ে তোলার বা সম্মিলিত প্রয়াসের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

আকীদা প্রমাণ হওয়ার উৎস

আকীদার উৎস হচ্ছে তিনটি বিষয় : কুরআন, সহীহ হাদীস ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর ইজমা'।

হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত উসূলবিদ ইমাম ফখরুল ইসলাম বাযদাবী রাহ. (মৃ. ৪৮২ হি.) তাঁর বিখ্যাত 'উসূল'-এর শুরুতে লেখেন,

الْعِلْمُ نَوْعَانِ : عِلْمُ التَّوْحِيدِ وَالصِّفَاتِ، وَعِلْمُ الشَّرَائِعِ وَالْأَحْكَامِ، وَالْأَصْلُ فِي النَّوْعِ الْأَوَّلِ: هُوَ التَّمَسُّكُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمُجَانَبَةُ الْهَوَى وَالْبِدْعَةِ، وَلُزُومُ طَرِيقِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ، وَمَضَى عَلَيْهِ الصَّالِحُونَ، وَهُوَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ أَدْرَكْنَا مَشَايِخَنَا، وَكَانَ عَلَى ذَلِكَ سَلَفُنَا أَعْنِي أَبَا حَنِيفَةَ وَأَبَا يُوسُفَ وَمُحَمَّدًا وَعَامَّةَ أَصْحَابِهِمْ رَحِمَهُمُ اللهُ، وَقَدْ صَنَّفَ أَبُو حَنِيفَةَ ٦ فِي ذَلِكَ كِتَابَ الْفِقْهِ الْأَكْبَرِ... وَالْعَالِمِ وَالْمُتَعَلِّمِ، وَالرِّسَالَةَ.

'ইলম দুই প্রকার : ১. আল্লাহর তাওহীদ ও সিফাতের ইলম, ২. ফিকহ, শরীয়ত ও হালাল-হারামের ইলম। প্রথম প্রকারের ইলমের ক্ষেত্রে একমাত্র মূলনীতি হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা, প্রবৃত্তির অনুসরণ ও বিদআত বর্জন করা এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর পথে অবিচল থাকা, যে পথে ছিলেন সাহাবা, তাবেয়ীন ও সালাফে সালেহীন। এ পথেই অটল ছিলেন আমাদের সালাফ তথা আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ এবং তাঁদের শাগরিদগণ।

এ বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা রাহ. 'আল-ফিকহুল আকবার' নামে কিতাব রচনা করেছেন। আরও লিখেছেন, 'আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম' ও 'আর-রিসালাহ' কিতাব।'[১৭]

ইমাম ইবনে আব্দিল বার রাহ. (মৃ. ৪৬৩ হি.) বলেন,

لَيْسَ فِي الِاعْتِقَادِ كُلِّهِ فِي صِفَاتِ اللهِ وَأَسْمَائِهِ، إِلَّا مَا جَاءَ مَنْصُوصًا فِي كِتَابِ اللهِ، أَوْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ.

'আল্লাহ তাআলার সিফাত ও নামসহ সকল আকীদার উৎস হচ্ছে, কুরআন, সহীহ হাদীস ও উম্মাহর ইজমা'।'[১৮]

---

১৭. কানযুল উসূল (প্রকাশ : উসূলে বাযদাবী), পৃষ্ঠা ১-২

১৮. জামিউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাদলিহী, ২/৯৪৩

আকীদার ক্ষেত্রে কিয়াস-ইজতিহাদ ও যুক্তিনির্ভরতার বিষয়ে ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. (মৃ. ১৮২ হি.) বলেন,

وليس التوحيد بالقياس... لأن القياس يكون في شيء له شبه ومثل، فالله تعالى وتقدس لا شبه له ولا مثل له..

'তাওহীদ তথা আকীদা বিষয়ে কিয়াস চলবে না। কারণ, কিয়াস তো চলে এমন বিষয়ে, যার তুলনা আছে ও নমুনা আছে। আর মহাপবিত্র মহান আল্লাহর তো কোনো তুলনাও নেই এবং নমুনাও নেই।'[১৯]

উলূমুল হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমাম ইবনুস সালাহ্ রাহ. (মৃ. ৬৪৩ হি.) বলেন,

يجوز عند أهل الحديث وغيرِهم التساهلُ في الأسانيد... فيما سِوَى صفاتِ الله تعالى... وسائر ما لا تعلقَ له بالأحكام والعقائد.

আল্লামা আবদুল হাই লাখনাভী রাহ. (মৃ. ১৩০৪ হি.) বলেন,

ويَلتحِق بها جميعُ العقائد الدينية، فلا تثبت إلا بحديث صحيح أو حسن لذاته أو لغيره.

অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তাআলার সিফাত ও আকীদা-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সহীহ্ বা নির্ভরযোগ্য হাদীস ছাড়া অন্য কোনো হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।'[২০]

উল্লেখ্য, আমলের বিষয়ে যেভাবে ইজমা' বা সর্বসম্মত মাসআলা রয়েছে, আকীদা বিষয়েও রয়েছে। এর জন্য কয়েকটি কিতাবের নাম উল্লেখ করছি—

ইমাম আবুল হাসান আশআরী রাহ. (মৃ. ৩২৪ হি.)-এর 'রিসালাতুন ইলা আহলিছ-ছাগরি বিবাবিল আবওয়াব', ইবনে হাযম যাহেরী রাহ. (মৃ. ৪৫৬ হি.)-এর 'মারাতিবুল ইজমা', কাযী ইয়ায রাহ. (মৃ. ৫৪৪ হি.)-এর 'আশ-শিফা বি তা'রীফি হুকুকিল মুস্তাফা' (কিতাবদ্বয়ের শেষাংশে) ও ইবনুল কাত্তান ফাসী রাহ. (মৃ. ৬২৮ হি.)-এর 'আল-ইকনা' ফী মাসায়িলিল ইজমা'।

আকীদার ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহিদ গ্রহণযোগ্য কি না

আমাদের অনেকেই বলেন, খবরে ওয়াহিদ (সহীহ্ হাদীসের একটি প্রকার) দিয়ে আকীদা সাব্যস্ত হয় না, অথবা খবরে ওয়াহিদ আকীদার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়।

অথচ কথাটা এরূপ ব্যাপকভাবে বলা কিংবা এ থেকে ব্যাপকভাবে উদ্দেশ্য নেওয়া অগ্রহযোগ্য ও বাস্তবতা-বিবর্জিত।

এ বিষয়ে মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে 'খবরে ওয়াহিদ দিয়ে আকীদা সাব্যস্ত হয়

১৯. কিতাবুত তাওহীদ, ইবনে মান্দাহ, ৩/৩০৬
২০. মুকাদ্দামা ইবনিস সালাহ, পৃষ্ঠা ১০৩; যাফরুল আমানী, লাখনাভী, পৃষ্ঠা ২০১

না'—এই কথাটির মানে কী তা বুঝে নেওয়া দরকার।

খবর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হাদীস। আর ওয়াহিদ হলো হাদীসের একটি বিশেষ প্রকার, যেটা মুতাওয়াতির বা অকাট্য পর্যায়ের না। খবরে ওয়াহিদ যদি সহীহ্ সনদ বা সূত্রে বর্ণিত হয়, তবে এটি অকাট্য জ্ঞানের ফায়দা না দিলেও তা বিশ্বাস করা এবং এর ওপর আমল করা ওয়াজিব। উসূলুল হাদীস ও উসূলুল ফিকহের প্রায় কিতাবেই কথাটি আছে।

এখন 'খবরে ওয়াহিদ দিয়ে আকীদা সাব্যস্ত হয় না'-এর মানে হলো, এমন অকাট্য আকীদা সাব্যস্ত হয় না, যা অস্বীকার করলে ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে। অন্যথায় খবরে ওয়াহিদ সহীহ্ হলে তা বিশ্বাস করা এবং এর ওপর আমল করা ওয়াজিব—এই কথাটির কোনো অর্থ থাকে না।

মূলত আকীদার বিষয়গুলো দুইভাবে বিভক্ত :

ক. ঈমান-কুফরের সাথে সম্পৃক্ত। অর্থাৎ যে সকল আকীদা কেউ অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যাবে, যেমন : ঈমানের আরকান। কেননা, এগুলো অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। কাজেই এগুলোর ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহিদ অগ্রহযোগ্য তথা খবরে ওয়াহিদ দিয়ে ঈমান-কুফরের সাথে সম্পৃক্ত আকীদা সাব্যস্ত হয় না।

খ. যে সকল আকীদা ঈমান-কুফরের সাথে সম্পৃক্ত নয়, যেমন : নবীগণ কবরে জীবিত থাকার আকীদা। কেননা, এগুলো অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়। কাজেই এগুলোর ক্ষেত্রে খবরে ওয়াহিদ গ্রহণযোগ্য তথা খবরে ওয়াহিদ দিয়ে এ-জাতীয় আকীদা সাব্যস্ত হয়। তাই আকীদা ও ফাতাওয়ার কিতাবে খবরে ওয়াহিদ দ্বারা প্রমাণিত অনেক আকীদা ও আমল বিশ্বাস করতে বলা হয়েছে। এমনকি এগুলো অস্বীকারকারীকে ফাসেক ও গোমরাহ্ আখ্যায়িত করা হয়েছে।

মুহাক্কিক ইমাম ইবনুল হুমাম মাতুরীদী হানাফী রাহ. (মৃ. ৮৬১ হি.) লেখেন,

وما لم يجيء هذا المجيء، بل نقل آحادا... يكفّر الشاهد بإنكاره سؤال الملكين وإيجاب صدقة الفطر، ويفسّق الغائب به ويضلّل..؛ لأنه لمّا لم يسمعه مِن فيه: لم يكن ثبوته من النبي ﷺ قطعا، فلم يكن إنكاره تكذيبا له؛ بل للرواة، أو تغليطا لهم، وهو فسق وضلالة.

'যে সকল বিষয় অকাট্যভাবে প্রমাণিত নয়, বরং খবরে ওয়াহিদ দ্বারা প্রমাণিত—যেমন : কবরে দুই ফেরেশতার প্রশ্ন করা এবং সাদকায়ে ফিতরা ওয়াজিব হওয়া—এমন বিষয় রাসূল থেকে প্রত্যক্ষকারী (সরাসরি জেনেছেন এমন) ব্যক্তি অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যাবে।

আর অপ্রত্যক্ষকারী (সরাসরি না জানা) ব্যক্তি অস্বীকার করলে তাকে ফাসেক ও গোমরাহ বলা হবে। কেননা, সে সরাসরি রাসূলের মুখ থেকে শোনেনি। তাই তার

নিকট এটা রাসূল থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত নয়।

সুতরাং তার এ-জাতীয় বিষয় অস্বীকার করাটা রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হচ্ছে না; বরং (গ্রহণযোগ্য কোনো দলীল ও কারণ ছাড়া) বর্ণনাকারীদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা কিংবা ভুলের শিকার হয়েছে মনে করা হচ্ছে, যা ফাসেকী ও গোমরাহী।'[২১]

সুতরাং 'খবরে ওয়াহিদ দিয়ে আকীদা সাব্যস্ত হয় না'—এই কথা দিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয়গুলোকে প্রত্যাখ্যান করা ফাসেকী ও গোমরাহী।

তবে এখানে একটা শর্ত যোগ করতে হবে যে, খবরে ওয়াহিদ দ্বারা প্রমাণিত আকীদাটি যদি অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত কোনো আকীদার সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তখন গ্রহণযোগ্য হবে না।[২২]

কালামপন্থীরা কি আকল-যুক্তিকে নকলের ওপর প্রাধান্য দেয়?

আমরা জেনেছি যে, ঈমান-আকীদা প্রমাণিত হওয়ার উৎস হচ্ছে কুরআন, সহীহ হাদীস ও ইজমা'। অথচ কেউ কেউ বলেন, কালামপন্থী বা আশআরী-মাতুরীদীরা আকল-যুক্তির ব্যবহার করে এবং আকলকে নকল তথা কুরআন-হাদীসের ওপর প্রাধান্য দেয়। আর আমরাও বাস্তবে তা দেখতে পাই।

উত্তর :

সংক্ষেপে বলতে চাইলে, এখানে মূলত দুইটি দাবি করা হয়েছে।

১. আকল-যুক্তির ব্যবহার করা।

২. আকলকে নকলের ওপর প্রাধান্য দেওয়া।

এটা সত্য ও বাস্তব যে, অনেক ক্ষেত্রে আকল-যুক্তির ব্যবহার করা হয় এবং কোথাও কোথাও আকলকে নকলের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। কিন্তু এগুলোর যৌক্তিক কারণ ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং তা মূলনীতির আলোকে করা হয়েছে। যেমন : কিতাবের শুরুতে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণের ক্ষেত্রে এবং সিফাতের আলোচনায় দেখা যায়। নিম্নে এর যৌক্তিক কারণ ও প্রয়োজনীয়তা এবং মূলনীতি তুলে ধরছি।

কালামশাস্ত্রের আকীদার কিতাবসমূহে সাধারণত প্রথম পর্যায়ে আল্লাহর অস্তিত্ব আকলী দলীল তথা আকল-যুক্তির ব্যবহার করে সাব্যস্ত করা হয়। এরপর দ্বিতীয়

---

২১. আল-মুসায়ারাহ (খাতিমা), পৃষ্ঠা ২৯৯; আন-নিবরাস, ফারহারী, পৃষ্ঠা ৩৯ ও ৭৫৫

٢٢. قال ابن الهمام في «المسايرة» ص ١٩٠: ولا ينبغي في الإيمان بالأنبياء: القطعُ بحصرهم في عدد؛ لأن الوارد في ذلك خبر واحد. إن صح: وجب ظن مقتضاه، مع تجويز نقيضه. اهـ. وفي «شرح العقائد» للتفتازاني ص ١٧٧: ولا خفاء في أن هذه المسألة ظنية يكتفي فيها بالأدلة الظنية. اهـ. وانظر: «الشرح الكبير» لسعيد فودة ٢٦، «مقالات الأشعري» لابن فورك ص ٤١، و«نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى ﷺ قبل الآخرة» للشيخ الكوثري.

পর্যায়ে নকলী দলীল তথা কুরআন-হাদীস থেকে প্রমাণ তুলে ধরা হয়।

কেননা, এভাবে না করলে 'দাওর' বা পুনরাবৃত্তি আবশ্যক হবে। যেমন :

আল্লাহ্ আছেন কীভাবে বুঝব?

কুরআন বলেছে।

কুরআন যে সত্য কীভাবে বুঝব?

আল্লাহ্ বলেছেন।

আল্লাহ্ যে আছেন তার ভিত্তি?

কুরআন বলেছে।

কুরআন বললে সত্য হবে কেন?

আল্লাহ্ বলেছেন তাই।

এভাবে 'দাওর' বা পুনরাবৃত্তি হতেই থাকবে। আর যে স্রষ্টার অস্তিত্বই বিশ্বাস করে না, তাকে এর প্রমাণের জন্য 'কুরআন বলেছে' বলা হাস্যকর কাজ ছাড়া কিছু না। কারণ, যে আল্লাহকেই বিশ্বাস করে না, সে তাঁর কালামকে বিশ্বাস করার তো প্রশ্নই আসে না। তাই আকীদার কিতাবে আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে শুরুতে আকলী বা বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা করা হয়। নকলী দলীল সেখানে থাকে না অথবা দ্বিতীয় পর্যায়ে উল্লেখ করা হয়।

'শারহুল আকায়েদ'সহ কালামশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে আছে, ইলম বা জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম তিনটি :

১. পঞ্চইন্দ্রিয়, ২. নকল (খবরে সাদেক), ৩. আকল।

ইমাম গাযালী রাহ. (মৃ. ৫০৫ হি.) এ বিষয়ে বলেন,

وأهل النظر في هذا العلم يتمسكون أولا بآيات الله تعالى من القرآن، ثم بأخبار الرسول ﷺ، ثم بالدلائل العقلية والبراهين القياسية.

'এই ইলমের (আকীদার) অভিজ্ঞজনরা প্রথমত কুরআনের আয়াতকে দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করেন। এরপর রাসূলের হাদীসকে, অতঃপর আকল ও কিয়াসী বিষয়কে।'[২৩]

ইমাম মাতুরীদী রাহ. (মৃ. ৩৩৩ হি.) বলেছেন,

إنّ ما أقرّوا به واعتقدوه ثابت بالحجج السمعية والبراهين العقلية.

২৩. আর-রিসালাতুল লাদুন্নিয়্যাহ, গাযালী, পৃষ্ঠা ৩৮

'তারা যা আকীদা পোষণ করেন ও স্বীকার করেন, তা নকলী দলীল ও আকলী দলীল দ্বারা প্রমাণিত।'[২৪]

শায়খ যাহেদ কাউসারী রাহ. (মৃ. ১৩৭১ হি.) বলেন,

القول بمجرد الدليل العقلي في علم الشريعة بدعة وضلالة.

'ইসলামী শরীয়তে শুধু আকলী দলীলনির্ভর হওয়া বিদআত ও ভ্রষ্টতা।'[২৫]

অতীতের গোমরাহ ফেরকা মুতাযিলাদের আকীদাসমূহ ছিল শুধু 'আকলী দলীল'-নির্ভর। তাই যে আকীদা তাদের আকল ও যুক্তি-বুদ্ধির সাথে মিলত না, তারা সেটা প্রত্যাখ্যান করত। এ কারণেই তারা পথভ্রষ্ট ও বিদআতপন্থী।

কিন্তু আশআরী-মাতুরীদী ও কালামপন্থীদের আকীদা শুধু 'আকলী দলীল'-নির্ভর নয়; বরং নকলী দলীলের সাথে সাথে 'আকলী দলীল' দ্বারাও সমৃদ্ধ। অর্থাৎ প্রথমে নকলী দলীল থেকে আকীদা গ্রহণ করেন, এরপর 'আকলী দলীল' দ্বারা উক্ত আকীদাকে শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করেন।

কাজেই কালামপন্থীদের আকীদা শুধু আকলী দলীলনির্ভর নয় এবং আকল ও বুদ্ধির সাথে না মিললে কোনো আকীদা বা হাদীস প্রত্যাখ্যানেরও সুযোগ নেই।

দ্বিতীয় দাবি হচ্ছে, আকলকে নকলের ওপর প্রাধান্য দেওয়া। এটা সত্য যে, কোথাও কোথাও আকলকে নকল তথা কুরআন-হাদীসের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। কিন্তু কেন এবং এ ক্ষেত্রে মূলনীতি কী?

এর কারণ এবং এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হচ্ছে, আকল দুই ধরনের : অকাট্য ও সন্দেহপূর্ণ। নকলও দুই রকমের : অকাট্য ও সন্দেহপূর্ণ। আবার 'অকাট্য নকল' ও 'সন্দেহপূর্ণ নকল' দুই প্রকার : অকাট্য অর্থবোধক ও একাধিক অর্থবোধক।[২৬]

এগুলোর প্রত্যেকটার ভিন্ন ভিন্ন হুকুম আছে। তবে 'অকাট্য আকল'-এর সাথে

---

২৪. আন-নূরুল লামি' ওয়াল বুরহানুস সাতি', নাসিরী, পৃষ্ঠা ৩১৯

২৫. আল-আকীদা ও ইলমুল কালাম, পৃষ্ঠা ৫২

২৬. কাজেই ছয় প্রকার হলো :

১. অকাট্য আকল العقلي القطعي।

২. সন্দেহপূর্ণ আকল العقلي الظني।

৩. অকাট্য নকল ও অকাট্য অর্থবোধক القطعي نقلا ودلالة।

৪. অকাট্য নকল ও একাধিক অর্থবোধক القطعي نقلا والظني دلالة।

৫. সন্দেহপূর্ণ নকল ও অকাট্য অর্থবোধক الظني نقلا والقطعي دلالة।

৬. সন্দেহপূর্ণ নকল ও একাধিক অর্থবোধক الظني نقلا ودلالة।

এগুলোর প্রত্যেকটার ভিন্ন ভিন্ন হুকুম আছে। এখানে প্রথম প্রকার তথা 'অকাট্য আকল'-এর সাথে যদি পঞ্চম প্রকার তথা 'সন্দেহপূর্ণ নকল ও অকাট্য অর্থবোধক'-এর বিরোধ হয়, তখন শুধু 'অকাট্য আকল'কে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

যদি 'সন্দেহপূর্ণ নকল ও অকাট্য অর্থবোধক'-এর বিরোধ হয়, তখন শুধু 'অকাট্য আকল'কে প্রাধান্য দেওয়া হয়।[২৭] যেমন : একজন বলল, দুইয়ে দুইয়ে পাঁচ; অথবা বলল, আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্টির সাথে একীভূত বা কারও ভেতরে প্রবিষ্ট। এই উভয় বক্তব্য অকাট্য আকলের সাথে সাংঘর্ষিক ও বিরোধী। কেননা আকল বলে, দুইয়ে দুইয়ে পাঁচ নয়, বরং চার হয়। আর খালেক কখনো মাখলূকের সাথে একীভূত বা কারও ভেতরে প্রবিষ্ট হতে পারে না। কাজেই এমন কথা অবশ্যই ভুল। তাই এখানে 'অকাট্য আকল' প্রাধান্য পাবে।

বলাবাহুল্য, 'অকাট্য আকল' প্রাধান্য পাওয়ার এ মূলনীতি মুহাদ্দিসগণও গ্রহণ করেছেন, যা তাঁরা 'জাল হাদীস' চেনার আলোচনায় উল্লেখ করেছেন।

অকাট্য আকল আর বিজ্ঞান এক নয়

এখানে একটু সতর্ক করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি যে, কেউ কেউ ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রাহ.[২৮]-সহ কারও কারও বক্তব্য থেকে ভুল বোঝেন এবং বলেন, 'আগে আকল ও বিজ্ঞান, তারপর নকল ও ওহী!'

অথচ 'অকাট্য আকল' আর 'বিজ্ঞান' এক নয়। কেননা, বিজ্ঞান পরিবর্তনশীল এবং কিছু দিন পরপর পরিবর্তন হয়। কিন্তু ইমাম রাযী-সহ অন্যরা যেটা বলেছেন তা হলো, দুইয়ে দুইয়ে চারের মতো 'অকাট্য আকল' ও অকাট্য জ্ঞানের কথা, যা কখনো পরিবর্তন হয় না, হতেই পারে না।

---

২৭. আকায়িদুল আশাঈরা, ইদলীবী, পৃষ্ঠা ৮০-৯০, দারুর রায়াহীন
উল্লেখ্য, কখনো কোনো অকাট্য নকলের (কুরআন-হাদীসের) সাথে অকাট্য আকলের বিরোধ হয় না। এটা অসম্ভব। সবিস্তারে জানতে দেখুন, শায়খ মুস্তফা সাবরী রাহ.-এর 'মাওকিফুল আকল ওয়াল ইলম ওয়াল আলম'।

২৮. ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রাহ. (মৃ. ৬০৬ হি.) 'মাআলিমু উসুলিদ দ্বীন' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৪৮) বলেন,

وأما الظَّواهِر النقلية المشعرة بالجسمية والجهة: فالجَواب الكُلِّي عَنْها: أن القواطع العَقْلِيَّة دلَّت على امْتناع الجسمية والجهة، والظواهر النقلية مشعرة بِحُصُول هَذا المَعْنى، والجمع بَين تصديقهما محال، وإلّا لزم اجْتِماع النقيضين، والجمع بَين تكذيبهما محال، وإلّا لزم الخُلُو عَن النقيضين، والقَوْل بترجيح الظَّواهِر النقلية على القواطع العَقْلِيَّة محال، لأن النَّقْل فرع على العقل، فالقدح فِي الأصْل لتصحيح الفَرْع يُوجب القدح فِي الأصْل والفرع مَعًا، وهُوَ باطِل، فَلم يبْق إلّا الإقْرار بِمُقْتَضى الدَّلائِل العَقْلِيَّة القطعية، وحمل الظَّواهِر النقلية: إمّا على التَّأْوِيل، وإمّا على تَفْوِيض علمها إلى الله سُبْحانَهُ وتَعالى، وهُوَ الحق.

"নকল তথা কুরআন-হাদীসের বাহ্যিক পাঠ থেকে যদি আল্লাহ্ তাআলা দেহ ও দিকবিশিষ্ট হওয়া বোঝা যায়, তাহলে এর মৌলিক জবাব হলো, 'অকাট্য আকল' দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি দেহ ও দিকবিশিষ্ট হওয়া অসম্ভব। অন্যদিকে নকল তথা কুরআন-হাদীসের বাহ্যিক পাঠ বলছে, সম্ভব। আর এই দুই সাংঘর্ষিক বক্তব্যের উভয়ের একই সাথে সঠিক হওয়া সম্ভব না, আবার দুইটা একই সাথে বেঠিক হওয়াও সম্ভব না। (সুতরাং একটাকে অন্যটার ওপর প্রাধান্য দিতে হবে।)

এখন বাহ্যিক পাঠকে অকাট্য আকলের ওপর প্রাধান্য দেওয়া অসম্ভব। কারণ, বাহ্যিক পাঠ অকাট্য আকলের একটি শাখা। যদি শাখা ঠিক রাখতে গিয়ে শিকড় উপড়ে ফেলা হয়, তাহলে শিকড় ও শাখা দুটোই উপড়ে ফেলা হবে। আর এটা বাতিল। সুতরাং সমাধানের একক পথ হলো, অকাট্য আকলকে নিজ জায়গায় ঠিক রাখতে হবে এবং বাহ্যিক পাঠকে এর সাথে সংগতি রেখে তাবীল বা ব্যাখ্যা করতে হবে অথবা এই বাহ্যিক পাঠের সঠিক ব্যাখ্যা কী হবে, তার জ্ঞান তাফবীয বা আল্লাহর কাছে সোপর্দ করে দিতে হবে। আর এটাই সঠিক পথ।"

এ কারণেই কখনো অকাট্য নকলের সাথে অকাট্য আকলের বিরোধ হয় না, হওয়া অসম্ভব। যদি হয়, তাহলে আকল ও যুক্তি-বুদ্ধি অকাট্য না হওয়ার কারণে হবে; অন্যথায় নয়। কাজেই 'অকাট্য আকল' আর 'বিজ্ঞান' কখনো এক নয়।

ভালোভাবে জেনে রাখা দরকার, কুরআন-হাদীস থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণিত ও সর্বসম্মত ইসলামের কোনো বিষয় অযৌক্তিক ও অবৈজ্ঞানিক নয় এবং ইসলামে বিবেক-বিরুদ্ধ কোনো কথা নেই। কেননা, ওহীর জ্ঞানের সাথে এসবের কোনো দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সাংঘর্ষিক অবস্থান হতেই পারে না।

তবে হ্যাঁ, ইসলামে বিবেকের ঊর্ধ্বের কথা আছে। আর যেটাকে বিবেক-বিরুদ্ধ মনে করা হচ্ছে কিংবা ওহীর জ্ঞানের সাথে এসবের সাংঘর্ষিক অবস্থান পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা হয়তো কুরআন-হাদীসেরই কথা নয়। কিংবা কুরআন-হাদীসে আছে, কিন্তু বুঝতে ভুল হয়েছে। ফলে বিবেক-বিরুদ্ধ ও সাংঘর্ষিক অবস্থান মনে হয়েছে। অথবা কুরআন-হাদীসের বিপরীতে যেটাকে বিবেক ও বিজ্ঞান মনে করছি, সেটা আসলে স্বীকৃত বিবেক ও বিজ্ঞান নয়।

এ বিষয়ে সংক্ষেপে ও বিস্তারিতভাবে অনেকে আলোচনা করেছেন। তবে সবচেয়ে সুন্দর ও সারগর্ভ আলোচনা করেছেন হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রাহ. 'আল-ইনতিবাহাতুল মুফীদাহ আনিল ইশতিবাহাতিল জাদীদাহ' কিতাবে।[২৯]

ইলমুল কালাম কী ও কেন?

ঈমান-আকীদার বিষয়গুলোর যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন এবং বিদআতপন্থীদের চিন্তাধারা খণ্ডন করার নাম 'ইলমুল কালাম' বা কালামশাস্ত্র। আল্লামা ইবনে খালদুন রাহ. (মৃ. ৮০৮ হি.) বলেন,

هو علم يتضمّن الحجاج عن العقائد الإيمانيّة بالأدلّة العقليّة، والرّدّ على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السّلف وأهل السّنّة.

'কালামশাস্ত্রে যৌক্তিক দলীলের আলোকে ঈমান-আকীদার বিষয়গুলো নিয়ে বিতর্ক

---

২৯. এটাকে মুফতী তাকী উসমানী সাহেবের তত্ত্বাবধানে Answer to Modernism নামে ইংরেজিতে রূপান্তর করা হয়, যা পাশ্চাত্যের মুসলিম সমাজে সাড়া ফেলে। অতঃপর মূল পুস্তিকার নামেই একে আরবী ভাষায় রূপান্তর করা হয়। আর বাংলায় এর দুটি অনুবাদ রয়েছে। একটা হচ্ছে, হযরত মাওলানা আব্দুল গাফফার সাহেবের **'ইসলামী আকীদা বিশ্বাসে উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব'** নামে। আরেকটার নাম হলো, **'বিবেকের আদালত ও ইসলামী আকিদা বিশ্বাস'**, এর অনুবাদক মাওলানা শাব্বীর আহমদ, ঢালকানগর। তবে দ্বিতীয়টাতে মূল বইয়ের অনুবাদ ছাড়াও 'বিবেক-বুদ্ধির কার্যক্ষেত্রের সীমারেখা' নামক শিরোনামে মুফতী তাকী সাহেবের অনেক উপকারী একটি বয়ানের অনুবাদ এবং সবশেষে গুরুত্বপূর্ণ ৯টি বিষয় সম্পর্কে আকীদার বিবরণ সংযোজন করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, হাকীমুল উম্মত থানভীর মুজাযে বাইআত হযরত মাওলানা মুস্তফা খান বিজনূরী রাহ. 'ইসলাম আওর আকলিয়াত' নামে মূল পুস্তিকাটির বড় ধরনের ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচনা করেছেন। আবার হযরত মাওলানা নূর আলম খলীল আমীনী রাহ. 'আল-ইসলাম ওয়াল আকলানিয়্যাহ' নামে এর আরবীও করেছেন।

এবং সালাফ ও আহলুস সুন্নাহর আকীদা থেকে বিচ্যুত বিদআতপন্থীদের খণ্ডন অন্তর্ভুক্ত থাকে।'[৩০]

এ কথা উল্লেখ হয়েছে যে, ঈমান-আকীদার মূল উৎস হচ্ছে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা'। কাজেই যে ব্যক্তি ইসলামে পূর্ণ বিশ্বাসী এবং তার অন্তর প্রশান্ত, তার জন্য যৌক্তিক দলীল বা অন্য কিছুর দরকার নেই।

কিন্তু যে ইসলামকেই বিশ্বাস করে না, তার সামনে কুরআন-সুন্নাহ থেকে প্রমাণ দিলে এই প্রমাণ তার কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। এভাবে যে ব্যক্তি ইসলামে বিশ্বাসী, তবে বিদআতপন্থী বা সংশয়গ্রস্তদের বাহ্যত যৌক্তিক দলীল দেখার কারণে তার অন্তর ভালোভাবে প্রশান্ত নয় অথবা বিভ্রান্ত হয় কিংবা সংশয় দেখা দেয়, তখন কেবল কুরআন-সুন্নাহ থেকে প্রমাণ দিলে এর সমাধান হবে না।

বরং এ ক্ষেত্রে করণীয় হলো, ঈমান-আকীদার বিষয়গুলোসহ যাবতীয় কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা ও নির্দেশনার যৌক্তিকতা, যথার্থতা, কার্যকারিতা, উপকারিতা ও ফলপ্রসূতা তুলে ধরা এবং বিবেকের সঙ্গে সামঞ্জস্য দেখানো। যাতে অমুসলিমদের ইসলাম নিয়ে ভাবার পথ সুগম হয় এবং মুসলিমের অন্তর ভালোভাবে প্রশান্ত হয়, বিভ্রান্তি নিরসন হয় ও সংশয় দূরীভূত হয়।

বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রের যুক্তি যেভাবে মানুষ মেনে নিতে বাধ্য হয়, সেভাবে যদি কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষাকে সঠিক যৌক্তিক দলীলের আলোকে তুলে ধরা হয়, তাও মানতে বাধ্য হবে। সুতরাং এ ধরনের লোকের জন্য কুরআন-সুন্নাহর সাথে আকল ও যুক্তির ব্যবহার ছাড়া উপায় নেই। আশআরী-মাতুরীদী ও মুতাকাল্লিম তথা কালামশাস্ত্র চর্চাকারীরা মূলত 'ইলমুল কালাম' চর্চা করে এ কাজটাই করেছে।

অথচ ঢালাওভাবে 'ইলমুল কালাম' নিয়ে এবং আশআরী-মাতুরীদী ও কালামশাস্ত্র চর্চাকারীদের ওপর অপবাদ আরোপ করা হয়, অবাস্তব তথ্য দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়। যেমন বলা হয়, 'ইলমুল কালাম' দর্শনভিত্তিক, আর 'ইলমুল আকীদা' ওহীভিত্তিক; 'ইলমুল কালাম' হলো কুরআন-সুন্নাহবিহীন তর্কশাস্ত্র বা যুক্তিবিদ্যা; 'ইলমুল কালাম' মানে ফালসাফা বা গ্রিক-দর্শন; অথবা দাবি করা হয়, 'ইলমুল কালাম'-এর কারণে আশআরী-মাতুরীদীরা আকীদায় বিভ্রান্ত ও সিফাতের মাসআলায় বিচ্যুত হয়েছে!

কিন্তু এগুলোর কোনোটাই সত্য ও সঠিক নয়।

---

৩০. তারীখে ইবনে খালদুন, ১/৫৮০, দারুল ফিকর; আরও দেখুন, মিফতাহুস সাআদাহ, তাশ কুবরী যাদাহ, ২/১৩২

সালাফ ও ইমামগণ ইলমুল কালামের নিন্দা ও সমালোচনা করেছেন কেন?

প্রশ্ন : যদি 'ইলমুল কালাম' খারাপ কিছু না হয়, তাহলে সালাফ ও ইমামগণ এটাকে বিদআত ও হারাম আখ্যা দিয়েছেন কেন? এবং এর নিন্দা করেছেন কেন? যেমন : আবু হানীফা রাহ. বলেন, 'আমি দেখলাম, কালামচর্চায় লিপ্ত মানুষগুলোর প্রকৃতি ও প্রকাশ নেককার মানুষদের মতো নয়। তাদের হৃদয়গুলো কঠিন, মন ও প্রকৃতি কর্কশ এবং তারা কুরআন-সুন্নাহর বিরোধিতা করার বিষয়ে বেপরোয়া। কালামচর্চা যদি কল্যাণকর হতো, তাহলে অবশ্যই সালাফগণ এর চর্চা করতেন।'[৩১]

আবু ইউসুফ রাহ. বলেছেন, 'কালাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করাই অজ্ঞতা। আর এ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা জ্ঞান। কোনো ব্যক্তি যখন কালামের শিরোদেশে পৌঁছে যায়, তখন সে যিন্দীকে পরিণত হয় বা যিন্দীক লকব পায়।' তিনি আরও বলেন, 'কালাম চর্চাকারী (মুতাকাল্লিম) হক কথা বললেও তার পেছনে নামাজ বৈধ নয়।'[৩২]

ইমাম শাফেয়ী রাহ. বলেন, 'আহলে কালামের ব্যাপারে আমার রায় হলো, তাদের খেজুরের ডাল দিয়ে পেটানো হবে। পাড়ায়-মহল্লায় তাদের ঘোরানো হবে। যারা কুরআন-সুন্নাহ ছেড়ে কালামে মগ্ন হয়, তাদের এটাই শাস্তি।' বরং তাঁর থেকে আরও বর্ণিত আছে, 'শিরক ছাড়া অন্য কোনো গুনাহ নিয়ে আল্লাহর সামনে উপস্থিত হওয়া, কালাম নিয়ে উপস্থিত হওয়ার চেয়ে উত্তম।'

ইমাম আহমদ রাহ. বলেন, 'কালামের অধিকারী কখনো সাফল্য লাভ করে না। আর কালামের মাঝে প্রবেশকারী ব্যক্তির হৃদয় অবশ্যই নষ্ট হয়ে যায়।'[৩৩]

উত্তর :

'ইলমুল কালাম'-এর বিপক্ষে এমন নিন্দা ও সমালোচনা আরও পাবেন, আবার এর স্বপক্ষেও অনেক প্রশংসা ও উৎসাহ পাবেন। তো এর পক্ষে-বিপক্ষে প্রশংসা ও নিন্দার প্রধান কারণ হলো, 'ইলমুল কালাম' দুই প্রকার : বিদআতীদের 'ইলমুল কালাম' আর হকপন্থীদের 'ইলমুল কালাম'। অর্থাৎ যুক্তি প্রয়োগের দুটো দিক রয়েছে :

১. বিবেককে লাগামহীনভাবে যুক্তিপূজারী হিসেবে ছেড়ে দেওয়া। যেমন : নিজ বুঝ ও মস্তিষ্ক দ্বারা যদি যুক্তির সঙ্গে কুরআন-সুন্নাহর সামঞ্জস্য দেখতে পাওয়া না যায়, তাহলে আকীদা এবং ইসলামের শিক্ষা ও নির্দেশনা প্রত্যাখ্যান করা।

২. আকল ও যুক্তিকে কুরআন-সুন্নাহর অনুগামী বানিয়ে নিজেদের আকীদার পক্ষে

---

৩১. মানাকিবে আবী হানীফা, কারদারী, পৃষ্ঠা ১৩৮; তবাকাতুল হানাফিয়্যাহ, কুরাশী
৩২. তারীখে বাগদাদ, খতীব বাগদাদী, ৭/৫৩৮; ফাতহুল কাদীর, ইবনুল হুমাম, ১/৩৫১
৩৩. জামিউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী, ইবনে আব্দিল বার, ২/৯৩৯-৯৪১

শক্ত দলীল ও যুক্তি উপস্থাপন এবং বিদআতী চিন্তাধারা ও ভ্রান্ত আকীদার যৌক্তিক খণ্ডন করা।

ইসলামের প্রথম দিকে তথা হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে 'ইলমুল কালাম' বলতে কুরআন-সুন্নাহর বিপরীতে বিদআতপন্থীদের যুক্তিতর্ক এবং ওহীর বিপরীতে তাদের আকলকে কেন্দ্র করে ঈমান ও আকীদাচর্চা বোঝানো হতো। অর্থাৎ বিদআতপন্থীরা কালামশাস্ত্রের মাধ্যমে তাদের বিদআতী চিন্তাধারা প্রমাণের অপচেষ্টা চালাত। ফলে মুতাযিলা, কাদেরিয়া, মুরজিয়া ও জাহমিয়া সম্প্রদায়ের ভ্রান্ত বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গিগুলো 'কালামশাস্ত্র' নামে পরিচিতি পায়। তখন বিদআতীদের মধ্যে প্রধানতম ছিলেন : ওয়াসেল বিন আতা, আমর ইবনে উবাইদ, মা'বাদ জুহানী, জাহম ইবনে সাফওয়ান, গাইলান দিমাশকী ও বিশর আল-মারীসী প্রমুখ।

এখন 'ইলমুল কালাম' বা কালামশাস্ত্রের বিপক্ষে যারা নিন্দা করেছেন, তারা প্রথম প্রকার তথা বিদআতপন্থীদের 'ইলমুল কালাম' উদ্দেশ্য নিয়েছেন। আর যারা প্রশংসা করেছেন, তারা দ্বিতীয় প্রকার তথা হকপন্থীদের 'ইলমুল কালাম'-এর স্বপক্ষে বলেছেন। ইমাম বায়হাকী শাফেয়ী রাহ. (মৃ. ৪৫৮ হি.) বলেন,

إنما أراد الشافعي بهذا كلامَ حفصٍ وأمثالِه من أهل البِدَع، وهكذا مراده بكل ما حُكي عنه في ذمّ الكلام وذم أهله.

'ইমাম শাফেয়ী রাহ. থেকে কালামশাস্ত্র ও কালাম চর্চাকারীদের ব্যাপারে যত নিন্দা বর্ণিত আছে, এগুলো থেকে বিদআতপন্থীদের কালাম উদ্দেশ্য।'

ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. ও ইমাম মালেক রাহ. যে 'ইলমুল কালাম' গ্রহণকারীকে যিন্দীক বলেছেন, সে সম্পর্কে তিনি বলেন,

وإنما يريد – والله أعلم – بالكلام: كلامَ أهل البدع؛ فإن في عصرهما إنما كان يُعرَف بالكلام أهلُ البدع، فأما أهل السنة فقلما كانوا يخوضون في الكلام حتى اضطُرُّوا إليه بعدُ.

"এ থেকে বিদআতপন্থীদের কালাম উদ্দেশ্য। কেননা, তাদের যুগে (তৃতীয় শতাব্দী) কালাম বলতে বিদআতীদের কালাম পরিচিত ছিল। আর আহলুস সুন্নাহ 'ইলমুল কালাম' বিষয়ে খুবই কম নিবিষ্ট হতেন, পরবর্তী সময়ে তাঁরা এতে নিবিষ্ট হতে বাধ্য হয়েছেন।"[৩৪]

প্রখ্যাত ইমাম ইবনে আসাকির রাহ. (মৃ. ৫৭১ হি.) 'তাবয়ীনু কাযিবিল মুফতারী' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৬০১-৬৩৩) বায়হাকীর উপরিউক্ত ব্যাখ্যার স্বপক্ষে অনেকের বর্ণনা ও বক্তব্য উল্লেখ করেছেন।

---

৩৪. তাবয়ীনু কাযিবিল মুফতারী, ইবনে আসাকির, পৃষ্ঠা ৬১২, ৬০২, তাহকীক : আনাস শারফাবী, দারুত তাকওয়া

এভাবে ইমাম আবু ইউসুফ যে বলেছেন, 'কালাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করাই অজ্ঞতা। আর কালাম সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা জ্ঞান। কোনো ব্যক্তি যখন কালামের শিরোদেশে পৌঁছে যায়, তখন সে যিন্দীক হয়'—এ কথা তিনি বিশর আল-মারীসীকেই লক্ষ্য করে বলেছিলেন। কেননা, এর বর্ণনাকারী বাশশার বিন মুসা শুরুতেই বলেন, 'আমি আবু ইউসুফকে শুনতে পেয়েছি যে, তিনি বিশর আল-মারীসীকে বলছেন, 'কালাম...।' আর বক্তব্যটি এখানেই শেষ নয়; বরং এরপর তিনি বলেছেন, 'হে বিশর, তুমি নাকি কুরআন নিয়ে কথা বলছ। যদি আল্লাহর জন্য ইলম সাব্যস্ত করো, তাহলে নিজেই নিজেকে খণ্ডন করলে। আর যদি আল্লাহর জন্য ইলম অস্বীকার করো, তাহলে তো কুফরী করলে।'[৩৫]

পুরো বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়, ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. মূলত বিশরের কালামচর্চার পরিণতি দেখে কালামের নিন্দা ও সমালোচনা করেছেন। কাজেই এটা হকপন্থী কালামশাস্ত্রের সমালোচনা নয়; বরং বিদআতপন্থী কালামশাস্ত্রের সমালোচনা হিসেবে গণ্য হবে, যা ইমাম বায়হাকীও বলেছেন।

'ফাতাওয়া বাযযাযিয়্যাহ' প্রণেতা ইমাম কারদারী রাহ. (মৃ. ৮২৭ হি.) লেখেন,

ويجوز أن يراد بالكلام المنهي عنه: كلام الحكماء لا كلام المشائخ.

'ইমামগণ যে কালাম নিষিদ্ধ করেছেন, সেটা হলো হুকামা তথা দার্শনিকদের কালাম; মাশায়েখের কালাম নয়।'[৩৬]

আর অনেকেই বলেছেন, এককথায় কালামশাস্ত্রকে ভালো কিংবা মন্দ বলার সুযোগ নেই। কেননা, এর মাঝে উপকার ও অপকার, ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক—দুটোই আছে। সুতরাং এর ব্যবহারকারীর উদ্দেশ্যে, মাত্রা ও ব্যবহারের পদ্ধতির আলোকে তা নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে, অন্যথায় নয়।

আকীদার অন্যতম ইমাম গাযালী রাহ. (মৃ. ৫০৫ হি.) বলেন,

فاعلم أن الحق فيه: أن إطلاق القول بذمه في كل حال، أو بحمده في كل حال خطأ...

'জেনে রাখো, সঠিক কথা হলো, 'ইলমুল কালাম' বা কালামশাস্ত্রকে এককথায় ভালো কিংবা মন্দ বলার সুযোগ নেই।'[৩৭]

'ফাতাওয়া তাতারখানিয়্যাহ' গ্রন্থে 'সিরাজিয়্যাহ'র উদ্ধৃতিতে এসেছে, 'একদল আলেম 'ইলমুল কালাম' চর্চা করতে নিষেধ করেছেন। এটা মূলত দ্বীন নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ করার নিষেধাজ্ঞার ওপর আরোপিত হবে। কিংবা যখন বিতর্ককারী অদূরদর্শী

---

৩৫. তারীখে বাগদাদ, খতীব বাগদাদী, ৭/৫৩৮
৩৬. মানাকিবে আবু হানীফা, পৃষ্ঠা ১৩৯
৩৭. ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, ১/৯৭

হবে (তখন সে বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে)। অথবা সত্যের জয়ের জন্য নয়, নফসের জন্য লড়াই করবে। কিন্তু এসব নিষিদ্ধ বিষয়ের পরিবর্তে এটা যদি তাওহীদ, নবুওয়াত এবং ইসলামের অন্যান্য আকীদা জানার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়, তাহলে এমন কালাম নিষিদ্ধ নয়।'[৩৮]

ইবনুল হুমাম হানাফী রাহ. লেখেন, 'ইমাম আবু হানীফা রাহ. তাঁর সন্তান হাম্মাদকে একদিন কালাম নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখে নিষেধ করলে হাম্মাদ বললেন, আমি আপনাকে এ শাস্ত্র চর্চা করতে দেখেছি, অথচ আমাকে নিষেধ করছেন কেন?

ইমাম বললেন, আমরা এটা নিয়ে মুনাযারা করার সময় আতঙ্কিত থাকতাম যেন কেউ বিভ্রান্ত না হই। আর তোমরা এখন এটা নিয়ে মুনাযারা করোই প্রতিপক্ষকে গোমরাহ করতে। আর যে ব্যক্তি এমন কামনা করে, সে মূলত তার কুফর কামনা করে। আর যে অন্যের কুফর কামনা করে তার আগেই নিজে তাতে পতিত হয়। এটা নিষিদ্ধ। ফলে এ ধরনের মুতাকাল্লিমের পেছনে নামাজ হবে না।'

ফকীহ্ আবু জাফর বলখী (প্রকাশ হিন্দুওয়ানী) রাহ. (মৃ. ৩৬২ হি.) বলেন,

يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ: مَنْ يَنَاظِرُ فِي دَقَائِقِ عِلْمِ الْكَلَامِ.

'ইমাম আবু ইউসুফ যে বলেছেন, "কালাম চর্চাকারী (মুতাকাল্লিম) হক কথা বললেও তার পেছনে নামাজ পড়া বৈধ নয়।" এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ওই ব্যক্তি, যে ইলমুল কালামের সূক্ষ্ম ও অত্যন্ত গভীরের বিষয়গুলোতে নিবিষ্ট হয়।'[৩৯]

তাফতাযানী রাহ. (মৃ. ৭৯২ হি.) 'শারহুল আকায়েদ'-এর শুরুতে লেখেন,

وَمَا نُقِلَ عَنِ السَّلَفِ مِنَ الطَّعْنِ فِيْهِ وَالْمَنْعِ عَنْه، فَإِنَّمَا هُوَ: لِلْمُتَعَصِّبِ فِيْ الدِّيْنِ، وَالقَاصِرِ عَنْ تَحْصِيْلِ الْيَقِيْنِ، وَالقَاصِدِ إِلَى إِفْسَادِ عَقَائِدِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَالخَائِضِ فِيْمَا لَا يَفْتَقِرُ إِلَيْهِ مِن غَوَامِضِ الْمُتَفَلْسِفِيْنَ، وَإِلَّا فَكَيْفَ يُتَصَوَّرُ الْمَنْعُ عَمَّا هُوَ أَصْلُ الوَاجِبَاتِ وَأَسَاسُ الْمَشْرُوْعَاتِ!

'সালাফ থেকে কালামের সমালোচনা এবং এটা চর্চায় নিষেধাজ্ঞা হলো (চার ব্যক্তির জন্য) : ১. যে দ্বীনী বিষয়ে (সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও) গোঁড়ামিকারী, ২. যে ইয়াকিন হাসিল করতে অক্ষম (ইয়াকিন আসার পরিবর্তে বিনষ্ট হয়), ৩. যে মুসলমানদের আকীদা বরবাদ করতে চায় এবং ৪. যে অপ্রয়োজনীয় ও অত্যন্ত সূক্ষ্ম ফালসাফা (দর্শন) চর্চা করে। অন্যথায় এ শাস্ত্র (যাতে মূলত তাওহীদ ও আকায়েদ নিয়ে আলোচনা হয়) সর্বপ্রধান ওয়াজিব এবং সকল আমলের ভিত্তি। এটার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা কী করে সম্ভব?'

৩৮. ফাতাওয়া তাতারখানিয়্যাহ, ১৮/২৭৬
৩৯. ফাতহুল কাদীর, ১/৩৫১; মানাকিবে আবী হানীফা, কারদারী, পৃষ্ঠা ১৩৮-৩৯

ইমাম হালীমী রাহ. (মৃ. ৪০৩ হি.) ও বায়হাকী রাহ. (মৃ. ৪৫৮ হি.) বলেন,

‘উমর ইবনে আবদুল আযীয রাহ.-সহ অন্যান্য সালাফ কালামের মাঝে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। কারণ, তারা মনে করতেন, বিশুদ্ধ দ্বীন বোঝার জন্য এটার প্রয়োজন নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব দলীল-প্রমাণ নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন সেগুলো তাওহীদ-নবুওয়াত ইত্যাদি প্রমাণের জন্য যথেষ্ট। উপরন্তু তারা ভয় করতেন, যদি ‘ইলমুল কালাম’-এর দরজা সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, তাহলে অদূরদর্শী লোকেরা তাতে বিভ্রান্ত হবে এবং অবিশ্বাসীদের জালে ফেঁসে যাবে। সাঁতার সম্পর্কে অনভিজ্ঞ লোককে সমুদ্রে ফেললে যেমন হয়, তাদের অবস্থাও তেমন হবে।

‘ইলমুল কালাম’ থেকে তাদের নিষেধাজ্ঞা এ কারণে নয় যে, মৌলিকভাবে এটা নিন্দনীয় ও অনুপকারী শাস্ত্র। এমন এক শাস্ত্র যার মাধ্যমে আল্লাহকে জানা যায়, তাঁর গুণাবলি চেনা যায়, রাসূলদের সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়, যার মাধ্যমে সত্য নবী ও মিথ্যা নবীর মাঝে পার্থক্য করা যায়, সেটা কীভাবে নিন্দনীয় শাস্ত্র হতে পারে? তাই কালামশাস্ত্রের ক্ষেত্রে তাদের নিষেধাজ্ঞা ছিল মূলত বিভ্রান্তি থেকে দুর্বলচিত্তের মানুষদের বাঁচানোর জন্য।’[৪০]

কাযী আবুল ইউসর বাযদাবী হানাফী রাহ. (মৃ. ৪৯৩ হি.) লেখেন,

‘ইলমুল কালাম চর্চার ব্যাপারে আলেমগণ মতভেদ করেছেন। অধিকাংশ মুতাকাল্লিম এটাকে সম্পূর্ণ বৈধ বলেছেন। আশআরী ও মুতাযিলাদের মত এটাই। কিন্তু অধিকাংশ মুহাদ্দিস এটাকে অবৈধ বলেছেন।

ইমাম আবু হানীফা রাহ. প্রথম-জীবনে এটা চর্চা করেছেন। তিনি ‘আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম’ গ্রন্থে কালামচর্চার পক্ষে সম্মতি দিয়েছেন; বরং এটাকে যুদ্ধের হাতিয়ারের সঙ্গে তুলনা করেছেন...। কিন্তু আমাদের অঞ্চলের অধিকাংশ ফকীহ ও ইমাম মানুষকে প্রকাশ্যে এটা শিখতে, শেখাতে এবং এ বিষয়ে বিতর্ক করতে নিষেধ করেন...। আমরা আকীদা ও ফিকহ উভয় ক্ষেত্রে আবু হানীফাকে অনুসরণ করি।

তিনি (একসময়) কালাম শেখা, শিক্ষাদান ও এ বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন ইত্যাদি সবই বৈধ বলতেন। কিন্তু জীবনের শেষদিকে তিনি কালাম নিয়ে মুনাযারা পরিত্যাগ করেন এবং তাঁর শাগরিদদের এ নিয়ে মুনাযারা করতে নিষেধ করেন। তিনি তাদের যেভাবে প্রকাশ্যে ফিকহ শিক্ষা দিতেন, এটা সেভাবে শেখাতেন না...।

তবে দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো যেহেতু দলীলসহ জানা দরকার, তাই ইলমুল কালাম শেখা বৈধ; বরং কখনো কখনো ফরজে কিফায়া। আর যে এটা শিখবে, সবার

---

৪০. আল-মিনহাজ ফী শুআবুল ঈমান, হালীমী, ১/১৪৯-৫০; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, ১/১৮১

কাছ থেকে শিখবে না; বরং ভালো আলেম ও আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআহর আকীদার ওপর প্রতিষ্ঠিত এ শাস্ত্রে ইমাম পর্যায়ের ব্যক্তি থেকে শিখবে।'[৪১]

এবার কয়েকজন হাম্বলী আলেমের বক্তব্যও দেখুন।

প্রখ্যাত হাম্বলী ফকীহ্ ইবনে মুফলিহ্ রাহ. (মৃ. ৭৬৩ হি.), যিনি ইবনে তাইমিয়ার সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ও প্রশংসিত এবং ইবনুল কায়্যিমের ভাষ্যানুযায়ী ইমাম আহমদের মাযহাব সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞাত ছিলেন, তিনি 'ইলমুল কালাম' বিষয়ে চমৎকারভাবে বলেন,

وَالصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ أَنَّ عِلْمَ الْكَلَامِ مَشْرُوعٌ مَأْمُورٌ بِهِ، وَتَجُوزُ الْمُنَاظَرَةُ فِيهِ وَالْمُحَاجَّةُ لِأَهْلِ الْبِدَعِ، وَوَضْعُ الْكُتُبِ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ، وَإِلَى ذَلِكَ ذَهَبَ أَئِمَّةُ التَّحْقِيقِ الْقَاضِي، وَالتَّمِيمِيُّ فِي جَمَاعَةِ الْمُحَقِّقِينَ... وَقَدْ صَنَّفَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ كِتَابًا فِي الرَّدِّ عَلَى الزَّنَادِقَةِ وَالْقَدَرِيَّةِ فِي مُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ، وَاحْتَجَّ فِيهِ بِدَلَائِلِ الْعُقُولِ... وَمَا تَمَسَّكَ بِهِ الْأَوَّلُونَ مِنْ قَوْلِ أَحْمَدَ فَهُوَ مَنْسُوخٌ. قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: قَدْ كُنَّا نَأْمُرُ بِالسُّكُوتِ فَلَمَّا دُعِينَا إِلَى أَمْرٍ مَا كَانَ بُدٌّ لَنَا أَنْ نَدْفَعَ ذَلِكَ، وَنُبَيِّنَ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَنْفِي عَنْهُ مَا قَالُوهُ. ثُمَّ اسْتَدَلَّ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: ١٢٥]. وَبِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْ رُسُلِهِ الْجِدَالُ، وَلِأَنَّ بَعْضَ اخْتِلَافِهِمْ حَقٌّ، وَبَعْضَهُ بَاطِلٌ وَلَا سَبِيلَ إِلَى التَّمْيِيزِ بَيْنَهُمْ إِلَّا بِالنَّظَرِ فَعَلِمْتَ صِحَّتَهُ.

'বিশুদ্ধ মাযহাব মতে 'ইলমুল কালাম' শেখা বৈধ ও অনুমোদিত। এটার সহায়তায় বিদআতপন্থীদের সঙ্গে মুনাযারা এবং তাদের খণ্ডন করা, তাদের বিরুদ্ধে গ্রন্থ লেখা জায়েয। এটাই (হাম্বলী মাযহাবের) মুহাক্কিক ইমামদের মত...। ইমাম আহমদ রাহ. তাঁর নিজের 'আর-রাদ্দু আলায যানাদিকাহ' গ্রন্থে আকলী দলীলের মাধ্যমে তাদের খণ্ডন করেছেন। (কালামের বিরোধিতায় দেওয়া) তাঁর বক্তব্য যারা গ্রহণ করেছেন, তা রহিত হয়ে গেছে। কেননা তিনি বলেন, আমরা এ ব্যাপারে চুপ থাকতাম। কিন্তু যখন তারা এগুলোতে প্রবেশ করল, তখন তাদের খণ্ডন না করে উপায় ছিল না...।'[৪২]

শায়খুল হানাবিলা ইবনে হামদান হাম্বলী রাহ. (মৃ. ৬৯৫ হি.) লেখেন,

وَعِلْمُ الْكَلَامِ الْمَذْمُومِ: هُوَ أُصُولُ الدِّينِ إِذَا تُكُلِّمَ فِيهِ بِالْمَعْقُولِ الْمَحْضِ، أَوِ الْمُخَالِفِ لِلْمَنْقُولِ الصَّرِيحِ الصَّحِيحِ. فَإِنْ تُكُلِّمَ فِيهِ بِالنَّقْلِ فَقَطْ، أَوْ بِالنَّقْلِ وَالْعَقْلِ الْمُوَافِقِ لَهُ؛ فَهُوَ أُصُولُ الدِّينِ، وَطَرِيقَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ.

'নিন্দিত বা হারাম ইলমুল কালাম হলো সেটা, যা কেবল যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত অথবা যা সুস্পষ্ট সহীহ নকল তথা কুরআন-সুন্নাহর বিপরীত। কিন্তু যেটা শুধু কুরআন-

---

৪১. উসূলুদ্দীন, পৃষ্ঠা ১৫-১৬

৪২. আল-আদাবুশ শারইয়্যাহ, ১/২০৬-২০৭, আলামুল কুতুব

সুন্নাহ বা এর সমর্থনে আকলের সমন্বয়ে গঠিত, সেটা 'উসূলুদ দ্বীন' (আকীদা) এবং আহলুস সুন্নাহর মানহাজ।'[৪৩]

একই কথা আরেক হাম্বলী আলেম মানসুর বিন ইউনুস বাহুতী রাহ.-ও (মৃ. ১০৫১ হি.) 'আল-ইকনা'র ব্যাখ্যায় বলেছেন।[৪৪]

প্রসিদ্ধ হাম্বলী শায়খ সাফ্ফারীনী রাহ. (মৃ. ১১৮৮ হি.) বলেন,

فَعِلْمُ الْكَلَامِ الَّذِي نَهَى عَنْهُ أَئِمَّةُ الْإِسْلَامِ هُوَ الْعِلْمُ الْمَشْحُونُ بِالْفَلْسَفَةِ وَالتَّأْوِيلِ، وَالْإِلْحَادِ وَالْأَبَاطِيلِ، وَصَرْفِ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ عَنْ مَعَانِيهَا الظَّاهِرَةِ، وَالْأَخْبَارِ النَّبَوِيَّةِ عَنْ حَقَائِقِهَا الْبَاهِرَةِ.

'মুসলমানদের ইমামগণ যে ইলমুল কালাম শিখতে নিষেধ করেছেন, তা হলো ফালসাফা (দর্শন), তাবীল (অপব্যাখ্যা), ইলহাদ (সীমালঙ্ঘন ও বিকৃতি), মিথ্যা-জোচ্চুরি ও কুরআন-সুন্নাহর অপব্যাখ্যা ইত্যাদি দিয়ে ভরা।'[৪৫]

সুতরাং প্রমাণিত হলো, মুতাকাল্লিম ও গায়রে মুতাকাল্লিম সকল মাসলাকের মুহাক্কিক আলেমের মতে কালামশাস্ত্র নিন্দনীয় নয়; বরং কীভাবে এটাকে ব্যবহার করা হবে, তার ওপর এর বিধান নির্ভর করবে।

'ইলমুল কালাম'কে ঢালাওভাবে মন্দ বলা—এটা সালাফী বন্ধুদের ভুল প্রোপাগান্ডা। কেননা, হকপন্থী ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর 'ইলমুল কালাম'কে মন্দ আখ্যা দেওয়া ঠিক নয়। এ বিষয়ে ইমাম আশআরী রাহ.-এর ছোট রিসালা 'ইসতিহসানুল খাওযি ফী ইলমিল কালাম' মুতালাআ করতে পারেন। এই কিতাবে তিনি দলীলের আলোকে এর গুরুত্ব প্রমাণ করেছেন।

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের আকীদা, তাওহীদের আকীদা, নবুওয়াতের আকীদা ও পুনরুত্থানের আকীদার পক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছে। হাদীসেও যুক্তি রয়েছে। সাহাবীদের আলোচনায়ও যুক্তি পাওয়া যায়। ইমামগণের লেখায়ও যুক্তি পরিদৃষ্ট হয়। তবে সবগুলো যুক্তিই মূলনীতির অনুগামী; অবাধ ও লাগামহীন নয়। অপরদিকে নাস্তিকরাও যুক্তি দেয়। মুতাযিলা-জাহমিয়ারাও যুক্তি দেয়। সবগুলোর নাম যুক্তি হলেও সবগুলোর অবস্থা ও স্তর এক নয়।

আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বের আকীদার পক্ষে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর যুগের শাসক নমরুদের সাথে সংঘটিত এক ঘটনার কথা কুরআনে এসেছে,

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِىْ رَبِّهٖۤ اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ ۘ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّیَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ قَالَ اَنَا اُحْىٖ وَاُمِيْتُ قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ

---

৪৩. সিফাতুল মুফতী ওয়াল মুস্তাফতী, পৃষ্ঠা ২২৫-২২৬, দারুস সামীয়ী

৪৪. দেখুন, কাশশাফুল কিনা', ৩/৩৪, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

৪৫. লাওয়ামিউল আনওয়ারিল বাহিয়্যাহ, ১/১১১-১১২

‘তুমি কি ওই ব্যক্তিকে দেখোনি, যে ইবরাহীমের সঙ্গে তার প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল, যেহেতু আল্লাহ তাকে কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন? যখন ইবরাহীম বলল, “তিনি আমার প্রতিপালক, যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান।” সে বলল, “আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই।” ইবরাহীম বলল, “আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক হতে উদিত করান, তুমি একে পশ্চিম দিক হতে উদিত করাও তো।” এরপর যে কুফরী করেছিল সে নিরুত্তর হয়ে গেল।’[৪৬]

ব্যাখ্যা :

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও নমরুদের পারস্পরিক বিতর্কের যে ঘটনা ঘটেছিল, এখানে তা উল্লেখ করা হয়েছে। নমরুদকে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বললেন, ‘আমার রব জীবন ও মৃত্যুর মালিক।’ উত্তরে নমরুদ দুজন হাজতীকে ডেকে এনে একজনকে হত্যা এবং অপরজনকে মুক্তি দিয়ে বলল, ‘দেখো, আমিও তা করতে পারি।’

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নমরুদের এমন স্থূলতা ও নির্বোধতা দেখে তাকে নিরুত্তর ও লা-জবাব করার জন্য একটি যুক্তি দিয়ে বললেন, ‘আমার রব পূর্ব দিকে সূর্য উদিত করেন, তুমি পশ্চিম দিকে সূর্যকে উদিত করে দেখাও তো।’

তখন নমরুদ নিরুত্তর ও লা-জবাব হয়ে গেল।

ইমাম নাসাফী রাহ. (মৃ. ৭১০ হি.) তাঁর তাফসীরে ‘মাদারীকুত তানযীল’ গ্রন্থে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, ‘এই আয়াত থেকে ইলমুল কালামের সহায়তায় কথা বলা ও মুনাযারা করার বৈধতা প্রমাণিত হয়।’

এভাবে দেখুন, তাওহীদের আকীদার পক্ষে যুক্তি সূরা আম্বিয়া, (২১) : ২২, নবুওয়াতের আকীদার পক্ষে যুক্তি সূরা বাকারা, (২) : ২৩ এবং পুনরুত্থানের আকীদার পক্ষে যুক্তি সূরা আম্বিয়া, (৩৭) : ৭৯-সহ অসংখ্য আয়াতে।

সুতরাং যুক্তির ব্যবহার মন্দ ও সমালোচনার কোনো বিষয় নয়।

এদিকে বিভিন্ন ধর্মের গ্রন্থসমূহ ও গ্রিক-দর্শনের আরবী অনুবাদ হয়ে যাওয়ায় ভ্রান্ত যুক্তি ও গ্রিক-দর্শননির্ভর বিদআতপন্থী কাদেরিয়া, জাবারিয়া, মুতাযিলা, জাহমিয়া ইত্যাদি মতবাদ দ্বিতীয় হিজরী শতকের শুরু থেকেই জন্ম লাভ করে এবং তাদের দর্শনভিত্তিক বিভ্রান্ত মতবাদগুলো তখন কুফা, বসরা ইত্যাদি এলাকায় প্রচার হতে শুরু করে। ফলে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর নিত্য-নতুন আপত্তি তৈরি হতে থাকে এবং যুক্তি ও বাস্তবতার আলোকে ইসলামী আকীদা বুঝতে চাওয়া লোকদের সংখ্যা বাড়তে থাকে আর ইসলামে ইলমুল কালামের চাহিদাও বাড়তে থাকে।

---

৪৬. সূরা বাকারা, (২) : ২৫৮

তখন কুরআন-সুন্নাহ সমর্থিত ইলমুল কালামের চাহিদা পূরণ এবং এ সকল ভ্রান্ত মতবাদ খণ্ডন করতে উলামায়ে কেরামের একটি দল এগিয়ে আসেন। তাঁরা আকল ও যুক্তিকে লাগামহীন না রেখে, বরং কুরআন-সুন্নাহর অনুগামী বানিয়ে নিজেদের আকীদার পক্ষে শক্ত দলীল ও যুক্তি উপস্থাপন এবং বিদআতী চিন্তাধারা ও ভ্রান্ত আকীদার খণ্ডন করে ইসলামী আকীদা সুরক্ষার খেদমত আঞ্জাম দিতে থাকেন। বিশেষত মুতাযিলাদের বিভ্রান্তিকর আকীদা থেকে মুসলিম উম্মাহকে হেফাজতের গুরুদায়িত্ব পালন করেন।

কাজেই যে কালামশাস্ত্র বিদআতপন্থীদের সকল বিভ্রান্তির ভিত ছিল, সেটাকেই ধসিয়ে দেন আহলুস সুন্নাহর আলেমগণ। ফলে যে শাস্ত্রটি একসময় ইসলামকে শেষ করে দেওয়ার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছে, আহলুস সুন্নাহর আলেমগণ সেটাকে সংস্কার করে ইসলামের খেদমতে লাগান। 'ইলমুল কালাম' বা কালামশাস্ত্র তখন বিশুদ্ধ ইসলামী আকীদার সমার্থক হয়ে ওঠে। আর আলেমরা হয়ে ওঠেন মুতাকাল্লিম।[৪৭]

শাহরাস্তানী রাহ. (মৃ. ৫৪৮ হি.) লেখেন, 'একপর্যায়ে আবদুল্লাহ বিন সাঈদ ইবনুল কুল্লাব, আবুল আব্বাস কালানিসী, হারেস বিন আসাদ মুহাসেবী প্রমুখের আগমন ঘটে। তারা সামগ্রিকভাবে সালাফের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তারা সরাসরি ইলমুল কালাম চর্চা করেন। সালাফের আকীদাকে কালামী দলীল এবং উসূলী প্রমাণের মাধ্যমে সুসংহত করেন...। এরপর আসেন আবুল হাসান আশআরী। তিনি তাদের (সালাফের) বক্তব্যকে কালামী মানহাজে শক্তিশালী করেন।'[৪৮]

সাহাবায়ে কেরাম তো যুক্তির পথে হাঁটেননি, আমরা হাঁটব কেন?

প্রশ্ন : সালাফী বন্ধুরা বলে থাকেন, সাহাবায়ে কেরামও তো ঈমান-আকীদা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাঁরা তো ইলমুল কালাম বা যুক্তির পথে হাঁটেননি। তাহলে আমরা কেন হাঁটব?

উত্তর : একই প্রশ্ন ইমাম আবু হানীফা রাহ.-কে করা হয়েছিল, তিনি কী উত্তর দিয়েছেন দেখুন। আবু মুকাতিল সমরকন্দী আবু হানীফাকে বলেন, অনেকে এসব বিষয়ে (ইলমুল কালাম ও মুনাযারা ইত্যাদিতে) ঢুকতে নিষেধ করেন। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম রাযি. তো এ পথে হাঁটেননি। তাহলে আমরা হাঁটব কেন?

ইমাম আবু হানীফা রাহ. জবাবে বলেন,

بلى يسعني ما وسعهم لو كنت بمنزلتهم، وليس بحضرتي مثل الذي كان بحضرتهم، وقد ابتُلينا بمن

---

৪৭. শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, ১/১৮২
৪৮. আল-মিলাল ওয়ান নিহাল, ১/৯৩

يطعن علينا ويستحل الدماء منا، فلا يسعنا أن لا نعلم مَن المخطئ منا والمصيب؟ وأن لا نذب عن أنفسنا وحرمنا؟ فمثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كقوم ليس بحضرتهم مَن يقاتلهم، فلا يتكلّفون السلاح، ونحن قد ابتُلينا بمن يقاتلنا، فلا بدّ لنا من السلاح.

مع أن الرجل إذا كفّ لسانه عن الكلام فيما اختلف فيه الناس، وقد سمع ذلك لم يطق أن يكف قلبه، لأنه لا بد للقلب من أن يكره أحد الأمرين أو هما جميعا. فأما إن يحبهما جميعا وهما مختلفان فهذا لا يكون، وإذا مال القلب إلى الجور أحبّ أهله. وإذا أحبّ القوم كان منهم، وإذا مال القلب إلى الحق وأهله كان لهم وليا.

'হ্যাঁ, এটা ঠিক যে, আমরা যদি সাহাবাদের (যুগে তাঁরা যে অবস্থায় ছিলেন, সে) পর্যায়ে থাকতাম, তাহলে তাঁরা যতটুকু করেছেন, আমাদের ক্ষেত্রেও ততটুকু যথেষ্ট হতো। কিন্তু আমাদের যুগ বা অবস্থা তাঁদের মতো নয়। আমরা এমন কিছু লোকের সম্মুখীন হয়েছি, যারা আমাদের আঘাত করে, আমাদের রক্তকে হালাল মনে করে। তাহলে কারা সঠিক, কারা বেঠিক তা না জেনে বসে থাকা যাবে? আমরা আমাদের জান-মালের হেফাজত না করে বসে থাকব? **সাহাবায়ে কেরামের যুগে ওই যুদ্ধবাজরা ছিল না, ফলে তাঁদের হাতিয়ার হাতে নিতে হয়নি। আমাদের যুগে ওই যুদ্ধবাজরা আছে, কাজেই আমাদের হাতিয়ার হাতে নিতে হবে।**

তা ছাড়া, মানুষ মতভেদপূর্ণ বিষয় শুনে মুখ বন্ধ রাখলেও হৃদয় বন্ধ রাখতে পারে না। ফলে হৃদয়ে এগুলো প্রভাব ফেলে। দুটো বিষয় শুনলে যেকোনো একটার দিকে মন চলে যায়। মনের মাঝে এগুলো নিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলতে থাকে। আল্লাহ না করুন, যদি বাতিলের দিকে মন ঝুঁকে পড়ে, তাহলে তো সে বাতিলপন্থীদের পছন্দ করতে শুরু করবে। আর যখন তাদের পছন্দ করবে, তখন সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে। পক্ষান্তরে যদি হকের দিকে হৃদয় ঝুঁকে পড়ে, তাহলে হকপন্থীদের বন্ধু হিসেবে সে গণ্য হবে।'[৪৯]

সুতরাং ইলমুল কালামকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করা যাবে এবং খোদ ইমামও তা গ্রহণ করেছেন। ইমাম আবদুল কাহের বাগদাদী রাহ. (মৃ. ৪২৯ হি.) বলেন,

أول متكلِّمي أهل السنَّة من الفقهاء أبو حنيفة، ألَّف فيه الفقه الأكبر والرسالة في نصرة أهل السنة.

'ফকীহগণের মধ্যে আহলুস সুন্নাহর প্রথম মুতাকাল্লিম হচ্ছেন আবু হানীফা। তিনি কালাম বিষয়ে আহলুস সুন্নাহর পক্ষে 'আল-ফিকহুল আকবার' ও 'আর-রিসালাহ' গ্রন্থ রচনা করেছেন।'

---

৪৯. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম, আকীদা নং ২-সূত্রে মাজমুউ কুতুব ওয়া রাসায়িল ওয়া ওসায়াল ইমামিল আযম, পৃষ্ঠা ৩৫৪; আল-উসূলুল মুনীফাহ, কামালুদ্দীন বায়াযী, পৃষ্ঠা ৫৩; আত-তামহীদ, আবু শাকুর সালেমী, পৃষ্ঠা ১৯১

প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও ব্যাখ্যাকার সায়্যিদ মুরতাযা যাবীদী রাহ. (মৃ. ১২০৬ হি.) এটা নকল করার পর বলেন, 'আবু হানীফা রাহ. খারেজী, শিয়া, কাদেরিয়া ও নাস্তিকদের সঙ্গে বিতর্ক করেছেন। এ সকল বিদআতপন্থীদের প্রচারকরা ছিল বসরা এলাকায়। তাই বসরায় তিনি বিশ বারেরও অধিক সফর করে তাদেরকে সুদৃঢ় দলীল-প্রমাণ দ্বারা তর্কে পরাজিত করেছেন। তিনি কালামে এতটাই উচ্চস্তরে উপনীত হয়েছিলেন যে, সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে তিনি ছিলেন বরিত। তাঁর যোগ্য ছাত্ররাও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছে।'[৫০]

তবে হ্যাঁ, ইমামগণ ওপরে ইলমুল কালাম নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে যে সকল কারণ উল্লেখ করেছেন, সেগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে। সুতরাং এ বিষয়ে অতিরঞ্জন করা যাবে না, মাধ্যমকে গন্তব্য মনে করা যাবে না, উপলক্ষকে লক্ষ্য গণ্য করা যাবে না।

'দেহ' ইত্যাদির আলোচনা কি কেবল দার্শনিকদের কথা?

ইলমুল কালামের সমালোচনা করতে গিয়ে অনেক সালাফী বন্ধুকে তাদের লেখা ও আলোচনায় ইমাম আবু হানীফা রাহ. ও তাঁর ছাত্র নূহ ইবনে আবী মরিয়মের নিম্নোক্ত কথোপকথন তুলে ধরতে দেখা যায়।

ইমাম আবু হানীফার ছাত্র নূহ ইবনে আবী মরিয়ম বলেন,

قُلْتُ لِأَبِي حَنِيفَةَ: مَا تَقُولُ فِيمَا أَحْدَثَ النَّاسُ مِنَ الْكَلَامِ فِي الْأَعْرَاضِ وَالْأَجْسَامِ؟

فَقَالَ: مَقَالَاتُ الْفَلَاسِفَةِ، عَلَيْكَ بِالْأَثَرِ وَطَرِيقَةِ السَّلَفِ، وَإِيَّاكَ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ فَإِنَّهَا بِدْعَةٌ.

'আমি আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহকে বললাম, মানুষেরা ইলমুল কালামে (স্রষ্টার অস্তিত্ব, অনাদিত্ব ও বিশেষণ প্রমাণে) 'আরায' (অমৌল-পরনির্ভর : nonessential), 'জিসম' (দেহ : body) ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনা উদ্ভাবন করেছে। এগুলোর বিষয়ে আপনার মত কী?

তিনি বলেন, এগুলো দার্শনিকদের কথাবার্তা। তোমার দায়িত্ব হাদীসের ওপর নির্ভর করা এবং পূর্ববর্তীদের (সাহাবী-তাবেয়ীদের) তরীকা অনুসরণ করা। সাবধান! সকল নব-উদ্ভাবিত বিষয় বর্জন করবে; কারণ তা বিদআত।"[৫১]

এখানে আবু হানীফা রাহ. 'জিসম' বা দেহ ও 'আরায' ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনাকে

---

৫০. উসূলুদ্দীন, আব্দুল কাহের বাগদাদী, পৃষ্ঠা ১৬২, ১৬৪; ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন, যাবীদী, ২/১৮

৫১. যাম্মুল কালাম ওয়া আহলিহী, হারাবী, ৫/২০৬-২০৭-সূত্রে 'আল-ফিকহুল আকবার : বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা', ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, পৃষ্ঠা ১৫১। এখানে বন্ধনীর মাঝের ব্যাখ্যাগুলোও জাহাঙ্গীর স্যারের। সালাফী বন্ধুরা এটা নকল করে হানাফী মাতুরীদীদের ওপর অপবাদ দিয়ে বলেন, 'আকীদার ক্ষেত্রে এ সমস্ত আলোচনার কারণে মাতুরীদীরা পথভ্রষ্ট!'

দার্শনিকদের কথা ও বিদআত আখ্যা দিয়ে তা বর্জন করতে বলেছেন। অথচ মাতুরীদীরা ইমাম আবু হানীফাকে আকীদার ক্ষেত্রে অনুসরণ না করে এ সমস্ত আলোচনা করেন।

উত্তর :

ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর নামে প্রচলিত যে 'আল-ফিকহুল আকবার' গ্রন্থ রয়েছে, যা সালাফী বন্ধুদের কাছেও গ্রহণযোগ্য, তাতে স্বয়ং তিনি স্রষ্টার অস্তিত্ব, অনাদিত্ব ও বিশেষণ প্রমাণে বলেছেন,

وهو شئ لا كالأشياء، ومعنى الشئ: إثباته بلا جسم ولا جوهر ولا عرض.

'তিনি (আল্লাহ) বিদ্যমান বস্তু ও সত্তা, তবে অন্যান্য বিদ্যমান বস্তুর মতো নন। আর বিদ্যমান হওয়ার ব্যাখ্যা হলো, তাঁকে সাব্যস্ত করা যে, তিনি **'জিসম'** বা দেহধারী নন, 'জওহর' বা স্বনির্ভর মৌলপদার্থ নন এবং **'আরয'** বা পরনির্ভর অস্থায়ী কোনো বস্তু নন।'[৫২]

এ ছাড়া ইমাম তাহাবী রাহ. (মৃ. ৩২১ হি.) তাঁর বিখ্যাত আকীদাগ্রন্থ, যা তিনি ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রাহ.-এর মাসলাক অনুসারে সংকলন করেছেন, তাতে বলেন,

وَتَعَالَى اللهُ عَنِ الْحُدُودِ وَالْغَايَاتِ، وَالْأَرْكَانِ وَالْأَعْضَاءِ وَالْأَدَوَاتِ.

'আল্লাহ তাআলা সকল সীমা-প্রান্ত, **দৈহিক সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং সকল উপায়-উপকরণ** থেকে বহু ঊর্ধ্বে।'

সুতরাং আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে আকীদার বিবরণে দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইত্যাদির আলোচনার কথা ইমাম আবু হানীফা রাহ. থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত।

জাদীদ (আধুনিক) ইলমুল কালাম পরিচিতি ও প্রয়োজনীয়তা

'জাদীদ বা আধুনিক ইলমুল কালাম' বলতে কী উদ্দেশ্য, এর পরিধি কতটুকু বিস্তৃত, এর প্রয়োজনীয়তা কতটুকু ইত্যাদি বিষয় লম্বা আলোচনার দাবি রাখে। তবে এ বিষয়ে হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী রাহ. (মৃ. ১৩৬২ হি.)-এর একটি কথা এখানে উল্লেখ করা যথেষ্ট মনে করছি। তিনি বলেন,

'...একটি বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যায় না। আর তা হলো,

ক. কিছু সংশয় ও আপত্তি, যেগুলো মানুষের মুখে এখন আর উচ্চারিত হয় না, যেগুলো মানুষের আলোচনা-পর্যালোচনা থেকে বিদূরিত ও বিলুপ্ত হয়ে গেছে,

---

৫২. আল-ফিকহুল আকবার, বি-রিওয়াতি হাম্মাদ, আকীদা নং ১২-সূত্রে মাজমুউ কুতুব ওয়া রাসায়িল ওয়া ওসায়াল ইমামিল আযম, পৃষ্ঠা ২৫৯

সেগুলো পুনরায় নতুন করে চর্চিত হতে শুরু করেছে।

খ. আর কতক সংশয় ও আপত্তি নতুন শিরোনামে আলোচিত হচ্ছে। (সেগুলো মূলত পুরোনো হলেও আঙ্গিক ও শিরোনামের নতুনত্বের কারণে নতুন বলা যায়।)

গ. এ ছাড়া কতিপয় সংশয় ও আপত্তির মূল বিষয়বস্তুই এমন যে, সেগুলোকে প্রকৃতার্থে ও বাস্তবিক পক্ষে নতুন গবেষণা অভিহিত করা যায়।

এই সকল (তিন প্রকার) সংশয় ও আপত্তির সমষ্টিকেই নতুন বলা যায় এবং সেগুলোর নিরসন, সমাধান ও জবাবকেও নতুন বলা যায়।

তা ছাড়া যুগের মানুষের মেজায ও রুচির পরিবর্তনের ফলে আলোচনা ও জবাব দানের আঙ্গিক ও ধরনেও নতুনত্ব আনয়ন উপকারী প্রমাণিত হয়েছে।

সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে এরূপ জবাব দানের উপাদানকে 'জাদীদ (আধুনিক) ইলমুল কালাম' বলা যথার্থ। আর এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'জাদীদ ইলমুল কালাম' সংকলন আবশ্যকীয় হওয়ার দাবি করা আপত্তিকর নয়।'[৫৩]

আশরাফ আলী থানভী রাহ. উক্ত আবশ্যকীয় দাবি পূরণে এবং আধুনিক-কালের বিষাক্ত ছোবলময় যুক্তি-বিশ্বাসগুলোর অসারতা প্রমাণ করতেই সংকলন করেছেন অতি মূল্যবান একটি পুস্তিকা। এতে তিনি বেশ কিছু মৌলিক নীতিমালা এবং যুক্তি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও উদাহরণসহ তুলে ধরেছেন। এটি মূলত ছিল আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের উদ্দেশে প্রদত্ত তাঁর বয়ান। অতঃপর একে উর্দু ভাষায় পুস্তিকার রূপ দেওয়া হয় 'আল-ইনতিবাহাতুল মুফীদাহ আনিল ইশতিবাহাতিল জাদীদাহ' নামে।[৫৪]

বিধি-বিধান তিন প্রকার

কুরআন-সুন্নাহয় বিধি-বিধান তিন প্রকার, যা হাদীসে জিবরীলে একসাথে এসেছে :

এক. اعتقادية। আকীদা-সংক্রান্ত তথা আমরা অন্তর দিয়ে যে আকীদা-বিশ্বাস লালন করি।

দুই. عملية আমলের সাথে সম্পৃক্ত তথা আমরা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে যে নেক আমল করি।

তিন. أخلاقية আখলাক সম্পর্কীয় তথা আখলাক-চরিত্র পরিশুদ্ধ করা, আত্মশুদ্ধি অর্জন করা এবং আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তোলা। হাদীসে জিবরীল হচ্ছে,

أخرج الشيخان والترمذي واللفظ له:... ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ،

---

৫৩. আল-ইনতিবাহাতুল মুফীদাহ আনিল ইশতিবাহাতিল জাদীদাহ, পৃষ্ঠা ২

৫৪. কিতাবটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ইলমুল কালামের আলোচনার আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَالْقَدَرِ: خَيْرِهِ وَشَرِّهِ». فَمَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: «شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ». فَمَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، فَإِنَّهُ يَرَاكَ».

'(জিবরীল) বললেন, হে মুহাম্মাদ! ঈমান কী?

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি আল্লাহর ওপর, তাঁর ফেরেশতা, কিতাব, রাসূলগণ ও আখিরাত এবং তাকদীরের ভালো-মন্দের (তাঁর পক্ষ থেকেই হয়) ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবে।

লোকটি বললেন, ইসলাম কী?

তিনি বললেন, এই কথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল, নামাজ কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, বায়তুল্লাহর হজ করা ও রমজানের রোযা পালন করা।

লোকটি বললেন, ইহসান কী?

তিনি বললেন, এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যেন তুমি তাঁকে প্রত্যক্ষ করছ। আর যদি তুমি তাঁকে না-ও দেখো, তবে তিনি তো তোমাকে দেখছেন।'[৫৫]

এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মৌলিক হাদীস। এর ভেতর রয়েছে তিনটি বিষয়—ঈমান, ইসলাম ও ইহসান—যা দ্বীনের প্রধান বিষয়। বান্দার প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য যাবতীয় আমল এর মধ্যে এসে গেছে। অন্তরের আমল 'আকীদা-বিশ্বাস' ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল 'ইবাদত-বন্দেগী' সবই এ তিনটির অন্তর্ভুক্ত। নিয়ত ও উদ্দেশ্যকে সহীহ-শুদ্ধ করা এবং আখলাক-চরিত্র পরিশুদ্ধ করাও এর আওতাভুক্ত। সমস্ত আমলকে রিয়া ও লোকদেখানোর মানসিকতা থেকে মুক্ত রাখা এবং যাবতীয় পাপাচার থেকে আত্মরক্ষার বিষয়টাও এর অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু হাদীস ও সুন্নাহ সম্পর্কিত সমগ্র ইলমের সারসংক্ষেপ এর মধ্যে এসে গেছে, তাই এ হাদীসকে 'উম্মুস-সুন্নাহ'ও (সমস্ত হাদীস ও সুন্নাহর মূল) বলা হয়। কাজেই এটা সমগ্র দ্বীনেরই সারসংক্ষেপ।

তিন প্রকারের ব্যাখ্যা

ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আকীদার বিষয়গুলো তিন প্রকারে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম স্তরের দিকে লক্ষ করে আমাদের নাম মুসলিম ও মুমিন আর বিপরীত বিশ্বাসীদের সাধারণ নাম 'কাফের-মুশরিক', বিশেষ নাম হিন্দু, বৌদ্ধ, নাস্তিক, ইহুদী, খ্রিষ্টান, কাদিয়ানী (যারা নিজেদের আহমদী বলে), শিয়াদের বিভিন্ন গোষ্ঠী (যাদের কুফরী বিশ্বাস রয়েছে) প্রভৃতি।

---

৫৫. বুখারী; মুসলিম; তিরমিযী, হাদীস নং ২৬১০

আর কিছু আকীদা-বিশ্বাস রয়েছে দ্বিতীয় স্তরের, যা একজন ব্যক্তি মুসলিম হওয়ার পর সে আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত হওয়া-না হওয়া নির্ভর করে। আকীদার এ দ্বিতীয় স্তর হিসেবে আমাদের নাম 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ' আর বিপরীতদের সাধারণ নাম 'আহলুল বিদআহ ওয়াল ফুরকাহ'।

অবশ্য কখনো আকীদার উভয় স্তরের দিকে লক্ষ করেও 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ' বলা হয়।

দ্বিতীয় প্রকার তথা আমলের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলোর কিছু ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহয় একাধিক ব্যাখ্যা ও পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে কিংবা মতভিন্নতার সুযোগ রয়েছে। ফলে এ-জাতীয় ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা ও পদ্ধতি অনুসরণের কারণে কারও নাম হানাফী, কেউ মালেকী মাযহাবের অনুসারী, কেউ-বা শাফেয়ী, আবার কারও নাম হাম্বলী।

এদের বিপরীত একটি দলের নাম হচ্ছে লা-মাযহাবী, গায়রে মুকাল্লিদ বা আহলে হাদীস (তথা যারা তাকলীদ-মাযহাব বিদ্বেষী, ইমামগণের সমালোচনাকারী)। সবিস্তারে জানতে দেখুন আমাদের 'কুরআন-হাদীস থাকতে মাযহাব কেন?' বইটি।[৫৬]

তৃতীয় প্রকার তথা আখলাক-সংক্রান্ত বিষয়াদিকে কুরআনের ভাষায় 'তাযকিয়াহ' আর হাদীসের ভাষায় 'ইহসান' বলা হয়েছে। তবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে 'তাসাওউফ' নামে। এ তৃতীয় প্রকার হাসিলের বিভিন্ন তরীকার দিকে লক্ষ করে??? ভারত উপমহাদেশে চিশতিয়া, কাদেরিয়া, নক্শবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া ও সোহরাওয়ার্দিয়া নামগুলো প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।[৫৭]

উপরিউক্ত আলোচনায় 'মুসলিম, আহলুস সুন্নাহ, চিশতী ও হানাফী' প্রভৃতির নামকরণ জানতে পেরেছি। একজন ব্যক্তি যেভাবে মুসলিম হওয়ার পর বিশেষ গুণের কারণে মুসল্লী, মুক্তাদী ও কারী ইত্যাদি হতে পারে, তদ্রূপ বিশেষ গুণের কারণে তার বিভিন্ন নাম হতে পারে।

মৌলিক আকীদায় চার মাযহাব এক ও অভিন্ন

ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী শাফেয়ী রাহ. (মৃ. ৭৭১ হি.) বলেন,

وهذه المذاهب الأربعة – ولله الحمد – في العقائد واحدة، إلا من لحق منها بأهل الاعتزال

---

৫৬. আরও দেখুন, হযরত মাওলানা আব্দুল মালেক হাফিযাহুল্লাহর 'উম্মাহর ঐক্য : পথ ও পন্থা', মুফতী তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহর 'তাকলীদ কী শরয়ী হাইছিয়াত' এবং হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রাহ.-এর 'আল-ইকতিসাদ ফীত তাকলীদ ওয়াল ইজতিহাদ'। অধম শেষ কিতাবটির আরবী অনুবাদ ও উপকারী তা'লীকসহ প্রকাশ করেছি।

৫৭. শারহুল খারীদাতিল বাহিয়্যা, আহমদ দারদীর, পৃষ্ঠা ১৯২-১৯৩; আল-মুহান্নাদ, সাহারানপুরী, মুকাদ্দামা

والتجسيم. وإلا فجمهورها على الحق يقرون عقيدة أبي جعفر الطحاوي، التي تلقاها العلماء سلفا وخلفا بالقبول.

'আল্লাহর শোকর! চার মাযহাবের আকীদা এক ও অভিন্ন। তবে যারা মুতাযিলা বা দেহবাদীদের অনুসারী হয়েছে এরা ছাড়া। অন্যথায় (চার মাযহাবের) অধিকাংশ অনুসারী হকপন্থী এবং 'আকীদাতুত তাহাবী'র আকীদা পোষণকারী, যে কিতাবকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উলামায়ে কেরাম ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছেন।'[৫৮]

হাফেজুল হাদীস ইবনে আসাকির রাহ. (মৃ. ৫৭১ হি.) লেখেন,

ولسنَا نرى الأئمة الْأَربَعَة الذين عُنِيتم فِي أصُول الدّين مُخْتَلفين، بل نراهم فِي القَوْل بتوحيد الله، وتنزيهه فِي ذَاته وصفاته مؤتلفين، وعَلى نفي التَّشْبِيه عَن القَدِيم سُبْحانه وتعالى مُجْتَمعين.

সারাংশ : 'আমরা চার ইমামের মাঝে মৌলিক আকীদার ক্ষেত্রে কোনো মতানৈক্য দেখতে পাই না; বরং এ বিষয়ে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ।'[৫৯]

ইমাম আবু মানসুর আবদুল কাহের বাগদাদী রাহ. (মৃ. ৪২৯ হি.) বলেন,

فأما الفرقة الثالثة والسبعون: فهي أهل السنة والجماعة، من فريقَي الرأي والحديث، دون من يشتري لهو الحديث. وفقهاءُ هذَيْن الفريقين، وقرّاؤهم، ومحدثوهم، ومتكلمو أهل الحديث منهم، كلهم متفقون على مقالة واحدة في توحيد الصانع وأسمائه وصفاته، وفي سائر أصول الدين... وهم الفرقة الناجية.. وقد دخل في هذه الجملة جمهورُ الأمة وسوادها الأعظم: من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري وأهل الظاهر. اهـ ملخصا.

সারমর্ম : 'মুহাদ্দিস ও ফকীহদের মধ্যে যারা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ, তাঁরা সবাই... মৌলিক আকীদার বিষয়ে একমত। তাঁরা সবাই মুক্তিপ্রাপ্ত দল। আর এতে ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আবু হানীফা, আওযায়ী, (সুফিয়ান) সাওরী ও আহলে যাহেরের অনুসারীসহ অধিকাংশ উম্মত অন্তর্ভুক্ত।'[৬০]

আকীদার তিনটি ধারা : কী ও কেন?

আকীদার ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর প্রতিনিধিত্বকারী তিনটি নাম উচ্চারিত হয় : ১. আশআরী, ২. মাতুরীদী, ৩. আছারী বা হাম্বলী। যেমন : আল্লামা আবদুল বাকী হাম্বলী রাহ. (মৃ. ১০৭১ হি.) লেখেন,

إن طوائف أهل السنة ثلاثة: أشاعرة، وحنابلة، وماتريدية.

---

৫৮. মুঈদুন নি'আম, সুবকী, পৃষ্ঠা ২২-২৩
৫৯. তাবয়ীনু কাযিবিল মুফতারী, পৃষ্ঠা ৬৩৭, তাহকীক : আনাস শারফাবী, দারুত তাকওয়া দামেশক
৬০. আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃষ্ঠা ২৩

‘আহলুস সুন্নাহর দল হলো তিনটা : আশআরী, হাম্বলী ও মাতুরীদী।’[৬১]

শায়খ সাফ্ফারীনী হাম্বলী রাহ. (মৃ. ১১৮৮ হি.) বলেন,

أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ثَلَاثُ فِرَقٍ: الْأَثَرِيَّةُ وَإِمَامُهُمْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ٦، وَالْأَشْعَرِيَّةُ وَإِمَامُهُمْ أَبُو الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيُّ ٦، وَالْمَاتُرِيدِيَّةُ وَإِمَامُهُمْ أَبُو مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ ٦، وَأَمَّا فِرَقُ الضَّلَالِ فَكَثِيرَةٌ جِدًّا.

‘আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর তিনটি ধারা রয়েছে : ‘আছারিয়্যাহ’, যাদের ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহ. (মৃ. ২৪১ হি.); ‘আশআরিয়্যাহ’, যাদের ইমাম আবুল হাসান আশআরী রাহ. (মৃ. ৩২৪ হি.) এবং ‘মাতুরীদিয়্যাহ’, যাদের ইমাম আবু মানসুর মাতুরীদী রাহ. (মৃ. ৩৩৩ হি.)। আর পথভ্রষ্ট দলের সংখ্যা অনেক বেশি।’[৬২]

আল্লামা আযুদুদ্দীন ইজী রাহ. (মৃ. ৭৫৬ হি.) বলেন,

وأما الناجية المستثناة الذين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيهم: "هم الذين على ما أنا عليه وأصحابي" فهم الأشاعرة والسلف من المحدثين وأهل السنة والجماعة، ومذهبهم خالٍ من بدع هؤلاء.

‘মুক্তিপ্রাপ্ত দল হলো, যাদের ব্যাপারে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যারা আমার ও সাহাবাদের মতাদর্শে প্রতিষ্ঠিত,” আর তারা হলেন, আশআরীগণ এবং সালাফদের মাঝে যারা মুহাদ্দিস ও আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর অন্তর্ভুক্ত। (কেননা,) তাদের মাযহাব ওদের (বিদআতীদের) বিদআত থেকে মুক্ত।’[৬৩]

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ তাশ কুবরী যাদাহ রাহ. (মৃ. ৯৬৮ হি.) বলেন, ‘জেনে রাখো, ইলমুল কালাম বা আকীদাশাস্ত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর প্রধান হচ্ছেন দুজন। একজন হানাফী, আরেকজন শাফেয়ী। আর হানাফী হচ্ছেন আবু মানসুর মাতুরীদী এবং শাফেয়ী হলেন আবুল হাসান আশআরী।’[৬৪]

কারও মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, **আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর সবাই যদি আকীদার বিষয়ে এক ও অভিন্ন হন, তাহলে একাধিক নামে তাঁদের মাঝে বিভক্তি কেন?**

উত্তর :

মৌলিক আকীদার ক্ষেত্রে তাঁদের মাঝে কোনো বিভক্তি নেই। কেননা, আকীদার

---

৬১. আল-আইনু ওয়াল আসার, পৃষ্ঠা ৫৩

৬২. লাওয়ামিয়ুল আনওয়ারিল বাহিয়্যাহ, ১/৭৩; আল্লামা ইবনুশ শাততী ‘তাবসীরুল কানি’ গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৭২), ইবনুস সাল্লুম ‘শারহুদ দুররাতিল মুজিয়্যাহ’ গ্রন্থে এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। এ ছাড়াও সাফ্ফারীনী রাহ. তাঁর উক্ত গ্রন্থের তিন জায়গায় আশআরী-মাতুরীদীদের উদ্ধৃতিতে তাদের অভিমত উল্লেখ করেছেন।

৬৩. শারহুল মাওয়াকিফ, ৮/৪০০

৬৪. মিফতাহুস সাআদাহ, ১/২৩৯

ক্ষেত্রে বিভক্তি হলে উল্লিখিত আকীদার বিষয়সমূহের তিন প্রকারের প্রথম দুই প্রকারের কোনো এক প্রকারে অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

যদি প্রথম প্রকার তথা ঈমান-কুফরের বিভক্তি হয়, তাহলে একপক্ষ মুমিন ও অপরপক্ষ কাফের হবে। আর যদি দ্বিতীয় প্রকার তথা সুন্নাহ-বিদআহর বিভক্তি হয়, তাহলে একপক্ষ আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত হবে এবং অপরপক্ষ হবে আহলুল বিদআহর অন্তর্ভুক্ত বা বিদআতপন্থী।

অথচ তাঁদের একপক্ষ অন্যপক্ষকে কাফের তো দূরের কথা, বিদআতীও বলে না। হাফেজ ইবনে আসাকির রাহ. (মৃ. ৫৭১ হি.) বলেন,

فأما الأصحابُ: – فإنهم مع اختلافهم في بعض المسائل أجمعون – على ترك تكفير بعضهم بعضا مجمعون.

'(আকীদার) কিছু মাসআলায় আমাদের (আশআরীদের) তাঁদের (মাতুরীদীদের) সাথে মতভেদ হওয়া সত্ত্বেও একপক্ষ অন্যপক্ষকে কাফের না বলার ওপর সকলেই একমত।'[৬৫]

ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী আশআরী শাফেয়ী রাহ. (মৃ. ৭৭১ হি.) লেখেন,

تفحصتُ كتب الحنفية (أي: الماتريدية) فوجدتُ جميع المسائل التي بيننا وبين الحنفية خلافٌ فيها: ثلاثَ عشرة مسألة، منها معنوي ست مسائل، وتلك الست المعنوية لا تقتضي مخالفتُهم لنا ولا مخالفتُنا لهم فيها تكفيرًا ولا تبديعًا، صرح بذلك: الأستاذ أبو منصور البغدادي وغيرُه من أئمتنا وأئمتهم، وهو غنيٌّ عن التصريح لظهوره.

সারাংশ: 'আমাদের (আশআরীদের) সাথে মাতুরীদীদের ১৩টি মাসআলায় মতভেদ রয়েছে। এরপরও এগুলোতে একপক্ষ অন্যপক্ষকে কাফের বা বিদআতপন্থী বলার দাবি করে না। এটা আমাদের (আশআরীদের) মধ্য থেকে উস্তাদ আবু মানসুর বাগদাদী রাহ. (মৃ. ৪২৯ হি.) এবং আমাদের ও তাঁদের (মাতুরীদীদের) অনেক ইমাম সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, যা জাহের হওয়ার কারণে আর বলার অপেক্ষা রাখে না।'[৬৬]

আহমাদ মারদাবী হাম্বলী রাহ. (মৃ. ১২৩৬ হিজরীর পর) বলেন,

وإن كان قد وقع الخلاف بين الشيخ أبي الحسن الأشعري شيخ أهل السنة من الشافعية وغيرهم، وبين الإمام أبي حنيفة في آخر من مسائل أصول الدين؛ لكنها يسيرة لا تقتضي تكفيرا ولا تبديعا.

---

৬৫. তাবয়ীনু কাযিবিল মুফতারী, পৃষ্ঠা ৭০২

৬৬. তাবাকাতুশ শাফিয়াতিল কুবরা, সুবকী, ৩/৩৭৭, ৩৭৮; আস-সাইফুল মাশহুর ফী শারহি আকীদাতি আবী মানসুর, পৃষ্ঠা ১১

'যদিও শাফেয়ী ও অন্যান্য আহলুস সুন্নাহর শায়খ ইমাম আবুল হাসান আশআরী এবং ইমাম আবু হানীফার মাঝে আকীদার কিছু মাসআলায় ইখতিলাফ হয়েছে; তবে তা নগণ্য, যা কাফের বা বিদআতী আখ্যায়িত করা দাবি করে না।'[৬৭]

শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে আওদা কাদূমী হাম্বলী রাহ. (মৃ. ১৩৩১ হি.) বলেন,

أهل الحديث والأشعرية والماتريدية فرقة واحدة متفقون في أصول الدين... والخلاف بينهم في مسائل قليلة... لا يوجب تكفير بعضهم لبعض ولا تضليله.

'আহলুল হাদীস (আছারী), আশআরী ও মাতুরীদীরা মূলত এক দল, যারা মৌলিক আকীদায় একমত। ইখতিলাফ হলো তাদের মধ্যে মাত্র অল্প কিছু মাসআলায়, যা একে অপরকে কাফের বা বিদআতপন্থী বলা আবশ্যক করে না।'[৬৮]

আল্লামা মুসতাফা কাসতালী রাহ. (মৃ. ৯০১ হি.) বলেন,

وبين الطائفتين (الأشاعرة والماتريدة) اختلاف في بعض مسائل الأصول كمسألة التكوين، ومسألة الاستثناء في الإيمان، ومسألة إيمان المقلد، وغير ذلك، والمحققون من الفريقين لا ينسب أحدهما الآخر إلى البدعة والضلالة.

'উভয় পক্ষের মাঝে কিছু মাসআলায় ইখতিলাফ থাকা সত্ত্বেও মুহাক্কিকগণ একে অপরকে বিদআতপন্থী ও পথভ্রষ্ট আখ্যা দেন না।'[৬৯]

উল্লেখ্য, এটা হচ্ছে আশআরী ও মাতুরীদী মাসলাকের মুহাক্কিক এবং ভারসাম্য বজায় রাখেন এমন আহলে ইলম কর্তৃক মাসলাকের খেদমতসমূহকে সামনে রেখে বলা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, আশআরী বা মাতুরীদী মাসলাকের কোনো লেখক কোথাও বাড়াবাড়ি করেননি; বরং অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এখানেও কিছু ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি হয়েছে। নিঃসন্দেহে ইলমুল কালাম সম্পর্কে যারা লিখেছেন তাদের কেউ কেউ কোনো কোনো জায়গায় বাড়াবাড়ির শিকার হয়েছেন এবং কোনো আকীদার অপ্রয়োজনীয় চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ভুলের শিকার হয়েছেন। আমরা এ ধরনের বাড়াবাড়ি থেকে নিজেদেরকে মুক্ত ঘোষণা করছি; এগুলোর সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। আমরা কারও বাড়াবাড়ির সঙ্গ দিই না। তেমনইভাবে কোনো মুক্তাদা ও অনুসরণীয় আলেমের ত্রুটি-বিচ্যুতিকেও হক মনে করি না এবং ভুলত্রুটির ক্ষেত্রে আমরা কারও অনুসরণ করি না।

অতএব উভয় পক্ষের মুহাক্কিকগণ যা বলেছেন, তা-ই চূড়ান্ত ও গ্রহণযোগ্য।

---

৬৭. আল-লাআলীল বাহিয়্যাহ শারহু লামিয়াতি ইবনি তাইমিয়া, পৃষ্ঠা ১৮২, দারুল ইবনে হাযম

৬৮. দ্র. আল-মানহাজুল আহমাদ ফী দারয়িল মাছালিবিল লাতি তুনমা লি-মাযহাবিল ইমাম আহমাদ, পৃষ্ঠা ৪৩-৪৪

৬৯. বি. দ্র. আল-মাজমুআতিস সানিয়্যাহ আলা শারহিল আকীদাতিন নাসাফিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ৮২; আরও দেখুন, ইশারাতুল মারাম, বায়াযী, পৃষ্ঠা ৮৩

সুতরাং আকীদার কিছু মাসআলায় মতভেদের কারণে তাঁরা একাধিক নাম গ্রহণ করলেও মূলত তাঁদের মাঝে এমন কোনো বিভক্তি হয়নি যে, একপক্ষ অন্যপক্ষকে কাফের বা বিদআতপন্থী বলতে পারে।

কাজেই এ কথা বলার আর অপেক্ষা রাখে না যে, তাঁদের এ মতভেদ যেহেতু উল্লিখিত আকীদার বিষয়সমূহের তিন প্রকারের প্রথম দুই প্রকারে অন্তর্ভুক্ত নয়, তাহলে তৃতীয় প্রকারে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এর বিধান প্রয়োগ হবে।

অর্থাৎ কোনো পক্ষকে কাফের বা বিদআতপন্থীদের মধ্যে গণ্য করা যাবে না; এমনকি গুনাহগারও বলা যাবে না। কারণ, এতে কোন পক্ষ সঠিক আর কোন পক্ষ বেঠিক, তা একেবারে নির্ধারিত করে বলা যায় না; বরং এগুলো ইজতিহাদী বিষয়, ভুল হলেও ক্ষমা পাবে এবং একটা প্রতিদান পাবে আর সঠিক হলে তো দ্বিগুণ প্রতিদান রয়েছেই।

ভিন্ন ভিন্ন নাম গ্রহণ করার কারণ কী?

তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন নাম গ্রহণ করার কারণ হচ্ছে, অমৌলিক ও শাখাগত কিছু মাসআলায় তাঁদের মাঝে মতভেদ হয়েছে, যা মূলত গন্তব্যে পৌঁছার রাস্তা গ্রহণ ও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হয়েছে।

শায়খ আবু আবদিল্লাহ বাক্কী রাহ. (মৃ. ৯১৬ হি.) বলেন,

اعلم أن أهل السنة والجماعة كلهم قد اتفقوا على معتقد واحد، فيما يجب ويجوز ويستحيل، وإن اختلفوا في الطرق والمبادئ الموصلة إلى ذلك، أو في لِمِّيَّة المسالك.

'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর সবাই মৌলিক আকীদায় একমত...। যদিও তাঁরা গন্তব্যে পৌঁছার রাস্তা গ্রহণে এবং এগুলোর কারণ বিবরণে মতভেদ করেছেন।'[৭০]

কামালুদ্দীন বায়াযী রাহ. (মৃ. ১০৯৮ হি.) 'ইশারাতুল মারাম' গ্রন্থে লেখেন,

إنهم متحدو الأفراد في أصول الاعتقاد، وإن وقع الاختلاف في التفاريع بينها...

'মৌলিক আকীদার ক্ষেত্রে তাঁরা এক ও অভিন্ন। যদিও তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মতপার্থক্য হয়েছে।'[৭১]

প্রখ্যাত ফকীহ ইবনে আবেদীন শামী রাহ. (মৃ. ১২৫২ হি.) বলেন,

أهل السنة والجماعة وهم الأشاعرة والماتريدية، وهم متوافقون؛ إلا في مسائل يسيرة أرجعها بعضهم إلى الخلاف اللفظي، كما بين في محله.

---

৭০. তাহরীরুল মাতালিব, পৃষ্ঠা ৪০; ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন, মুরতাযা যাবীদী, ২/৬
৭১. ইশারাতুল মারাম, পৃষ্ঠা ১৩৮

'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর অনুসারী 'আশায়িরা' এবং 'মাতুরীদীয়্যাহ'-এর আকীদা একই। তবে কয়েকটি মাসআলায় মতভেদ রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে কারও কারও অভিমত হলো, উক্ত মতভেদ শাব্দিক অর্থে তথা উপস্থাপনের ভিন্নতায় (বাস্তবিক অর্থে নয়)।'[৭২]

এ কারণেই দেওবন্দের অন্যতম ভাষ্যকার ও মুখপাত্র আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী রাহ. (মৃ. ১৩৪৬ হি.) 'আল-মুহান্নাদ' কিতাবে বলেন,

إنا بحمد الله ومَشايخُنا... ومتّبِعُون للإمام أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي في الاعتقاد والأصول.

'আমরা ও আমাদের শায়খগণ আকীদা ও উসূলে ইমাম আবুল হাসান আশআরী ও আবু মানসুর মাতুরীদী রাহ.-এর অনুসারী।'[৭৩]

দেওবন্দী-বেরেলভী মতানৈক্য এবং তাদের মাতুরীদী-হানাফী হওয়ার দাবি ও বাস্তবতা

মুফতী তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ বলেন, 'নিজেকে "দেওবন্দী মাসলাক"-এর লোক বলতে ও লিখতে দ্বিধাবোধ হয় আমার। দ্বিধাবোধ হয় এই কারণে যে, এ পরিচয় থেকে ফেরকাবন্দীর গন্ধ আসে। "দেওবন্দী মাসলাক" শব্দবন্ধ দ্বারা অনেকে বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। তারা মনে করে, "দেওবন্দী" এমন কোনো ধর্মীয় উপদল ও ফেরকার নাম, যে ফেরকা উম্মতের সংখ্যাগরিষ্ঠের মত থেকে সরে গিয়ে স্বতন্ত্র কোনো পথ তৈরি করে নিয়েছে।

অথচ দারুল উলূম দেওবন্দের চিন্তাধারা সে রকম কিছু নয়। এ চিন্তাধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত উলামায়ে কেরাম নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস ও কাজকর্মে কুরআন মাজীদ ও সুন্নতে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওই ভারসাম্যমান ও মধ্যপন্থী ব্যাখ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা চৌদ্দশ বছর যাবৎ এ উম্মতের মধ্যে প্রজন্মপরম্পরায় চলে এসেছে। দারুল উলূম দেওবন্দ নতুন কোনো ফেরকার ভিত্তি স্থাপন করেনি;

---

৭২. রদ্দুল মুহতার, মুকাদ্দামা, ১/১৪০

وانظر للتوسع: «مسائل الاختلاف بين الأشاعرة والماتريدية» لابن كمال باشا (ت: ٩٤٠هـ)، «نظم الفرائد وجمع الفوائد» لشيخ زاده (ت: ٩٤٤هـ)، و«الروضة البهية» لأبي عذبة (ت: ١١٧٢هـ)، «مختصر الروضة البهية» لوليد الأموي، «شرح قصيدة السبكي النونية» لنور الدين الشيرازي (توفي بعد: ٧٥٨هـ)، «أرجوزة في معرفة المسائل الخلافية بين الأشعرية والحنفية» لنجم الدين الطرطوسي (ت: ٧٥٨هـ)، «مقدمة تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة)» للمحقق د. مجدي باسلوم، «المدرسة الكلامية الماتريدية» لعوّاد محمود سالم، «التوفيق الجلي بين الأشعري والحنبلي» للنابلسي (ت: ١١٤٣هـ).

وانظر لزاما: تقدمة الباحث الخبير الدكتور محمد حمزة وسيم البكري لكتاب «عقود العقائد في فنون الفوائد» لإمام زاده؛ فإن فيها كلاما نفيسا للغاية في بيان المراحل المختلفة للسادة الأشاعرة والماتريدية وكتبهم.

৭৩. আল-মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ, মুকাদ্দামা, পৃষ্ঠা ২৯-৩০

বরং জমহুর তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মত যে আকীদা-বিশ্বাসের প্রবক্তা এবং যে কর্মধারার অনুসারী, উলামায়ে দেওবন্দও ঠিক সেই আকীদা ও আমলেরই অনুসরণে যত্নবান।

হ্যাঁ, এই বৈশিষ্ট্য তাদের অবশ্যই আছে যে, যখনই তারা জমহুর উম্মতের আকীদা-বিশ্বাস ও তাদের অনুসৃত আমলের ওপর (শিরক ও বিদআতের) কোনো ধুলোবালি পড়তে দেখেছে, তখন তারা হিকমত ও দৃঢ়তার সাথে তা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করেছে। সেই প্রশংসনীয় চেষ্টার ফলেই তাদের প্রতি বিদ্বেষী কোনো কোনো মহল মানুষকে ধারণা দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছে যে, তারা একটি স্বতন্ত্র ফেরকা, একটি আলাদা দল।'[৭৪]

আল্লামা খলীল আহমদ সাহারানপুরী রাহ. (মৃ. ১৩৪৬ হি.) লেখেন, যার ওপর উলামায়ে দেওবন্দের ২৪ জন সত্যায়ন করেছেন,

إنا لا نتكلم بكلام ولا نقول قولا في الدين إلا وعليه عندنا دليل من الكتاب أو السنة، أو إجماع الأمة، أو قول من أئمة المذهب، ومع ذلك لا ندعي أنا مبرؤون من الخطأ والنسيان في ضلة القلم وزلة اللسان، فإن ظهر لنا أنا أخطأنا في قول، سواء كان من الأصول أو الفروع، فما يمنعنا الحياء أن نرجع عنه، ونعلن بالرجوع، كيف لا؟ وقد رجع أئمتنا رضوان الله عليهم في كثير من أقوالهم...

فلو ادعى أحد من العلماء أنا غلطنا في حكم، فإن كان من الاعتقاديات فعليه أن يثبت بنص من أئمة الكلام، وإن كان من الفرعيات فيلزم أن يبني بنيانه على القول الراجح من أئمة المذاهب، فإذا فعل ذلك فلا يكون منا إن شاء الله تعالى إلا الحسنى والقبول بالقلب واللسان، وزيادة الشكر بالجنان والأركان.

'দ্বীনী বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা'র দলীল ও কোনো মাযহাবের ইমামের মত ছাড়া আমরা কথা বলি না। সাথে সাথে এই দাবিও করি না যে, আমরা ভুলত্রুটির ঊর্ধ্বে। যদি প্রকাশ পায়, মৌলিক কিংবা সাধারণ মাসআলার কোনো বিষয়ে আমরা ভুল করেছি, তবে লজ্জার কারণে রুজু করতে এবং তা ঘোষণা করতে আমরা দ্বিধা করি না। কেনই-বা দ্বিধা করব? আমাদের ইমামগণও তো বহু মাসআলায় রুজু করেছেন!

সুতরাং আমরা ভুল করেছি বলে যদি কোনো আলেম দাবি করেন, তবে আকীদার মাসআলা হলে ইলমুল আকায়িদের ইমামগণের মতামতসহ দাবি প্রমাণ করুন। ইজতিহাদী মাসআলা হলে মাযহাবের ইমামগণের অগ্রগণ্য মত দ্বারা প্রমাণ করুন। আমরা সর্বান্তঃকরণে মেনে নেব এবং শুকরিয়া আদায় করব।'[৭৫]

---

৭৪. দ্র. আমার জীবনকথা, ১/৩৯, মাকতাবাতুল আশরাফ

৭৫. আল-মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ, পৃষ্ঠা ৩০-৩১

প্রশ্ন : সংক্ষেপে ও স্পষ্টভাবে বলুন, দেওবন্দী মাসলাক কী?

উত্তর : দেওবন্দী মাসলাক নতুন কিছু না; বরং আকীদা, আমল ও ইহসান-তাসাওউফ তিনটার সমষ্টি, যা হাদীসে জিবরীলে এসেছে। আর আকীদা, আমল ও ইহসান-তাসাওউফের ক্ষেত্রে যদি **মজবুত উসূল ও মূলনীতির আলোকে** ব্যাখ্যা গ্রহণের প্রয়োজন হয় এবং ইখতিলাফী বিষয়ে সমাধানের দরকার হয়, তখন দেওবন্দীরা আকীদার ক্ষেত্রে আশআরী-মাতুরীদী ধারা অনুসরণ করে, আমলের ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তাসাওউফ বিষয়ে চার তরীকা তথা নক্শবন্দিয়া-মুজাদ্দেদিয়া, চিশতিয়া, সোহরাওয়ার্দিয়া ও কাদেরিয়ার সাথে সম্পর্ক রাখে।[৭৬]

উলামায়ে দেওবন্দের দ্বীনী 'রোখ' (দ্বীনের মৌলিক বিষয়) এবং 'মাসলাকী মেজায' (শরীয়তের শাখাগত মাসআলা ও তার রুচি-প্রকৃতি) সম্পর্কে দারুল উলূম দেওবন্দের দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের মুহতামিম হাকীমুল ইসলাম কারী তায়্যিব রাহ. (মৃ. ১৪০৩ হি.) স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছেন, যা তাঁর সর্বশেষ লিখিত কিতাব। উক্ত কিতাবের শেষে 'সাবআ সানাবিল' শিরোনামে সাতটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। সংক্ষেপে তা তুলে ধরা হলো :

১. দ্বীনের ভিত্তি ইলমে শরীয়ত তথা কিতাবুল্লাহ, সুন্নতে রাসূল, ইজমায়ে উম্মত ও মুজতাহিদ ইমামগণের কিয়াসের ওপর রাখা।

২. **আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর ফিকর ধারণ করে মাতুরীদী ও আশআরীদের সম্পাদিত উসূল ও মূলনীতির আলোকে সহীহ আকীদার ওপর সুদৃঢ় থাকা। কেননা, এটা ছাড়া বাতিল ফেরকার ভ্রান্তি ও ভ্রষ্টতা থেকে বেঁচে থাকা অসম্ভব।**

৩. যেহেতু এই উপমহাদেশে হানাফী মাযহাবের অনুসরণ হয়ে আসছে, তাই ফিকহের ক্ষেত্রে ফিকহে হানাফী অনুসরণ করা এবং অন্য তিন মাযহাবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।

৪. তাযকিয়া ও ইহসানের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া এবং এ বিষয়ে সূফীয়ায়ে কেরামের যেসব উসূল কুরআন-সুন্নাহসম্মত তার অনুমোদন করা।

৫. রদ্দে বিদআত, আমর বিল মারূফ নাহি আনিল মুনকার ও ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহর কাজে সক্রিয় থাকা।

---

৭৬. দ্র. আল-মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ, পৃষ্ঠা ২৯-৩০
উল্লেখ্য, সাহারানপুরী রাহ.-এর এই কিতাবের ওপর তৎকালীন দেওবন্দের উলামায়ে কেরাম সত্যায়ন ও স্বাক্ষর করেন। যেমন : শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী, হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী, উসওয়াতুস সুলাহা আব্দুর রহীম রাইপুরী ও মুফতী আযম কিফায়াতুল্লাহ দেহলবী রাহিমাহুমুল্লাহ-সহ দেওবন্দের ২৪ জনের স্বাক্ষর রয়েছে। এ ছাড়াও মক্কা মুকাররমার ৬ জন, মদীনা শরীফের ২৫ জন, মিশর জামিয়াতুল আযহারের ৩ জন এবং শাম ও দামেস্কের ১২ জন আলেমের সত্যায়ন রয়েছে কিতাবটির শেষে।
আরও দেখুন, ইউসুফ লুধিয়ানবীর 'ফাতাওয়া বায়্যিনাত', ১/৫২৬-২৭

৬. আকল-নকল, ইলম ও মহব্বত, রেওয়ায়াত-দেরায়াত, কানুন এবং রিজাল ইত্যাদির ক্ষেত্রে জামইয়্যত (সামগ্রিক সমন্বয়) সৃষ্টি করা।

৭. সবকিছুতে সুন্নাত ও উসওয়ায়ে রাসূলের অনুসরণ করা।[৭৭]

প্রশ্ন : একই দাবি তো বেরেলভীরাও করে। এমনকি বিশিষ্ট দেওবন্দী আলেম মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানবীও 'ইখতিলাফে উম্মত আওর সীরাতে মুস্তাকীম' কিতাবে বেরেলভীদের ব্যাপারে একই কথা বলেছেন।

উত্তর : বেরেলভীরা এমন দাবি করলেও তিন ক্ষেত্রেই তারা নতুন নতুন বিষয় ঢুকিয়েছে। যেমন : আকীদার ক্ষেত্রে নিজেদেরকে মাতুরীদী দাবি করা সত্ত্বেও নবী গায়ব জানেন, হাযির-নাযির, মুখতারে কুল, নূরের তৈরি ও শর্তহীন ইস্তিগাছাহ বা ইসতিমদাদ বিগায়রিল্লাহর অনুপ্রবেশ করিয়েছে। **অথচ হাজার বছরের ইতিহাসে গ্রহণযোগ্য কোনো আকীদার কিতাবে বা আকীদা হিসেবে অন্য কোনো কিতাবে উপরিউক্ত বিষয়গুলোর উল্লেখ পাওয়া যায় না।**

বাস্তবতা হলো, তারা সীরাতের কিতাব বা রাসূলের শান-মানসংবলিত আলোচনা থেকে, বিভিন্ন যন্নী ফযীলত থেকে আগ বাড়িয়ে স্বতন্ত্র আকীদা বানিয়ে নিয়েছে এবং বিভিন্ন ওলীর সাথে ঘটে যাওয়া কারামত দিয়ে অকাট্য আকীদা তৈরি করেছে, আর সাধারণ মুসলমানদের মাঝে বিভ্রান্তি ও বিভক্তি সৃষ্টি করেছে।[৭৮]

তাদের এ সকল আকীদার ভ্রান্তি সবিস্তারে জানার জন্য দেখুন, মাওলানা মনযুর নুমানী রাহ. লিখিত 'বাওয়ারিকুল গায়ব' (এ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে চল্লিশটি আয়াত এবং দ্বিতীয় খণ্ডে একশ পঞ্চাশটি হাদীস অনুবাদ ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ উল্লেখ করা হয়েছে), মাওলানা সরফরায খান সফদার রাহ. লিখিত 'ইযালাতুর রাইব আন ইলমিল গায়ব', 'তাবরীদুন নাওয়াযির ফী তাহকীকিল হাযির ওয়ান নাযির' ও 'নূর

---

৭৭. উলামায়ে দেওবন্দ কা দ্বীনী রুখ আওর মাসলাকী মেজায, পৃষ্ঠা ১৮১-১৮৯

৭৮. **বেরেলভীরা যে সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সীমা থেকে আগে বাড়িয়ে যায়, তা অন্যরাও বলেছে। মিশর জামিআতুল আযহারের ইসলামিক আকীদা অনুষদের (كلية أصول الدين) প্রথম বর্ষে পঠিত ড. মিছবাহ মানসুর মুসার 'আল-মাদখাল ইলা দিরাসাতিন নুযুমিল ইসলামিয়্যাহ' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ১৭৩) আকীদার ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা-বিষয়ক আলোচনায় বলা হয়েছে,**

كما توسط أهل السنة في تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرفعوه عن مقام الرسالة، ويدعوا له شيئا من خصائص الألوهية، مثل طائفة البريلوية.

'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেছে। তাঁকে রিসালাতের স্তর থেকে আগে বাড়িয়ে আল্লাহ তাআলার কোনো বৈশিষ্ট্য (যেমন গায়ব জানা) তাঁর জন্য দাবি করেনি, যেমনটি বেরেলভী ফেরকা করেছে।'

বাংলাদেশের অনেক বেরেলভী (যারা নিজেদের 'সুন্নী' নামে পরিচয় দেয়) ছাত্র ভাইয়েরা আযহার ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেন। তারা মনে করেন এবং অনেকে এ দেশে প্রচারও করেন যে, আযহার বেরেলভী মতবাদ লালন করে বা সমর্থন করে। অথচ এখানে বেরেলভীদেরকে সীমালঙ্ঘনকারী হিসেবে সাব্যস্ত করা হয়েছে।

ও বাশার' কিতাবত্রয় এবং মুরতাযা হাসান চাঁদপুরী রাহ. লিখিত 'সাবীলুস সাদাদ ফী মাসআলাতিল ইমদাদ', মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী রচিত 'বাশারিয়্যাতে আম্বিয়া কুরআন মাজীদ মেঁ', সাইয়েদ লাল শাহ্ বুখারীর 'বাশারিয়্যাতে রাসূল', মাওলানা মনযুর মেঙ্গল হাফিযাহুল্লাহর 'তুহফাতুল মুনাযির', ড. আবু আদনান সুহাইলের 'বেরেলভিয়্যাত কা যেহেনী সফর' ও মাওলানা মতিউর রহমানের 'এসব হাদীস নয়'।

এভাবে তারা আমলের ক্ষেত্রে নিজেদেরকে হানাফী দাবি করলেও এমন অনেক বিষয় আমল করে, যা হানাফী মাযহাবে নেই অথবা শরীয়তেই নেই। যেমন : আজানের আগে দরূদ ও সালাম বলা, ঈসালে সওয়াবের জন্য কুরআনে কারীম তিলাওয়াত করে বিনিময় গ্রহণ করাকে বৈধ মনে করা, গায়রুল্লাহর নামে মান্নত মানা, ব্যাপকভাবে কবরওয়ালার কাছে প্রার্থনা ও ফরিয়াদ করা, জানাযার পরে দুআ করা, বুযুর্গদের কবর তাওয়াফ করা, সিজদা করা, নাম জপা, ওরশ করা, মাজার পাকা করা, তার ওপর গম্বুজ নির্মাণ করা, কবরে বাতি জ্বালানো, কবরের ওপর চাদর বিছানো ও ফুল ছড়ানো, খাবার সামনে নিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে ফাতেহা পড়া, জুমআর নামাজের পর নিয়মিত মিলাদ-কিয়াম, ঈদে মিলাদুন্নবী নামে ইসলামে নতুন ঈদের আবিষ্কার, মৃত্যুর পর চার দিন, চল্লিশা ও মৃত্যুবার্ষিকীসহ অনেক বিদআত ও রসম ঢুকিয়েছে। এমনকি বিদআতের সংজ্ঞাই বদলে ফেলেছে!

এভাবে তৃতীয় ক্ষেত্র তথা তাসাওউফেও সমস্যা রয়েছে।

আর ইউসুফ লুধিয়ানবী রাহ. 'ইখতিলাফে উম্মত' কিতাবে বিষয়টি ভালোভাবে পরিষ্কার না করলেও তাঁর আরেকটি কিতাব, যা জীবনের শেষপ্রান্তে লেখা হয়েছে, এ বিষয়ে বিস্তারিত আকারে স্পষ্ট করেছেন। তাঁর বক্তব্য দেখুন,

بریلویوں نے اہل السنت والجماعت کے عقائد میں بھی اضافہ کیا ہے، اور ایسے فروعی مسائل کو بھی دین کا جزو بنایا ہے جن کی فقہ حنفی میں واقعی کوئی اصل نہیں ہے، مثلاً: عقائد میں چار اُصول اور بنیادی عقائد بڑھاتے ہیں: ۱: نور و بشر کا مسئلہ ۲: علم غیب کلی کا مسئلہ ۳: حاضر وناظر کا مسئلہ ۴: مختار کل ہونے کا مسئلہ۔ اور فروعی مسائل میں غیر اللہ کو پکارنا، قبروں پر سجدہ کرنا، قبروں کا طواف کرنا، غیر اللہ کی منتیں ماننا، قبروں پر چڑھاوے چڑھانا، میلاد مروجہ اور تعزیہ وغیرہ سینکڑوں باتیں ان کی ایجاد ہیں، جو صریح بدعات ہیں۔ اور بیعت وارشاد میں بھی ان لوگوں نے بہت سی غیر شرعی چیزوں کی آمیزش کر لی ہے، مثلاً: قوالی اور وجد وسماع وغیرہ۔۔۔ رسالہ «فیصلہ ہفت مسئلہ» «مسلک منقح» سے پہلے کی تصنیف ہے، اس سے استدلال صحیح نہیں ہے۔

(আপকে সাওয়ালাত আওর উনকা হল, ১/৫৩৮-৪০)

এ বিষয়ে কুরআন হাদীসের প্রমাণাদি জানার জন্য নিম্নোক্ত গ্রন্থাবলি দেখুন, মনযুর

নুমানী রাহ. লিখিত 'কুরআন আপসে কিয়া কাহতা হ্যায়' ও 'দ্বীন ও শরীয়ত', সরফরায খান রাহ. লিখিত 'ইতমামুল বুরহান ফী রদ্দি তাউযীহুল বয়ান' ও 'রাহে সুন্নাত' এবং মাওলানা আবদুল মালেক হাফিযাহুল্লাহ্ লিখিত 'তাসাওউফ তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ'। আরও দেখুন, 'আল জুন্নাহ্ লি আহলিস সুন্নাহ', মুফতী আবদুল গণী; 'বারাহীনে কাতিআহ', খলীল আহমদ সাহারানপুরী; 'ইসলাহুর রুসূম', আশরাফ আলী থানভী; 'সুন্নাত কী আযমাত আওর বিদআত কী কাবাহাত', আবদুর রহীম লাজপুরী (এর অনুবাদ 'সুন্নাতের আহ্বান ও বিদআতের অবসান' নামে আছে); 'ইখতিলাফে উম্মত', ইউসুফ লুধিয়ানবী ও 'আদইয়ানে বাতিলাহ', নাঈম আশরাফ।

আর বেরেলভীদের বিদআতী আকীদা ও আমল সম্পর্কে সংক্ষেপে সুন্দর আলোচনা-সংবলিত একটি সংকলন হচ্ছে, মাওলানা আমিন পালনপুরী হাফিযাহুল্লাহর 'মুহাযারাতে ইলমিয়্যাহ্ বর মাওযূ' রেযাখানিয়্যাত' কিতাবটি।[৭৯]

তা ছাড়া ড. খালেদ মাহমুদ রাহ. লিখিত ৮ খণ্ডের 'মুতালাআয়ে বেরেলভিয়্যাত' গ্রন্থটি বেরেলভী মতবাদ সম্পর্কে একটি বিশ্বকোষ।

আর زلزله বইয়ের মিথ্যা অপবাদসমূহের স্বরূপ জানার জন্য পড়ুন, মাওলানা মুহাম্মাদ আরেফ সাম্ভলী নদবী রচিত بریلوی فتنہ کا نیا روپ ।

হুসামুল হারামাইন ও তাকফীর

উপরিউক্ত বিষয়গুলো ছাড়াও বেরেলভীরা তাকফীরের মতো সবচেয়ে খতরনাক বিষয়কে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করে বড় বড় আলেমদের বিরুদ্ধে তাকফীর, বরং চেইন তাকফীরবাজি করেছে ও গোস্তাখে রাসূল ট্যাগ দিয়েছে।

যেমন : মরহুম মাওলানা আহমদ রেযা খান বেরেলভী সাহেব (যাকে তারা আ'লা হযরত বলে থাকে) দেওবন্দের আকাবির হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী (মৃ. ১২৯৭ হি.), মুফতী রশীদ আহমদ গাংগুহী (মৃ. ১৩২২ হি.), খলীল আহমদ সাহারানপুরী (মৃ. ১৩৪৬ হি.) ও আশরাফ আলী থানভী (মৃ. ১৩৬২ হি.) রাহিমাহুমুল্লাহর বক্তব্য কাটছাঁট করে তাঁদেরকে কাফের আখ্যায়িত করে 'হুসামুল হারামাইন' নামে একটা গ্রন্থ লিখেছিলেন।[৮০]

---

৭৯. **শীঘ্রই এর অনুবাদ 'বেরেলভী মতবাদ' নামে আসছে।** উল্লেখ্য, আমিন পালনপুরী সাহেব দারুল উলূম দেওবন্দের সিনিয়র মুহাদ্দিস এবং মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী রাহ.-এর আপন ভাই।

৮০. প্রশ্ন : ইসমাইল দেহলভী সম্পর্কে কেমন আকীদা রাখা উচিত? জবাবে আহমদ রেযা খান সাহেব বলেন,

میرا مسلک یہ ہے کہ وہ یزید کی طرح ہے اگر کوئی کافر کہے منع نہ کریں گے اور خود کہیں گے نہیں، البتہ غلام احمد (قادیانی)، سید احمد (علی گڑھی) خلیل احمد) انبیٹھوی (، رشید احمد) گنگوہی (، اشرف علی) تھانوی (کے کفر میں جو شک کرے وہ خود کافر، مَنْ شَكَّ فِي كُفْرِهِ وَعَذَابِهِ فَقَدْ كَفَرَ۔

উত্তর : 'ইসমাইল দেহলভীর ব্যাপারে আমার মত হলো, সে ইয়াযিদের মতো। তথা কেউ কাফের বললে নিষেধ করবো না, তবে আমি কাফের বলবো না। কিন্তু গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, সায়্যিদ আহমদ

এরই প্রতিবাদে রেযা খান বেরেলভীর মিথ্যাচার ও বিকৃতিসমূহ উন্মোচিত করে 'আল মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ' নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থ লেখা হয়েছিল। এ ছাড়া রেযা খান বেরেলভীর উক্ত গ্রন্থের জবাব প্রসঙ্গে আরও রচিত হয়েছে, শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী রাহ.-এর 'আশ-শিহাবুস সাকিব', মুরতাযা হাসান চাঁদপুরী রাহ.-এর 'আস-সাহাবুল মিদরার'-সহ অনেকগুলো পুস্তিকা; যা দুই খণ্ডবিশিষ্ট 'মাজমূআয়ে রাসায়েলে চাঁদপুরী' কিতাবের মধ্যে রয়েছে, হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রাহ.-এর 'বাসতুল বানান' ও 'তাগয়ীরুল উনওয়ান', কারী তায়্যিব সাহেব রাহ.-এর 'গলত ফাহমিয়ূঁ কা ইযালাহ', মাওলানা মনযুর নুমানী রাহ.-এর 'মা'রিকাতুল কলম' বা 'ফয়সালা কুন মুনাযারা', ড. খালেদ মাহমুদ রাহ.-এর 'ইবারতে আকাবির', মাওলানা সরফরায খান রাহ.-এর 'ইবারতে আকাবির', মাওলানা ইলিয়াস গুম্মান হাফিযাহুল্লাহর 'হুসামুল হারামাইন কা তাহকীকী জায়েযা' প্রভৃতি কিতাব।[৮১]

তবে 'আল-মুহান্নাদ' কিতাবটি অন্যগুলোর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।[৮২] কারণ, সে সময়

আলীগড়ী, খলীল আহমদ সাহারানপুরী, আশরাফ আলী থানভীর কুফরের ব্যাপারে যে ব্যক্তি সন্দেহ করবে, সেও কাফের। (দেখুন, মালফূযাতে আ'লা হযরত, ১/১৭২, মাকতাবাতুল মাদীনা, করাচী, ২০০৯ ঈসায়ী)
তিনি 'দামান বাগ' রিসালায় লেখেন,

اسمعیل دہلوی نرا کافر تھا، گنگوہی، نانوتوی، انبیٹھوی، تھانوی وغیرہم وہابی سب کھلے مرتد ہیں۔ جو کذب الٰہی ممکن کہے ملحد ہے۔تقویۃ الایمان، تنویر العینین، صراط مستقیم تصانیف اسمعیل دہلوی، معیار الحق تصنیف نذیر حسین دہلوی، تحذیر الناس تصنیف نانوتوی، براہین قاطعہ تصنیف گنگوہی وغیر با جملہ نجاسات انہوں سب کفری بول نجس تراز بول ہیں، جو ایسانہ جانے زندیق ہے۔

'ইসমাইল দেহলভী কাফের ছিলো। গাঙ্গুহী, নানুতুবী, সাহারানপুরী, থানভী প্রমুখ ওহাবী সবাই প্রকাশ্য মুরতাদ। 'তাকবিয়াতুল ঈমান', 'তানবীরুল আইনাইন', 'সিরাতে মুস্তাকিম', যা ইসমাইল দেহলভীর এবং নযীর হোসাইন দেহলভীর 'মি'য়ারুল হক', নানুতুবীর 'তাহযীরুন নাস', গাঙ্গুহীর 'বারাহীনে কাতিয়া' গ্রন্থসমূহে কুফরী কথাবার্তা, যা প্রশ্রাব থেকেও অপবিত্র। যে এমন মনে করবে না, সে যিন্দীক। (দ্র. ফাতাওয়া রেযাবিয়্যাহ, ১৫ নং খণ্ড ৮ নং রিসালা)
আব্দুল হাই রাহ. (মৃ. ১৩৪১ হি.) 'নুযহাতুল খাওয়াতির' গ্রন্থে (৮/১১৮১) লেখেন,

وأخذ فتاوى العلماء في أنحاء الهند وتوقيعاتهم في تكفير علماء الندوة، وجمعها في كتاب سماه «إلجام ألسنة لأهل الفتنة» وأخذ على ذلك توثيق علماء الحرمين، ونشره في مجموعة سماها «فتاوى الحرمين برجف ندوة المين» في سنة سبع عشرة وثلاث مئة وألف، ثم انصرف إلى تكفير علماء ديوبند.

'তিনি (আহমদ রেযা) নদওয়ার আলেমদের তাকফীর করতে হিন্দের বিভিন্ন জায়গার উলামায়ে কেরাম থেকে ফতওয়া এবং তাদের সাক্ষর সংগ্রহ করেছে, যা 'ইলজামু আলসিনাহ লি-আহলিল ফিতনাহ' নামে সংকলন করেছে। এর উপর হারামাইনের উলামাদের সমর্থন নিয়ে 'ফাতওয়াল হারামাইন বি-রজফি নাদওয়াতিল মাইন' নামে ১৩১৭ হিজরীতে প্রকাশ করেছে। অতঃপর উলামায়ে দেওবন্দের তাকফীরের দিকে মনোনিবেশ করেছে।'
৮১. হযরত সাহারানপুরী, মাদানী ও মনযুর নুমানীর তিন কিতাব একসাথে করে নতুনভাবে মুফতী তাকী উসমানী সাহেবের তত্ত্বাবধানে 'আকায়েদে উলামায়ে দেওবন্দ আওর হুসামুল হারামাইন' নামে ছেপেছে।
৮২. তবে এখানে একটা প্রশ্নের উত্তরের অংশ হিসেবে কবরের ফয়য সম্পর্কে একটা কথা এসেছে, যা অধমের কাছে দলীলের আলোকে পরিষ্কার হয়নি।

জীবিত উলামায়ে দেওবন্দ ও আকাবিরদের মধ্যে ২৪ জনের সত্যায়ন ও স্বাক্ষর রয়েছে। তাই এটা বলা যায় সবার সম্মিলিত একটা প্রয়াস।

এই কিতাবে আকীদা-আমলসংশ্লিষ্ট ২৬টি প্রশ্নের উত্তর রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু বিষয়ে সালাফীদের সাথে আর কিছু বিষয়ে বেরেলভীদের সাথে দেওবন্দীদের মতানৈক্য।

মুফতী আবদুশ শাকূর তিরমিযী রাহ. দেওবন্দী মাসলাকের ওপর প্রতিষ্ঠিত মাদরাসাওয়ালাদেরকে এই কিতাবের প্রতি খুবই গুরুত্ব দিতে বলেছেন এবং প্রত্যেক তালিবে ইলমকে এই কিতাব অবশ্যই পড়ার জন্য তাগিদ দিয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ ছাত্র এই কিতাব হাতে নেয় না; বরং এর নাম ও তা লেখার প্রেক্ষাপটই জানে না![৮৩]

উল্লেখ্য, এই কিতাবের মনমতো ব্যাখ্যা ও উপস্থাপন করে পাকিস্তানের সালাফী ঘরানার তালেবুর রহমান 'আদ-দেওবন্দীয়্যাহ' গ্রন্থে ও শাহ নাসীব সালাফী 'মুয়াযানা কী জিয়ে' গ্রন্থে দেওবন্দীদেরকে বেরেলভী প্রমাণের অপচেষ্টা করেছেন।

তাই উক্ত কিতাবের সাথে মাওলানা ইলিয়াস গুম্মান হাফিযাহুল্লাহর 'আল মুহান্নাদ আওর ই'তিরাযাত কা ইলমী জায়েযা' গ্রন্থটাও পড়া জরুরি।

এভাবে দেওবন্দীদেরকে বেরেলভীদের তাকফীরবাজির প্রসিদ্ধ একটি বিষয় হলো, 'ইমকানে কিযব'-এর মাসআলা তথা আল্লাহ তাআলা মিথ্যা বলার কুদরত রাখেন কি না।

কারও হয়তো ভুল বোঝার আশঙ্কা আছে, তাই একটু পরিষ্কার করে দিচ্ছি। একটা হলো, আল্লাহ তাআলার চেয়ে বড় সত্যবাদী আর কেউ নেই এবং কখনো তাঁর থেকে মিথ্যা প্রকাশ পাবে না, পেতে পারে না। এটার ওপর সকলেই একমত। কারণ, এর বিপরীত মত পোষণ করলেই কাফের হয়ে যাবে।

আরেকটা হচ্ছে, মিথ্যা বলাটা তাঁর কুদরতের অধীন কি না। এটাই হচ্ছে 'ইমকানে কিযব'।[৮৪]

হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত ইমাম মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম রাহ. (মৃ. ৮৬১ হি.)-এর 'আত তাহরীর' ও 'আল-মুসায়ারা' গ্রন্থদ্বয়ের আলোচনা এবং শায়খ ইবনে তাইমিয়া রাহ. (মৃ. ৭২৮ হি.)-এর 'মিনহাজুস সুন্নাহ' কিতাবের বক্তব্য থেকে জানা যায়, উক্ত মাসআলাটা আজকের নয়; বরং আশআরী ও মাতুরীদী ইমামদের মাঝেও

---

৮৩. দেখুন, আকায়েদে উলামায়ে দেওবন্দ মাআ হায়াতুন্নাবী, পৃষ্ঠা ৮-১০, যিয়াউল কুরআন কুতুবখানা

৮৪. বেরেলভীরা ২০১৩ সালে হেফাজতের নাস্তিক-বিরোধী ঐতিহাসিক আন্দোলনের সময় চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে আমার মুহসিন উস্তাদ ও মুরশিদ শায়খুল ইসলাম হযরত আহমদ শফী রাহ.-এর ব্যাপারে উক্ত কুফরী লালন করার কথা বলে ফাঁসি দাবি করেছিল!

ইখতিলাফী বিষয় ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে তাঁরা বেরেলভীদের মতো কেউ কাউকে কাফের আখ্যা দেননি। উভয়ের বক্তব্য দেখুন,

قال ابن الهمام في "التحرير" مع "التيسير" ٢/١٦٤: (والخلاف) الجاري في استحالة اتصافه تعالى بالكذب ونحوه (جارٍ في كل نقيصة)، ثم صَوَّر كيفيتَه بقوله: (أقُدرتُه) تعالى (عليها) أي على تلك النقيصة (مسلوبة، أم هي) أي النقيصة (بها) أي بقدرته (مشمولة، والقطع بأنه لا يفعل؟) أي والحال القطع بعدم فعل تلك النقيصة.

(والحنفية والمعتزلة على الأول) أي على أن قدرته عليها مسلوبة؛ لاستحالة تعلق قدرته بالمحال...

(وذكرنا في "المسايرة") بطريق الإشارة (أن الثاني) وهو أنها بها مشمولة، والقطع بأنه لا يفعلها اختيارا. [في "التقرير" لابن أمير حاج: أي: أنه يقدِر ولا يفعل قطعا] (أدخلُ في التنزيه).

قال في "المسايرة" ص ١٨٢: ثم قال صاحب "العمدة" من مشايخنا: (ولا يُوصف تعالى بالقدرة على الظلم والسفه والكذب؛ لأن المحال لا يدخل تحت القدرة، وعند المعتزلة يقدر ولا يفعل). انتهى. ولا شك أن سلب القدرة عما ذكر هو مذهب المعتزلة، وأما ثبوتها ثم الامتناع عن متعلقها فمذهب الأشاعرة أليق، ولا شك أن الامتناع عنها من باب التنزيهات، فيُسبر العقل في أن أي الفصلين أبلغ في التنزيه عن الفحشاء: أهو القدرة عليه مع الامتناع عنه مختارا، أو الامتناع لعدم القدرة، فيجب القول بإدخال القولين في التنزيه. انتهى ملخصا.

وقال ابن تيمية في "منهاج السنة" ٣/٢١:...فِي تَفْسِيرِهِ قَوْلَيْنِ، أَحَدُهُمَا: أَنَّ الظُّلْمَ مُمْتَنِعٌ لِذَاتِهِ غَيْرُ مَقْدُورٍ، كَمَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ الْأَشْعَرِيُّ وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو الْمَعَالِي وَأَبُو يَعْلَى وَابْنُ الزَّاغُونِيِّ وَغَيْرُهم يقُولُونَ: إِنَّهُ يَمْتَنِعُ أَنْ يُوصَفَ بِالْقُدْرَةِ عَلَى الْكَذِبِ وَالظُّلْمِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَنْوَاعِ الْقَبَائِحِ...

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الظُّلْمَ مَقْدُورٌ، وَاللهُ تَعَالَى مُنَزَّهٌ عَنْهُ، وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ مِنَ الْمُثْبِتِينَ لِلْقَدَرِ وَنُفَاتِهِ، وَهُوَ قَوْلُ...كَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ.

এ ছাড়া আরও দেখুন, তালীফাতে রশীদিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ৯২; ইমদাদুল ফাতাওয়া, ১১/৫৫৫-৫৭ (হাশিয়াসহ); আশ-শিহাবুস সাকিব, পৃষ্ঠা ২৬২

আশআরী-মাতুরীদীদের মাঝে মতভেদের মূল কারণ কী?

ইমাম আশআরী রাহ. ও মাতুরীদী রাহ. দ্বীনের ক্ষেত্রে নতুন কোনো মাযহাব বা মত-পথ সৃষ্টি করেননি; বরং আহলুস সুন্নাহর আকীদার সংরক্ষণ এবং উদ্ভূত বিভিন্ন বিদআতপন্থী ও বাতিল ফেরকার খণ্ডনে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর আকীদাসমূহকে কুরআন, সুন্নাহ, সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফের বক্তব্যের আলোকে সুবিন্যস্ত ও বিস্তৃত আকারে উপস্থাপন করে এই দুই ইমাম অধিক পরিচিতি লাভ করেন।

আর এ কাজ করতে গিয়ে মানুষের স্বভাবজাত রুচির পার্থক্য ও বুঝের তারতম্য থাকার কারণে কিছু মাসআলাতে অমৌলিক ও শাখাগত কিছু বিষয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে। ফলে প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন তরীকা ও পদ্ধতিতে সেগুলোর ব্যাখ্যা করেছেন এবং উপস্থাপন করেছেন।

এখন যারা উক্ত মাসআলাগুলোতে আশআরী রাহ.-এর তরীকা অবলম্বন করেন, তাদেরকে 'আশআরী' আর যারা মাতুরীদী রাহ.-এর পদ্ধতি গ্রহণ করেন, তাদেরকে 'মাতুরীদী' বলা হয়। এ কথা অনেক ইমাম সুস্পষ্টভাবে বলেছেন। যেমন : মুহাদ্দিস আবুল হাসান কাবেসী মালেকী রাহ. (মৃ. ৪০৩ হি.) বলেন,

وَاعْلَمُوا أن أبا الحسن الأشعري لم يَأْتِ من علم الْكَلَام، إِلَّا مَا أَرَاد به إِيضَاحَ السُّنَن والتثبُّت عَلَيْها. وَمَا أَبُو الْحسن إِلَّا وَاحِدٌ من جملَة القائمين فِي نصْرَة الْحق. إِلَى أَن قَالَ: لقد مَاتَ الأشعري يَوْم مَاتَ، وَأهلُ السّنة باكون عَلَيْهِ، وَأهلُ الْبدعَ مستريحون مِنْهُ.

'জেনে রাখা দরকার, আবুল হাসান আশআরী রাহ. ইলমুল কালামের মাধ্যমে মূলত সুন্নাহর ব্যাখ্যা করেছেন এবং সুন্নাহকে মজবুত করেছেন।

তিনি আরও বলেন, আবুল হাসান রাহ. হক প্রতিষ্ঠায় সাহায্যকারীদেরই একজন। আশআরী রাহ. যেদিন মৃত্যুবরণ করেছিলেন, সেদিন আহলুস সুন্নাহ কেঁদেছিল আর বিদআতপন্থীরা খুশি হয়েছিল!'[৮৫]

ইমাম বায়হাকী শাফেয়ী রাহ. (মৃ. ৪৫৮ হি.) বলেন,

...إِلَى أَن بلغتْ النّوبَة إِلَى شيخِنَا أَبِي الحسن الْأَشْعَرِيّ، فَلم يُحدِث فِي دين الله حَدثًا وَلم يَأْتِ فِيهِ ببدعة، بل أَخذ أقاويل الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ، وَمَن بعدهمْ من الْأَئِمَّة فِي أصُول الدّين، فنصرها بِزِيَادَة شرح وتبيين.

'আবুল হাসান আশআরী রাহ. দ্বীনের ক্ষেত্রে নতুন কোনো মাযহাব বা মত-পথ সৃষ্টি করেননি; বরং তিনি সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন ও ইমামগণের আকীদা-সংশ্লিষ্ট বক্তব্যসমূহকে বিস্তৃত আকারে উপস্থাপন করেছেন।'[৮৬]

আল্লামা মুরতাযা যাবীদী মাতুরীদী হানাফী রাহ. (মৃ. ১২০৫ হি.) লেখেন,

وليُعلم أن كُلًّا من الإمامَيْن أبي الحسن وأبي منصور – وجزاهما عن الإسلام خيرًا – لم يَبْدِعا من عندهما رأيًا ولم يَشْتَقَّا مذهبًا، إنما هما مقرِّران لمذاهب السلف، مناضِلان عما كانتْ عليه أصحابُ رسول ﷺ.

'জেনে রাখো, আবুল হাসান (আশআরী) ও আবু মানসুর (মাতুরীদী), উভয় ইমাম নিজেদের পক্ষ থেকে নতুন কোনো মত উদ্ভাবন করেননি এবং কোনো মাযহাব সৃষ্টি

---

৮৫. তাবাকাতুশ শাফিয়াতিল কুবরা, ৩/৩৬৭

৮৬. তাবয়ীনু কাযিবিল মুফতারী, পৃষ্ঠা ২৩০; তাবাকাতুশ শাফিয়াতিল কুবরা, ৩/৩৬৭

করেননি; বরং তারা সালাফের মাযহাবকে সুদৃঢ় করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামের মত-পথ প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন।'[৮৭]

ইবনে আসাকির আশআরী শাফেয়ী রাহ. (মৃ. ৫৭১ হি.) বলেছেন,

ولسنَا نُسلِّم أَن أَبَا الْحسن اخترع مذهبًا خَامِسًا، وَإِنَّمَا أَقَامَ مِن مَذَاهِب أهل السّنة مَا صَار عِنْد المبتدعة دارسا، وأوضح من أَقْوَال من تقدمه من الْأَرْبَعَة وَغَيرهم مَا غَدَا ملتبسًا...

وَإِنَّمَا يَنتسِب مِنَّا مَن انتسب إِلَى مذْهبه ليتميز عَن المبتدعة الَّذين لَا يَقُولُونَ بِهِ مِن: أصنَاف الْمُعْتَزِلَة، والجَهمِيَّة المعطِّلة، والمجسِّمة الكرَّامية، والمشبِّهة السالميَّة، وَغَيرهم من سَائِر طوائف المبتدعة، وَأَصْحَاب المقَالات الْفَاسِدَة المخترعة؛ لِأَن الْأَشْعَرِيّ هُوَ الَّذِي انتدب للرَّدّ عَلَيْهِم حَتَّى قَمَعهم، وَأظْهر لمن لم يعرِف الْبِدَع بِدَعَهم.

সারাংশ : 'আমরা এ কথা মনে করি না যে, আবুল হাসান (আশআরী) রাহ. পঞ্চম মাযহাব সৃষ্টি করেছেন; বরং তিনি আহলুস সুন্নাহর মাযহাবকে প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং চার ইমামসহ অন্য ইমামের বক্তব্যগুলো ব্যাখ্যা করেছেন।

আমরা তাঁর মাযহাবের প্রতি নিজেদেরকে যুক্ত করার (তথা আশআরী বলার) কারণ হচ্ছে, বিভিন্ন বিদআতপন্থী ও বাতিল ফেরকার আকীদার অনুসারী, যেমন : মুতাযিলা, জাহমিয়া, দেহবাদী কাররামিয়া ও সাদৃশ্যবাদী সালেমিয়া থেকে পার্থক্য সৃষ্টি করা। কেননা, আশআরী রাহ. তাদের খণ্ডন করে পরাজিত করেছেন এবং ভ্রষ্টতা সম্পর্কে বেখবর লোকদের সামনে তাদের ভ্রষ্টতা তুলে ধরেছেন।'[৮৮]

প্রিয় পাঠক, ইবনে আসাকির রাহ.-এর বক্তব্য থেকে এ কথাও সুস্পষ্ট হয়েছে যে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর অনুসারীগণ তখনকার বিভিন্ন বিদআতপন্থী ও বাতিল ফেরকার অনুসারী থেকে নিজেদের পার্থক্য করার জন্য 'আশআরী' বা 'মাতুরীদী' কিংবা 'আছারী' বলে থাকেন। যেভাবে বর্তমানে আমরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর বিপরীত আকীদা-মাসলাক বা মানহাজের অনুসারী ও বিদআতপন্থী থেকে নিজেদের পার্থক্য করার জন্য 'দেওবন্দী' বলে থাকি।

অন্যথায় 'আশআরী' বা 'মাতুরীদী' কিংবা 'আছারী' যেমন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর বিপরীত ভিন্ন কোনো দল নয়, তেমনইভাবে 'দেওবন্দীরা'ও কোনো নতুন ফেরকা নয়।

শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে আওদা কাদূমী হাম্বলী রাহ. (মৃ. ১৩৩১ হি.) বলেন,

---

৮৭. ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন, ২/৭

৮৮. তাবয়ীনু কাযিবিল মুফতারী, পৃষ্ঠা ৬৩৬-৩৭; আরও দেখুন, আহলুস সুন্নাহ আল-আশায়িরা, পৃষ্ঠা ৩৪-৩৭ ও বান্দার তাইসীরু ইলমিল আকীদার ভূমিকা

فإن هذه الفرق الثلاث هم المعبر عنهم بأهل السنة والجماعة، وهم أهل الظهور في جميع الأعصار والأمصار، وهم الطائفة المنصورة، وهم السواد الأعظم.

'এই তিনও দলকে 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ' বলে ব্যক্ত করা হয়। সকল যুগে সমস্ত এলাকায় তাঁরাই প্রতিষ্ঠিত। তাঁরাই 'তায়েফায়ে মানসূরাহ' তথা সাহায্যপ্রাপ্ত দল এবং তাঁরাই 'সাওয়াদে আযম' তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ উম্মাহ।'[৮৯]

তাই চতুর্থ শতাব্দী থেকে আজ অবধি উম্মাহর প্রায় আহলে ইলম 'আশআরী' নতুবা 'মাতুরীদী' কিংবা 'আছারী'। এ সম্পর্কে মোটামুটিভাবে ধারণা নিতে নিম্নে আশআরী, মাতুরীদী ও আছারী ধারার উল্লেখযোগ্য কিছু কিতাব ও এগুলোর লেখকগণকে দেখে নিতে পারেন।

আশআরী ধারার গুরুত্বপূর্ণ কিছু কিতাব

«رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب» و«استحسان الخوض في علم الكلام» و«الإبانة» و«مقالات الإسلاميين» و«اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» كلها للإمام الأشعري ٦ (ت: ٣٢٤هـ)، «مقالات الأشعري» و«أسماء الله» و«شرح العالم والمتعلم لأبي حنيفة» كلها لابن فُورَك (ت: ٤٠٦هـ)، «الإنصاف فيما يجب اعتقاده» و«تمهيد الأوائل في تلخيص الدلائل» كلاهما للباقلاني (ت: ٤٠٣هـ)، كتاب «الاعتقاد» و«الأسماء والصفات» كلاهما للبيهقي (ت: ٤٥٨هـ)، «مختصر الاعتقاد للبيهقي» للشعراني (ت: ٩٧٣هـ)، «أصول الدين» و«الأسماء والصفات» و«الفرق بين الفِرَق» كلها للبغدادي (ت: ٤٢٩هـ)، «الفِصَل» و«مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» لابن حزم الظاهري (ت: ٤٥٦هـ)، «القصيدة القُشَيْرية» للقُشَيْري (ت: ٤٦٥هـ)، «الأوسط» و«التبصير في الدين» للإسفراييني (ت: ٤٧١هـ)، «الإرشاد إلى قواطع الأدلة» و«لُمع الأدلة» و«العقيدة النظامية» كلها للجُوَيْني (ت: ٤٧٨هـ)، «إلجام العوام» و«قواعد العقائد» و«الاقتصاد في الاعتقاد» و«المقصد الأسنى» و«الأربعين في أصول الدين» كلها للغزالي (ت: ٥٠٥هـ)، «الكتاب المتوسط» و«الأمد الأقصى» لابن العربي (ت: ٥٤٣هـ)، «الإعلام بحدود قواعد الإسلام» و«الشفا بتعريف حقوق المصطفى» لعياض (ت: ٥٤٤هـ)، «المِلل والنحل» للشهرستاني (ت: ٥٤٨هـ)، «تبيين كذب المفتري فيما نُسب إلى الإمام الأشعري» (ت: ٥٧١هـ)، «المطالب العالية» و«معالم أصول الدين» و«تأسيس التقديس» و«الأربعين في أصول الدين» و«لوامع البينات» كلها للفخر الرازي (ت: ٦٠٦هـ)، «الإقناع في مسائل الإجماع» (كتاب الإيمان) لابن القطان الفاسي (ت: ٦٢٨هـ)، «غاية المرام» و«أبكار الأفكار» للآمدي (ت: ٦٣١هـ)، «عقيدة ابن الحاجب» (ت: ٦٤٦هـ)، رسائل في العقائد لعِزّ ابن عبد السلام (ت: ٦٦٠هـ)، «مصباح الأرواح» للبيضاوي (ت: ٦٨٥هـ)، «إيضاح الدليل في قطع حجج أهل

৮৯. দ্র. আল-মানহাজুল আহমাদ ফী দারয়িল মাছালিবিল লাতি তুনমা লি-মাযহাবিল ইমাম আহমাদ, পৃষ্ঠা ৪২

التعطيل» لابن جماعة (ت: ٧٣٣هـ)، «النور المبين في قواعد عقائد الدين» لابن جُزَي الكلبي (ت: ٧٤١هـ)، «إزالة الشبهات عن المتشابهات» لابن اللَّبَّان (ت: ٧٤٩هـ)، «المواقف» للإيجي (ت: ٧٥٦هـ)، «شرح العقائد النسفية» و«شرح المقاصد» كلاهما للتفتازاني (ت: ٧٩٣هـ)، الكتب الستة للسَّنوسي (ت: ٨٩٥هـ)، «تحرير المطالب فيما تضمَّنتْه عقيدة ابن الحاجب» للبكّي (ت: ٩١٦هـ)، «جوهرة التوحيد» لإبراهيم اللَّقاني (ت: ١٠٤١هـ)، «العقيدة الحسنة» لولي الله الدهلوي (ت: ١١٧٦هـ)، «الخريدة البهيَّة» وشرحها كلاهما لأحمد الدردير (ت: ١٢٠١هـ)، «الجواهر الكلامية» للجزائري (ت: ١٣٣٨هـ).

মাতুরীদী ইমামগণের উল্লেখযোগ্য কিছু কিতাব

«كتاب التوحيد» و«تأويلات القرآن» كلاهما للإمام الماتريدي ٦ (ت: ٣٣٣هـ)، «أصول الدين» لأَبي اليُسر البَزدوي (ت: ٤٩٣هـ)، «التمهيد» لأبي شكور السالمي (ت: بعد ٤٦٠هـ)، «بحر الكلام» و«تبصرة الأدلة» و«التمهيد في أصول الدين» كلها لأبي المعين النسفي (ت: ٥٠٨هـ)، «البداية» و«الكفاية في الهداية» و«المنتقى من عصمة الأنبياء» كلها لنور الدين الصابوني (ت: ٥٨٠هـ)، «التمهيد لقواعد التوحيد» لأبي الثناء اللامشي (ت: في أوائل السادس الهجري)، «تلخيص الأدلة لقواعد التوحيد» لإبراهيم الصفّار (ت: ٥٣٤هـ)، «العقائد النسفية» لنجم الدين النسفي (ت: ٥٣٧هـ)، «بدء الأمالي» (وهو نظم العقائد النسفية) للأوشي (ت: ٥٧٥هـ) وشرحه «ضوء المعالي» للقاري، «المُعتَمَد من المُعتقَد» للكاساني (ت: ٥٨٧هـ)، «المُعتَمَد في المُعتقَد» (فارسي) للتوربِشتي (ت: ٦٦١هـ)، «الشافي في أصول الدين» لابن دمرك (ت: منتصف القرن الثامن الهجري)، «عمدة العقائد» وشرحها «الاعتماد في الاعتقاد» كلاهما لأبي البركات النسفي (ت: ٧١٠هـ)، «شرح وصية الإمام أبي حنيفة» و«شرح المقصد في أصول الدين» كلاهما لأكمل الدِّين البَابِرْتي (ت: ٧٧٨هـ)، «المسايرة» للمحقق ابن الهمام (ت: ٨٦١هـ)، «الأصول المنيفة للإمام أبي حنيفة»[৯০] و«إشارات المرام عن عبارات الإمام» للبَياضي (ت: ١٠٩٨هـ)، وشرح

---

٩٠. جمع فيه نصوص الإمام أبي حنيفة في العقائد من: الفقه الأكبر، والفقه الأبسط، وكتاب العالم والمتعلم، والرسالة، والوصية: برواية حماد بن أبي حنيفة، وأبي يوسف، وأبي مطيع البلخي، وأبي مقاتل حفص السمرقندي، ثم شرحه نفسُه شرحا نفيسا باسم: «إشارات المرام عن عبارات الإمام».

وكذا شرَح «الفقه الأكبر» جماعةٌ، منهم: أبو الليث السمرقندي (ت: ٣٧٥هـ)، والبزدوي (ت: ٤٨٢هـ)، والبَابِرْتي (ت: ٧٧٨هـ) سماه «الإرشاد»، والياس بن إبراهيم السِّينوبي (ت: ٨٩١هـ)، وهو شرح مفيد، وأبو المنتهى المغنيساوي (ت: ٩٣٩هـ) سماه «الحكمة النبوية»، ومحيي الدين البَيرامي (ت: ٩٥٦هـ) سماه «القول الفصل»، والملا علي القاري (ت: ١٠١٤هـ) سمَّاه «منح الروض الأزهر» وهو معروف متداول. وكذا شرح «الفقه الأبسط» إبراهيم الملطي من القرن الخامس، وعطاء بن علي الجُوزجاني من القرن السابع.

উল্লেখ্য, প্রচলিত 'আল-ফিকহুল আকবার' গ্রন্থটি ইমাম আবু হানীফার কি না, এতে যথেষ্ট কালাম রয়েছে এবং এর কিছু নুসখায় আবার কিছু তাহরীফ রয়েছে। তবে ইমাম আবু হানীফার 'আল-ফিকহুল আকবার' নামক গ্রন্থ রয়েছে, এতে সন্দেহ নেই। আব্দুল কাহের বাগদাদী, ফখরুল ইসলাম বাযদাভী, ইবনে তাইমিয়া ও যারকাশী রাহ.-

قواعد العقائد من «إتحاف السادة المتقين» للزَّبِيْدي (ت: ١٢٠٥هـ)، «ما لا بد منه» (فارسي، مبحث الإيمان والكفر) للفاني فتي (ت: ١٢٢٥هـ)، «النبراس» و«مرام الكلام» للفرهاروي (ت: بعد ١٢٣٩هـ)، «العقيدة وعلم الكلام» للكوثري (ت: ١٣٧١هـ) و«مقدمات الكوثري».

উল্লিখিতরা ছাড়াও আশআরী বা মাতুরীদী ইমামগণের মধ্যে আছেন,

মুফাসসিরদের মধ্যে :

ইমাম বাগাবী, কুরতুবী, আবুল লাইস সামারকান্দী, আলাউদ্দিন খাযেন, আবু হাইয়ান, যারকাশী, সা'লাবী, ইবনে আদেল হাম্বলী, জালালুদ্দিন সুয়ূতী, আবুস সাউদ, যুরকানী, সানাউল্লাহ পানিপথী, মাহমুদ আলূসী, তাহের ইবনে আশুর ও আলী সাবুনী রাহ. প্রমুখ।

মুহাদ্দিসদের মধ্যে :

ইবনে হিব্বান, খাত্তাবী, আবু নুয়াইম আসবাহানী, খতীব বাগদাদী, ইবনুস সালাহ, ইবনুল কাত্তান ফাসী, মুনযিরী, মুহাদ্দিস কুরতুবী, নববী, ইবনে দাকীকিল ঈদ, কিরমানী, যাইলায়ী, ইবনুল মুলাক্কিন, যাইনুদ্দিন ইরাকী, হাইসামী, ইবনুল মুনায়্যির, ইবনে হাজার আসকালানী, বদরুদ্দিন আইনী, সাখাবী, কাস্তাল্লানী, মুনাবী, আবদুল হাই লাখনাভী, সাহারানপুরী ও আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রাহ. প্রমুখ।

হানাফীদের মধ্যে :

বুরহানুদ্দিন মারগীনানী (হেদায়ের লেখক), আলাউদ্দিন বুখারী, কাসেম বিন কুতলুবুগা, ইবনু আমির হাজ, ইবনে নুজাইম, ইবনে কামাল পাশা ও ইবনে আবেদিন শামী রাহ. প্রমুখ।

মালেকী মাযহাবের মধ্যে :

ইবনে বাত্তাল, আবুল ওয়ালিদ বাজী, কারাফী, শাতিবী ও ইবনে খালদুন রাহ. প্রমুখ।

শাফেয়ীদের মধ্যে :

সহ অনেকেই উক্ত কিতাব আবু হানীফার বলেছেন। মুরতাযা যাবীদী রাহ. 'আল-ফিকহুল আকবার'-সহ অন্য কিতাবগুলো নিয়ে লম্বা আলোচনা করেছেন 'ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে।

বাংলাদেশের ইলমী জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্র প্রখ্যাত মুহাক্কিক হযরত মাওলানা আবদুল মালেক হাফিযাহুল্লাহ 'আলকাউসার'-এ লিখেছেন, "আসল 'আল-ফিকহুল আকবার' সেটিই, যেটি মিসরের প্রকাশকগণ 'আল-ফিকহুল আবসাত' নামে ছাপিয়েছেন এবং অনেক প্রকাশক এটিকে 'আল-ফিকহুল আকবার' নামেই ছাপিয়েছেন।"

এ ছাড়া রুস্তম মাহদী নামে একজন এ বিষয়ে স্বতন্ত্র একটি কিতাব লিখেছেন। যার নাম হলো,

دحض الشبهات المثارة حول الفقه الأكبر رواية حماد بن أبي حنيفة، والفقه الأكبر رواية أبي مطيع البلخي

তবে বিষয়টি আরও ব্যাপক গবেষণা ও বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে।

সামআনী, ইস্ফারায়েনী, ইবনুল জাযারী, জালালুদ্দিন মাহাল্লী, কাযবিনী, ইবনে ইসহাক শিরাযী, তকিউদ্দিন সুবকী, তাজুদ্দীন সুবকী, যাকারিয়া আনসারী, ইবনে হাজার হাইতামী, শামসুদ্দিন রমালী ও ইবনে আল্লান রাহ. প্রমুখ।

ভাষাবিদদের মধ্যে :

ইবনুল আম্বারী, ফায়রুযাবাদী, ইয়াকুত হামাবী, ইবনে মানযুর (লিসানুল আরবের লেখক), ইবনে আকীল ও ইবনে মালেক রাহ. প্রমুখ।

মুজাহিদদের মধ্যে :

আলপ আরসালান, নিজামুল মুলক তুসী, ইউসুফ বিন তাশফীন, নুরুদ্দীন যিনকী, সালাহুদ্দিন আইউবী, সাইফুদ্দীন কুতয ও মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ রাহ. প্রমুখ।

মাতুরীদী আকীদা ও 'আকীদাতুত তাহাবী' নিয়ে কিছু আলোচনা

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর ইমামদ্বয় আশআরী ও মাতুরীদীর সমসাময়িক ছিলেন আরেক ইমাম আবু জাফর তাহাবী রাহ.। তাঁর জন্ম ২৩৯ হিজরীতে আর মৃত্যু ৩২১ হিজরীতে। তিনি ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিকহের বড় ইমামগণের অন্যতম ছিলেন। আকীদার দিক থেকে তিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর ইমাম ছিলেন আর মাযহাবের দিক থেকে হানাফী মাযহাবের ফকীহ ছিলেন। তাঁর রচিত 'শারহু মাআনীল আসার'[৯১] ও 'শারহু মুশকিলিল আসার' হলো হাদীসশাস্ত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটি কিতাব।

তিনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর আকীদা বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত কিতাব রচনা করেন, যা 'আকীদাতুত তাহাবী' বা 'আল-আকীদাতুত তাহাবিয়্যাহ' নামে পরিচিত। এই কিতাব আশআরী, মাতুরীদী, আছারী, সালাফী, হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও

---

৯১. আমাদের দরসে নেজামীতে সনদসহ হাদীসের আলোকে হানাফী মাযহাবের প্রায় মাসআলার (বিশেষত ইবাদত-সংক্রান্ত) দলীলসমৃদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য একমাত্র বড় কিতাব হচ্ছে এটি। এ কারণেই ইউসুফ বানূরী রাহ. পাকিস্তানে তাঁর মাদরাসায় তাহাবী শরীফকে তিরমিযী শরীফের মান দিয়ে এবং এর মতো গুরুত্ব দিয়ে পড়ানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। এটা আমি হযরতের দুই শাগরিদ, আমার তাহাবী শরীফের শায়খ উস্তাদে মুহতারাম মুফতী আযম আব্দুস সালাম চাটগামী রাহ. এবং আমার মুসলিম শরীফের শায়খ উস্তাদে মুহতারাম শায়খুল হাদীস জুনায়েদ বাবুনগরী রাহ.—উভয়ের কাছ থেকে শুনেছি।

এ ছাড়া শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রাহ. 'আউজাযিল মাসালিক'-এর মুকাদ্দিমাতে এবং আব্দুল বারী লাখনাভী রাহ. 'আত-তা'লীকুল মুখতার আলা কিতাবিল আসারে' হানাফীদের জন্য বিশেষ গুরুত্ব সহকারে তাহাবী শরীফ পড়ার জন্য বলেছেন। অথচ প্রায় মাদরাসায় এ কিতাবটি চরম অবহেলিত।

বর্তমানে কওমী মাদরাসায় পড়ুয়া কিছু ছাত্র ও ফারেগ আহলে হাদীস ও লা-মাযহাবী বন্ধুদের প্রোপাগান্ডায় হানাফী মাযহাব সম্পর্কে সন্দিহান হওয়া বা প্রশ্ন তোলা কিংবা তাদের দিকে ধাবিত হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে, নকলী দলীল এবং তাহাবী শরীফ কিতাবটিকে যথাযথ গুরুত্ব না দেওয়া। আল্লাহ তাআলা হযরত বানূরী রাহ.-এর ওপর রহম করুন। তিনি কত দূরদর্শী ও বিচক্ষণতার সাথে আমাদেরকে ও পরবর্তী প্রজন্মকে ফিতনা থেকে রক্ষা করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

হাম্বলীসহ সকলের কাছে সমাদৃত এক মাকবূল কিতাব। দারুল উলূম দেওবন্দের নেসাবে (হেদায়া আওয়াল জামাতে) এবং আরববিশ্ব-সহ সমগ্র পৃথিবীতে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত।[৯২]

এ কিতাবটির শুরুতে ইমাম তাহাবী রাহ. লিখেছেন,

هَذَا ذِكْرُ بَيَانِ اعْتِقَادِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ عَلَى مَذْهَبِ فُقَهَاءِ الْمِلَّةِ: أَبِيْ حَنِيفَةَ النُّعْمَانِ بْنِ ثَابِتٍ الْكُوفِيِّ، وَأَبِيْ يُوسُفَ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَنْصَارِيِّ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيِّ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، وَمَا يَعْتَقِدُوْنَ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ وَيَدِينُوْنَ بِهِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.

অর্থাৎ তিনি এই কিতাবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর আকীদা বর্ণনা করবেন। আর এসব আকীদা তিনি হানাফী মাযহাবের প্রথম সারির তিন ইমাম (আবু হানীফা রাহ. ৮০-১৫০ হি., আবু ইউসুফ রাহ. ১১৩-১৮২ হি. ও মুহাম্মাদ ১৩২-১৮৯ হি.)-এর মাসলাক ও আকীদা মোতাবেক বর্ণনা করবেন।

ইতিহাস থেকে ইমামত্রয়ের (আশআরী, মাতুরীদী ও তাহাবীর) পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার কথা জানা যায় না। তবে তিনজনই একই সময়ে ইসলামী-বিশ্বের (ইরাক, শাম, খোরাসান, সমরকন্দ, মাতুরীদ ও মিশরসহ) বিভিন্ন প্রান্তে ইসলামী আকীদার প্রতিনিধিত্ব করতে গিয়ে যে খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন তার ফলাফল এক ও অভিন্ন হয়েছে।

কারও কারও ধারণা হচ্ছে, ইমাম তাহাবীর বর্ণনাকৃত আকীদা ইমাম আবু হানীফা রাহ. ও হানাফী মাযহাবের আকীদা হলেও ইমাম আবু মানসুর মাতুরীদীর লিখিত আকীদা এমন নয়। কেননা, ইমাম মাতুরীদী রাহ. হানাফী মাযহাবের রেওয়ায়েতের পরিবর্তে ইলমুল কালামের তরীকা অবলম্বন করেছেন।[৯৩]

---

৯২. কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, বাংলাদেশের অনেক বড় বড় মাদরাসায় এমন বিশ্বব্যাপী সব ঘরানায় সমাদৃত কিতাবটি নেসাবে অন্তর্ভুক্ত নয়। আবার কিছু মাদরাসায় থাকলেও যথাযথ গুরুত্বের সাথে পড়ানো হয় না। ফলে আমাদের ছাত্ররা,

ক. এমন গুরুত্বপূর্ণ ও সমাদৃত কিতাবটি পড়া থেকে মাহরুম হয়।

খ. এই কিতাব না পড়ে প্রথমেই 'শারহুল আকায়েদ' পড়ার কারণে আকীদা অনেক কঠিন মনে হয়।

গ. বর্তমান সালাফী শায়খ ও তাদের অনুসারী ভাইয়েরা কিতাবটি নিজেদের মতো ব্যাখ্যা করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। তাদের বড় বড় প্রায় শায়খ এটার ব্যাখ্যা লিখেছেন। কিন্তু আমাদের ছাত্ররা এ বিষয়ে যথাযথভাবে অবগত না হওয়ার কারণে তা নিজেরাও ভালোভাবে বুঝতে পারে না এবং অন্যকেও সতর্ক করতে পারে না।

আলহামদুলিল্লাহ, বান্দা ৩০টির অধিক মাখতূত সামনে রেখে 'আকীদাতুত তাহাবী'র তাহকীক শেষ করেছি। এখন জরুরি সংক্ষিপ্ত তা'লীক করা হচ্ছে।

৯৩. ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (১৯৫৮ ঈ.-২০১৬ ঈ.) তাঁর 'আল-ফিকহুল আকবার : বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা' বইয়ে (পৃষ্ঠা ২৭৭) লেখেন, 'তবে আকীদা ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে ইমাম মাতুরীদী ইমাম ইবনে কুল্লাব ও ইমাম আশআরীর ইলমে কালাম-নির্ভর ধারা অনুসরণ করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম তাহাবী মূলত ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর দুই সঙ্গীর আকীদা ব্যাখ্যা করেছেন।'

অথচ এ ধারণা সঠিক নয়। কেননা, উভয়ের মাঝে পার্থক্য এটুকু যে, ইমাম তাহাবী রাহ. সংক্ষেপে শুধু মৌলিক আকীদাগুলো উপস্থাপন করেছেন এবং মতানৈক্যপূর্ণ বিষয় আনলেও মতানৈক্যের আলাপ করেননি; বরং এ ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের প্রথম সারির তিন ইমামের নীতি অনুযায়ী সিদ্ধান্তটা শুধু লিখেছেন, যেমন তিনি ঈমানের সংজ্ঞায় করেছেন।[৯৪]

আর ইমাম মাতুরীদী রাহ. সেই মৌলিক আকীদাগুলো ব্যাখ্যা ও দলীলসহ সবিস্তারে আলোচনা করেছেন এবং মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়ের বিশ্লেষণ, অতঃপর প্রাধান্যদান ইত্যাদির কাজও করেছেন। অর্থাৎ মৌলিক আকীদাগুলোর ব্যাখ্যা করেছেন আবার সেসব বিষয়ে কুরআন, হাদীস ও আসার থেকে দলীল উল্লেখের পাশাপাশি আকলী দলীল তথা যুক্তিনির্ভর দলীলও উপস্থাপন করেছেন এবং মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়ের বিশ্লেষণ করে একটি মতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আর সেসব আকীদার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভ্রান্ত ফেরকা বিকৃতির যে অপচেষ্টা চালিয়েছে তার খণ্ডনও করেছেন এবং ভ্রান্ত ফেরকাগুলোর বিভিন্ন সংশয় ও আপত্তির জবাবও দিয়েছেন।

অতএব পার্থক্য সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত বর্ণনার এবং উপস্থাপনের বিভিন্নতার; নতুবা মূল আকীদার বিষয়ে তাঁদের মাঝে কোনো মতবিরোধ নেই।

এ জন্যই আমরা দেখি, মাতুরীদী মাসলাকের অনুসারী অনেক আলেম 'আকীদাতুত তাহাবী'র ব্যাখ্যা লিখেছেন। তবে তাদের কেউই ইমাম তাহাবীর সঙ্গে মতবিরোধ করেননি।

'আকীদাতুত তাহাবী'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও হাশিয়া বা টীকা

'আকীদাতুত তাহাবী'র অনেক ব্যাখ্যাগ্রন্থ ও হাশিয়া (টীকা) রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো :

«البيان: اعتقاد أهل السنة» للشيباني (ت: ٦٢٩هـ)، و«النور اللامع والبرهان الساطع» للناصري (ت: ٦٥٨هـ)، ومختصره للتركستاني (ت: ٧٣٣هـ)، و«القلائد في العقائد» للقُونوي (ت: ٧٧١هـ)، و«شرح العقيدة الطحاوية» للغزنوي (ت: ٧٧٣هـ)، أو للبابِرتي (ت: ٧٧٨هـ)، و«نور اليقين في أصول الدين» للأقحصاري (ت: ١٠٢٥هـ)، و«شرح العقيدة الطحاوية» للميداني (ت: ١٢٩٨هـ)، وللقاري طيب الديوبندي (ت: ١٤٠٢هـ). ومن المعاصرين: «العصيدة السماوية» لرضاء الحق، و«الشرح الكبير» لسعيد فودة، و«العقيدة الطحاوية بين السلفية المعاصرة والمتكلمين» لحازم حسن عبد البصير.

---

৯৪. অর্থাৎ তিনি কোনো বিষয়ে মতানৈক্য ও এর বিশ্লেষণ, অতঃপর একটাকে প্রাধান্যদান—এ-জাতীয় কাজ করেননি। যেমন, তিনি ঈমানের সংজ্ঞা লিখেছেন, সিফাতের আলোচনা এনেছেন—এগুলোতে মতানৈক্য আছে। কিন্তু তিনি বিস্তারিত আলোচনায় যাননি, মতানৈক্যের আলাপ তুলেননি; বরং শুধু হানাফী মাযহাবের মতটা উল্লেখ করেছেন। কাজেই মতানৈক্যের আলাপ না করা, আর মতানৈক্যপূর্ণ বিষয় না আনা এক কথা নয়।

মাতুরীদীরা ইমাম আবু হানীফার আকীদা না মানার দাবি ও বাস্তবতা

কিছু লোকের পক্ষ থেকে খুব জোরালোভাবে এই প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, মাতুরীদীরা শুধু ফিকহ ও আমলের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফাকে মানে এবং তাঁর দিকে সম্বন্ধ করে নিজেদেরকে 'হানাফী' হিসেবে পরিচয় দেয়। কিন্তু আকীদার ক্ষেত্রে আবু হানীফাকে মানে না বা তাঁর মানহাজ অনুসরণ করে না!

এ প্রোপাগান্ডার পক্ষে ইমাম আবু হানীফার নামে তাদের কতিপয় দাবি,

প্রথম দাবি : আল্লাহ তাআলা আরশে আছেন না মানলে কাফের হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় দাবি : আল্লাহর 'হাত' ইত্যাদি আছে।

তৃতীয় দাবি : আল্লাহর সিফাতের তাবীল করা যাবে না।

চতুর্থ দাবি : তাফবীযুল মা'না নয়, বরং তাফবীযুল কাইফিয়াহ।

পঞ্চম দাবি : 'জিসম' বা দেহ ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনা তো দার্শনিকদের কথা।

ষষ্ঠ দাবি : মাতুরীদীরা আকীদার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফার অনুসারী হলে, আমলের মতো আকীদার ক্ষেত্রেও নিজেদেরকে 'হানাফী' বলে পরিচয় দেয় না কেন?

এখানে উপরিউক্ত দাবিগুলোর মধ্যে প্রথম চারটি দাবি আল্লাহ তাআলার সিফাতের আলোচনার সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই প্রথম চারটি দাবির জবাব এখানে আলোচনা না করে সিফাতের আলোচনার শেষে করব, যাতে ভালোভাবে বোধগম্য হয়।

এখানে শুধু পঞ্চম ও ষষ্ঠ দাবির জবাব উল্লেখ করছি।

পঞ্চম দাবি : 'জিসম' বা দেহ ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনা তো দার্শনিকদের কথা।

ইমাম আবু হানীফা রাহ. 'জিসম' বা দেহ, 'আরয' বা পরনির্ভর অস্থায়ী কোনো বস্তু নন ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনাকে দার্শনিকদের কথা ও বিদআত আখ্যা দিয়ে তা বর্জন করতে বলেছেন। অথচ মাতুরীদীরা এ সমস্ত আলোচনা করে থাকে।

পঞ্চম দাবির জবাব :

এ সম্পর্কে কথা 'ইলমুল কালাম জাদীদ'-এর আলোচনায় আগে একবার গেছে। তাই সংক্ষেপে বলছি, ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর নামে প্রচলিত যে 'আল-ফিকহুল আকবার' গ্রন্থ রয়েছে, যা সালাফী বন্ধুদের কাছেও গ্রহণযোগ্য, তাতে স্বয়ং তিনি স্রষ্টার অস্তিত্ব, অনাদিত্ব ও বিশেষণ প্রমাণে বলেছেন,

وهو شيء لا كالأشياء، ومعنى الشيء: إثباته بلا جسم ولا جوهر ولا عرض.

'তিনি (আল্লাহ) বিদ্যমান বস্তু ও সত্তা, তবে অন্যান্য বিদ্যমান বস্তুর মতো নন। আর বিদ্যমান হওয়ার ব্যাখ্যা হচ্ছে, তিনি **'জিসম'** বা দেহধারী নন, 'জওহর' বা স্বনির্ভর

মৌলপদার্থ নন এবং 'আরয' বা পরনির্ভর অস্থায়ী কোনো বস্তু নন প্রমাণ করা।'[৯৫]

যদি এগুলো বর্জনীয় দার্শনিকদের কথা হতো, তাহলে তিনি আলোচনা করতেন না। সুতরাং তিনি যেহেতু এ সমস্ত আলোচনা করেছেন, তাই মাতুরীদীরাও করে থাকে।

ষষ্ঠ দাবি : 'মাতুরীদী'রা আমলের মতো আকীদার ক্ষেত্রেও 'হানাফী' বলে না কেন?

'মাতুরীদী'রা ফিকহের মতো ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর দিকে সম্বন্ধ করে আকীদার ক্ষেত্রেও নিজেদেরকে 'হানাফী' হিসেবে পরিচয় দেয় না; বরং ইমাম আবু মানসুর মাতুরীদীর দিকে সম্বন্ধ করে 'মাতুরীদী' পরিচয় প্রদান করে বা নিজেদেরকে 'মাতুরীদী' বলে।

ষষ্ঠ দাবির জবাব :

আসল জবাবের আগে একটা প্রশ্ন হলো, ফিকহের মাযহাবগুলো সাহাবীদের নামে হলো না কেন? বরং আবু হানীফা, মালেক, শাফেয়ী বা ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের নামে হলো কেন?

'হানাফী' ফিকহের মূল গোড়ায় আছেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি., আর শেষে আছেন হাম্মাদ বিন আবী সুলায়মান রাহ.। তো ফিকহে হানাফীর নাম 'মাসঊদী' বা 'হাম্মাদী' নামে হয়নি কেন?

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহ. তাবে-তাবেয়ীও না, বরং এর পরের। হাম্বলীরা যেহেতু সালাফকে অনুসরণের কথা বলেন, তো বড় সালাফ হলেন সাহাবায়ে কেরাম, এরপর তাবেয়ী। কাজেই সাহাবা-তাবেয়ী থেকে কারও দিকে নিজেদের সম্বোধন না করে একজন তাবে-তাবেয়ীও না—এমন ব্যক্তির দিকে সম্বন্ধ করে 'হাম্বলী' বলেন কেন?

এগুলোর উত্তর হলো, কোনো ক্ষেত্রে কারও কাজ ও অবদান যদি মূলনীতি ও জরুরি বিষয়গুলোসহ বিস্তৃত আকারে ও যথেষ্ট পর্যায়ে হয় এবং তাঁর মাধ্যমে সুবিন্যস্ত হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে, তখন তার দিকে সম্বন্ধ হয়ে উক্ত কাজের নামকরণ হয় বা প্রসিদ্ধি লাভ করে। ফিকহের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফার কাজ ও অবদান বিস্তৃত আকারে ও যথেষ্ট পর্যায়ে হয়েছে বিধায় তাঁর দিকে সম্বন্ধ হয়ে 'হানাফী' নামে উক্ত কাজের নামকরণ হয়েছে বা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। একই কারণ 'হাম্বলী'-সহ অন্যান্য মাযহাবের ক্ষেত্রেও।

অনুরূপ, আকীদার ক্ষেত্রে নিসবত ও সম্বন্ধকরণের বিষয়টা। ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর আকীদার ক্ষেত্রে অনেক কাজ ও অবদান রয়েছে সত্য, যেভাবে 'হানাফী'

---

৯৫. আল-ফিকহুল আকবার, বি-রিওয়াতি হাম্মাদ, আকীদা নং ১২-সূত্রে মাজমুউ কুতুব ওয়া রাসায়িল ওয়া ওসায়াল ইমামিল আযম, পৃষ্ঠা ২৫৯

ফিকহের ক্ষেত্রে ইবনে মাসউদ রাযি. ও হাম্মাদ রাহ.-এরও রয়েছে। কিন্তু তা বিস্তৃত আকারে ও যথেষ্ট পর্যায়ে নয়; যেমনটা পরবর্তীকালে ইমাম আবু মানসুর মাতুরীদী রাহ. করেছেন। বিশেষত যুগের চাহিদা পূরণে ও বাতিল ফেরকার খণ্ডনে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর আকীদার যথাযথ উপস্থাপন বিস্তৃত আকারে ও যথেষ্ট পর্যায়ে করেছেন। এবং তাঁকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে সুবিন্যস্ত হয়ে তা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। ফলে তাঁর দিকে সম্বন্ধ করে হানাফীরা নিজেদেরকে 'মাতুরীদী' পরিচয় প্রদান করে বা 'মাতুরীদী' বলে।

এ জন্যই যারা এ বিষয়ে কাজ করেছেন এবং বিস্তর গবেষণা করেছেন তারা বলেছেন, ইমাম আবু মানসুর মাতুরীদী রাহ. মূলত ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর আকীদাকে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন এবং বিস্তৃত আকারে উপস্থাপন করেছেন।

আল্লামা মুরতাযা যাবীদী হানাফী রাহ. (মৃ. ১২০৫ হি.) লেখেন,

وليُعلم أن كُلًّا من الإمامَيْن أبي الحسن وأبي منصور لم يَبْدِّعا من عندهما رأيًا ولم يَشْتَقَّا مذهبًا، إنما هما مقرِّران لمذاهب السلف، مناضِلان عما كانتْ عليه أصحابُ رسول ﷺ. فأحدُهما قام بنصرة نصوص مذهب الشافعي وما دلتْ عليه، والثاني قام بنصرة نصوص مذهب أبي حنيفة وما دلتْ عليه. وناظَرَ كلٌّ منهما ذوي البدع والضلالات، حتى انقَطَعُوا وولُّوا منهزِمِيْن. فالانتساب إليهما إنما هو باعتبار أن كلا منهما عقد على طريق السلف نطاقًا، وتمسك وأقام الحجج والبراهين عليه، فصار المُقتدى به في تلك المسالك والدلائل، ويسمى أشعريًا وماتريديًا.

'জেনে রাখো, আবুল হাসান (আশআরী) ও আবু মানসুর (মাতুরীদী), উভয় ইমাম নিজেদের পক্ষ থেকে নতুন কোনো আকীদা আবিষ্কার করেননি এবং কোনো মাযহাব সৃষ্টি করেননি; বরং তারা সালাফের মাযহাবকে সুদৃঢ় করেছেন এবং সাহাবায়ে কেরামের মত-পথ প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন।

একজন শাফেয়ী মাযহাবের বক্তব্যগুলোর (ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে) সহায়তা করেছেন। আর দ্বিতীয়জন আবু হানীফার মাযহাবের বক্তব্যগুলোর (ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে) সাহায্য করেছেন। উভয়ের প্রত্যেকে বিদআতপন্থী ও গোমরাহদের সাথে মুনাযারা করেছেন। অবশেষে তাদের অবসান হয়েছে এবং পরাজিত হয়ে পলায়ন করেছে।'

তিনি আরও বলেন,

فالأشعرى بنى كتبه على مسائل من مذهب الإمامين مالك والشافعي، أخذ ذلك بوسائط فأيدها وهذَّبها، والماتريدي كذلك أخذها من نصوص الإمام أبي حنيفة، وهي في خمسة كتب: «الفقه الأكبر» و«الرسالة» و«الفقه الأبسط» وكتاب «العالم والمتعلم» و«الوصية» نُسِبَت إلى الإمام.

'আশআরী রাহ. তাঁর কিতাবাদির ভিত্তি রেখেছেন ইমাম মালেক রাহ. ও ইমাম শাফেয়ী রাহ.-এর মাযহাবের মাসআলাসমূহের ওপর, যা তিনি বিভিন্ন মাধ্যমে গ্রহণ

করেছেন, অতঃপর তা শক্তিশালী করেছেন এবং সুবিন্যস্ত করেছেন।

অনুরূপ ইমাম মাতুরীদী রাহ.-ও ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর বক্তব্য থেকে তা আহরণ করেছেন, যা তাঁর দিকে সম্বোধিত পাঁচ কিতাবে রয়েছে। তথা 'আল-ফিকহুল আকবার', 'আল-ফিকহুল আবসাত', 'আর-রিসালা', 'আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম' ও 'কিতাবুল ওসিয়্যাহ'।'[৯৬]

কামালুদ্দীন বায়াযী রাহ. (মৃ. ১০৯৮ হি.) বলেন,

الماتريدي مفصّل لمذهب الإمام وأصحابه.

'মাতুরীদী রাহ. হলেন ইমাম আবু হানীফা রাহ. ও তাঁর শিষ্যদের মাযহাবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণকারী।'[৯৭]

নিকট অতীতের আকীদা-বিশেষজ্ঞ শায়খ যাহেদ কাউসারী রাহ. (মৃ. ১৩৭১ হি.) 'ইশারাতুল মারাম'-এর ভূমিকায় লেখেন,

إن الماتريدي ليس بمبتكر لطريقة؛ بل هو مفصل لمذهب أبي حنيفة وأصحابه.

'মাতুরীদী রাহ. নতুন কোনো মতবাদ প্রবর্তনকারী নন; বরং তিনি আবু হানীফা রাহ. ও তাঁর শিষ্যদের মাযহাবের বিশদ বিবরণকারী।'[৯৮]

শায়খ আবু যুহরা মিসরী রাহ. (মৃ. ১৩৯৪ হি.) বলেন, 'ইমাম আবু হানীফা থেকে আকীদা বিষয়ে বর্ণিত অভিমতসমূহ এবং আবু মানসুর মাতুরীদীর গ্রন্থসমূহে সিদ্ধান্তকৃত বক্তব্যগুলোর মাঝে তুলনামূলক ইলমী পর্যালোচনা করলে এ কথা প্রতীয়মান হয়, উভয়ের মতামত মৌলিক নীতিমালায় একই সূত্রে গাঁথা।

এ কারণেই উলামায়ে কেরাম বলেছেন, আকীদা বিষয়ে ইমাম আবু হানীফার অভিমতসমূহ হলো মূলভিত্তি, যা থেকে শাখা-প্রশাখা হিসেবে মাতুরীদীর বিভিন্ন বক্তব্য নিঃসৃত হয়েছে।

ইরাক ও তার পার্শ্ববর্তী সিরিয়া প্রভৃতি এলাকার আলেমগণ ইমাম আবু হানীফার ফিকহী রায়সমূহের ওপর শাখা-প্রশাখা উদ্‌ঘাটনের ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করলেও আকীদা বিষয়ে তাঁর রায়সমূহ নিয়ে গুরুত্ব দিতেন না। কেননা, ফুকাহা-মুহাদ্দিস, অতঃপর আশআরী আলেমদের রায়-সিদ্ধান্ত তাদের মাঝে প্রসিদ্ধি লাভ করার ফলে এর ওপর ক্ষান্ত হতেন।

তবে মা-ওয়ারান্নাহরের আলেমগণ ইমাম আবু হানীফার ফিকহের পাশাপাশি আকীদা

---

৯৬. ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন, ২/৭, ৯, ১৮
৯৭. ইশারাতুল মারাম, পৃষ্ঠা ৮৩
৯৮. মুকাদ্দামাতুল কাউসারী, পৃষ্ঠা ১৮০

বিষয়ে তাঁর রায়সমূহের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করতেন। এগুলোর ওপর টীকা-টিপ্পনী সংযুক্ত করে, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে, বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল-প্রমাণ ও দার্শনিক কিয়াস পেশ করে শক্তিশালী করতেন।

আর ইমাম মাতুরীদী রাহ. নিজেই সুস্পষ্ট করে বলেছেন, তিনি ইমাম আবু হানীফার 'আল-ফিকহুল আবসাত', 'আর-রিসালা', 'আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম' এবং ইউসুফ বিন খালেদের প্রতি তাঁর 'ওসিয়্যাহ' ইত্যাদি কিতাব বর্ণনা করেছেন। এমনকি তিনি উল্লেখ করেছেন, এই কিতাবসমূহ তিনি স্বীয় উস্তাদত্রয় আবু নসর আহমদ বিন আব্বাস ইয়াযী, আবু বকর আহমদ বিন ইসহাক জুযজানী এবং নাসির বিন ইয়াহয়া বালখী রাহ. থেকে বর্ণনা করেছেন। তাঁরা স্বীয় উস্তাদ আবু সুলায়মান মুসা জুযজানী রাহ. হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি স্বীয় উস্তাদ ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান শায়বানী রাহ. হতে বর্ণনা করেছেন।'[৯৯]

'ইশারাতুল মারাম'-এর রচয়িতা এই সনদের শেষে বলেন, 'ইমাম মাতুরীদী রাহ. তাঁর কিতাবাদিতে ইমাম আবু হানীফার উসূল ও নীতিমালাগুলো অকাট্য প্রমাণের আলোকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং শক্তিশালী প্রমাণ উপস্থাপন করে সুদৃঢ় করেছেন।'

(এরপর আবু যুহরা বলেন,) আমার প্রিয় সুহৃদ শায়খ কাউসারী 'ইশারাতুল মারাম'-এর ভূমিকায় বলেন, 'ইমাম আবু হানীফার এসব অভিমত ও রায়সমূহ ইমামুল

---

৯৯. ইমাম মাতুরীদীর নাম মুহাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ। উপনাম আবু মানসুর। সমরকন্দের নিকটবর্তী একটি মহল্লার নাম মাতুরীদ। তিনি সেখানকার অধিবাসী হওয়ায় তাঁকে মাতুরীদী বলা হয়। বিভিন্ন শক্তিশালী আলামত থেকে বোঝা যায়, ২৪০ হিজরীর কাছাকাছি সময়ে তাঁর জন্ম হয়ে থাকবে। ইন্তেকাল হয়েছে ৩৩৩ হিজরীতে।
তাঁর উস্তাদগণের মধ্যে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে মুকাতিল রাহ. (২৪৮ হি.), ইমাম আবু নসর 'ইয়াযী, ইমাম নুসাইর ইবনে ইয়াহইয়া বলখী (২৬৮ হি.) এবং ইমাম আবু বকর আহমদ ইবনে ইসহাক জুযজানী রাহ.-এর কথা বিশেষভাবে আলোচিত হয়। আবু বকর জুযজানী হলেন ইমাম আবু সুলায়মান জুযজানীর শাগরিদ, যিনি ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শায়বানী (১৮৯ হি.)-এর শাগরিদ। আর ইমাম মুহাম্মাদ হলেন ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম সুফিয়ান সাওরীসহ হাদীস, ফিকহ ও আকায়েদের অনেক ইমামের শাগরিদ। এমনইভাবে মুহাম্মাদ ইবনে মুকাতিল রাযী সরাসরি ইমাম মুহাম্মাদের শাগরিদ। অপরদিকে নুসাইর ইবনে ইয়াহইয়া ইমাম আবু সুলায়মান জুযজানীরও শাগরিদ আবার ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে সামাআরও শাগরিদ। মুহাম্মাদ ইবনে সামাআ ইমাম আবু ইউসুফের শাগরিদ আর তিনি ইমাম আবু হানীফার শাগরিদ। মাতুরীদী রাহ.-এর বিশিষ্ট উস্তাদ ইমাম আবু নসর 'ইয়াযী, যিনি ফকীহ হওয়ার পাশাপাশি অনেক বড় মুজাহিদ ছিলেন। এমনকি জীবনের শেষে তিনি আল্লাহর রাস্তায় শাহাদাতের মহাসৌভাগ্যও লাভ করেন। তিনিও ফিকহশাস্ত্রে ইমাম আবু বকর জুযজানীর শাগরিদ ছিলেন। এসব বলার উদ্দেশ্য হলো, ইমাম আবু মানসুর মাতুরীদী রাহ.-এর ইলমী সনদ খায়রুল কুরূনের ইমামগণের সঙ্গে যুক্ত। তিনি আকীদা, হাদীস, তাফসীর, ফিকহ ও উসূলের ইলম আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর ইমামগণের নিকট হাসিল করেছেন। আর আমৃত্যু তিনি এই নির্ভরযোগ্য ইলমই তাঁর কিতাবসমূহে প্রচার করে গেছেন।
তাঁর মূল ব্যস্ততা ছিল বিভিন্ন ভ্রান্ত ফেরকার খণ্ডন করা এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর পথ ও আদর্শকে দলীলের মাধ্যমে শক্তিশালী করা। সে জন্যই মুসলিম উম্মাহ তাঁকে 'ইমামুল হুদা' উপাধিতে স্মরণ করে।
দেখুন, কাতায়িবু আ'লামিল আখইয়ার, কাফাবী; আল-ফাওয়াইদুল বাহিয়্যা, লখনভী; ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন, মুরতাযা যাবীদী ২/৩-১৪; ইমাম মাতুরীদীর তাফসীর গ্রন্থ تأويلات أهل السنة-এর মুহাক্কিকের ভূমিকা এবং বায়াযীর 'ইশারাতুল মারাম' এর ওপর লিখিত শায়খ কাউসারী রাহ.-এর ভূমিকা।

হুদা আবু মানসুর মাতুরীদী রাহ. পর্যন্ত এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্ম বর্ণিত হয়ে আসছে। অতঃপর তিনি মাসআলাগুলো তাহকীক করার জন্য এবং দলীল-প্রমাণের আলোকে যাচাই-বাছাই করার জন্য উদ্যত হন এবং স্বীয় রচনাবলিতে শরয়ী দৃষ্টিকোণ ও আকলের সমন্বয়ে মজবুতভাবে প্রমাণ করেন।

এই আলোচনা থেকে প্রতিভাত হলো, ইমাম মাতুরীদী রাহ. ইমাম আবু হানীফা রাহ. থেকে বর্ণিত কিতাবাদির আলোকে নিজের আকীদাকেন্দ্রিক মতাদর্শের গোড়াপত্তন করেছেন এবং এর ওপর ভিত্তি করে শাখা-প্রশাখা উদ্‌ঘাটন করেছেন আর আকীদাগুলোকে অকাট্য দার্শনিক দলীলের বিচারে এবং সন্দেহাতীত প্রমাণের আলোকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছেন।'[১০০]

উল্লেখ্য, যেহেতু ইমাম মাতুরীদীর আকীদাকেন্দ্রিক মতাদর্শের মূল ও ভিত্তি হলেন ইমাম আবু হানীফা রাহ., তাই সদরুল ইসলাম বাযদাবী রাহ. (মৃ. ৪৯৩ হি.) ও আবুল মুঈন নাসাফী রাহ. (মৃ. ৫০৮ হি.)-সহ অনেক হানাফী ইমাম বলেছেন, 'হানাফীরা আকীদা ও আমল উভয় ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফার অনুসারী।'[১০১] আর ইবনুল হুমাম রাহ. (মৃ. ৮৬১ হি.) তো অনেক স্থানে 'আশআরী'-এর সাথে 'মাতুরীদী' না বলে, বরং 'হানাফী' শব্দ বলেছেন।[১০২]

সারকথা, ইমাম আবু হানীফার ইন্তেকালের এক শতাব্দীরও কম সময়ে মুসলিম-বিশ্বে আকীদাকেন্দ্রিক বড় বড় ফিতনা বিস্তার লাভ করে। তখন ইমাম মাতুরীদী রাহ. ইমাম আবু হানীফার উসূল ও নীতিমালাকে কেন্দ্র করে পূর্ববর্তীদের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা আকীদাবিষয়ক আলোচনা ও শিক্ষাগুলোকে একত্র করেন। সেগুলোকে যুগোপযোগী উপস্থাপনায় দলীল-প্রমাণের সঙ্গে গ্রন্থের রূপ দেন। এতে তিনি মৌলিক কোনো আকীদা আবিষ্কার করেননি এবং এই সুযোগও কারও জন্য নেই; বরং তিনি প্রমাণিত আকীদার পক্ষে কুরআন ও সুন্নাহর বর্ণনার পাশাপাশি বিষয়গুলো বিস্তৃত আকারে উপস্থাপন করেছেন আর ফিতনা সৃষ্টিকারীদের ফিতনা নিরোধের জন্য এবং সংশয়গ্রস্তদের অন্তরের উপশমের জন্য সঠিক যুক্তির সঙ্গে তার সামঞ্জস্য দেখিয়েছেন।

বর্তমান সালাফীদের দৃষ্টিতে আশআরী-মাতুরীদীগণ

সৌদি আরবের সরকারি বড় মুফতী শায়খ বিন বায রাহ. বলেন,

فالأشاعرة وأشباههم لا يدخلون في أهل السنة في إثبات الصفات.

---

১০০. তারীখুল মাযাহিবিল ইসলামিয়া, পৃষ্ঠা ১৭৭-১৭৮

১০১. দেখুন, উসূলুদ্দীন, বাযদাবী, পৃষ্ঠা ১৬; তাবসিরাতুল আদিল্লাহ, নাসাফী, ১/৩৫৬

১০২. দেখুন, আল-মুসায়ারাহ, পৃষ্ঠা ৯১, ২৮২

‘আশআরীরা সিফাত সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত নয়।’[১০৩]

সৌদি ফতোয়া বোর্ড ও সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের সদস্য শায়খ সালেহ বিন ফাওযান বলেছেন,

أما كون الأشاعرة لم يخرجوا عن الإسلام: نعم هم من جملة المسلمين. وأما أنهم من أهل السنة والجماعة في باب الصفات: فلا؛ لأنهم يخالفون أهل السنة والجماعة في ذلك، فأهل السنة والجماعة يثبتون الصفات على ما جاءت من غير تأويل.

‘আশআরীরা মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হলেও সিফাতের বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, তাবীল ছাড়া (আল্লাহর) সিফাতগুলোকে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে তারা আহলুস সুন্নাহর বিরোধিতা করে।’[১০৪]

কী অবাক করা কথা! আশআরীরা যদি আহলুস সুন্নাহ না হয়, তবে আহলুস সুন্নাহ কারা?

শুধু তা-ই নয়, এই সালাফী আলেমদের তত্ত্বাবধানে ও সহযোগিতায় হাদীসের ইমাম ইবনে হিব্বান, খাত্তাবী, ইবনে বাত্তাল, ইমামুল হারামাইন জুয়াইনী, আবুল মুঈন নাসাফী, কাযী ইয়ায, আবদুল কাদের জিলানী, ফখরুদ্দীন রাযী, ইয্যুদ্দীন বিন আবদিস সালাম, মাযিরী, কুরতুবী, নববী, সুবকী, শাতেবী, জুরজানী, তাফতাযানী, ইবনে খালদুন, ইবনে হাজার, সুয়ূতী, হাইতামী, মোল্লা আলী কারী, সাবী, কাউসারী রাহিমাহুমুল্লাহ-সহ হাজার বছরের বড় বড় ইমামগণকে আহলুস সুন্নাহবিরোধী ও বিদআতী বা গোমরাহ অ্যাখ্যা দিয়ে খণ্ডনমূলক থিসিস ও গবেষণাপত্র লিখে যাচ্ছে। এমনকি তাদের অনুসরণীয় ইবনে হাযম, কাযী শাওকানী, মুবারকপুরী ও আযীমাবাদীর বিরুদ্ধেও লিখেছে। টীকায় কিতাবগুলোর নাম দেখে নিতে পারেন।[১০৫]

---

১০৩. মাজমু ফাতাওয়া বিন বায, ৩/৭৪

১০৪. আল-বয়ান লি-আখতায়ি বা’যিল কুত্তাব, পৃষ্ঠা ৩২, দারু ইবনিল জাওযী

١٠٥. «آراء الإمام ابن حبان في المسائل الاعتقادية»، «الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة»، «أقوال ابن بطال في مسائل العقيدة ومنهجه في تقريرها في كتابه شرح البخاري»، «ابن حزم وموقفه من الإلهيات»، «منهج إمام الحرمين في دراسة العقيدة»، «أبو المعين النسفي وآراؤه في التوحيد»، «القاضي عياض اليحصبي ومنهجه في العقيدة»، «الشيخ عبد القادر الجيلاني وآراؤه الاعتقادية والصوفية»، «موقف الرازي من مسائل الإيمان والأسماء والأحكام»، «آراء العز بن عبد السلام العقدية»، «آراء القرطبي والمازري الاعتقادية»، «التعقبات على ما وقع فيه النووي من هفوات في شرحه لصحيح مسلم في أبواب الاعتقادات»، «آراء أبي الحسن السبكي الاعتقادية»، «الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام»، «الإمام الشاطبي: عقيدته وموقفه من البدع وأهلها»، «مواقف التفتازاني الاعتقادية في كتابه شرح العقيدة النسفية»، «ابن خلدون وآرائه الاعتقادية»، «المخالفات العقدية في فتح الباري»، «منهج الحافظ ابن حجر العسقلاني في العقيدة»، «آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية»، «جلال الدين السيوطي وآرائه الاعتقادية»، «ملا علي القاري وآراؤه الاعتقادية في الإلهيات»، «منهج الإمام الشوكاني في العقيدة»، «آراء الصاوي في العقيدة والسلوك»، «التنبيهات الجلية على الأخطاء العقدية في كتب شروح السنة النبوية في كتابَي تحفة الأحوذي وعون المعبود، زاهد الكوثري وآراؤه الاعتقادية»، «عداء الماتريدية للعقيدة السلفية».

আজ যারা বলছেন 'আশআরী-মাতুরীদী গোমরাহ', তাদের কি একটু তালাশ করে দেখার হিম্মত হবে যে, এক হাজার বছরের বেশি সময় ধরে কুরআন, হাদীস, ফিকহ, ইতিহাস, জিহাদ-সহ ইসলাম প্রচারের আরও যত দিক রয়েছে, এতে কারা বেশি খেদমত করেছেন?

সকলের নিকট পরিচিত 'বায়তুল মুকাদ্দাস'-বিজেতা সুলতান সালাহউদ্দীন আইউবী ও মুহাম্মাদ আল-ফাতিহ কোন আকীদায় বিশ্বাসী ছিলেন? আপনারা যাদের কিতাব থেকে প্রমাণ গ্রহণ করেন, যেমন : ইমাম বায়হাকী, নববী, কুরতুবী, হাফেজ ইবনে হাজার, আইনী, সুয়ূতী ও শাহ ওলীউল্লাহ দেহলবী কারা ছিলেন? এখন 'আশআরী-মাতুরীদী গোমরাহ' বলার মানে এ মহান বিদ্বানগণ সবাই গোমরাহ! কত ভয়ংকর কথা! আল্লাহ তাআলা সকলকে হেফাজত করুন।

আরও অবাক করা কথা হচ্ছে, যেই ইমাম শাতেবী রাহ. সুন্নাত-বিদআতের আলোচনায় এবং উভয়ের মাঝে পার্থক্য জানার ক্ষেত্রে তাদের কাছে মহান ইমাম, তিনিই আবার 'আশআরী' হওয়ার কারণে আকীদার ক্ষেত্রে বিদআতী!

আছারীগণের দুই দলে বিভক্তি এবং ফুযালাউল হানাবিলা ও তাঁদের কিতাবসমূহ

ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর আকীদার তৃতীয় ধারার নাম হচ্ছে 'আছারিয়্যাহ' তথা যারা ইমাম আহমদ রাহ.-এর অনুসারী। তবে 'আছারী' দাবিদারদের দুটি দল রয়েছে। তন্মধ্যে এক দলকে বলা হয়, 'ফুযালাউল হানাবিলা' তথা মধ্যমপন্থী হাম্বলী বা সঠিক ধারার হাম্বলী, যারা ইমাম আহমদের মাসলাকের প্রকৃত অনুসারী ছিলেন।

তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, আবুল ফযল তামীমী (মৃ. ৪১০ হি.), ইবনুল জাওযী (৫৯৭ হি.), ইবনে কুদামাহ (৬২০ হি.), ইবনে হামদান (৬৯৫ হি.), মারয়ী কারমী (১০৩৩ হি.), আবদুল বাকী (১০৭১ হি.), ইবনে বালবান (১০৮৩ হি.), সাফ্ফারীনী (১১৮৮ হি.) ও কাদূমী রাহ. (১৩৩১ হি.)।

তাঁদের কিতাবসমূহ :

«اعتقاد الإمام المنبَّل» للتميمي، «دفع شُبَه التشبيه» لابن الجوزي، «لمعة الاعتقاد» و«ذم الكلام» لابن قدامة، «نهاية المبتدئين» لابن حَمْدان، «قلائد العِقيان» لابن بَلْبان، «أقاويل الثقات» لمرعي الكرمي، «العين والأثر» لعبد الباقي، «لوامع الأنوار البهية» للسفَّاريني، «المنهج الأحمد» لعبد الله بن صوفان القَدومي.

ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী রাহ. (মৃ. ৭৭১ হি.) বলেন,

وهؤلاء الحنفية والشافعية والمالكية وفضلاء الحنابلة – ولله الحمد – في العقائد يد واحدة، كلهم

على رأي أهل السنة والجماعة.

'আল্লাহর শোকর! সকল হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী ও ফুযালাউল হানাবিলার হাম্বলীর আকীদা এক। তাঁরা সকলে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর মত পোষণ করেন।'[১০৬]

শায়খুল ইসলাম ইয্যুদ্দীন ইবনে আবদিস সালাম রাহ. (মৃ. ৬৬০ হি.) বলেন,

أن عقيدة الأشعري اجْتمع عليها الشافعية، والمالكية، والحنفية، وفضلاء الحنابلة.

'(আবুল হাসান আশআরীর) আকীদার ওপর শাফেয়ী, মালেকী, হানাফী ও ফুযালাউল হানাবিলা (সঠিক ধারার হাম্বলীগণ) একমত হয়েছেন।'[১০৭]

বলাবাহুল্য, এখানে 'ফুযালাউল হানাবিলা' বলে মূলত 'গুলাতুল হানাবিলা' নামে আরেকটি দল থেকে পার্থক্য করা উদ্দেশ্য, যাদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা একটু পরে আসছে।

ইতিহাস থেকে মতানৈক্যের এপিঠ-ওপিঠ

আশআরীদের সাথে যেভাবে মাতুরীদীদের কিছু বিষয়ে মতভেদ আছে, তদ্রূপ ফুযালাউল হানাবিলার সাথেও কিছু বিষয়ে মতানৈক্য হয়েছে। যেমন : তাঁদের অনেকেই সিফাতে তাবীল করার বিরোধী। কিন্তু যারা শর্তসাপেক্ষে নিয়ম মেনে সীমিতকারে তাবীল করে, তাদেরকে ফুযালাউল হানাবিলার গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিগণ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ থেকে খারেজ মনে করেন না (যার আলোচনা সামনে আসবে)। এভাবে তাঁদের সাথে কালামুল্লাহ বিষয়েও মতানৈক্য হয়েছে।[১০৮]

ইসলামী ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, আশআরী, মাতুরীদি ও আছারীগণের মাঝে ফুরুয়ী বা শাখাগত আকীদার ক্ষেত্রে মতভেদ থাকলেও তাঁরা প্রত্যেকেই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর অন্তর্ভুক্ত ও সাহায্যকারী ছিলেন। তাঁদের মুহাক্কিক ও মু'তাদিল ব্যক্তিবর্গ পরস্পরকে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর অন্তর্ভুক্ত বা পরিপূরক মনে করতেন, একে অন্যকে আহলুস সুন্নাহ থেকে খারেজ মনে করতেন না; যা ইতিপূর্বে আযুদুদ্দীন ইজী আশআরী ও হাম্বলীদের আবদুল বাকী, সাফ্ফারীনী, মারদাবী ও কাদূমী রাহ.-সহ বিভিন্ন ইমামের বক্তব্যে উঠে এসেছে। এ বিষয়ে আরও কিছু তথ্য দেখুন :

ইমাম আবুল হাসান তামীমী হাম্বলী (আছারী) রাহ. (মৃ. ৩৭১ হি.) তাঁর ছাত্রদেরকে

---

১০৬. মুঈদুন নি'আম, সুবকী, পৃষ্ঠা ৭৫

১০৭. তাবাকাতুশ শাফিয়াতিল কুবরা, সুবকী, ৩/৩৬৫

১০৮. দ্র.) التوفيق الجلي بين الأشعري والحنبلي للنابلسي (ت: ١١٤٣هـ .

আশআরী আকীদার প্রখ্যাত ইমাম কাযী আবু বকর বাকিল্লানী রাহ. (মৃ. ৪০৩ হি.) সম্পর্কে বলতেন,

تمسّكوا بهذا الرّجل فليس للسنة عنه غِنًى.

'এই ব্যক্তিকে তোমরা আঁকড়ে ধরো। কেননা, আহলুস সুন্নাহ তাঁর থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারে না।'[১০৯]

হাম্বলীদের আরেক ইমাম আবুল ফযল তামীমী রাহ. (মৃ. ৪১০ হি.) আবু বকর বাকিল্লানীর জানাযার খাটিয়ার সামনে আওয়াজ দিয়ে বলেন,

هَذَا نَاصِرُ السُّنَّة وَالدِّينِ، وَالذَّابُّ عَنِ الشَّرِيْعَة، هَذَا الَّذِي صَنَّفَ سَبْعِيْنَ أَلفَ وَرقَة ردًا عَلَى المُلحدين.

'এ ব্যক্তি ছিলেন সুন্নাহ ও দ্বীনের সাহায্যকারী, শরীয়তের অতন্দ্রপ্রহরী এবং মুলহিদদের খণ্ডনে ৭০ হাজার পৃষ্ঠা লিখেছেন।'[১১০]

ইমাম দারাকুতনী রাহ. (মৃ. ৩৮৫ হি.) ইমাম বাকিল্লানীর কপালে চুমো দিয়ে তাকে সম্মান করতে দেখলে আবু যর হারবী বললেন, 'আপনি যুগের ইমাম হয়ে এমন কাজ কীভাবে করলেন?'

তখন দারাকুতনী রাহ. বললেন,

هَذَا إِمَامُ المُسْلِمِيْنَ، وَالذَّابُّ عَنِ الدِّيْنِ، هَذَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ الطَّيِّب. فَمِنْ ذَٰلِكَ الوَقْت تَكَرَّرْتُ إِلَيْهِ مَعَ أَبِي، كُلُّ بَلَد دَخَلْتُهُ مِنْ بلاَد خُرَاسَان وَغيرِهَا لاَ يُشَارُ فِيْهَا إِلَى أَحدٍ مِنْ أَهْلِ السُّنَّة إِلاَّ مَنْ كَانَ عَلَى مَذْهَبِهِ وَطَرِيْقِه.

'ইনি হলেন মুসলমানদের ইমাম এবং দ্বীনের অতন্দ্রপ্রহরী কাযী আবু বকর মুহাম্মাদ বিন তাইয়্যিব (বাকিল্লানী)।'

এরপর আবু যর বলেন, 'তখন থেকে আমি আমার পিতার সাথে তাঁর কাছে বারংবার গেছি। আর আমি খোরাসানসহ যেখানে প্রবেশ করেছি, সেখানে আহলুস সুন্নাহ বলতে বাকিল্লানীর মাযহাবের অনুসারীদেরকেই বোঝানো হতো।'

এটা উল্লেখ করার পর ইমাম যাহাবী রাহ. (মৃ. ৭৪৮ হি.) বলেন,

وَكَانَ يَرُدُّ عَلَى الكَرَّامِيَّة، وَينصرُ الحَنَابِلَةَ عَلَيْهِم، وبَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْل الحَدِيْث عَامِرٌ، وَإِنْ كَانُوا قَدْ يَخْتَلِفُون فِي مَسَائِل دقيقَة.

---

১০৯. তাবয়ীনু কাযিবিল মুফতারী, ইবনে আসাকির, বাকিল্লানীর জীবনী, পৃষ্ঠা ৪২২; তারীখুল ইসলাম, যাহাবী, ৮/৩৬১-৬২২, দারুল গরবিল ইসলামী

১১০. তাবয়ীনু কাযিবিল মুফতারী, পৃষ্ঠা ৪২৩; সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৭/১৯৩, মুআসসাসাতুর রিসালাহ

'তিনি (বাকিল্লানী) কাররামিয়ার খণ্ডন করতেন এবং তাদের বিরুদ্ধে হাম্বলীদেরকে সহযোগিতা করতেন। আর তাঁর ও আহলুল হাদীসের মাঝে সুসম্পর্ক ছিল, যদিও তারা কিছু সূক্ষ্ম মাসআলায় মতভেদ করতেন।'[১১১]

প্রখ্যাত ইমাম ইবনে আসাকির রাহ. (মৃ. ৫৭১ হি.) লেখেন,

وَتبَيَّنُوا فَضْلَ أَبِي الْحَسَنِ وَاعْرِفُوا إِنْصَافَهُ، وَاسْمَعُوا وَصْفَهُ لِأَحْمَدَ بِالْفَضْلِ وَاعْتِرَافَهُ لِتَعْلَمُوا أَنَّهُمَا كَانَا فِي الِاعْتِقَادِ مُتَّفِقَيْنِ، وَفِي أُصُولِ الدِّينِ وَمَذْهَبِ السُّنَّةِ غَيْرَ مُفْتَرِقَيْنِ. وَلَمْ تَزَلِ الْحَنَابِلَةُ بِبَغْدَادَ فِي قَدِيمِ الدَّهْرِ عَلَى مَمَرِّ الْأَوْقَاتِ تَعْتَضِدُ بِالْأَشْعَرِيَّةِ عَلَى أَصْحَابِ الْبِدَعِ، لِأَنَّهُمُ الْمُتَكَلِّمُونَ مِنْ أَهْلِ الْإِثْبَاتِ، فَمَنْ تَكَلَّمَ مِنْهُمْ فِي الرَّدِّ عَلَى مُبْتَدِعٍ فَبِلِسَانِ الْأَشْعَرِيَّةِ يَتَكَلَّمُ، وَمَنْ حَقَّقَ مِنْهُمْ فِي الْأُصُولِ فِي مَسْأَلَةٍ فَمِنْهُمْ يَتَعَلَّمُ، فَلَمْ يَزَالُوا كَذَلِكَ حَتَّى حَدَثَ الِاخْتِلَافُ فِي زَمَنِ أَبِي نَصْرٍ الْقُشَيْرِيِّ وَوَزَارَةِ النِّظَامِ...

'তোমরা (ইমাম) আবুল হাসান (আশআরীর) মর্যাদা যাচাই করো এবং তার ইনসাফ সম্পর্কে জানো। তিনি (ইমাম) আহমদকে যে মর্যাদা ও স্বীকৃতি দিয়েছেন, তা শোনো। যাতে তোমরা জানতে পারো যে, আকীদার ক্ষেত্রে তাঁরা উভয়ে একমত ছিলেন এবং মৌলিক আকীদা, দ্বীনের মূল বিষয়সমূহ ও আহলুস সুন্নাহর মাযহাবে তারা আলাদা ছিলেন না।

বাগদাদের হাম্বলীরা পূর্বে থেকেই যুগ যুগ ধরে বিদআতীদের খণ্ডন করার জন্য আশআরীদের সাহায্য গ্রহণ করত। কারণ, (আল্লাহর গুণাবলি) সাব্যস্তকারীদের মধ্যে তারাই মুতাকাল্লিম। সুতরাং (হাম্বলীদের) যে কেউ কোনো বিদআতীর রদ করার জন্য কালাম করত, সে আশআরীদের ভাষায় কালাম করত। এবং তাদের মধ্যে যে কেউ আকীদার কোনো মাসআলা তাহকীক করত, সে আশআরীদের থেকেই শিখে নিত।'[১১২]

এটা ইতিহাসের একটা দিক ও একটা পিঠ, যেখান থেকে প্রমাণিত হয় যে, আশআরীদের সাথে আছারী-হাম্বলীদের কিছু মাসআলায় মতভেদ থাকা সত্ত্বেও সুসম্পর্ক ছিল এবং বিদআতপন্থীদের খণ্ডনে একে অপরকে সহযোগিতা করত।

কিন্তু ইতিহাসের ওপিঠ বা আরেকটা দিক রয়েছে, যেখানে আহলুস সুন্নাহর উভয় পক্ষের কিছু লোকের বাড়াবাড়ি ও প্রান্তিকতার কারণে পরস্পরে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে; এমনকি ভয়ংকর ফিতনা ও হতাহতের মতো ঘটনাও ঘটেছে!

৩১৭ হিজরীতে বাগদাদে আবু বকর মারওয়াযী হাম্বলীর (মৃ. ২৭৫ হি.) সাথিগণ ও

---

১১১. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ১৭/৫৫৮, মুআসসাসাতুর রিসালাহ
১১২. তাবয়ীনু কাযিবিল মুফতারী, পৃষ্ঠা ৩২৫-৩২৬, দারুত তাকওয়া দামেশক; আল-ফাতাওয়াল কুবরা, ইবনে তাইমিয়া, ৬/৬৬০; ইকামাতুদ দলীল, ইবনে তাইমিয়া, ৪/১৬৫

জনসাধারণের একটি দলের মাঝে বড় ফিতনা ও সংঘর্ষ দেখা দেয়। এর কারণ হচ্ছে, কুরআনে কারীমের সূরা বনী ইসরাঈলের ৭৯ নং আয়াতটির তাফসীর সম্পর্কে তারা মতবিরোধ করেন। আয়াতটি হলো :

عَسَىٰٓ أَن يَبۡعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامٗا مَّحۡمُودٗا

'আশা করা যায়, আপনার রব আপনাকে "মাকামে মাহমূদে" (প্রশংসিত স্থানে) অধিষ্ঠিত করবেন।'

হাম্বলীগণ ('মাকামে মাহমূদ'-এর ব্যাখ্যায়) বলেছেন, يُجْلِسُهُ مَعَهُ عَلَى الْعَرْشِ.

'আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর সাথে আরশে বসাবেন।'

অন্যরা বললেন, 'এটার ব্যাখ্যা হচ্ছে, শাফাআতে উযমা তথা বড় শাফাআত।'

অতঃপর এটাকে কেন্দ্র করে তারা সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। তাদের দুদলের মধ্যে বহুলোক নিহত হয়।

ইমাম ইবনে কাসীর রাহ. (মৃ. ৭৭৪ হি.) এ ঘটনা উল্লেখ করার পর ইন্নালিল্লাহি... পড়ে বলেন, 'সহীহ বুখারীতে রয়েছে, "মাকামে মাহমূদ"-এর অর্থ হলো বড় ও শ্রেষ্ঠ শাফাআতের মর্যাদা। তা হলো, বান্দাদের মধ্যে ফয়সালার ক্ষেত্রে শাফাআতের মর্যাদা। এটা এমন এক মর্যাদা, যার প্রতি সমস্ত সৃষ্টি আগ্রহান্বিত; এমনকি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামও। এ ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল লোকই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈর্ষান্বিত।'[১১৩]

এভাবে বাগদাদে ৩২৩ হিজরী, ৪৬৯ হিজরী এবং ৪৭৫ হিজরীতে আকীদাকেন্দ্রিক ফিতনা হয়েছিল, যা 'ফিতনাতুল হানাবিলা' ও 'ফিতনাতুল কুশাইরী' নামে প্রসিদ্ধ।

বরং ইতিহাসের কালো অধ্যায়ে আরও যুক্ত হয়েছে যে, এ আকীদার মতভেদের কারণে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম আবু নুয়াইম আসবাহানী রাহ. (মৃ. ৪৩০ হি.)-এর মতো ব্যক্তিকেও কিছু হাম্বলী পরিত্যাগ করার দাবি জানিয়েছিল এবং তাঁকে হত্যা করার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়েছিল!

এই ঘটনা উল্লেখ করে ইমাম যাহাবী রাহ. হাম্বলীদের 'আসহাবুল হাদীস' নামের ওই সকল ফিতনাবাজদের কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানিয়ে বলেন,

مَا هَؤُلَاءِ بِأَصْحَابِ الحَدِيْث، بَلْ فَجرَةٌ جَهَلَة، أبعد اللهُ شَرَّهُم.

---

১১৩. আল-কামিল ফীত তারীখ, ইবনুল আছীর, ৬/৭৪৬, দারুল কিতাবিল আরবী; তারীখুল ইসলাম, যাহাবী, ৭/২২১-২২, দারুল গরবিল ইসলামী; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসীর, ১১/১৮৪, দারু ইহয়াইত তুরাছ, ১১/৩০৩-৪, বাংলা ইসলামিক ফাউন্ডেশন; তারীখুল খুলাফা, সুয়ুতী, পৃষ্ঠা ২৭৮

'এরা মূলত 'আসহাবুল হাদীস' নয়; বরং এরা হচ্ছে মূর্খ ফাজের লোক! আল্লাহ তাদের অনিষ্টতাকে ধ্বংস করুন!"[১১৪]

ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে এ ধরনের বিচ্ছিন্ন তথ্য আরও পাওয়া যাবে। এমনকি আকীদার সাথে সাথে আমলের ক্ষেত্রেও হানাফী-শাফেয়ীর মাযহাবকেন্দ্রিক ফিতনার কথাও ইতিহাসের পাতায় সংরক্ষিত আছে।

কিন্তু এ বাস্তবতা অনস্বীকার্য যে, সব যুগে সব সময় সব ক্ষেত্রে এ ধরনের বাড়াবাড়ি ও ফিতনা সৃষ্টিকারী কিছু লোক থাকে, যারা কদর্য ইতিহাস ও কালো অধ্যায় রচনা করে। তবে তা কখনো মূল ইতিহাস হিসেবে স্বীকৃতি পায় না এবং এগুলোর দ্বারা প্রকৃত ইতিহাস বিচার করা যায় না।

গুলাতুল হানাবিলা

ওপরে উল্লেখ হয়েছে যে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর তৃতীয় ধারার নাম 'আছারিয়্যাহ' তথা যারা ইমাম আহমদ রাহ.-এর অনুসারী। আর 'আছারী' দাবিদারদের দুটি দল রয়েছে। তন্মধ্যে এক দলের নাম বলা হয়েছে 'ফুযালাউল হানাবিলা' অর্থাৎ যারা ইমাম আহমদের মাসলাকের প্রকৃত অনুসারী।

আরেক দলকে বলা হয় 'গুলাতুল হানাবিলা' বা সীমালঙ্ঘনকারী হাম্বলী। অর্থাৎ 'আছারী'দের মধ্য থেকে যারা আল্লাহর সিফাতের মাসআলায় ইমাম আহমদের মাসলাক থেকে সরে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করে মুজাসসিমা (দেহবাদী) ও মুশাব্বিহাদের (সাদৃশ্যবাদী) পথ গ্রহণ করেছেন কিংবা সেদিকে ঝুঁকে গেছেন। কাজেই 'আছারী'গণ দুই দলে বিভক্ত। আর দ্বিতীয় দলের নাম হলো 'গুলাতুল হানাবিলা' তথা যারা দেহবাদী ও সাদৃশ্যবাদীদের পথ গ্রহণ করেছেন কিংবা সেদিকে ঝুঁকে গেছেন।

আছারী ও হাম্বলী মাযহাবের ইমাম ইবনুল জাওযী রাহ. (মৃ. ৫৯৭ হি.) বলেন,

ورأيت من أصحابنا من تكلم في الأصول بما لا يصلح، وانتدب للتصنيف ثلاثة: أبو عبد الله بن حامد، وصاحبه القاضي – أبو يعلى الفراء –، وابن الزاغوني، فصنفوا كتبا شانوا بها المذهب، ورأيتهم قد نزلوا إلى مرتبة العوام، فحملوا الصفات على مقتضى الحس، فسمعوا: أن الله تعالى خلق آدم على صورته.

فأثبتوا له صورة ووجها زائدا على الذات وعينين وفما ولهوات وأضراسا وأضواء لوجهه هي السبحات ويدين وأصابع وكفا وخنصرا وإبهاما وصدرا وفخذا وساقين ورجلين، وقالوا: ما سمعنا بذكر الرأس. وقالوا: يجوز أن يمس ويمس ويدني العبد من ذاته. وقال بعضهم: ويتنفس.

'আমি আমার মাযহাবের কিছু লোককে আকীদা বিষয়ে এমন কথা আলোচনা করতে

১১৪. সিয়ারু আলামিন নুবালা, যাহাবী, ১৭/৪৬০; তাযকিরাতুল হুফফাজ, যাহাবী, ৩/১০৯৫

দেখেছি, যা সঠিক নয়। আকীদা বিষয়ে তিনজন গ্রন্থ রচনা করেছে। একজন হলো আবু আবদুল্লাহ ইবনে হামেদ (মৃ. ৪০৩ হি.), দ্বিতীয়জন তার ছাত্র কাযী (আবু ইয়া'লা ফাররা, মৃত্যু ৪৫৮ হি.) আর তৃতীয়জন হলো ইবনুয যাগুনী (মৃ. ৫২৭ হি.)। তারা এমন কিতাব লিখেছে, যার দ্বারা (ইমাম আহমদ রাহ.-এর) মাযহাবকে কলঙ্কিত করেছে।

আমি তাদেরকে দেখলাম, তারা সাধারণ মানুষের স্তরে নেমে গেছে। তারা (আল্লাহর) সিফাতকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বানিয়ে ফেলেছে। তারা (হাদীস) শুনেছে, "আদম আ.-কে আল্লাহ নিজ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।" তাই তারা আল্লাহ তাআলার জন্য সত্তার বাইরে আকৃতি ও চেহারা সাব্যস্ত করেছে; এমনকি দুই চোখ, মুখ, মাড়ির দাঁত, দুই হাত, আঙুলসমূহ, হাতলি, কান, বৃদ্ধাঙ্গুলি, কনিষ্ঠাঙ্গুলি, বুক, রান, দুই পায়ের পিণ্ডালি ও দুই পা সাব্যস্ত করেছে। এবং তারা বলেছে, "তাঁর (আল্লাহ তাআলার) মাথার আলোচনা আমরা শুনতে পাইনি।" অতঃপর তারা বলেছে, "তাঁকে স্পর্শ করা যাবে...।" তাদের কেউ কেউ বলল, "তিনি (আল্লাহ তাআলা) শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করেন ও ছাড়েন।"'

তিনি আরও লেখেন,

ولقد كسيتم هذا المذهب شيئا قبيحا، حتى صار لا يقال: حنبلي إلا مجسم... وقد كان أبو محمد التميمي يقول في بعض أئمتكم: لقد شان المذهب شينا قبيحا: لا يغسل إلى يوم القيامة.

'তোমরা এই মাযহাবে নিকৃষ্ট জিনিস (আকীদা) প্রবেশ করিয়েছ। পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, (মানুষ) হাম্বলী বলতে শুধু দেহবাদী বোঝে।

আবু মুহাম্মাদ তামীমী রাহ. তোমাদের এক ইমাম (আবু ইয়া'লা ফাররা) সম্পর্কে বলতেন, "সে (হাম্বলী) মাযহাবের ওপর এমন নিকৃষ্টভাবে কলঙ্ক লেপন করেছে যে, কিয়ামত পর্যন্ত তা ধৌত করলেও পরিষ্কার হবে না।"'[১১৫]

দারুল উলূম দেওবন্দের সাবেক শায়খুল হাদীস ও সদরুল মুদাররসীন মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী রাহ. বলেছেন,

عقائد میں برحق تین فرقے ہیں: اشاعرہ، ماتریدیہ اور امام احمد رحمہ اللہ تک کے سلفی، آج کے یہ سلفی نہیں، یہ تو امام احمد کے بعد غلو کرنے والے سلفی ہیں، یہی تین جماعتیں برحق ہیں، ان کے علاوہ سب گمراہ ہیں۔ اور فقہ میں چار جماعتیں برحق ہیں: حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی، پس جب دونوں طرف سے حق پر جمع ہونگے تو مکمل برحق ہوں گے.

'আকীদায় তিনটি দল হক : আশআরী, মাতুরীদী ও ইমাম আহমদ পর্যন্ত সালাফী

---

১১৫. দাফউ শুবাহিত তাশবিহ, ৬-৯; আরও দেখুন, কাযী আবু ইয়া'লা ফাররার জীবনী আল-কামিল ফীত তারীখ, ইবনুল আছীর, ৮/২০৯, দারুল কিতাবিল আরবী; তারীখুল ইসলাম, যাহাবী, ১০/১০৮, দারুল গরবিল ইসলামী; আল-ওয়াফী বিল ওফায়াত, সাফদী, ৩/৮, দারু ইহয়াইত তুরাছিল আরবী

(তথা আছারী)। বর্তমান সালাফীরা হক নয়। কেননা, তারা ইমাম আহমদের পর সীমালঙ্ঘনকারী সালাফী। এই তিন দলই হক; এরা ছাড়া বাকি সব গোমরাহ।

আর আমলে চার দল হক : হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী। সুতরাং কোনো ব্যক্তি যদি আকীদা ও আমলে উপরিউক্ত দুই সিলসিলার মধ্যে থাকে, তাহলে সে 'পরিপূর্ণ হক'-এর ওপর আছে বলে বিবেচিত হবে।'[১১৬]

এদের উত্থানের তিনটি যুগ রয়েছে :

১. ইবনে হামেদ হাম্বলী (মৃ. ৪০৩ হি.), আবু আলী আহওয়াযী (৩৬২-৪৪৬ হি.), কাযী আবু ইয়া'লা হাম্বলী (৩৮০-৪৫৮ হি.)।

২. ইমাম ইবনে তাইমিয়া (৭২৮ হি.), তাঁর শিষ্য ইবনুল কায়্যিম (৭৫১ হি.) ও ইবনে আবীল ইয হানাফী (৭৯২ হি.)।

৩. শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব নজদী (১২০৬ হি.) ও সৌদি সালাফীগণ এবং তাদের মতো আরও কিছু ব্যক্তি, বিশেষত হাফেজ হাকামী (১৩৭৭ হি.), শায়খ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম (১৩৮৯ হি.), শায়খ খলীল হাররাস (১৩৯৫ হি.), শায়খ বিন বায (১৪২০ হি.), শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ উসাইমীন (১৪২১ হি.), শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (১৪২০ হি.), শায়খ সালেহ বিন ফাউযান, শায়খ সালেহ মুনাজ্জিদ, শায়খ নাসির আকল ও শায়খ আহমদ মুসা জিবরীল প্রমুখ।

তবে এ তিন যুগের মধ্যে তৃতীয় যুগের শায়খদের বাড়াবাড়ি ও ভ্রান্তি সবচেয়ে বেশি।

উল্লেখ্য, 'আছারী'দের এই দ্বিতীয় দলের অনুসারী সালাফী বন্ধুদের আকীদা বিষয়ে লেখা ও কথায় প্রায় উদ্ধৃতি পাবেন উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের নাম ও তাদের কিতাবসমূহের হাওয়ালা অথবা তাদের আকীদার কিতাবগুলোর অনুবাদ প্রকাশ করতে দেখবেন। অথচ ইসলামের চৌদ্দশ বছরের ইতিহাসে শুধু এ কয়জন ব্যক্তি সহীহ আকীদার ইমাম ছিলেন!

এই দ্বিতীয় দলের আরেকটা মারাত্মক বিষয় হচ্ছে, তাওহীদকে তিন প্রকারে ভাগ করে কুফর নয় এমন কিছু বিষয়কে কুফর আখ্যায়িত করে ঢালাওভাবে তাকফীর করা এবং তাকফীরের দরজা খুলে দেওয়া।[১১৭] এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা

---

১১৬. ইলমী খুতবাত, ১/১২৭ ও ১২৯-৩০

১১৭. তাওহীদ বিষয়ে ভালোভাবে জানার জন্য কেউ কেউ শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব নজদী রাহ.-এর 'কিতাবুত তাওহীদ'কে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করেন। কিন্তু জেনে রাখা দরকার, এতে অনেক যয়ীফ ও অগ্রহণযোগ্য হাদীস ছাড়াও তাওহীদকে ভাগকেন্দ্রিক ভ্রান্তি এবং কিছু বিষয়কে ঢালাওভাবে কুফর-শিরক আখ্যায়িত করার মতো প্রান্তিকতা রয়েছে; বরং এ ক্ষেত্রে শাহ ইসমাঈল শহীদ রাহ.-এর 'তাকবিয়াতুল ঈমান' উত্তম ও গ্রহণযোগ্য। সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রাহ. 'রিসালাতুত তাওহীদ' নামে এর আরবী করেছেন।

‘ইলাহিয়্যাত’-এর আলোচনায় আসবে।[১১৮]

বলাবাহুল্য, এটা হচ্ছে তাদের উত্থানের তিনটি যুগ। তবে এদের আগে এমন আরও কিছু ব্যক্তি ও কিতাব রয়েছে। যেমন : আবদুল্লাহ বিন আহমদ (২৯০ হি.) ও তার কিতাব ‘আস-সুন্নাহ’, আবু সাঈদ উসমান দারেমী (২৮০ হি.)[১১৯] ও তার দুটি কিতাব **النقض على المريسي** ও **الرد على الجهمية** ।

‘আস-সুন্নাহ’ কিতাবটির বিষয়ে জানতে দেখুন, শায়খ যাহেদ কাউসারী রাহ.-এর ‘মাকালাতুল কাউসারী’-তে একটি প্রবন্ধ (পৃষ্ঠা ২৪৫-২৫০), যার নাম হচ্ছে, **كتاب يسمى كتاب السنة وهو كتاب الزيغ**, আরও দেখুন, ২১৭-২৪৪ পৃষ্ঠা।

আমাদের কোনো কোনো কওমী তরুণ আলেম ‘আল-আশাঈরা ফী মীযানি আহলিস সুন্নাহ’ গ্রন্থটি পড়ে বিভ্রান্ত হন, তারা নিম্নোক্ত তথ্যবহুল কিতাবটি পড়ে নিলে আশা করি গ্রন্থটির অসারতা ও জবাব দেখে দিল প্রশান্ত হবে। কিতাবটির নাম হলো,

الرد الإسلامي الممتاز على فيصل بن قزّاز

শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব ও উলামায়ে দেওবন্দ

মাওলানা মনযুর নুমানী রাহ.-এর ‘শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব আওর হিন্দুস্তান কে উলামায়ে হক’ নামে একটি বই রয়েছে, যা প্রথমে তাঁর ‘আল-ফুরকান’ মাসিক পত্রিকায় একটি ধারাবাহিক নিবন্ধ হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল। বইটি পড়ে কেউ কেউ মনে করেন, উলামায়ে দেওবন্দ ও শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব নজদী রাহ.-এর দৃষ্টিভঙ্গিতে তেমন কোনো মতবিরোধ নেই।

কিন্তু ওপরের আলোচনা পড়ে তো মনে হলো, উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে অবশ্যই মতবিরোধ আছে। তাহলে এর সমাধান কী?

এর সমাধান শায়খুল ইসলাম মুফতী তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহর এ লেখা থেকে জেনে নিন। তিনি তাঁর ‘নুকূশে রফতেগাঁ’ গ্রন্থে বলেন,

اسی دوران سعودی عرب میں علمائے دیوبند کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والوں نے وہاں یہ تاثر پھیلانا شروع کیا کہ علمائے دیوبند علمائے نجد کے سرخیل شیخ محمد بن عبدالوہاب کے بارے میں معاندانہ رائے رکھتے ہیں اوران کے بارے

---

১১৮. দেখুন, ইবনে আবীল ইয হানাফীর ‘শারহুল আকীদাতিত তাহাবিয়্যা’-এর শুরুতে শায়খ শুয়াইব আরনাউত ও আবদুল্লাহ তুরকীর ভূমিকা, পৃষ্ঠা ৩০; আল-ফাতাওয়াল হাদীসিয়া, ইবনে হাজার হাইতামী, পৃষ্ঠা ২০৩; মাআরিফুস সুনান, বানূরী, ৪/১৪৭; মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব : মুছলিহুন মাযলূমুন ওয়া মুফতারা আলাইহি, মাসউদ নদবী; আর-রুয়াতুল ওয়াহহাবিয়্যা লিত-তাওহীদ ও আকসামিহী, উসমান নাবলূসী।
উল্লেখ্য, এদের সবার আকীদা ও বক্তব্য একই পর্যায়ের নয়। যেমন : অন্যদের তুলনায় শায়খ আলবানীর আকীদা ভালো; পক্ষান্তরে শায়খ উসাইমীনের কিছু আকীদা ও কথা খুবই ভয়াবহ পর্যায়ের।

১১৯. ইনি প্রসিদ্ধ হাদীসের কিতাব ‘সুনানে দারেমী’র লেখক ইমাম আবু মুহাম্মাদ (মৃ. ২৫৫ হি.) নন।

میں توہین آمیز رویہ اختیار کرتے رہے ہیں مولانا نے اس تاثر کے ازالے کیلئے 'الفرقان' میں ایک سلسلہ مضامین شروع کیا جس میں شیخ محمد بن عبدالوہاب اور علمائے دیوبند کے درمیان وجوہ مماثلت شرح وبسط کے ساتھ بیان کی گئی تھیں اور شرک وبدعت کی تردید میں دونوں کے درمیان جو قدر مشترک تھی اس پر زور دیا گیا تھا۔ اگرچہ یہ مضمون بھی مولانا کی عام عادت کے مطابق مدلل اور مفید تھا لیکن اس کی چند قسطیں پڑھنے کے بعد مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں وہ تصویر کے صرف ایک رخ ہی پر ختم نہ ہو جائے۔ اور علمائے دیوبند کو شیخ محمد بن عبدالوہاب کے بعض نظریات سے جو واقعی اختلاف رہا ہے۔ اس کے تذکرے سے خالی نہ رہ جائے۔

چنانچہ میں نے حضرت مولانا کی خدمت میں ایک خط لکھا جس میں اپنے اس طالب علمانہ اندیشے کا اظہار کرتے ہوئے یہ درخواست کی کہ مضمون کا تاثر یہ ہرگز نہ ہونا چاہئے کہ علماء دیوبند اور شیخ محمد بن عبدالوہاب کے نظریات میں کوئی اختلاف ہی نہ تھا۔ اس کے بجائے جس حد تک اور جتنا اختلاف تھا اس کا اظہار بھی ریکارڈ درست رکھنے کیلئے ضروری ہے جس کے بغیر یہ سلسلہ مضامین ادھورا بھی رہے گا اور اس سے مزید غلط فہمیاں پیدا ہوں گی۔

میں نے لکھنے کو تو یہ خط لکھ دیا تھا لیکن بار بار یہ احساس ہو رہا تھا کہ مولانا کے مقام بلند کے آگے میری حیثیت انکے ایک ادنی شاگرد کی بھی نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جسارت کر کے میں نے اپنی حدود سے تجاوز کیا ہو لیکن میرے خط کے جواب میں مولانا کا جو گرامی نامہ آیا۔ اس میں انہوں نے اپنی بڑائی کی انتہا کر دی۔ میری گذارش پر کسی ناگواری کا اظہار تو کجا میری اتنی ہمت افزائی فرمائی کہ میں پانی پانی ہو گیا۔

'তদানীন্তন সময়ে সৌদি আরবে উলামায়ে দেওবন্দের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডাকারীরা এ কথা প্রচার করছিল যে, 'উলামায়ে দেওবন্দ' নজদের পুরোধা ব্যক্তিত্ব শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাবের ব্যাপারে বিদ্বেষী মনোভাব রাখে এবং তার ক্ষেত্রে অসম্মান ও অপমানমূলক চিন্তা লালন করে।

তো মাওলানা (মনযুর নুমানী) এ মনোভাব দূর করার জন্য 'আল-ফুরকান'-এ একটি ধারাবাহিক নিবন্ধ ছাপা শুরু করে দিলেন, যেখানে তিনি শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব নজদী ও উলামায়ে দেওবন্দের মাঝে যে যে বিষয়ে মিল রয়েছে, সেগুলোর সবিস্তার বিবরণ প্রদান করলেন। শিরক ও বিদআত নির্মূলে উভয় পক্ষের মাঝে যতটুকু মিল আছে, নিবন্ধে তা জোরালোভাবে তুলে ধরলেন।

যদিও মাওলানার এই নিবন্ধটিও তাঁর চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী দলীলসমৃদ্ধ ও উপকারী ছিল, তথাপি তার কয়েক কিস্তি পড়ার পর আমার মনে আশঙ্কা হলো যে, এই নিবন্ধ যেন বাস্তবতার একটি দিক আলোচনা করেই সমাপ্ত হয়ে না যায় এবং যেসব বিষয়ে শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব নজদী রাহ.-এর সঙ্গে উলামায়ে দেওবন্দের মতভিন্নতা রয়েছে, সেসব বিষয়ের আলোচনা বাদ পড়ে না যায়।

সুতরাং আমি মাওলানার কাছে একটি পত্র লিখলাম। এই পত্রে আমি একজন ছাত্রসুলভ

আশঙ্কা প্রকাশ করে আবেদন জানালাম, "আপনার এই নিবন্ধের প্রতিক্রিয়া কোনো অবস্থাতেই যেন এমন না হয় যে, উলামায়ে দেওবন্দ ও শায়খ মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহহাব নজদীর দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো মতবিরোধই নেই। তার পরিবর্তে যে পরিমাণ এবং যতটুকু মতানৈক্য আছে, রেকর্ড ঠিক রাখার স্বার্থে তাও প্রকাশ করা আবশ্যক। অন্যথায় আপনার এই নিবন্ধটি একদিকে যেমন অপূর্ণ থাকবে, তেমনই অপরদিকে এই নিবন্ধটির দ্বারা আরও ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে।"

আমি আমার চিন্তা ও বুঝ অনুসারে চিঠি লিখে পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু পাশাপাশি মনে এই অনুভূতিও জাগতে লাগল যে, মাওলানার এমন সুউচ্চ মর্যাদার কাছে আমি তাঁর ছাত্র হওয়ারও উপযুক্ত নই। এমতাবস্থায় এই দুঃসাহস দেখিয়ে আমি সীমালঙ্ঘন করিনি তো আবার! কিন্তু আমার পত্রের জবাবে মাওলানার যে উত্তরপত্র এসেছিল, তাতে তিনি তাঁর বড়ত্ব ও মর্যাদা চূড়ান্তে পৌঁছিয়ে দিলেন। আমার নিবেদনে কোনো প্রকার অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা তো দূরের কথা, উল্টো তিনি আমাকে আরও উৎসাহিত করলেন।'

সেই উত্তরপত্রটিতে অনেক কথা ছিল। তন্মধ্যে চার নং পয়েন্টে লেখা ছিল,

شیخ محمد بن عبدالوہاب اور اپنے اکابر سے متعلق جو سلسلہ جاری ہے اس کے بارے میں جس کمی اور قابل اعتراض بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے اس سے اندازہ ہوا کہ اب تک میں آپ کو علم وفہم کے جس امتیازی مقام پر سمجھتا تھا اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت سے آپ اس سے بھی بالاتر ہیں۔ آپ کی اس بات کی میرے دل نے بڑی قدر کی یہ نہایت ضروری اور اہم بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو عطا فرما رکھا ہے اس سے ہزاروں درجہ زیادہ اور عطا فرمائے۔ اور علم کے ساتھ دین میں اور اپنی ذات پاک کے ساتھ خاص تعلق میں بے حساب اضافہ فرمائے۔

'শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব ও উলামায়ে দেওবন্দ বিষয়ে যে ধারাবাহিক নিবন্ধটি ছাপা হচ্ছে, সে ব্যাপারে যে ত্রুটি ও আপত্তিকর বিষয়টির প্রতি আপনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তার দ্বারা আমি অনুমান করতে পারছি যে, এতদিন যাবৎ (বয়স কম হওয়ার কারণে) আপনাকে আমি যে স্তরের আলেম মনে করতাম, আল্লাহ্ পাকের মেহেরবানিতে আপনি তারচেয়েও অনেক ঊর্ধ্বে। **আমার অন্তর আপনার এই পরামর্শটিকে খুব মূল্যায়ন করেছে। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল।** আল্লাহ্ পাক আপনাকে যা কিছু দিয়ে রেখেছেন, তার থেকেও হাজার গুণ বেশি আরও দান করুন।'[১২০]

মনযুর নুমানী রাহ. ও তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহর চিঠি আদান-প্রদানের খোলাসা হলো, কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে দেওবন্দী ও নজদীদের মাঝে অবশ্যই পার্থক্য আছে। সেটাও যেন লেখাতে তুলে ধরা হয়। অন্যথায় এ আশঙ্কা রয়েছে যে, ভুল বোঝাবুঝি

---

১২০. নুকূশে রফতেগাঁ, পৃষ্ঠা ৩৯৭-৩৯৮, ৪০১

সৃষ্টি হবে এবং নজদী আর দেওবন্দীকে একই ঘরানার, একই চিন্তা-চেতনার মনে করা হবে। মনযুর নুমানী রাহ. এ আশঙ্কার সাথে একমত পোষণ করে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আর এ বিষয়টির প্রতি তাকী উসমানী সাহেব দৃষ্টি আকর্ষণ করায় তাঁর বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

কাজেই এ পার্থক্যের বিষয়টি আমাদেরও বোঝা ও স্বীকার করা দরকার।

দেওবন্দের সাবেক শায়খুল হাদীস মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী রাহ. বলেন,

سعودیہ والے حنبلی سلفی امام احمد رحمہ اللہ کے بعد غلو میں مبتلا ہو چکے ہیں، وہ غلو کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ان کے نزدیک سارے عقیدے انہی دو باتوں میں منحصر ہو گیا ہے کہ اللہ کو عرش پر بیٹھا ہوا مانو، اور اللہ کو آسمان دنیا پر اترتا ہوا مانو بھی تم مسلمان ہو، ورنہ تم مسلمان نہیں!... اصلی سلفی اور تھے، اور یہ سلفی اور ہیں، وہ لوگ سلفی نہیں ہیں جو اللہ کے لئے جسم مانتے ہیں، اللہ کے لئے جہت مانتے ہیں، اور اللہ کے لئے مکان مانتے ہیں۔

'সৌদি আরবের হাম্বলী সালাফীরা ইমাম আহমদ রাহ.-এর পর সীমালঙ্ঘন করে বসেছে। তাদের সীমালঙ্ঘন এ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে যে, তাদের নিকট মূল আকীদা হলো, আল্লাহকে আরশের ওপর বসে আছেন মানতে হবে এবং তিনি দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন বিশ্বাস করতে হবে, তাহলে তুমি মুসলিম; অন্যথায় মুসলিম নও। আসল সালাফী ভিন্ন। যারা আল্লাহর দেহ আছে মনে করে অথবা আল্লাহ কোনো দিক ও স্থানে আছেন বিশ্বাস করে, তারা সালাফী নয়।'[১২১]

ইমাম আহমদ ও গুলাতুল হানাবিলার মাঝে পার্থক্যের কিছু উদাহরণ

'আছারী' দাবিদারদের মধ্যে গুলাতুল হানাবিলা এবং তাদের অনুসারী সালাফী ও সহীহ আকীদার বন্ধুরা ইমাম আহমদ রাহ.-এর মাসলাক থেকে সরে আসার তথা ইমাম আহমদ ও গুলাতুল হানাবিলার আকীদার মাঝে পার্থক্যের কিছু উদাহরণ :

এক. আল্লাহ তাআলা দেহ, অঙ্গ ও এ-জাতীয় বস্তু থেকে মুক্ত ও পবিত্র না বলা

ইমাম আহমদ রাহ. (মৃ. ২৪১ হি.) সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, আল্লাহ তাআলা 'জিসম' তথা 'দেহ' ও এ-জাতীয় বস্তু থেকে মুক্ত ও পবিত্র। যেমন : তাঁর আকীদার বিবরণে এসেছে,

إنَّ للهِ تعالى يَدَيْنِ، وهُما صفةٌ لَه فِي ذاتِه، لَيْسَتَا بِجَارِحَتَيْنِ، ولَيْسَتَا بمركَّبَتَيْنِ، ولا جِسْمَ، ولا مِن جِنْسِ الأَجْسَام، وَلَا من جنس الْمَحْدُود والتركيب والأبعاض والجوارح، وَلَا يقَاس على ذَلِك، لَا مرفق وَلَا عضد، وَلَا فِيمَا يقْتَضِي ذَلِك من إِطْلَاق قَوْلهم: يَد، إِلَّا مَا نطق الْقُرْآن بِهِ أَو صحت عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم السّنة فِيهِ.

---

১২১. ইলমী খুতবাত, ১/১২৯-১৩০, ঈষৎ সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত

'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার দুটি 'ইয়াদ' বা হাতের'[১২২] কথা (কুরআন-হাদীসে) এসেছে, যা তাঁর সত্তাগত গুণ। **হস্তদ্বয় অঙ্গ নয়, যৌগিক বা দেহের অংশ নয়, দেহ নয়, এমনকি দেহজাতীয় বস্তুর কোনো প্রকার থেকেও নয় এবং সীমিত, সংযোজন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গজাতীয় কিছুই নয়।** এ বিষয়ে কিয়াস-যুক্তি অচল। এতে কনুই, বাহু ইত্যাদি কোনো কিছুর অস্তিত্ব কল্পনার সুযোগ নেই। কুরআন ও সহীহ হাদীসে যতটুকু বলা হয়েছে, তার অতিরিক্ত মানুষের হাত শব্দের ব্যবহার থেকে সংযোজন করা যাবে না।'

তাঁর আকীদার বিবরণে আরও এসেছে,

وأنكَر – الإمام أحمد – على من يقول بالجِسم، وقال: إن الأسماءَ مأخوذةٌ بالشريعة واللغة، وأهلُ اللغة وضعوا هذا الاسمَ – الجِسم – على كل ذي طُوْل وعرض وسمك وتركيب وصورة وتأليف، والله تعالى خارج عن ذلك كله، فلم يجز أن يُسَمَّى جِسْمًا؛ لخروجه عن معنى الجِسْمِيَّة، ولم يجئ في الشريعة ذلك، فبَطَل.

'যে ব্যক্তি (আল্লাহ তাআলার শানে) 'দেহ' বা 'পদার্থ' শব্দ বলে, তার বিরুদ্ধে তিনি (ইমাম আহমদ রাহ.) অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, "নিশ্চয় বিভিন্ন বস্তুর নাম শরীয়ত ও ভাষাতত্ত্ব থেকে নেওয়া হয়। ভাষাবিদরা এই শব্দ (দেহ বা পদার্থ বোঝায় এমন শব্দ) প্রণয়ন করেছেন দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, গঠন ও সূরত-আকৃতি বোঝানোর জন্য। **অথচ আল্লাহ তাআলা এসব থেকে মুক্ত।**

কাজেই তাঁর শানে 'দেহ' শব্দ বলা যাবে না। কারণ, **তিনি দেহবৃত্তীয় অর্থ থেকে পবিত্র।** আর শরীয়তেও তা আসেনি (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলাকে এ বিশেষণে বিশেষিত করা হয়নি)। অতএব তাঁর শানে 'দেহ' শব্দ বলা বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য।"'

ইমাম আহমদ রাহ.-এর আকীদা সম্পর্কে আরও এসেছে,

وَلَيْسَ معنى وَجْهِ معنى جَسَدٍ عِنْده، وَلَا صُورَةَ وَلَا تخطيطَ، وَمَن قَالَ ذَلِك: فقد ابتَدَع.

'তাঁর (ইমাম আহমদের) মতে (আল্লাহর) **চেহারার অর্থ দেহের অর্থে নয়** এবং আকৃতি ও ছবিও নয়। যদি কেউ এমন বলে, তাহলে নিঃসন্দেহে সে বিদআতী।'[১২৩]

বলাবাহুল্য, আল্লাহ তাআলা 'জিসম' বা দেহবিশিষ্ট নন এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, আকার-আকৃতি ইত্যাদি বস্তু থেকে মুক্ত ও চিরপবিত্র হওয়ার ব্যাপারে ইজমা'সহ অনেক ইমামের সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে, যা সামনে আসবে।

অথচ আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রাহ. (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেন,

---

১২২. কুরআন-হাদীসে আল্লাহ তাআলার শানে যে 'ইয়াদ' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, এর অনুবাদ হিসেবে 'হাত' বলা যাবে কি না, এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে।

১২৩. দেখুন, ই'তিকাদুল ইমামিল মুনাব্বাল : আহমদ ইবনে হাম্বল, আবুল ফযল তামীমী, পৃষ্ঠা ৪৫, ২২, ১৭; তবাকাতুল হানাবিলা, ২/২৫৪, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله، ولا قول أحد من سلف الأمة وأئمتها: أنه ليس بجسم.

'কুরআন-সুন্নাহয় ও **উম্মতের সালাফের কারও বক্তব্যে এবং কোনো ইমামের বক্তব্যে এ কথা নেই** যে, "তিনি (আল্লাহ্ তাআলা) দেহবিশিষ্ট নন।"'

অন্যত্র লিখেছেন,

لَمْ يُنقَل عن أحد من الأنبياء ولا الصحابة ولا التابعين ولا سلف الأمة: أن الله جسم أو أن الله ليس بجسم؛ بل النفي والإثبات بدعة في الشرع.

'নবী, সাহাবী, তাবেয়ী ও উম্মতের সালাফের কেউ বলেননি যে, "আল্লাহ্ হলেন দেহবিশিষ্ট", আর না বলেছেন, **"আল্লাহ দেহবিশিষ্ট নন"**; বরং (আল্লাহ্র শানে) 'জিসম' বা 'দেহ' শব্দ উল্লেখ করা-না করা উভয়টা বিদআত।'

বরং তিনি বলেন,

وأن الموجود القائم بنفسه لا يكون إلا جسمًا، وما لا يكون جسمًا لايكون إلا معدومًا.

'স্বয়ংসম্পূর্ণ অস্তিত্বশীল সত্তা 'জিসম' বা 'দেহ' ছাড়া হতে পারে না। আর **যিনি দেহবিশিষ্ট নন, তিনি তো অস্তিত্বহীন ছাড়া কিছু নন।**'[১২৪]

এমনকি তিনি আরও লেখেন,

وَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ وَنَحْوُ ذَلِكَ هِيَ أَعْضَاءُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، فَالْغَنِيُّ الْمُنَزَّهُ عَنْ ذَلِكَ: مُنَزَّهٌ عَنْ آلَاتِ ذَلِكَ، بِخِلَافِ الْيَدِ فَإِنَّهَا لِلْعَمَلِ وَالْفِعْلِ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ مَوْصُوفٌ بِالْعَمَلِ وَالْفِعْلِ.

'কলিজা, প্লীহা ইত্যাদি খানা-পিনার অঙ্গ। কাজেই অমুখাপেক্ষী সত্তা (আল্লাহ্) এ ধরনের সবকিছু থেকে পবিত্র। **তবে 'হাত' থেকে পবিত্র নন, কেননা তা কাজ-কর্মের জন্য।** আর আল্লাহ্ তাআলা কাজ-কর্মের সাথে গুণান্বিত।'[১২৫]

প্রিয় পাঠক, যারা আকীদায় কালাম চর্চাকারীদের সমালোচনা করেন, তারা আল্লাহ্ তাআলাকে নিয়ে এ ধরনের গবেষণা ও মন্তব্য কোন দৃষ্টিতে দেখবেন তা আমার জানা নেই।

'সাফওয়াতুত তাফাসীর' গ্রন্থের রচয়িতা শায়খ মুহাম্মাদ আলী সাবূনী রাহ.-কে খণ্ডন করতে গিয়ে শায়খ বিন বায রাহ. (মৃ. ১৪২০ হি.) লিখেছেন,

ثم ذكر الصابوني – هداه الله – تنزيه الله سبحانه عن الجسم والحدقة والصماخ واللسان والحنجرة، وهذا ليس بمذهب أهل السنة، بل هو من أقوال أهل الكلام المذموم وتكلفهم.

---

১২৪. দ্র. বয়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ, ১/৩৭৩, ৩৫৯; মাজমুউল ফাতাওয়া, ৫/৪৩৪; জামিউল মাসাইল, ৩/২০৬

১২৫. মাজমুউল ফাতাওয়া, ৩/৮৬

‘অতঃপর সাবূনী হাদাহুল্লাহ আল্লাহ তাআলাকে দেহ, নয়নতারা, কর্ণকুহর, জিহ্বা ও বাগ্‌যন্ত্র থেকে মুক্ত ও পবিত্র বলে উল্লেখ করেছে। এটা আহলুস সুন্নাহর মতাদর্শ নয়; বরং এটা নিন্দনীয় কালামশাস্ত্র চর্চাকারীদের মতবাদ এবং তাদের বাড়াবাড়ি বক্তব্য।’[১২৬]

মরহুম শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ উসাইমীন (মৃ. ১৪২১ হি.) বলেছেন,

فالمؤلف رحمه الله يرى أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يقولون: إن الله ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم، ولا شك أن هذا النفي ليس بصحيح، ولم يقل أهل السنة بذلك، وليس هذا مذهبهم.

‘লেখক (সাফ্‌ফারীনী হাম্বলী, মৃ. ১১৮৮ হি.)-এর মতে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর আকীদা হলো, “আল্লাহ ‘জওহর’ নন, ‘আরয’ নন ও ‘জিসম’ বা দেহধারী নন” বলা। অথচ নিঃসন্দেহে এ নাকচকরণ সহীহ নয়। না আহলুস সুন্নাহ এ ধরনের নাকচ করতে বলেছে, আর না এটা তাঁদের মতাদর্শ।’

তিনি আরও বলেন,

مسألة الجسمية لم ترد لا في القرآن ولا في السنَّة إثباتاً ولا نفياً، ولكن نقول بالنسبة للفظ: لا ننفي ولا نثبت، لا نقول: جسم وغير جسم.

‘দেহবাদের মাসআলা কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত হয়নি। না বলা হয়েছে, এর অস্তিত্ব আছে; আর না বলা হয়েছে, এর অস্তিত্ব নেই। তাই আমরা এই শব্দের ব্যাপারে বলি, আমরা (এটাকে) সাব্যস্ত করি না, আবার নাকচও করি না। আমরা বলি না, আল্লাহর দেহ আছে। আবার এও বলি না যে, আল্লাহর দেহ নেই।’[১২৭]

দুই. অর্থের ‘তাফবীয’ না করা এবং ‘কাইফিয়াত’ নাকচ না করে ‘তাফবীয’ করা

ইমাম আহমদ রাহ.-সহ আহলুস সুন্নাহর বক্তব্য হচ্ছে, কুরআন-হাদীসে বর্ণিত আল্লাহ তাআলার হাত, চেহারা, আসমানে অবতরণ ও আরশে ইস্তিওয়া করা ইত্যাদি সিফাত বা গুণাবলির হুবহু শব্দগুলোর প্রতি ঈমান আনা। আর যেহেতু এগুলোর আভিধানিক বা বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়, তাই সেগুলোর অর্থ ও জ্ঞান দুর্বোধ্য এবং অবোধগম্য হওয়ার কারণে বান্দার কাছে তা অজানা। কাজেই এগুলোর অর্থের পেছনে না পড়ে তা আল্লাহ তাআলার ওপর হাওয়ালা করা এবং ন্যস্ত করা বা এভাবে বলা, ‘আমরা সেই শব্দগুলোর প্রতি ওই অর্থের ওপর ঈমান আনলাম, যে অর্থ আল্লাহ উদ্দেশ্য নিয়েছেন।’ আর এগুলোর আভিধানিক অর্থ ও ‘কাইফিয়াত’ বা ধরন নাকচ করা কিংবা ‘নেই’ বলা। পরিভাষায় এটাকে ‘তাফবীয’ বলে।

---

১২৬. মাজমুউ ফাতাওয়া বিন বায, ৩/৬১
১২৭. শারহুল আকীদাতিস সাফফারীনিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ২২৪, ১৮, ৪৫৮

ইমাম আহমদ রাহ. (মৃ. ২৪১ হি.) বলেন,

نُؤمِن بهَا ونُصدِّق بهَا، وَلَا كَيفَ وَلَا معنى، وَلَا نَرُدُّ مِنْهَا شَيْئا.

'আমরা এগুলোর ওপর ঈমান রাখি এবং বিশ্বাস করি, তবে (এগুলোর) কোনো 'কাইফিয়াত' বা ধরন নেই এবং অর্থ নেই (তথা বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়)। আবার এগুলোর কোনোটাই প্রত্যাখ্যান করি না।'[১২৮]

আছারী ও হাম্বলীসহ সকলের বরেণ্য ইমাম ইবনে কুদামাহ মাকদেসী হাম্বলী রাহ. (মৃ. ৬২০ হি.) আকীদা বিষয়ে তাঁর ব্যাপক মাকবূল কিতাব 'লুমআতুল ই'তিকাদ' রিসালায় বলেন,

وما أَشْكَلَ مِنْ ذلك وَجَبَ إِثْباتُه لفْظا، وتَرْكُ التَّعَرُّضِ لِمعْناه، ونرُدُّ عِلْمَه إلى قائله.

'আল্লাহর যে সকল সিফাতের অর্থ দুর্বোধ্য মনে হবে, সেগুলোর বর্ণিত শব্দ সাব্যস্ত করতে হবে এবং সেগুলোর অর্থের পেছনে পড়া যাবে না। আর সেগুলোর জ্ঞান আমরা উক্তিকারীর (আল্লাহর ইলমের) ওপর ন্যস্ত করব।'

তিনি আরও সুস্পষ্ট করে 'তাহরীমুন নযর' কিতাবে বলেন,

وَأما إِيمَاننَا بِالْآيَاتِ وأخبار الصِّفَات: فَإِنَّمَا هُوَ إِيمَان بِمُجَرَّد الْأَلْفَاظ الَّتِي لَا شكّ فِي صِحَّتهَا وَلَا ريب فِي صدقهَا، وقائلها أعلم بمعناها، فآمَنا بهَا على الْمَعْنى الَّذِي أَرَادَ رَبنا تبَارك وَتَعَالَى.

'আল্লাহর সিফাত-বিষয়ক আয়াত ও হাদীসের ব্যাপারে আমাদের ঈমানের স্বরূপ হলো কেবল ওই শব্দগুলো বিশ্বাস করা, যা সঠিকভাবে প্রমাণিত এবং যা সত্য হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। আর **সেগুলোর অর্থ সেগুলোর উক্তিকারী ভালো জানেন। সুতরাং আমরা সেই শব্দগুলোর প্রতি ওই অর্থের ওপর ঈমান আনলাম, যে অর্থ আল্লাহ উদ্দেশ্য নিয়েছেন।**'[১২৯]

ইমাম আহমদ রাহ. বলেন,

أَحَادِيثُ الصِّفَاتِ تُمَرُّ كَمَا جَاءَتْ مِنْ غَيْرِ بَحْثٍ عَنْ مَعَانِيهَا، وَنُخَالِفُ مَا خَطَرَ فِي الْخَاطِرِ عِنْدَ سَمَاعِهَا، وَنَنْفِي التَّشْبِيهَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ ذِكْرِهَا مَعَ تَصْدِيقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْإِيمَانِ بِهَا، وَكُلُّ مَا يُعْقَلُ وَيُتَصَوَّرُ فَهُوَ تَكْيِيفٌ وَتَشْبِيهٌ وَهُوَ مُحَالٌ، كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْإِمَامُ ابْنُ حَمْدَانَ.

'সিফাতের হাদীসসমূহ যেভাবে এসেছে, এগুলোর **অর্থ অনুসন্ধান না করে** সেভাবেই রেখে দেওয়া হবে। এগুলো শুনলে অন্তরে যে (আভিধানিক) অর্থ উদ্রেক হয়, আমরা তার বিরোধিতা করি। আমরা এগুলো শোনার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু

---

১২৮. লুমআতুল ই'তিকাদ, ইবনে কুদামাহ, পৃষ্ঠা ৬; ইবতালুত তাবীলাত, আবু ইয়ালা, পৃষ্ঠা ৪৫

১২৯. দেখুন, লুমআতুল ই'তিকাদ, পৃষ্ঠা ৪; যাম্মুত তাবীল, পৃষ্ঠা ১২; তাহরীমুন নযর ফী কুতুবিল কালাম, পৃষ্ঠা ৫৯

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সত্যায়ন করি এবং এগুলোর প্রতি ঈমান রেখে আল্লাহ তাআলা থেকে সাদৃশ্য নাকচ করি। আর এতে যা বোধগম্য হবে ও কল্পনায় আসবে, তা হলো ধরন নির্ধারণ ও সাদৃশ্য নিরূপণ, যা অসম্ভব।'

সাফ্ফারীনী হাম্বলী রাহ. (মৃ. ১১৮৮ হি.) ইমাম ইবনে হামদান হাম্বলী রাহ. (মৃ. ৬৯৫ হি.) থেকে ইমাম আহমদের এ বক্তব্য নকল করার পর বলেন,

وَهَذَا مَذْهَبُ السَّلَفِ الْأَثَرِيَّةِ فَهُوَ الْحَقُّ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ.

'এটা আছারী সালাফের মাযহাব এবং এটাই হক।'

তিনি আরও বলেন,

فَمَذْهَبُ السَّلَفِ فِي آيَاتِ الصِّفَاتِ أَنَّهَا لَا تُؤَوَّلُ، وَلَا تُفَسَّرُ؛ بَلْ يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهَا، وَتَفْوِيضُ مَعْنَاهَا الْمُرَادُ مِنْهَا إِلَى اللهِ تَعَالَى.

'সিফাতের আয়াতসমূহের ব্যাপারে সালাফের মাযহাব হলো, এগুলোর তাবীল ও তাফসীর করা হবে না; বরং এগুলোর প্রতি ঈমান রাখা এবং এগুলো থেকে যে অর্থ উদ্দেশ্য, তা **'তাফবীয' করা তথা আল্লাহ তাআলার ওপর হাওয়ালা করা ওয়াজিব।'**

সাফ্ফারীনী হাম্বলী রাহ. অন্যত্র বলেন,

اعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبَ الْحَنَابِلَةِ هُوَ مَذْهَبُ السَّلَفِ... فَإِذَا وَرَدَ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ، وَصَحِيحُ سُنَّةِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَأَتَمُّ التَّسْلِيمِ بِوَصْفٍ لِلْبَارِي جَلَّ شَأْنُهُ: تَلَقَّيْنَاهُ بِالْقَبُولِ وَالتَّسْلِيمِ، وَوَجَبَ إِثْبَاتُهُ لَهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي وَرَدَ، وَنَكِلُ مَعْنَاهُ لِلْعَزِيزِ الْحَكِيمِ... فَهَذَا اعْتِقَادُ سَائِرِ الْحَنَابِلَةِ كَجَمِيعِ السَّلَفِ، فَمَنْ عَدَلَ عَنْ هَذَا الْمَنْهَجِ الْقَوِيِّ: زَاغَ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَانْحَرَفَ.

'জেনে রাখো, হাম্বলীদের মাযহাব সালাফেরই মাযহাব। কুরআন ও সহীহ হাদীসে আল্লাহর কোনো সিফাত বর্ণিত হলে আমরা কবুল করি ও স্বীকৃতি প্রদান করি। এগুলো আল্লাহর জন্য যেভাবে এসেছে, সেভাবে সাব্যস্ত করা ওয়াজিব। আর **এগুলোর অর্থ আল্লাহর ওপর হাওয়ালা করি**। এটা সমস্ত সালাফের মতো সকল হাম্বলীর আকীদা। কাজেই এ পথ থেকে যে বিচ্যুত হবে, সে পথভ্রষ্ট হবে।'[১৩০]

আরেক হাম্বলী শায়খ আল্লামা মারয়ী কারমী রাহ. (মৃ. ১০৩৩ হি.) বলেন,

وَجُمْهُور أهل السّنة، مِنْهُم السّلف وَأهل الحَدِيث على الْإِيمَان بهَا، وتفويض مَعْنَاهَا المُرَاد مِنْهَا إِلَى الله تَعَالَى، وَلَا نفسرها مَعَ تنزيهنا لَهُ عَن حَقِيقَتهَا.

'অধিকাংশ আহলুস সুন্নাহর মতে, যাদের মধ্যে সালাফ ও মুহাদ্দিসগণও রয়েছেন, সিফাতগুলোর প্রতি ঈমান আনা এবং এগুলো থেকে যে অর্থ উদ্দেশ্য, তা **'তাফবীয'**

---

১৩০. নিহায়াতুল মুবতাদিয়ীন, ইবনে হামদান, পৃষ্ঠা ৩৩; লাওয়ামিউল আনওয়ারিল বাহিয়্যা, ১/২৪১, ২১৯, ১০৭

করা তথা আল্লাহ তাআলার ওপর হাওয়ালা করা। আর আমরা এগুলোর তাফসীর করব না এবং এগুলোর হাকীকত তথা আভিধানিক ও আসল অর্থ থেকে আল্লাহ তাআলাকে পবিত্র মনে করব।'

তিনি আরও বলেন,

وهذا المذهب هو الذي نقل الخطابي وغيره أنه مذهب السلف، ومنهم الأئمة الأربعة، وبهذا المذهب قال الحنفية والحنابلة وكثير من الشافعية وغيرهم، وهو إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها، مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، محتجين بأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود، لا إثبات تكييف فكذلك إثبات صفاته إنما هي إثبات وجود، لا إثبات تحديد وتكييف.

'সালাফ, (ফিকহের প্রসিদ্ধ) চার ইমাম, হানাফী, হাম্বলী ও অনেক শাফেয়ীসহ অন্যদের মাযহাব হলো, সিফাতের আয়াত ও হাদীসসমূহকে আপন অবস্থায় রেখে দেওয়া এবং **কাইফিয়াত (ধরন) ও সাদৃশ্যতাকে নাকচ করা বা 'নেই'** বলা। কেননা, আল্লাহ তাআলার সিফাতের আলোচনা তাঁর সত্তার আলোচনার অধীন। আর তাঁর সত্তাকে ইছবাত করার অর্থ হলো, তাঁর অস্তিত্ব সাব্যস্ত করা; কাইফিয়াত বা ধরন সাব্যস্ত করা নয়। তাই তাঁর সিফাত সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্য হলো, সিফাতের শুধু অস্তিত্ব সাব্যস্ত করা, সীমারেখা কিংবা ধরন-ধারণ সাব্যস্ত করা নয়।'[১৩১]

সুতরাং প্রমাণিত হলো, আহলুস সুন্নাহর অন্যদের মতো হাম্বলীরাও সিফাতের অর্থের 'তাফবীয' করে এবং 'কাইফিয়াত' নাকচ করে বা 'নেই' বলে।

অথচ সালাফী শায়খ ও সহীহ আকীদার বন্ধুরা সিফাতের অর্থের 'তাফবীয' করেন না এবং 'কাইফিয়াত' নাকচ করেন না বা 'নেই' বলেন না; বরং বলেন, 'আমরা সিফাতের অর্থ জানি এবং এ সকল সিফাতের কাইফিয়াত (ধরন) রয়েছে, তবে আমাদের জানা নেই।'

শায়খ ইবনে তাইমিয়া রাহ. (মৃ. ৭২৮ হি.) লেখেন,

إن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد!

'নিজেদেরকে সুন্নাহ ও সালাফের অনুসারী ধারণাকারী তাফবীযপন্থীদের বক্তব্য বিদআতী ও মুলহিদদের বক্তব্যের থেকেও নিকৃষ্টতর।'[১৩২]

অন্যত্র বলেন,

---

১৩১. আকাবীলুছ ছিকাত, পৃষ্ঠা ৬০, ৬৫

১৩২. দারউ তাআরুযিল আকলি ওয়ান নাকল, ১/২০৫

وأن له كيفية؛ لكن تلك الكيفية مجهولة لنا، لا نعلمها نحن.

'এর ধরন রয়েছে, তবে তা আমাদের কাছে অজ্ঞাত, আমরা তা জানি না।'[১৩৩]

শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ উসাইমীন (মৃ. ১৪২১ হি.) বলেন,

نحن نعلم معاني صفات الله، ولكننا لا نعلم الكيفية. وقال أيضا: وليس مراده أن لا كيفية لصفاته؛ لأن صفاته ثابتة حقا، وكل شيء ثابت فلابد له من كيفية؛ لكن كيفية صفات الله غير معلومة لنا. وقال أيضا: وعلى كل حال لا شك أن الذين يقولون: إن مذهب أهل السنة هو التفويض، أنهم أخطأوا؛ لأن مذهب أهل السنة هو: إثبات المعنى وتفويض الكيفية.

'আমরা আল্লাহ্ তাআলার সিফাতের অর্থ জানি, তবে আমরা 'ধরন' জানি না। তাঁর গুণাবলির 'ধরন' রয়েছে, তবে তা আমাদের কাছে অজ্ঞাত। তাফবীযপন্থীরা ভুলে নিপতিত; বরং (উনার দাবি মতে) আহলুস সুন্নাহর মাযহাব হলো, এগুলোর অর্থ সাব্যস্ত করা এবং কাইফিয়াত বা ধরন (নাকচ না করে) তাফবীয করা।'[১৩৪]

শায়খ বিন বায (মৃ. ১৪২০ হি.) 'আকীদাতুত তাহাবী'র টীকায় লেখেন,

وصفاته الذاتية من الوجه واليد والقدم ونحو ذلك، فهو سبحانه موصوف بذلك، لكن ليست صفاته مثل صفات الخلق، ولا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه.

'আল্লাহ্ তাআলার চেহারা, হাত, পা ইত্যাদি আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলি, যা মাখলূকের গুণাবলির মতো নয়। আর এগুলোর 'ধরন' রয়েছে, তবে তা আল্লাহ্ তাআলা ব্যতীত কেউ জানে না।'

তিন. আল্লাহ্ তাআলাকে ওপরের দিকে 'স্থানে' আছেন মনে করা

আহলুস সুন্নাহর আকীদা মতে, আল্লাহ্ তাআলাকে ওপরের দিকসহ সকল দিক এবং সব ধরনের 'স্থান' থেকে পবিত্র মনে করতে হয়। ইমাম আহমদ রাহ.-ও আল্লাহকে দিক ও স্থানমুক্ত মনে করতেন। ইবনুল জাওযী হাম্বলী রাহ. (মৃ. ৫৯৭ হি.) ও বদরুদ্দীন ইবনে জামাআহ রাহ. (মৃ. ৭২৭ হি.) উভয়ে বলেন,

وكان أحمد لا يقول بالجهة للباري .

'ইমাম আহমদ রাহ. মহান স্রষ্টার জন্য দিক আছে বলতেন না।'[১৩৫]

ইমাম ইবনে হামদান হাম্বলী রাহ. (মৃ. ৬৯৫ হি.) নকল করেন,

---

১৩৩. মাজমূউল ফাতাওয়া, ৫/১৮১

১৩৪. মাজমূউ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িল, ৫/১৮৫; শারহু লুমআতুল ই'তিকাদ, পৃষ্ঠা ৯; শারহুল আকীদাতিল ওয়াসিতিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ৯৩

১৩৫. দ্র. দাফউ শুবাহিত তাশবীহ, পৃষ্ঠা ১৩৫, তাহকীক : সাক্কাফ; ইযাহুদ দলীল, পৃষ্ঠা ১০৮

والله فوق ذلك لا مكان ولا حد؛ لأنه كان ولا مكان، ثم خلق المكان، وهو كما كان قبل خلق المكان.

‘(ইমাম আহমদের আকীদা হচ্ছে,) মহান আল্লাহ্ আরশের ঊর্ধ্বে। তাঁর কোনো স্থান নেই এবং কোনো সীমা নেই। কেননা, তিনি ছিলেন, যখন কোনো স্থান ছিল না। এরপর তিনি স্থান সৃষ্টি করেছেন; আর তিনি এভাবেই আছেন, যেভাবে স্থান সৃষ্টি করার পূর্বে ছিলেন।’[১৩৬]

অথচ কাযী আবু ইয়া'লা হাম্বলী (মৃ. ৪৫৮ হি.) ও আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (মৃ. ৭৫১ হি.) উল্লেখ করেছেন,

فلا تُنكروا أنه قاعدٌ

‘তিনি (আল্লাহ) যে বসে আছেন, তা তোমরা অস্বীকার কোরো না।’[১৩৭]

শায়খ ইবনে তাইমিয়া লেখেন,

أن العرش في جهة بلا خلاف، وقد ثبت بنص القرآن أنه مستو عليه، فاقتضى أنه في جهة.

‘আরশ যে (ওপরের) দিকে রয়েছে, এতে কোনো মতভেদ নেই। আর কুরআনে আছে, আল্লাহ্ আরশের ওপর ইস্তিওয়া করেছেন। কাজেই এর দাবি হলো, আল্লাহ্ (ওপরের) দিকে রয়েছেন।’[১৩৮]

তিনি আরও বলেন,

أَهْل السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ الَّذِينَ يُثْبِتُونَ أَنَّ اللهَ عَلَى الْعَرْشِ، وَأَنَّ حَمَلَةَ الْعَرْشِ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِمَّنْ دُونَهُمْ، وَأَنَّ مَلَائِكَةَ السَّمَاءِ الْعُلْيَا أَقْرَبُ إِلَى اللهِ مِنْ مَلَائِكَةِ السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ: صَارَ يَزْدَادُ قُرْبًا إِلَى رَبِّهِ بِعُرُوجِهِ وَصُعُودِهِ، وَكَانَ عُرُوجُهُ إِلَى اللهِ لَا إِلَى مُجَرَّدِ خَلْقٍ مِنْ خَلْقِهِ.

‘আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআহ্ সাব্যস্ত করে যে, আল্লাহ্ আরশের ওপর রয়েছেন। আরশ বহনকারী ফেরেশতারা অন্যদের তুলনায় তাঁর অধিক নিকটবর্তী। প্রথম আসমানের ফেরেশতারা দ্বিতীয় আসমানের ফেরেশতাদের তুলনায় তাঁর অধিক নিকটবর্তী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন মেরাজের সময় আসমানে নেওয়া হয়েছিল, তখন ওপরে উঠা ও ঊর্ধ্বে আরোহণের দ্বারা তিনি তাঁর রবের অধিক নিকটবর্তী হচ্ছিলেন। তাঁর মেরাজ আল্লাহর নিকট হয়েছিল; তাঁর কোনো

---

১৩৬. নিহায়াতুল মুবতাদিয়ীন, পৃষ্ঠা ৩১

১৩৭. ইবতালুত তাবীলাত, আবু ইয়ালা, পৃষ্ঠা ৪৯২; বাদায়িউল ফাওয়ায়িদ, ইবনুল কায়্যিম, ৪/৮৪১; সাথে অবশ্যই দেখুন, সিলসিলাতুল আহাদীসিয যয়ীফা, আলবানী, ২/২৫৬; যাহাবীর মুখতাসারুল উলু, তাহকীক : আলবানী, পৃষ্ঠা ১৮-১৯, ২৩৪-২৩৫; তাফসীরে কুরতুবী, ১০/৩১১; ইবনে জামাআহর ইযাহুদ দলীলের শুরুতে ওহাবী সুলায়মান গাওজীর মুকাদ্দামা, পৃষ্ঠা ৩১-৩২

১৩৮. বয়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ, ১/৪৭

সৃষ্টির নিকট নয়।'[১৩৯]

এমনকি তিনি উসমান বিন সাঈদ দারেমী থেকে নকল করে বলেন,

وَلَوْ قَدْ شَاءَ: لَاسْتَقَرَّ عَلَى ظَهْرِ بَعُوضَةٍ ...فَكَيْفَ عَلَى عَرْشٍ عَظِيمٍ أَكْبَرَ مِنَ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرَضِينَ السَّبْعِ؟

'তিনি (আল্লাহ) চাইলে মশার পিঠের ওপর অবস্থানগ্রহণ করতে পারেন, সেখানে সাত আসমান ও সাত জমিনের চেয়ে এত বড় আরশে আযীমের ওপর অবস্থানগ্রহণ করতে পারবেন না?'[১৪০]

ইবনে তাইমিয়ার এ ধরনের সাদৃশ্যের কাছাকাছি বক্তব্যের কারণে আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রাহ. (মৃ. ১৩৫২ হি.) তাঁর সম্পর্কে বলেছেন,

إنه لما بالغ في إثباتها وشدد فيه: قارب المشبهة في التعبير.

'তিনি সিফাতের ইছবাতের (সাব্যস্ত করার) ক্ষেত্রে এত বেশি জোর দিয়েছেন ও বাড়াবাড়ি করেছেন যে, তার বাচনভঙ্গি ও প্রকাশরীতি সাদৃশ্যবাদীদের নিকটবর্তী হয়ে গেছে।'[১৪১]

চার. তাবীল বিষয়ে বাড়াবাড়ি

ফুযালাউল হানাবিলাদের মতে সিফাতের তাবীল যদিও অবৈধ, এরপরও ইমাম আহমদ রাহ.-সহ কারও কারও থেকে কিছু ক্ষেত্রে তাবীল পাওয়া যায়। আর তারা শর্ত সাপেক্ষে তাবীলকারীদের আহলুস সুন্নাহ থেকে খারেজ মনে করেন না।

কিন্তু গুলাতুল হানাবিলা যেকোনো তাবীলকারীকে আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত মনে করে না। শায়খ সালেহ ফাওযান বলেছেন, 'আশআরীরা সিফাতের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, তাবীল ছাড়া (আল্লাহর) সিফাতকে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে তারা আহলুস সুন্নাহর বিরোধিতা করে।'[১৪২]

এ কারণেই হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রাহ. (মৃ. ১৩৬২ হি.) তাদের চারটি ভুল চিহ্নিত করে তৃতীয় নম্বর ভুল হিসেবে বলেন,

تیسری غلطی یہ کہ مسلک تاویل کو علی الاطلاق باطل کہہ کر ہزاروں اہل حق کی تضلیل کرتے ہیں۔

'তৃতীয় ভুল হলো, যেকোনো তাবীলকে বাতিল বলে হাজারো হকপন্থীদেরকে

---

১৩৯. মাজমূউল ফাতাওয়া, ৬/৭
১৪০. বয়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ, ৩/২৪৩
১৪১. ফয়যুল বারী, ৬/৪০৫
১৪২. আল-বয়ান লি-আখতায়ি বা'যিল কুত্তাব, পৃষ্ঠা ৩২, দারু ইবনিল জাওযী

গোমরাহ সাব্যস্ত করে।'[১৪৩]

বরং আরও দেখুন, ইমাম বুখারী রাহ. সূরা কাসাসের ৮৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন,

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ إِلَّا مُلْكَهُ.

'আল্লাহর সত্তা ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে।'

এখানে তিনি 'ওয়াজহুন' শব্দের ব্যাখ্যা করেছেন 'মুলকুন' তথা আল্লাহর রাজত্ব। ফলে অর্থ হবে, 'সবকিছু ধ্বংস হবে, তাঁর রাজত্ব ব্যতীত।'

শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী রাহ.-কে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন,

هذا لا يقوله مسلم مؤمن... مثل هذا التأويل هو عين التعطيل.

'এ ধরনের তাবীল-ব্যাখ্যা কোনো মুমিন-মুসলিম বলতে পারে না।'

এরপর কিছুদূর এগিয়ে বলেন, 'এ তাবীল মূলত তা'তীলের (সিফাত অস্বীকারের) অন্তর্ভুক্ত।'[১৪৪]

আর আমাদের দেশের সালাফী বন্ধুদের 'তাওহীদ পাবলিকেশন্স' থেকে প্রকাশিত সহীহ বুখারীর অনুবাদের টীকায় তারা লিখে দিয়েছেন, 'ইমাম বুখারী যে তাফসীর করেছেন সেটি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর আকীদার অনুপাতে হয়নি।'[১৪৫]

অর্থাৎ তাবীল করার কারণে ইমাম বুখারীর মতো আহলুস সুন্নাহর মহান ব্যক্তিকেও আহলুস সুন্নাহর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হচ্ছে!

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম ইমাম তিরমিযী রাহ.-এর তাবীল সম্পর্কে লেখেন,

وَأَمَّا تَأْوِيلُ التِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ بِالْعِلْمِ فَقَالَ شَيْخُنَا: هُوَ ظَاهِرُ الْفَسَادِ مِنْ جِنْسِ تَأْوِيلَاتِ الْجَهْمِيَّةِ.

'ইমাম তিরমিযী ও অন্যরা যে ("তোমরা একটি রশি পৃথিবীর তলদেশে নামিয়ে দিলে তা আল্লাহর কাছে গিয়ে পৌঁছাবে" হাদীসটি আল্লাহর) জ্ঞান বলে তাবীল করেছেন, এ সম্পর্কে আমার শায়খ (ইবনে তাইমিয়া) বলেছেন, এই তাবীল স্পষ্ট বাতিল। এটি (ভ্রান্ত দল) জাহমিয়াদের তাবীলের মতো।'[১৪৬]

অথচ ইমাম আহমদ রাহ. থেকে তাবীল বিষয়ে কঠোরতা পাওয়া গেলেও সহীহ সূত্রে কিছু তাবীল করাও প্রমাণিত আছে। ইমাম ইবনে কাসীর রাহ. (মৃ. ৭৭৪ হি.) ও আল্লামা ইবনে হাযম যাহেরী (মৃ. ৪৫৬ হি.) উল্লেখ করেছেন,

---

১৪৩. ইমদাদুল ফাতাওয়া, ১২/২৫১

১৪৪. ফাতাওয়া শায়খ আলবানী, পৃষ্ঠা ৫২৩, মাকতাবাতুত তুরাছিল ইসলামী, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৪ ঈসায়ী

১৪৫. দ্র. সহীহুল বুখারী, ৪/৫০৩, টীকা নং ১৫৪, জানুয়ারি ২০১১ ঈসায়ী

১৪৬. মুখতাসারুস সাওয়ায়িকিল মুরসালা, পৃষ্ঠা ৪৮৫

وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنِ الْحَاكِمِ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ السَّمَّاكِ عَنْ حَنْبَلٍ: أَنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ تَأَوَّلَ قَوْلَ اللهِ تَعَالَى: وَجَاءَ رَبُّكَ أَنَّهُ جَاءَ ثَوَابُهُ. ثُمَّ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَهَذَا إِسْنَادٌ لَا غُبَارَ عَلَيْهِ.

'(ইমাম) বায়হাকী রাহ. নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম আহমদ রাহ. এ আয়াত وَجَاءَ رَبُّكَ তথা "আপনার প্রভু আগমন করবেন"-এর তাবীল (ব্যাখ্যা) করেছেন جَاءَ ثَوَابُهُ "আল্লাহর সাওয়াব" দ্বারা। অতঃপর বায়হাকী রাহ. বলেন, এর সনদে সমস্যা নেই।'[১৪৭]

ইমাম বায়হাকী রাহ. তাঁর 'মানাকিবু আহমদ' গ্রন্থে বর্ণনা করেন, 'হাম্বল ইবনে ইসহাক বলেন, আমার চাচা (ইমাম) আহমদ বিন হাম্বল রাহ.-কে বলতে শুনেছি, তারা সেদিন আমীরুল মুমিনীনের দরবারে আমার বিরুদ্ধে দলীল পেশ করে বলেন, কিয়ামতের দিন সূরা বাকারা ও সূরা মুলক আগমন করবে।

আমি (আহমদ) তাদেরকে বললাম, "এটার উদ্দেশ্য হলো সাওয়াব বা প্রতিদান।" যেমন : আল্লাহ বলেন, وَجَاءَ رَبُّكَ (তথা "আপনার প্রভু আগমন করবেন")-এর উদ্দেশ্য হলো, إنما تأتي قدرته তথা "আল্লাহর কুদরতের আগমন ঘটবে।"'[১৪৮]

ইমাম ইবনে হামদান হাম্বলী রাহ. (মৃ. ৬৯৫ হি.) লেখেন,

وقد تأول أحمد آيات وأحاديث كآية النجوى، وقوله: «أن يأتيهم الله» وقال: قدرته وأمره. وقوله: «وجاء ربك» قال: قدرته. ذكرهما ابن الجوزي في «المنهاج» واختار هو إمرار الآيات كما جاءت من غير تفسير. وتأول ابن عقيل كثيرا من الآيات والأخبار. وتأول أحمد قول النبي ﷺ: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» ونحوه.

'ইমাম আহমদ অনেক আয়াত ও হাদীসের তাবীল করেছেন। যেমন এই আয়াত, "কখনো তিনজনের মধ্যে এমন কোনো গোপন কথা হয় না, যাতে চতুর্থজন হিসেবে আল্লাহ উপস্থিত থাকেন না এবং কখনো পাঁচজনের মধ্যে এমন কোনো গোপন কথা হয় না, যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি উপস্থিত না থাকেন। এমনইভাবে তারা এর কম হোক বা বেশি, তারা যেখানেই থাকুক, আল্লাহ তাদের সঙ্গে থাকেন।"[১৪৯] এই আয়াত, "তাদের কাছে আল্লাহ আসবেন"[১৫০]-এর তাবীল করেছেন, "তাঁর কুদরত ও নির্দেশ আসবে।" এবং এই আয়াত, "তোমার প্রতিপালক এসেছেন"[১৫১]-এর

১৪৭. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১০/৩৬১, দারু ইহয়াইত তুরাছ; আল ফিসাল ফিল মিলালি ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল, ২/১৩২; আর-রাদ্দুল ইসলামীল মুমতায আলা ফায়সাল বিন কায্যায, পৃষ্ঠা ২৪৭-২৫২; সূরা ফাজর, (৮৯) : ২২

১৪৮. দ্র. তাকমিলাতুর রদ্দ, যাহেদ কাউসারী, পৃষ্ঠা ৫০৪, টীকা ২

১৪৯. সূরা মুজাদালা, (৫৮) : ৭

১৫০. সূরা বাকারা, (২) : ২১০

১৫১. সূরা ফাজর, (৮৯) : ২২

তাবীল করেছেন, "তাঁর কুদরত এসেছে।" এ দুটো তাবীল ইবনুল জাওযী রাহ. 'আল-মিনহাজ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর তিনি এই মাযহাব পছন্দ করেছেন যে, শব্দকে কোনো ব্যাখ্যা না করে যেভাবে এসেছে সেভাবে রেখে দেওয়া হবে।

ইবনে আকীল হাম্বলী রাহ.-ও (মৃ. ৫১৩ হি.) অনেক আয়াত ও হাদীসের তাবীল করেছেন। ইমাম আহমদ রাহ. "হাজরে আসওয়াদ পৃথিবীতে আল্লাহর ডান হাত"— এই হাদীসসহ অন্য হাদীসেরও তাবীল করেছেন।'[১৫২]

ইমাম ইবনে কাসীর রাহ. লেখেন,

وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي الْحَسَنِ الْمَيْمُونِيِّ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ أَجَابَ الْجَهْمِيَّةَ حِينَ احْتَجُّوا عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ.

قَالَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ تَنْزِيلُهُ إِلَيْنَا هُوَ الْمُحْدَثُ، لَا الذِّكْرُ نَفْسُهُ هُوَ الْمُحْدَثُ. وَعَنْ حَنْبَلٍ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ذِكْرًا آخَرَ غَيْرُ الْقُرْآنِ.

'জাহমিয়ারা যখন এই আয়াত দ্বারা দলীল উপস্থাপন করল যে, "তাদের কাছে যখনই তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নতুন উপদেশ (আয়াত) আসে, তখন তারা কৌতুকচ্ছলে তা শোনে।" (কুরআন তো নিত্য ও অনাদি, তাহলে একে নতুন ও অনিত্য বলে উল্লেখ করা হলো কেন?) তখন ইমাম আহমদ রাহ. জবাব দিলেন, "হতে পারে এর ব্যাখ্যা হলো, কুরআন আমাদের ওপর নাযিল করার বিষয়টি অনিত্য; মূল কুরআন তো অনিত্য নয়।" ইমাম আহমদ থেকে এও বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, "এমনও হতে পারে যে, এর দ্বারা কুরআন ছাড়া অন্য কোনো উপদেশের কথা বোঝানো হয়েছে।"'[১৫৩]

'আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ ওয়ায যানাদিকাহ' গ্রন্থেও ইমাম আহমদের তাবীল বর্ণিত হয়েছে। যেমন : এক স্থানে রয়েছে,

وإنما معنى قول الله جل ثناؤه: وَهُوَ اللهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ. يقول: هو إله من في السموات وإله من في الأرض.

'কুরআনে আল্লাহ তাআলার বাণী "তিনি (আল্লাহ) আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে"-এর অর্থ হলো, তিনি আকাশসমূহে যারা আছে, তাদেরও ইলাহ এবং পৃথিবীতে যারা আছে, তাদেরও ইলাহ।'[১৫৪]

বলাবাহুল্য, এই তাবীলটা কিন্তু 'তাবীল অস্বীকারকারী' সকল আছারীও নির্বিশেষে গ্রহণ করে থাকেন। কেননা, তাবীল না করলে এ ধরনের আয়াত 'আল্লাহ স্থানগত

---

১৫২. নিহায়াতুল মুবতাদিয়ীন, পৃষ্ঠা ৩৫, তবে হাদীসটির সনদ যয়ীফ

১৫৩. সূরা আম্বিয়া, (২১) : ২; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১০/৩৬১

১৫৪. সূরা আনআম, (৬) : ৩; আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ ওয়ায যানাদিকাহ, পৃষ্ঠা ১৪৮-১৪৯

সর্বত্র বিরাজমান' হওয়ার পক্ষে দলীল হয়। তাই এ সকল আয়াতের তাবীল করতে তারাও বাধ্য হন।

কুরআনে 'রূহ' (আত্মা)-কে আল্লাহর দিকে নিসবত করে 'রুহুল্লাহ' বলা হয়েছে। ইমাম আহমদ রাহ. এর তাবীল করে বলেন,

تفسير روح الله إنما معناها: أنها روح خلقها الله تعالى، كما يقال: عبد الله وسماء الله وأرض الله.

''রুহুল্লাহ' বা আল্লাহর রূহের ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহর সৃষ্ট রূহ। যেমন বলা হয়, আল্লাহর বান্দা, আল্লাহর আসমান ও আল্লাহর জমিন।''[১৫৫]

অথচ আছারীরা এখানে বলে না, 'আল্লাহরও রূহ রয়েছে, তবে তা আমাদের রূহের মতো নয়'; যেমনটা বলে থাকে যে, 'আল্লাহরও সূরত-আকার রয়েছে, তবে তা আমাদের সূরত-আকারের মতো নয়।'

এ বিষয়ে আরও ভালোভাবে জানার জন্য দেখতে পারেন :

«دفع شُبَه التشبيه بأَكُفِّ التنزيه» لابن الجوزي، «السيف الصقيل في الرد على ابن زَفيل» للتقي السبكي مع التكملة المسماة بـ«تبديد الظلام المخيَّم من نونية ابن القيم» لزاهد الكوثري، «الحنابلة واختلافهم مع السلفية المعاصرة» لمصطفى الحنبلي، «نجم المهتدي ورجم المعتدي» لابن المُعَلِّم القُرَشي، «القول التمام بإثبات التفويض مذهبا للسلف الكرام» لسيف العصري، «معارف السنن» ليوسف البنوري ٤: ١٣٥-١٥٠، «الصفات الخبرية» لعَيَّاش الكُبيسي، «تنزيه الحق المعبود عن الحيِّز والحدود» لعبد العزيز الحاضري، «إتحاف الكائنات ببيان مذهب الخلف والسلف في المتشابهات» لمحمود السبكي، «الكاشف الصغير عن عقائد ابن تيمية» لسعيد فودة وكتبه الأخرى، «ابن تيمية ليس سَلَفيا» لمنصور محمد عَوَيْس، «التجسيم والمجسمة» لعبد الفتاح اليافعي، «رفع الغاشية عن المجاز والتأويل وحديث الجارية» لنضال آله رشي .

সালাফের আকীদা ও বর্তমান সালাফী আকীদা এক নয়

সালাফের আকীদা হচ্ছে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর আকীদা। আর আহলুস সুন্নাহ হচ্ছে 'আশআরিয়্যাহ', 'মাতুরীদিয়্যাহ' ও 'আছারিয়্যাহ'—এ তিন ধারা। যারা সালাফ তথা সাহাবা, তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনের আকীদারই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও সংরক্ষণের খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন।

আর বর্তমান 'সালাফী' হচ্ছে আলোচিত 'গুলাতুল হানাবিলার' তিন যুগ ও এর আগের বিচ্যুত কিছু ব্যক্তির আহলুস সুন্নাহর বিপরীত বিচ্ছিন্ন আকীদার সমষ্টিরূপ, যাতে সালাফের নামে এমন অনেক কিছু আকীদার মধ্যে অনুপ্রবেশ করানো হয়েছে, যেগুলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর ধারাবাহিকভাবে চলে আসা মুতাওয়ারাস

---

১৫৫. আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ১২৬; আল-উদ্দাহ ফী উসূলিল ফিকহ, আবু ইয়ালা, ৩/৭১৩

আকীদার অন্তর্ভুক্ত নয়। কাজেই ‘সালাফের আকীদা’ আর বর্তমান ‘সালাফী আকীদা’—দুটি এক নয়। এ পার্থক্য না জানার কারণে অনেক ভাই বর্তমান ‘সালাফী আকীদা’কে ‘সালাফের আকীদা’ মনে করে ধোঁকা খেয়ে বসেন! আল্লাহ তাআলা হেফাজত করুন।

বলাবাহুল্য, আকীদা ও আমল দুটি ভিন্ন বিষয়। আশআরী, মাতুরীদী, আছারী, সালাফী, মুতাযিলা, জাহমিয়া, কাররামিয়া, মুজাসসিমা, মুশাব্বিহা কিংবা এ যুগের কাদিয়ানী, শিয়া ও বেরেলভী ইত্যাদি শব্দগুলো আকীদার ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকার প্রতি লক্ষ করে বলা হয়।

আর হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী, হাম্বলী ও লা-মাযহাবী/আহলে হাদীস আমলের ভিন্নতাকে কেন্দ্র করে বলা হয়ে থাকে।

সুতরাং কেউ আমলের ক্ষেত্রে হানাফী হয়ে আকীদায় মুতাযালী হতে পারে, যেমন যামাখশারী ছিলেন। যেভাবে আমলে হানাফী হয়ে আকীদায় বেরেলভী হতে পারে, যেমন আমাদের সুন্নী নামের বিদআতী ভাইয়েরা। এভাবে আমলে শাফেয়ী হয়ে আকীদায় আছারী হতে পারে, যেমন ইমাম যাহাবী রাহ. ছিলেন। এটা বুঝে থাকলে সামনের কথা পরিষ্কার হবে।

‘শারহুল আকীদাতিত তাহাবিয়্যা’-এর লেখক ইবনে আবীল ইয হানাফী রাহ., আরবের প্রসিদ্ধ হাদীস-গবেষক শায়খ শুয়াইব আরনাউত রাহ. ও ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহ. প্রমুখ আমলের ক্ষেত্রে হানাফী কিংবা হানাফীদের প্রতি উদার হলেও আকীদার অনেক বিষয়ে ‘সালাফী’। সুতরাং ইবনে আবীল ইযের সাথে ‘হানাফী’ শব্দ দেখে প্রতারিত হবেন না এবং হানাফীদের প্রতি তাদের উদারতা দেখে আকীদার সকল বিষয়ে তাদের বক্তব্য-লেখা গ্রহণযোগ্য মনে করবেন না।

ইবনে আবীল ইয হানাফী ও তার ‘শারহুল আকীদাতিত তাহাবিয়্যা’-এর প্রকৃত অবস্থা ও মূল্যায়ন

আহলে ইলমের কাছে এ কথা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট যে, ইবনে আবীল ইযের উক্ত শরাহটি সহজবোধ্য ও আকীদার সাথে হাদীস-আসার উল্লেখ করা এবং কিছু বিষয়ে ভালো আলোচনা থাকার পাশাপাশি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর বিপরীত অনেক আকীদা ও কথা রয়েছে।

আমার জানা মতে, ছোটখাটো বিষয়গুলো বাদ দিলেও মৌলিকভাবে ১৫টির চেয়ে বেশি ভ্রান্ত আকীদা, অপব্যাখ্যা ও ভুল তথ্য রয়েছে। জর্ডানের শায়খ সাঈদ ফুদার الشرح الكبير ও মুফতী রেযাউল হক সাহেবের العصيدة السماوية দেখলে সহজে পেয়ে যাবেন।

আর উক্ত ব্যাখ্যাগ্রন্থে ভ্রান্তির মূল কারণ হচ্ছে, তিনি শায়খ ইবনে তাইমিয়া রাহ. ও ইবনুল কায়্যিমের কিতাবসমূহ থেকে তাদের নাম নেওয়া ছাড়া অসংখ্য কথা ও বক্তব্য ব্যাখ্যা হিসেবে এনেছেন। এটা নিছক দাবি নয়; বরং সালাফী আলেম ড. আবদুল আযীয বিন মুহাম্মাদ এ বিষয়ে স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেছেন, যার নাম হচ্ছে,

مصادر ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية

এতে তিনি এমন ১৮৭টি জায়গা চিহ্নিত করেছেন।

মোল্লা আলী কারী হানাফী রাহ. (মৃ. ১০১৪ হি.) বলেন,

والحاصل أن الشارح يقول بعلو المكان مع نفي التشبيه، وتبع فيه طائفة من أهل البدعة.

সারকথা : '(আকীদাতুত তাহাবীর) ব্যাখ্যাকার তাশবীহ বা সদৃশ নাকচ করার সাথে আল্লাহ তাআলা স্থানগতভাবে ওপরের দিকে রয়েছেন বলে বিশ্বাস করেন। আর এ ক্ষেত্রে তিনি একদল বিদআতীর অনুসরণ করেছেন।'

কিছুদূর এগিয়ে বলেন,

ومن الغريب أنه استدلّ على مذهبه الباطل برفع الأيدي في الدعاء إلى السماء، وهو مردود.

'আশ্চর্যের বিষয় হলো, সে তার ভ্রান্ত মতবাদ (তথা আল্লাহ স্থানগতভাবে ওপরে রয়েছেন) প্রমাণ করতে গিয়ে দুআর সময় হাত ওপরের দিকে উঠানোর দলীল দিয়েছে। অথচ তা অগ্রহণযোগ্য।'[১৫৬]

আরেক হানাফী ইমাম মুরতাযা যাবীদী রাহ. (মৃ. ১২০৫ হি.) ইবনে আবীল ইয সম্পর্কে লিখেছেন,

ولما تأملته حق التأمل: وجدته كلامًا مخالفًا لأصول مذهب إمامه! وهو في الحقيقة كالرد على أئمة السنة، كأنه تكلم بلسان المخالفين، وجازف وتجاوز عن الحدود، حتى شبه قول أهل السنة بقول النصارى! فليتنبه لذلك.

'আমি তার বক্তব্য নিয়ে ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছি যে, তার বক্তব্য তার ইমামের মাযহাবের উসূলের বিরোধী; বরং প্রকৃতপক্ষে তার বক্তব্য যেন আহলুস সুন্নাহর ইমামগণের খণ্ডনে লিখিত এবং সে প্রতিপক্ষ হিসেবে কথা বলেছে। সে বিকৃতির শিকার হয়েছে এবং সীমা অতিক্রম করেছে। এমনকি সে

---

১৫৬. শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃষ্ঠা ১৯৮, ১৯৯

উল্লেখ্য, মোল্লা আলী কারীর মতো আকীদাতুত তাহাবীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ রচয়িতাদের মধ্যে যারা আল্লাহ তাআলা 'স্থান' থেকে পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করেছেন, তাদের কয়েকজন হলেন : ইসমাঈল শাইবানী রাহ. (মৃ. ৬২৯ হি.), নাজমুদ্দীন মানকূবার্স নাসেরী রাহ. (মৃ. ৬৫২ হি.), হিবাতুল্লাহ তুর্কিস্তানী রাহ. (মৃ. ৭৩৩ হি.), মাহমুদ কাওনাবী রাহ. (মৃ. ৭৭১ হি.), সিরাজুদ্দীন উমর গজনবী রাহ. (মৃ. ৭৭৩ হি.), ইমাম আকমালুদ্দীন বাবারতী রাহ. (মৃ. ৭৮৬ হি.) ও আব্দুল গণী গুনাইমী মায়দানী রাহ. (মৃ. ১২৯৮ হি.) প্রমুখ।

আহলুস সুন্নাহর বক্তব্যকে খ্রিষ্টানদের বক্তব্যের সাথে তুলনা করেছে। সুতরাং এ বিষয়ে সতর্ক থাকা চাই।'[১৫৭]

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. 'ইমবাউল গুমর' কিতাবে উল্লেখ করেছেন,

...إلى أن انتهت القضية للسلطان، فكتب مرسوما طويلا، منه: بلغنا أن علي بن أيبك مدح النبي ﷺ بقصيدة، وأن علي بن العز اعترض عليه وأنكر أمورا، منها: التوسل بالنبي ﷺ، والقدح في عصمته، وغير ذلك، وأن العلماء بالديار المصرية خصوصا أهل مذهبه من الحنفية أنكروا ذلك.

সারাংশ : 'ইবনে আবীল ইয ওসীলা গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। মিশরের আলেমগণ, বিশেষভাবে হানাফী মাযহাবের উলামায়ে কেরাম তার বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন।'[১৫৮]

আশা করি ইবনে আবীল ইযের ব্যাখ্যাগ্রন্থটি সালাফীদের কাছে পছন্দনীয় হওয়া কিংবা তাদের মাদরাসায় সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং আমাদের কাছে তা অগ্রহণযোগ্য হওয়ার কারণ পরিষ্কার হয়েছে।

ইবনে তাইমিয়া রাহ. সম্পর্কে সঠিক অবস্থান

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রাহ. সম্পর্কে একটি বিষয় পরিষ্কার করি। তা হচ্ছে, তিনি অনেক বড় ইলমী ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং ইসলামের অনেক ক্ষেত্রে ও জটিল বিষয়ে তার খেদমত ও অবদান রয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এটাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, তিনি অনেক আকীদা ও ফিকহী মাসআলায় বড় ধরনের বিচ্যুতি ও ভুলের শিকার হয়েছেন।

তাই ইমাম ও ইতিহাসবিদগণ যেমন ইবনে তাইমিয়ার প্রশংসা করেছেন, তেমনই তার বিচ্যুতি ও ভুলের সমালোচনা করে উম্মাহকে সতর্ক করেছেন। উল্লিখিত কিতাবের লেখকগণ ছাড়াও আরও অনেকে বলেছেন। যেমন :

ইমাম যাহাবী রাহ. (মৃ. ৭৪৮ হি.) ইবনে তাইমিয়া রাহ. সম্পর্কে বলেন,

وأنا لا أعتقد فيه عصمة، بل أنا مخالف له في مسائل أصلية وفرعية.

'আমি তাকে (ইবনে তাইমিয়াকে) ত্রুটিমুক্ত মনে করি না; বরং অনেক আকীদা ও ফিকহী মাসআলায় আমি তার বিরোধিতা করি।'[১৫৯]

আল্লামা কাশ্মীরী রাহ. (মৃ. ১৩৫২ হি.) উভয়ের বিষয়ে নকল করেন,

---

১৫৭. ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন, ২/২৩২

১৫৮. ইমবাউল গুমর বি আবনায়িল উমর, ২/৯৫-৯৬

১৫৯. আদ-দুরারুল কামিনা, হাফেজ ইবনে হাজার, ১/১৭৬

واعلم أن الذهبي كتب كتابا إلى ابن تيمية: أنك تزعم أنك كتبت عقائد السلف في رسائلك، وهذا غلط، فإنه من آرائك.

'জেনে রাখো, যাহাবী রাহ. ইবনে তাইমিয়ার কাছে এক চিঠিতে লিখেছেন, "আপনার ধারণা হচ্ছে, আপনার কিতাবসমূহে যে আকীদাগুলো আপনি লিখছেন, তা সালাফের আকীদা। এটা ভুল (ধারণা)। কারণ, এগুলো আপনার নিজস্ব মত।"'[১৬০]

ইবনে তাইমিয়ার একটি মারাত্মক ও ঘৃণিত মত হচ্ছে, 'শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রওজা মুবারক জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েয নেই।' হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. (মৃ. ৮৫২ হি.) তার এই মত সম্পর্কে লেখেন,

وهي من أبشع المسائل المنقولة عن ابن تيمية.

'ইবনে তাইমিয়া থেকে বর্ণিত জঘন্য মাসআলাসমূহ থেকে এটি অন্যতম।'[১৬১]

ইবনে হাজার রাহ. তাঁর জীবনীতে উল্লেখ করেছেন,

فمنهم: من نسبه إلى التجسيم؛ لما ذكر في «العقيدة الحموية» و«الواسطية» وغيرهما من ذلك، كقوله: أن اليد والقدم والساق والوجه صفات حقيقية لله، وأنه مستوٍ على العرش بذاته. فقيل له: يلزم من ذلك التحيز والانقسام؟ فقال: أنا لا أسلم أن التحيز والانقسام من خواص الأجسام، فأُلزم بأنه يقول بتحيز في ذات الله. ومنهم: من ينسبه إلى الزندقة؛ لقوله: أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستغاث به، وأن في ذلك تنقيصا ومنعا من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم...

সারাংশ : ''আল-আকীদাতুল হামাবিয়্যাহ' ও 'আল-আকীদাতুল ওয়াসিতিয়্যাহ' গ্রন্থদ্বয়ে সিফাত বিষয়ে তার বক্তব্যের কারণে কেউ কেউ তাকে দেহবাদীদের দিকে সম্পৃক্ত করেছেন।...'[১৬২]

ফকীহ ইবনে হাজার হাইতামী রাহ. (মৃ. ৯৭৪ হি.) ইমাম আহমদ রাহ.-এর আকীদার বিশুদ্ধতা ও দেহবাদের আকীদা থেকে সম্পর্কহীনতার কথা উল্লেখ করার পর বলেন,

وإياك أن تصغي إلى ما في كتب ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية وغيرهما.

'তুমি ইবনে তাইমিয়া ও তার ছাত্র ইবনুল কায়্যিম এবং অন্যদের (আকীদা বিষয়ে) কিতাব শ্রবণ করা থেকে দূরে থাকো।'[১৬৩]

---

১৬০. ফয়যুল বারী, ৫/৬২৪

১৬১. ফাতহুল বারী, ৩/৬৬, ১৩/৪১০

১৬২. আদ-দুরারুল কামিনাহ, ১/১৮০-১৮১

১৬৩. আল-ফাতাওয়াল হাদীসিয়্যাহ, ইবনে হাজার হাইতামী, পৃষ্ঠা ২০৩। তিনি ১১৬ নং পৃষ্ঠায় লেখেন,

واعلم أنه خالف الناس في مسائل نبه عليها التاج السبكي وغيره، فمما خرق فيه الإجماع قوله:... وأن ربنا – سبحانه وتعالى عما

এভাবে শাহ আবদুল আযীয দেহলবী রাহ. (মৃ. ১২৩৯ হি.) 'ফাতাওয়া আযীযী'তে এবং আল্লামা আবদুল হাই লাখনাভী রাহ. (মৃ. ১৩০৪ হি.) 'গায়ছুল গামাম' (৩/৭৩-৭৫) কিতাবে সতর্ক করেছেন।

আল্লামা কাশ্মীরী রাহ. বলেন,

أما الحافظ ابن تيمية فلا ريب أنه بحر مواج لا ساحل له، ولكن شذ في الأصول والفروع جمهور الأمة المحمدية، والحق مع الجمهور.

'এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, হাফেজ ইবনে তাইমিয়ার ইলম কূলহীন সাগর ছিল। কিন্তু তিনি অনেক আকীদা ও ফিকহী মাসআলায় উম্মতে মুহাম্মাদীর অধিকাংশের সাথে মতানৈক্য করে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন। অথচ (এসব মাসআলায়) অধিকাংশের মত সঠিক।'[১৬৪]

হযরত মাওলানা ইউসুফ বানূরী রাহ. (মৃ. ১৩৯৬ হি.) 'মাআরিফুস সুনান'-এর একাধিক স্থানে ইবনে তাইমিয়ার ভুল-ভ্রান্তি নিয়ে আলোচনা করে সতর্ক করেছেন।

'রওজা মুবারক জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েয নেই'—তার এই মত সম্পর্কে বলেন,

وابن تيمية هو الذي بعثه من مرقده وأثاره من جديد، وبه فتح في الأمة باب من الفتنة جديد، ولذلك عد من شواذه كسائر الشواذ التي اختاره... فإذا ابن تيمية أول من خرق هذا الإجماع.

অন্য স্থানে সিফাত বিষয়ে তার বিভিন্ন ভ্রান্ত আকীদা উল্লেখ করে বলেন,

من الغريب المدهش والمؤسف: القول ما يتوسع به الحافظ ابن تيمية في كتبه من تجويز قيام الحوادث وحلولها فيه، ومن إثبات الجهة وتجويز الحركة، وقدم العرش، وتفسير الاستواء بالاستقرار في قوله: «ولو شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاستقلت به بقدرته فكيف بالعرش العظيم»...

সারাংশ : তিনি ইবনে তাইমিয়ার নিচের আকীদাগত মৌলিক বিচ্যুতিগুলো তুলে ধরেছেন,

১. আল্লাহর সত্তায় নশ্বর বিষয় সৃষ্টি হওয়ার আকীদা।

يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا – محل الحوادث، تعالى الله عن ذلك وتقدس، وأنه مركب تفتقر ذاته افتقار الجزء لكل، تعالى الله عن ذلك وتقدس، وأن القرآن محدث في ذات الله، تعالى الله عن ذلك وتقدس، وأن العالم قديم بالنوع ولم يزل مع الله مخلوقا دائما فجعله موجبا بالذات لا فاعلا بالاختيار، تعالى الله عن ذلك، وقوله بالجسمية والجهة والانتقال، وأنه بقدر العرش لا أصغر ولا أكبر، تعالى الله عن هذا الافتراء الشنيع القبيح والكفر البراح الصريح وخذل متبعيه وشت شمل معتقديه، وقال: إن النار تفنى، وأن الأنبياء غير معصومين، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا جاه له ولا يتوسل به، وأن إنشاء السفر إليه بسبب الزيارة معصية لا تقصر الصلاة فيه وسيحرم ذلك يوم الحاجة الماسة إلى شفاعته، وأن التوراة والإنجيل لم تبدل ألفاظهما وإنما بدلت معانيهما.

১৬৪. ফয়যুল বারী, ২/২১০, টীকায়

২. আল্লাহর জন্য দিক সাব্যস্ত করা।

৩. আল্লাহর জন্য হরকত তথা নড়াচড়া ও গতি সাব্যস্ত করা।

৪. আরশকে কাদীম বা অবিনশ্বর বলা।

৫. আরশে ইস্তিওয়ার অর্থ করেছেন, আরশে স্থির হওয়া। এমনকি তিনি বক্তব্য নকল করেছেন, আল্লাহ চাইলে মাছির পিঠেও স্থির হতে পারেন, তাহলে আরশে আযীমে কেন স্থির হতে পারবেন না?[১৬৫]

শুধু তা-ই নয়, সালাফী ভাইদের বরেণ্য ব্যক্তিত্ব শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী রাহ.-ও (মৃ. ১৪২০ হি.) حوادث لا أول لها তথা 'কতক সৃষ্টি সামগ্রিকভাবে অসীম থেকেই বিদ্যমান'-এর আকীদার মাসআলায় ইবনে তাইমিয়ার খণ্ডনে উম্মাহকে সতর্ক করে কলম ধরতে বাধ্য হয়েছেন।[১৬৬]

সুতরাং ইবনে তাইমিয়ার যে সকল মত সঠিক, তা অনুসরণ করা যাবে, উল্লেখ করা যাবে এবং প্রমাণস্বরূপ বলা যাবে; যেভাবে আমরা বিভিন্ন লেখাতে করে থাকি। কিন্তু যে সকল বিচ্ছিন্ন মত অধিকাংশ ইমামের মতের বিপরীত, তা কোনোভাবেই গ্রহণ ও অনুসরণ করা যাবে না।

অথচ সালাফী ও সহীহ আকীদার শায়খ ও বন্ধুরা এটা মানতে চান না। তাদের ভাষ্য অনেকটা এমন, অন্য কেউ যত বড়ই হোক না কেন, তার ভুল হতে পারে, কিন্তু ইবনে তাইমিয়ার হতে পারে না। বিষয়টির ভয়াবহতা উপলব্ধির জন্য শুধু শায়খ বিন বাযের হাফেজ ইবনে হাজারের 'ফাতহুল বারী'র ওপর টীকা দেখলেই হবে।

আল্লাহ তাআলা তার সকল বিচ্ছিন্ন মত থেকে উম্মাহর সবাইকে হেফাজত করুন এবং সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

সতর্কতা

এ-জাতীয় আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আমাদের পূর্ববর্তী ইমাম ও আকাবিরগণ যেমন মুসলমানদেরকে ভ্রান্ত ও ভুল আকীদা থেকে হেফাজত করার জন্য তাদের কিতাবসমূহে লিখেছেন, আমরাও একই কারণে তাঁদের কথাগুলো তুলে ধরছি।

তবে তাকে কাফের বলা কিংবা কুফরের শিকার হয়েছেন মনে করা তো দূরের কথা, তাকে অসম্মানই করা যাবে না। কেননা, ইসলামে তার অনেক অবদান রয়েছে এবং হতে পারে তার এ-জাতীয় বক্তব্যের সঠিক কোনো ব্যাখ্যা রয়েছে, যা আমাদের সামনে আসেনি। অথবা হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ.-এর দাবি অনুযায়ী

---

১৬৫. দেখুন, মাআরিফুস সুনান, ৩/৩৩০, ৪/১৪০, ১৪৬-৪৮
১৬৬. দেখুন, সিলসিলাতুল আহাদীসিস সহীহা, ১/২৫৮

তিনি মৃত্যুর আগে এগুলো থেকে ফিরে এসেছেন।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. (মৃ. ৮৫২ হি.) লেখেন,

وَوَقع الْبَحْث مَعَ بعض الْفُقَهَاء فكتب عَلَيْهِ محْضر بِأَنَّهُ قَالَ: أَنا أشعري، ثمَّ وجد خطه بِمَا نَصه الَّذِي اعْتقد أَن الْقُرْآن معنى قَائِم بِذَات الله، وَهُوَ صفة من صِفَات ذَاته الْقَدِيمَة، وَهُوَ غير مَخْلُوق، وَلَيْسَ بِحرف وَلَا صَوت، وَأَن قَوْله: {الرَّحْمَن على الْعَرْش اسْتَوَى} لَيْسَ على ظَاهره، وَلَا أعلم كنه المُرَاد بِهِ، بل لَا يعلمه إِلَّا الله، وَالْقَوْل فِي النُّزُول كالقول فِي الاسْتوَاء، وَكتبه أَحْمد بن تَيْمِية ثمَّ شهدوا عَلَيْهِ أَنه تَابَ مِمَّا يُنَافِي ذَلِك مُخْتَارًا.

সারাংশ : 'ইবনে তাইমিয়া রাহ.-এর সাথে একবার কতক ফুকাহার বাহাস অনুষ্ঠিত হয়। তিনি (ইবনে তাইমিয়া) বলেন, আমি আশআরী। এবং তার স্বহস্তে লিখিত কাগজে পাওয়া যায়, তিনি বিশ্বাস করতেন 'কুরআন' আল্লাহর সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত একটি অনাদি সিফাত, যা সৃষ্ট নয় এবং আল্লাহর কালাম শব্দ ও স্বরবিশিষ্ট নয়।

আর الرَّحْمَن على الْعَرْش اسْتَوَى তথা "রহমান আরশে ইস্তিওয়া করেছেন" আয়াতটি বাহ্যিক অর্থে প্রযোজ্য নয়। তবে আমি জানি না এর প্রকৃত উদ্দেশ্য কী। আল্লাহ তাআলা ছাড়া এটা কেউ জানে না। ইস্তিওয়া বিষয়ে যা বলেছি নুযূল (শেষ রাতে অবতরণ) সম্পর্কেও একই কথা।

এ কথাগুলো লিখেছেন আহমদ ইবনে তাইমিয়া। অতঃপর উপস্থিত লোকেরা তার ব্যাপারে সাক্ষ্য দেন যে, তিনি নিজ ইচ্ছায় পূর্বের অসংগতিপূর্ণ বক্তব্য থেকে তাওবা করেন।'[১৬৭]

আর সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো, ইবনে তাইমিয়ার সিফাত বিষয়ে বক্তব্যগুলো পরস্পরবিরোধী। যেমন : আল্লামা ইউসুফ বানূরী রাহ. বলেন,

كلام ابن القيم في تآليفه كـ"اجتماع الجيوش الإسلامية" و"الصواعق المرسلة" و"القصيدة النونية"، وكلام شيخه ابن تيمية في عدة كتبه مضطرب جدا في هذا الصدد أي: في الصفات.

'সিফাত বিষয়ে ইবনুল কায়্যিম ও তার শায়খ ইবনে তাইমিয়ার বিভিন্ন কিতাবের বক্তব্য স্ববিরোধিতায় ভরপুর।'[১৬৮]

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কারও প্রতি বিদ্বেষ পোষণ থেকে হেফাজত করুন।

---

১৬৭. আদ-দুরারুল কামিনাহ, ১/১৭২

১৬৮. দেখুন, মাআরিফুস সুনান, বানূরী, ৪/১৪০, ১৪৬-৪৮। মুফতী রেযাউল হক সাহেবের 'আল-আছীদাতুস সামাবিয়্যাহ' কিতাব থেকে ইবনে তাইমিয়ার পরস্পরবিরোধী কিছু বক্তব্য দেখে নিতে পারেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় : ইলাহিয়্যাত
আল্লাহ তাআলা-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা

এ অধ্যায়ের আলোচনা পাঁচ ভাগ ও এক পরিশিষ্টে বিভক্ত :

১. 'ওয়াজিবুল ওজূদ' তথা আল্লাহ তাআলার অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা।

২. তাওহীদ-পরিচিতি ও এর চারটি প্রকার :

ক. 'তাওহীদুয যাত' তথা আল্লাহ তাআলাকে সত্তাগতভাবে একক-অদ্বিতীয় বিশ্বাস করা।

খ. 'তাওহীদুস সিফাত' তথা আল্লাহ তাআলার গুণাবলির একত্ববাদের ওপর ঈমান আনা।

গ. 'তাওহীদুল আফআল' তথা আল্লাহ তাআলার কার্যাদির একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়া।

ঘ. 'তাওহীদুল উলূহিয়া/ইলাহিয়া' বা ইবাদত-উপাসনার একত্ব তথা সকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য করা।

৩. সালাফীদের তাওহীদের তিন ভাগ : 'তাওহীদুর রুবূবিয়া', 'তাওহীদুল উলূহিয়া' ও 'তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত' পরিচিতি ও পর্যালোচনা।

৪. 'তাওহীদুল হাকিমিয়া' পরিচিতি, বিকৃতি ও বিভ্রান্তি

৫. শিরক পরিচিতি ও তার প্রকারসমূহ

পরিশিষ্ট : ওহদাতুল ওজূদ, তাবীয, ইস্তিগাছাহ, ওসীলা ও বরকতগ্রহণ শিরক হবে কি না

যে সকল বিষয়ের ওপর ঈমান আনতে হয়, তন্মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান হলো, আল্লাহ্ তাআলা সম্পর্কে আকীদা। এ বিষয়ের আলোচনা পাঁচ ভাগ ও এক পরিশিষ্টে বিভক্ত। এগুলোর প্রথম বিষয় হচ্ছে 'ওয়াজিবুল ওজূদ' বা 'ওজূদে বারী'-সংক্রান্ত আলোচনা।

'ওয়াজিবুল ওজূদ' নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা

'ওয়াজিবুল ওজূদ'-এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তাআলার অবশ্যম্ভাবী অস্তিত্ব বিশ্বাস করা। এ ছাড়া নাস্তিকতা ও স্রষ্টায় অবিশ্বাস থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না।

'আল্লাহ' এমন এক সত্তার নাম, যার অস্তিত্ব অনিবার্য ও অপরিহার্য। তাঁর অস্তিত্বের অনুপস্থিতি এক মুহূর্তের জন্যও অসম্ভব। তাঁর অস্তিত্বের অবিদ্যমানতা কখনোই ছিল না, হতে পারবে না। তিনি অনাদি-অনন্ত। তাঁর শুরু নেই, শেষও নেই।

তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। তিনি সর্বদা ছিলেন, আছেন, থাকবেন। যখন কিছুই ছিল না তখনো ছিলেন, যখন কোনো কিছুই থাকবে না তখনো থাকবেন। আরবীতে যাকে সংক্ষেপে বলা হয় 'ওয়াজিবুল ওজূদ'।

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অস্তিত্বের অপরিহার্যতা এবং তা অস্বীকারের অসারতা বিভিন্নভাবে যুক্তিযুক্ত করে কুরআনে কারীমে তুলে ধরেছেন। এক স্থানে মানুষের প্রতি যৌক্তিক প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে ইরশাদ করেন,

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ

'তারা কি কারও (স্রষ্টা) ছাড়া নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়ে গেছে, নাকি তারা নিজেরাই (নিজেদের) স্রষ্টা?'[১৬৯]

ইমাম ইবনে কাসীর রাহ. (মৃ. ৭৭৪ হি.) এর ব্যাখ্যায় বলেন,

أي أُوجِدوا من غير موجد؟ أم هم أَوجَدوا أنفسَهم؟ أي: لا هذا ولا هذا، بل الله هو الذي خلقهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا.

'তারা কি কোনো স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়ে গেছে, নাকি তারা নিজেরাই নিজেদেরকে সৃষ্টি করেছে? অথচ কোনোটাই নয়; বরং আল্লাহ তাআলাই তাদেরকে অস্তিত্বহীন থেকে সৃষ্টি করেছেন।'[১৭০]

উক্ত আয়াত ও এর ব্যাখ্যা থেকে তিনটি অবস্থা সামনে আসে :

প্রথমত, তারা মূলত কোনো স্রষ্টা ব্যতীত প্রকৃতিগতভাবে বা নিজে নিজেই সৃষ্টি

---

১৬৯. সূরা তূর, (৫২) : ৩৫
১৭০. দ্র. তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৭/৪০৬

হয়েছে। যেমনটা দাবি করে প্রকৃতিবাদী বা নাস্তিক অথবা 'বিগব্যাং' (big bang) থিওরির অমুসলিম প্রবক্তারা।

অথচ এটা অসম্ভব একটা বিষয়। কেননা, সৃষ্টির সঙ্গে স্রষ্টার সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টির কল্পনা অসম্ভব। এ কারণেই এই বিষয়টা সুস্পষ্ট যৌক্তিক ও সর্বসম্মত বিষয় যে, স্রষ্টা ছাড়া কোনো কিছু সৃষ্টি হতে পারে না, অস্তিত্বদানকারী ব্যতীত কোনো কিছু অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না, সংঘটক-সম্পাদক বিনা কোনো ঘটনা সংঘটিত হয় না।

তাই আল্লাহ তাআলা যৌক্তিকভাবে প্রশ্ন রেখে বলেছেন, 'তারা কি কোনো স্রষ্টা ব্যতীত নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়ে গেছে?'

এর উত্তর হলো, 'না'। এটা বিলকুল যৌক্তিক উত্তর, যা অস্বীকারের উপায় নেই। কেননা, স্রষ্টাকে অস্বীকার করার অর্থই হলো নিজের সৃষ্টি ও অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। সুতরাং সৃষ্টি, অস্তিত্ব ও ঘটনার জন্য স্রষ্টা, অস্তিত্বদানকারী ও সংঘটক অপরিহার্য।

আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে নাস্তিকদের সঙ্গে ইমাম আযম আবু হানীফা রাহ.-এর মুনাযারার কথা তো প্রসিদ্ধ। তা হলো, আল্লাহর অস্তিত্ব নিয়ে নাস্তিকরা ইমাম আবু হানীফার সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হতে চাইলে তিনি বলেন, আলোচনা শুরু করার পূর্বে বলো তো, একটি জাহাজ কোনো নাবিক ব্যতীত নিজে নিজে মালামাল বোঝাই করে অন্যত্র পৌঁছিয়ে দিয়ে ফিরে আসতে পারবে কি না?

তারা বলল, এটা তো অসম্ভব একটা বিষয়; এমনটা আদৌ সম্ভব নয়।

ইমাম আযম রাহ. বললেন, সাধারণ ক্ষুদ্র একটি জাহাজের ক্ষেত্রে যদি এটা অসম্ভব হয়, তাহলে এই বিশাল পৃথিবী একজন সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালক ব্যতীত কীভাবে সম্ভব হতে পারে?[১৭১]

দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে, পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু নিজেকে সৃষ্টি করা।

অর্থাৎ একজন ব্যক্তি কোনো স্রষ্টা ব্যতীত নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করা। আর এটা তো আরও অসম্ভব একটা বিষয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোনো মানুষ সৃষ্টি হওয়ার পূর্বে নিশ্চয়ই অস্তিত্বহীন ছিল। আল্লাহ তাআলার ইরশাদ,

هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا

---

১৭১. দ্র. আল-উসূলুল মুনীফা, বায়াযী, পৃষ্ঠা ৬২; শারহুত তাহাবী, ইবনে আবীল ইয, ১/৩৫; শারহুল ফিকহিল আকবার, মোল্লা আলী কারী ও মানাকিবে আবী হানীফা, মাক্কী প্রভৃতি

'মানুষের ওপর এমন কিছু সময় এসেছে, যখন সে উল্লেখযোগ্য কোনো বস্তু ছিল না।'[১৭২]

সুতরাং যার নিজের অস্তিত্ব নেই, সে আরেক অস্তিত্বহীন বস্তু কী করে সৃষ্টি করতে পারে?

তৃতীয় অবস্থা হলো, পৃথিবীর সবকিছুর কোনো সৃষ্টিকর্তা থাকবে।

যখন উল্লিখিত দুটি অবস্থা তথা কোনো সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত সৃষ্টি হওয়া কিংবা নিজেরাই নিজেদেরকে সৃষ্টি করা অসম্ভব প্রমাণিত হলো, তখন আবশ্যকীয়ভাবে তৃতীয় অবস্থা তথা সবকিছুর কোনো স্রষ্টা রয়েছেন বলে নিশ্চিত প্রমাণিত হলো।

সুতরাং পৃথিবীর যখন স্রষ্টা রয়েছে এবং পৃথিবীর সবকিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন, তখন তাঁর ওপর ঈমান আনা অত্যাবশ্যক। আর তিনি আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কেউ নন। তাই রাসূলগণ বলেছিলেন,

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

'আল্লাহ সম্বন্ধে কি কোনো সন্দেহ আছে, যিনি আসমানসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা?'

এর উত্তর হলো, 'এতে কোনো সন্দেহ নেই।' কেননা, তিনি সৃষ্টিকর্তা হওয়ার ওপর প্রমাণ বহন করছে, যা সাথে সাথেই উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে। আর তা হলো, তিনি আসমান ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা।

বস্তুত সৃষ্টিজগতের নিদর্শনাবলি সম্পর্কে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা যৌক্তিক চিন্তা-ভাবনাই হলো আল্লাহর পরিচয় লাভের একটি মৌলিক ও প্রাকৃতিক উপায়। কারণ, এই বিশ্বজগৎ আল্লাহর সৃষ্টিকর্ম, আর যেকোনো কর্মই কর্তার কর্মসংশ্লিষ্ট গুণাবলির সাক্ষী। যেকোনো নিমার্ণ নির্মাতার অস্তিত্ব জানান দেয় এবং যেকোনো শিল্পকর্ম শিল্পীর প্রমাণ বহন করে। এর জন্য কর্তাকে সরাসরি দেখার প্রয়োজন নেই; বরং শুধু কর্ম দেখেই কর্তার পরিচয় লাভ করা সম্ভব।

সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর অস্তিত্বের স্বীকৃতির বিষয়টা মানুষের ফিতরাত এবং প্রকৃতির মাঝেই প্রোথিত করে দেওয়া হয়েছে। কোনো মানুষ সত্যানুসন্ধিৎসা নিয়ে এই পৃথিবী এবং তাঁর নিখুঁত পরিচালনা নিয়ে ভাবলে সে এসবের একজন পরিচালকের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য। কাজেই এই রহস্যপূর্ণ ও বৈচিত্র্যময় সৃষ্টিজগৎকে দেখে আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে, এর একজন সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালনাকারী রয়েছেন।

সারকথা, স্রষ্টা ও আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বে ঈমান আনা ও স্বীকৃতি প্রদান করা একটা আবশ্যকীয় বিষয়; যা ছাড়া একজন মানুষ সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন হওয়ার কল্পনাই

---

১৭২. সূরা দাহর, (৭৬) : ১

করা যায় না। বিবেকবান কোনো মানুষ এটা অস্বীকারই করতে পারে না।

এক কাফেরের নিরুত্তর হওয়ার করুণ কাহিনি

অনেক সময় কিছু লোক সামান্য ক্ষমতা ও সুযোগ পেয়ে আল্লাহ্ তাআলার ক্ষমতাকে অস্বীকার করে নিজেকে উক্ত ক্ষমতার অধিকারী মনে করে বসে। কুরআনে কারীমে এমন একটা সুন্দর ও শিক্ষণীয় ঘটনা এসেছে, যা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর যুগের শাসক নমরুদের সাথে ঘটেছে।

ইরশাদ হয়েছে,

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِىْ حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِىْ رَبِّهٖٓ اَنْ اٰتٰىهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ ۘ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّىَ الَّذِىْ يُحْىٖ وَيُمِيْتُ قَالَ اَنَا اُحْىٖ وَاُمِيْتُ قَالَ اِبْرٰهٖمُ فَاِنَّ اللّٰهَ يَاْتِىْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِىْ كَفَرَ

'তুমি কি ওই ব্যক্তিকে দেখোনি, যে ইবরাহীমের সঙ্গে তার প্রতিপালক সম্বন্ধে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল, যেহেতু আল্লাহ্ তাকে কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন? যখন ইবরাহীম বলল, "তিনি আমার প্রতিপালক, যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান।" সে বলল, "আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই।" ইবরাহীম বলল, "আল্লাহ্ সূর্যকে পূর্ব দিক হতে উদিত করান, তুমি একে পশ্চিম দিক হতে উদিত করাও তো।" এরপর যে কুফরী করেছিল সে নিরুত্তর হয়ে গেল।'[১৭৩]

ব্যাখ্যা :

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও নমরুদের পারস্পরিক বিতর্কের যে ঘটনা ঘটেছিল, এখানে তা উল্লেখ করা হয়েছে। নমরুদকে ইবরাহীম আলাইহিস সালাম বললেন, 'আমার রব জীবন ও মৃত্যুর মালিক।' উত্তরে নমরুদ দুজন হাজতীকে ডেকে এনে একজনকে হত্যা এবং অপরজনকে মুক্তি দিয়ে বলল, 'দেখো, আমিও তা করতে পারি।'

ইবরাহীম আলাইহিস সালাম নমরুদের এমন স্থূলতা ও নির্বোধতা দেখে তাকে নিরুত্তর ও লা-জবাব করার জন্য একটি যুক্তি দিয়ে বললেন, 'আমার রব পূর্ব দিকে সূর্য উদিত করেন, তুমি পশ্চিম দিকে সূর্যকে উদিত করে দেখাও তো।'

তখন নমরুদ নিরুত্তর ও লা-জবাব হয়ে গেল।

আস্তিক ও নাস্তিকের কথোপকথন

নাস্তিক : প্রথম বস্তু কী?

আস্তিক : আল্লাহ্।

---

১৭৩. সূরা বাকারা, (২) : ২৫৮

নাস্তিক : তাঁকে কে সৃষ্টি করেছেন?

আস্তিক : তাঁর কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই।

নাস্তিক : সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত কোনো বস্তুর অস্তিত্ব কী করে সম্ভব?

আস্তিক : আচ্ছা, তোমরা (প্রকৃতিবাদীরা) বলো দেখি, তোমাদের দৃষ্টিতে 'প্রথম বস্তু' কী? আর তোমরা যাকেই 'প্রথম বস্তু' হিসেবে আখ্যায়িত করবে, আমরা বলব, সেটার সৃষ্টিকর্তা কে?

হয়তো তোমরা কোনো একটা কিছুকে 'প্রথম বস্তু' বলবে। তখন প্রশ্ন আসবে, সেই 'কিছু'টার সৃষ্টিকর্তা কে? উত্তরে আরেকটা কিছুকে 'প্রথম বস্তু' বলা হবে। তখন আবার প্রশ্ন আসবে, সেটার স্রষ্টা কে? এভাবে প্রশ্নোত্তর চলতে থাকবে, যার কোনো শেষও নেই, সমাধানও নেই। কাজেই তোমাদের এ ধরনের বক্তব্য কোনোভাবেই সঠিক হতে পারে না।

কেননা, একজন পুলিশের গুলি করার জন্য তার উচ্চপদস্থ কারও অনুমতির প্রয়োজন এবং সে ব্যক্তিরও অন্য কারও অনুমতির প্রয়োজন। সুতরাং প্রত্যেকেরই যদি তার উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার অনুমতির প্রয়োজন হয়, তাহলে এমন কেউ থাকবে না, যার জন্য কারও অনুমতির প্রয়োজন নেই। ফলে কোনো পুলিশেরই গুলি করার সুযোগ থাকবে না। কাজেই এটা বাতিল। সুতরাং এমন একজন ব্যক্তির দরকার, যার কারও থেকে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। অনুরূপ, আমাদের অস্তিত্বের ক্ষেত্রেও এমন এক সত্তার প্রয়োজন, যিনি অবিনশ্বর ও চিরন্তন; যিনি আমাদের মতো নশ্বর ও সৃষ্ট নন। কারণ, সবাই যদি নশ্বর হয়, তাহলে সৃষ্টির অস্তিত্বই সম্ভব নয়।

আবার মহাবিশ্বও চিরন্তন হতে পারে না। কারণ, এর প্রতিটি বস্তু পরিবর্তনশীল। প্রতিটি বস্তুই তার আগের অবস্থা ও প্রকৃতি পরিবর্তন করছে। আর বস্তুর পরিবর্তন মানেই তা চিরন্তন নয়। কেননা, এখন যেমন আছে, একটু পর তেমন থাকবে না; আবার এখন নেই, তো একটু পর উদ্ভব হবে। বোঝা গেল, বস্তুটি অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আসছে। তার মধ্যে অনস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে। অতএব মহাবিশ্ব চিরন্তন হতে পারে না।

অথবা তোমরা বলবে, প্রথম বস্তু 'বিগব্যাং' তথা মহাবিস্ফোরণের আগের একটি বিন্দু বা সিঙ্গুলারিটি (Singularity)।[১৭৪]

---

১৭৪. বিজ্ঞানীদের ধারণা, প্রায় ১৩৮০ কোটি বছর আগে আমাদের এই মহাবিশ্ব একটি অসীম অথবা ক্ষুদ্রাকার ভরসম্পন্ন অতি উত্তপ্ত একটি বিন্দুতে পুঞ্জীভূত ছিল। পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় এই অবস্থাকে বলা হয় সিঙ্গুলারিটি (Singularity)। এরপর এটি মহাবিস্ফোরণের ফলে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে। এই সময় থেকে বর্তমান মহাবিশ্বের বয়স ধরা হয়। সুতরাং তাদের দাবি মতে, এই বিস্তৃত মহাবিশ্বের জন্য একটি বিন্দু থেকে। যার মহাবিস্ফোরণ ঘটে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে, এর নাম দিয়েছে তারা 'বিগব্যাং'। ১৯২৭ সালে বেলজিয়ামের পদার্থবিজ্ঞানী জর্জ লেমাইটর

এমন হলে তো আমরা যেমন 'প্রথম বস্তু' আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত অস্তিত্বশীল বস্তু হিসেবে মানি, একইভাবে তোমরাও 'প্রথম বস্তু' একটি বিন্দুকে স্রষ্টা ব্যতীত অস্তিত্বশীল বস্তু হিসেবে মানছ। সুতরাং বোঝা গেল, সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত অস্তিত্বশীল 'প্রথম বস্তু' হিসেবে আমরা উভয় পক্ষ একই অবস্থানে। পার্থক্য কেবল এটুকু যে, তোমরা 'প্রথম বস্তু' মনে করো একটি জড়পদার্থকে। আর আমরা বিশ্বাস করি আল্লাহকে।

নাস্তিক : তাহলে আমাদেরটা বাদ দিয়ে তোমাদের আল্লাহকে বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠত্ব ও যথার্থতা কী?

আস্তিক : তোমরা এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা এমন এক বস্তুকে বিশ্বাস করো, যা প্রাণহীন এবং অক্ষম তো বটেই। আর আমরা বিশ্বাস করি, বিশ্বজগতের স্রষ্টা এমন একজন সত্তা; যিনি সর্বশক্তিমান, সবকিছুতে সক্ষম, সর্ববিষয়ে জ্ঞাত।

সুতরাং প্রাণহীন ও অক্ষম কিছু বিশ্বজগতের স্রষ্টা হতে পারে না; বরং যিনি জ্ঞানী এবং সক্ষম হবেন, তিনিই স্রষ্টা হবেন।

নাস্তিক : আচ্ছা, শুরু-সূচনা ব্যতীত কোনো জিনিসের অস্তিত্ব কীভাবে হতে পারে, যেমনটা তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে বলো?

আস্তিক : প্রথমত, এই আপত্তি স্বাভাবিকভাবে তোমাদের প্রতিও হবে। কারণ, তোমরা যে জড়পদার্থকে 'প্রথম বস্তু' মনে করো, তার অস্তিত্ব সূচনা ব্যতীত কীভাবে হলো?

দ্বিতীয়ত, স্রষ্টা হলেন অনাদি, উৎপত্তিহীন, স্বয়ম্ভূ। কাজেই সকল জিনিসের অস্তিত্ব সূচনা ব্যতীত অসম্ভব হলেও স্রষ্টার জন্য সূচনা বলতে কিছুই নেই। কেননা, স্রষ্টার কোনো শুরু নেই, কোনো সূচনা নেই। সূচনা নেই বিধায় তিনি স্রষ্টা। যার সূচনা থাকে, তা কখনো স্রষ্টা হতে পারে না।

নাস্তিক : আল্লাহর অস্তিত্ব কোথা থেকে?

আস্তিক : আল্লাহর অস্তিত্ব এমন কোনো অস্বাভাবিক বিষয় নয়, যার ব্যাপারে প্রশ্ন করা যেতে পারে। কেননা, তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান ও অস্তিত্বশীল। অর্থাৎ, তাঁর অস্তিত্বশীলতা নিজ সত্তার সঙ্গে নিহিত। এমন নয় যে, তিনি একটি বস্তু, আর অস্তিত্বশীলতা তাঁর একটি গুণ; বরং তিনি মুখাপেক্ষীহীন।

নাস্তিক : এ রকম কোনো উদাহরণ আছে?

আস্তিক : কেন নয়? অনেক রয়েছে।

প্রথম 'বিগব্যাং তত্ত্ব' প্রকাশ করেন।

নাস্তিক : বলুন তাহলে!

আস্তিক : আলো, উষ্ণতা...

নাস্তিক : তা কীভাবে?

আস্তিক : আমাদের চারপাশ আলোকিত হয় যে আলোর মাধ্যমে, সেই আলো হলো স্বয়ংক্রিয়। অর্থাৎ আলোকে কোনো কিছু আলোকিত করতে পারে না। তদ্রূপ প্রত্যেক বস্তুর উষ্ণতা হয় আগুনের সাহায্যে; কিন্তু আগুনের উষ্ণতা স্বয়ংসম্পূর্ণ। অর্থাৎ আগুন অন্য কোথাও থেকে উষ্ণতা সরবরাহ করে না।

সারাংশ হলো :

১. একজন আস্তিক এবং নাস্তিক দুজনই 'প্রথম বস্তু' স্বীকার করে।

২. কিন্তু নাস্তিক যে বস্তুটিকে 'প্রথম বস্তু' মনে করে, সেটা 'প্রথম বস্তু' হওয়ার যোগ্যতা রাখে না; বরং মুমিন ব্যক্তির বিশ্বাসকৃত বস্তুটিই 'প্রথম বস্তু' হওয়ার প্রাধান্যতা ও বিশিষ্টতা রাখে।

৩. এটাও প্রমাণিত হলো যে, তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে অস্তিত্বশীল। কিন্তু বস্তুর অস্তিত্ব অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় বিষয় তথা তাওহীদ-পরিচিতি ও এর চারটি প্রকার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা

এখানে তাওহীদ-পরিচিতি ও এর চারটি প্রকার নিয়ে আলোচনা করা হবে।

ঈমান ও তাওহীদের মধ্যে পার্থক্য

তাওহীদ পরিচিতির আগে ঈমান ও তাওহীদের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরছি, যাতে বিষয়টি ভালোভাবে বুঝে আসে। 'ঈমান' শব্দটি তাওহীদের চেয়ে ব্যাপক অর্থ বহন করে। কেননা, ঈমানের মধ্যে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের পাশাপাশি নবী-রাসূল, ফেরেশতা, আসমানী গ্রন্থ, আখিরাত-তাকদীরসহ ইসলামের সকল অকাট্য বিধানাবলির প্রতি বিশ্বাসও অন্তর্ভুক্ত। অপরদিকে 'তাওহীদ' বলতে কেবল আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর প্রতি যথাযথ বিশ্বাসকেই বোঝায়, বাকিগুলো বোঝায় না। ফলে তাওহীদ হলো ঈমানের স্তম্ভগুলোর একটি অংশ, তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এখানে ঈমানের এই গুরুত্বপূর্ণ অংশ আলোচনা করা হচ্ছে।

সুতরাং ঈমানের স্তম্ভগুলোর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হলো আল্লাহর প্রতি ঈমান, যা এখানে 'তাওহীদ' শিরোনামে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

তাওহীদ পরিচিতি ও গুরুত্ব

আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে আকীদার মূল কথা হচ্ছে তাওহীদ। এই তাওহীদ ইসলামের

প্রথম ও প্রধান মূলনীতি। যার ওপর দাঁড়িয়ে আছে ইসলামের বুনিয়াদ ও ভিত্তি।

তাওহীদ কী?

আরবীতে 'তাওহীদ' শব্দটি 'ওয়াহদাতুন' ক্রিয়ামূল থেকে গৃহীত। যার অর্থ একক হওয়া, অতুলনীয় হওয়া। আর তাওহীদ অর্থ হলো, কাউকে একক হিসেবে ঘোষণা দেওয়া, একত্বের ঘোষণা দেওয়া, একত্ববাদে বিশ্বাস করা।

পরিভাষায় তাওহীদের ব্যাখ্যা হলো, সকল ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর একত্ব মেনে নেওয়া এবং একত্বে বিশ্বাস করা। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলাকে তাঁর সত্তা, গুণাবলি ও কার্যাদিতে একক-অদ্বিতীয় বিশ্বাস করা এবং তিনিই একমাত্র ইলাহ ও ইবাদতের উপযুক্ত বিশ্বাস করে তাঁরই ইবাদত-উপাসনা করা। এগুলোর কোনোটাতেই কাউকে বা কোনো কিছুকেই শরীক না কবা।

সুতরাং তাওহীদ পরিচিতি ও এর ব্যাখ্যা থেকে নিম্নোক্ত চার প্রকার বের হয় :

ক. 'তাওহীদুয যাত' তথা আল্লাহ্ তাআলাকে সত্তাগতভাবে একক-অদ্বিতীয় বিশ্বাস করা।

খ. 'তাওহীদুস সিফাত' তথা আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলির একত্বের ওপর ঈমান আনা।

গ. 'তাওহীদুল আফআল' তথা আল্লাহ্ তাআলার কার্যাদির একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়া।

ঘ. 'তাওহীদুল উলূহিয়া/ইবাদাহ' তথা ইবাদত-উপাসনার একত্ব। অর্থাৎ সকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার জন্য করা।[১৭৫]

---

١٧٥. بعض نصوص الأئمة في هذا التقسيم: قال الإمام الطحاوي ٦ (ت: ٣٢١هـ): إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. فإن قوله: (إن الله واحد لا شريك له) توحيد إجمالي من الأقسام الأربعة ونفي الشرك، والأظهر فيها توحيد الذات. وقوله: (ولا شيء مثله) توحيد الصفات، وقوله: (ولا شيء يعجزه) أي: عن فعله وإرادته، فهو الفاعل وَحدَه، وهو توحيد الأفعال، وقوله: (ولا إله غيره) هو توحيد الألوهية والعبادة.

وقال الرازي ٦ (ت: ٦٠٦هـ) في "المطالب العالية" ٢٥٧/٣: اعلم أنه تعالى واحد في ذاته، وواحد في صفاته، وواحد في أفعاله، أما أنه واحد في ذاته: فلأن ذاته منزهة عن جهات التركيبات... المقدارية الحسية كما في الجسم، والعقلية كما في النوع المركب من الجنس والفصل، وأما أنه واحد في صفاته فهو أنه ليس في الوجود موجود آخر يساويه في الوجود بالذات، والعلم بكل المعلومات، والقدرة على كل الممكنات، والغنى عن كل ما سواه. وأما أنه واحد في أفعاله فهو أنه ليس في الوجود موجود يكون مبدئاً لجميع الممكنات إما بواسطة أو بغير واسطة إلا هو. اهـ.

ويقول أبو عبد الله البكّي ٦ (ت: ٩١٦هـ) في «تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب» ص ٧٠: والتوحيد على أربعة أقسام: توحيد الألوهية، وتوحيد الأفعال، وتوحيد الصفات، وتوحيد الذات.

فتوحيد الألوهية: مرجعه أنّ الله هو الإله وَحْدَه، أي: هو المنفرد بوصف الألوهية التي من أجلها يُعبَد وَحدَه، الذي هو الوجود الذاتي الذي إليه يرجع كل ممكن لاحتياجه إليه.

তাওহীদুয যাত সম্পর্কে আলোচনা

তাওহীদের প্রথম প্রকার হলো 'তাওহীদুয যাত'। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাআলাকে সত্তাগতভাবে এক ও অদ্বিতীয় বিশ্বাস করা।

'আল্লাহু আহাদ' (اللهُ أَحَدٌ) তথা আল্লাহ্ তাআলা পরম একক সত্তা। তিনি একক-অনন্য। তাঁর কোনো সদৃশ নেই, শরীক নেই, সহযোগী নেই; তাঁর কোনো বিরোধী বা প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, বিকল্প ও স্থলাভিষিক্ত নেই। তিনি অসমকক্ষ, অতুলনীয়, অসাদৃশ্য। তাঁর মতো কিছুই নেই।

তিনি সংখ্যাগত বিবেচনায় এক নন

আল্লাহ্ তাআলা এক হওয়ার অর্থ সংখ্যাগত বিবেচনায় নয়। ইমাম আবু হানীফা রাহ. (মৃ. ১৫০ হি.) বলেন,

والله تعالى واحدٌ لا من طَرِيقِ العدَدِ، ولكن من طَرِيق أنَّه لا شَرِيكَ لَهُ.

'আল্লাহ্ তাআলা এক, তবে সংখ্যাগত বিবেচনায় নয়; বরং এ অর্থ বিবেচনায় যে, তাঁর কোনো শরীক নেই।'[১৭৬]

কেননা, যা সংখ্যায় এক হয়, তার অংশ থাকা ও সেটা বিভাজ্য হওয়া সম্ভব বা তার বিরোধী থাকাও সম্ভব এবং তার পরে দুই/দ্বিতীয় হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অথচ আল্লাহ্ তাআলা এই সব থেকে পবিত্র।

ইমাম মাতুরীদী রাহ. (মৃ. ৩৩৩ হি.) বলেন,

(واحد) ليس من حيث العدد؛ لأن كل ذي عدد يحتمل الزيادة والنقصان، ويحتمل الطول والعرض، ويحتمل القصر والكسر، ولكن يقال: ذلك (واحد) من حيث العظمة والجلال والرفعة، كما يقال: فلان واحد زمانه، وواحد قومه، يعنون به رفعته وجلالته في قومه وسلطانه عليهم، فهم لا يعنون من جهة العدد؛ لأن مثله كثير فيهم من حيث العدد.

সারাংশ : 'তিনি সংখ্যা হিসেবে এক নন। কেননা, প্রত্যেক সংখ্যা বেশ-কম ও দৈর্ঘ্য-প্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে; বরং তিনি সম্মান, মহত্ত্ব ও মর্যাদা হিসেবে একক। যেভাবে সম্মান ও মর্যাদা হিসেবে বলা হয়, অমুক তার গোত্র বা যুগের একক ব্যক্তি।'[১৭৭]

وتوحيد الأفعال: مرجعه إلى أنّ الله هو الفاعل وَحدَه.

وتوحيد الصفات مرجعه إلى أنّ الله هو الحيُّ وَحدَه.

وتوحيد الذات مرجعه إلى أنّ الله هو الموجود على الحقيقة وحده. انتهى.

১৭৬. আল-ফিকহুল আকবার, বি-রিওয়াতি হাম্মাদ, আকীদা নং ৩-সূত্রে মাজমুউ কুতুব ওয়া রাসায়িল ওয়া ওসায়াল ইমামিল আযম, পৃষ্ঠা ২৫১, মাকতাবাতুল গানিম

১৭৭. তাফসীরে মাতুরীদী, ২/২৩৭

কাজেই আল্লাহ তাআলা এক হওয়ার অর্থ হলো, তিনি সত্তাগত বিবেচনায় অনন্য; তাঁর অনুরূপ সত্তা আর কারও নেই, কোনো বিষয়ে কোনো ক্ষেত্রেই তাঁর কোনো শরীক নেই এবং তাঁর কোনো প্রতিপক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বীও নেই। তাঁর সদৃশ বা তাঁর মতো বলতে কেউ বা কোনো কিছুই নেই এবং তিনিও অন্য কারও বা কিছুর মতো নন।

সারকথা, আল্লাহ তাআলা সত্তাগতভাবে সৃষ্টির সাদৃশ্য থেকে মুক্ত ও পবিত্র—এ কথা তাওহীদের আকীদারই রুকন ও অংশ। আল্লাহর বৈশিষ্ট্যে সৃষ্টিকে শরীক করা যেমন শিরক ও তাওহীদ-পরিপন্থী, তেমনই সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যে আল্লাহকে শরীক মনে করাও শিরক ও তাওহীদ-পরিপন্থী।

তাঁর সত্তাগত একত্বের প্রধান দুটি দিক

তাঁর সত্তাগত একত্বের প্রধান দুটি দিক রয়েছে। তন্মধ্যে প্রথম দিক হলো, তাঁর সত্তার মতো সমকক্ষ বা প্রতিদ্বন্দ্বী ও বিকল্প অন্য কোনো সত্তা নেই। তিনি কারও থেকে জন্ম লাভ করেননি, তাঁর থেকেও কেউ জন্মগ্রহণ করেনি। সুতরাং তাঁর মতো বা তাঁর অংশ হিসেবে অন্য কোনো সত্তা থাকা অসম্ভব। তিনি পরম একক সত্তা। তাঁর মতো সত্তা আর কেউ নেই, কোনো কিছুই নেই।

তিনি সকল কিছু থেকে অমুখাপেক্ষী, সবাই ও সবই তাঁর মুখাপেক্ষী।

কুরআন মাজীদের অনেক আয়াতে উপরিউক্ত বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে। সূরা ইখলাসে বিশেষভাবে বর্ণিত হয়েছে,

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ، اَللّٰهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

'বলুন, আল্লাহ (সব দিক থেকে) এক। সবাই ও সবই তাঁর মুখাপেক্ষী, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। তাঁর কোনো সন্তান নেই এবং তিনিও কারও সন্তান নন। এবং তাঁর সমকক্ষ কেউ নয়।'

এই সূরায় আল্লাহ তাআলাকে 'আহাদ' বলা হয়েছে, যার অর্থ এক ও একক। অর্থাৎ তিনি সব দিক থেকে এক ও অদ্বিতীয়। যথা : তিনি সত্তাগত দিক থেকেও এক ও অদ্বিতীয় (যাকে বলা হয় 'তাওহীদুয যাত'), গুণাবলির দিক থেকেও এক ও অনন্য (যার শিরোনাম 'তাওহীদুস সিফাত'), কার্যাদির দিক থেকেও এক ও একক (এর নাম 'তাওহীদুল আফআল') এবং ইবাদতের হক ও অধিকারের ক্ষেত্রেও এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নেই (যার পরিভাষা 'তাওহীদুল উলূহিয়া/ইবাদাহ')।

আর 'তাঁর সমকক্ষ কেউ নয়'—এ কথার অর্থ হলো, তাঁর সত্তা সৃষ্টির মতো নয়। তাঁর মতো বলতে কিছুই নেই; তিনি বেনযীর, তিনি অনন্য।

কিন্তু মুশরিক-জাতি আল্লাহর জন্য সন্তান সাব্যস্ত করত। আর খ্রিষ্টানরা ঈশ্বরের

ত্রি-সত্তায় বিশ্বাস করে। এদের সকলের এমন ভ্রান্ত বিশ্বাসকে কুরআন সুস্পষ্টভাবে খণ্ডন করেছে।

কিছু আয়াত দেখুন,

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَنّٰى يَكُوْنُ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَمْ تَكُنْ لَّهٗ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ

‘তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আদি স্রষ্টা। কীরূপে আল্লাহর পুত্র হতে পারে, অথচ তাঁর কোনো সঙ্গী নেই! তিনি যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি সব বস্তু সম্পর্কে সুবিজ্ঞ।’[১৭৮]

আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করার কথা বলা কত মারাত্মক ও জঘন্য দেখুন,

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ۝ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدًّا ۝ تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۝ اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمٰنِ وَلَدًا ۝ وَمَا يَنْۢبَغِيْ لِلرَّحْمٰنِ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا

‘তারা বলে, দয়াময় আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। নিশ্চয় তোমরা তো এক অদ্ভুত কাণ্ড করেছ। হয়তো এর কারণে এখনই নভোমণ্ডল ফেটে পড়বে, পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হবে এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে। এ কারণে যে, তারা দয়াময় আল্লাহর জন্য সন্তান আহ্বান করে। অথচ সন্তান গ্রহণ করা দয়াময়ের জন্য শোভনীয় নয়।’[১৭৯]

মুশরিকরা আল্লাহর জন্য কন্যাসন্তান থাকার মিথ্যা অপবাদ দিত। আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

فَاسْتَفْتِهِمْ اَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُوْنَ ۝ اَمْ خَلَقْنَا الْمَلٰٓئِكَةَ اِنَاثًا وَّهُمْ شٰهِدُوْنَ. اَلَآ اِنَّهُمْ مِّنْ اِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ ۝ وَلَدَ اللّٰهُ وَاِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ اَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ. اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ اَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ فَاْتُوْا بِكِتٰبِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ.

‘এবার তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তোমার পালনকর্তার জন্য কি কন্যাসন্তান রয়েছে এবং তাদের জন্য কি পুত্রসন্তান, নাকি আমি তাদের উপস্থিতিতে ফেরেশতাগণকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছি? জেনে রাখো, তারা মনগড়া উক্তি করে যে, আল্লাহ্ সন্তান জন্ম দিয়েছেন। নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী।

তিনি কি পুত্রসন্তানের স্থলে কন্যাসন্তান পছন্দ করেছেন? তোমাদের কী হলো? তোমাদের এ কেমন সিদ্ধান্ত? তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? নাকি তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট কোনো দলীল রয়েছে? তোমরা সত্যবাদী হলে তোমাদের কিতাব আনো।’[১৮০]

---

১৭৮. সূরা আনআম, (৬) : ১০১
১৭৯. সূরা মারইয়াম, (১৯) : ৮৮-৯২
১৮০. সূরা ছাফ্ফাত, (৩৭) : ১৪৯-১৫৭

খ্রিষ্টানদের ত্রিত্ববাদ বিশ্বাসের প্রতি ইশারা করে বলা হয়েছে,

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ

'নিশ্চয় তারা কাফের হয়ে গেছে, যারা বলে "আল্লাহ তিনের মধ্যে একজন।"'[১৮১]

'ত্রিত্ববাদ'-এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তিন সত্তা (Persons) অর্থাৎ পিতা, পুত্র (মাসীহ) ও পবিত্র আত্মা (রূহুল কুদস)-এর সমষ্টির নাম। তাদের একদলের মতে, তৃতীয়জন হলেন মারয়াম। তাদের বক্তব্য হলো, এই তিনজন মিলে একজন।

তিনের সমষ্টি 'এক' কীভাবে?

এই হেঁয়ালির কোনো যুক্তিসংগত উত্তর কারও কাছে নেই। তাদের ধর্মতত্ত্ববিদগণ বিষয়টাকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। কেউ বলেছেন, ঈশ্বর যে তিন সত্তার সমষ্টি তার একজন হলেন পিতা অর্থাৎ আল্লাহ; আর দ্বিতীয়জন পুত্র, যিনি মূলত আল্লাহ তাআলারই একটি গুণ, যা মানব অস্তিত্বে মিশে গিয়ে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। সুতরাং তিনি যেমন মানুষ ছিলেন, তেমনই মৌলিকত্বের দিক থেকে ঈশ্বরও ছিলেন। আয়াতে এ বিশ্বাসকে খণ্ডন করা হয়েছে।[১৮২]

খ্রিষ্টানদের এসব আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাখ্যা এবং তার রদ ও জবাব সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য মুফতী তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহর রচিত 'ঈসাইয়্যাত কিয়া হ্যায়' শীর্ষক গ্রন্থ পড়া যেতে পারে, যা বাংলায় 'খৃষ্টধর্মের স্বরূপ' নামে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

খোদ আল্লাহ তাআলা খ্রিষ্টানদের বিশ্বাসের খণ্ডন করে বলেন,

مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ

'মাসীহ ইবনে মারয়াম তো একজন রাসূলই ছিল (তার বেশি কিছু নয়)। তার পূর্বেও বহু রাসূল গত হয়েছে। তার মা ছিল সিদ্দীকা (সত্যনিষ্ঠ)। তারা উভয়ে খাবার খেত। তারপর দেখুন আমি তাদের জন্য কীরূপ যুক্তি-প্রমাণ বর্ণনা করি; আবার দেখুন, (এরপরও তাদের ইন্দ্রিয়-চাহিদা ও ব্যক্তিস্বার্থই) তাদেরকে উল্টোদিকে নিয়ে যাচ্ছে।'[১৮৩]

হযরত ঈসা মাসীহ আ. ও তাঁর মা মারয়াম, উভয় সম্পর্কে কুরআন মাজীদ এই

---

১৮১. সূরা মায়েদা, (৫) : ৭৩
১৮২. দ্র. তাওযীহুল কুরআন
১৮৩. সূরা মায়েদা, (৫) : ৭৫

বাস্তবতা তুলে ধরেছে যে, তারা খাবার খেতেন। এটা উল্লেখ করা হয়েছে এ কারণে যে, তারা 'ঈশ্বর' না হওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট দলীলরূপে এটাই যথেষ্ট। একজন মামুলি জ্ঞানসম্পন্ন লোকও বুঝতে সক্ষম যে, খোদা কেবল এমন সত্তাই হতে পারেন, যিনি সব রকম মানবীয় প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে থাকবেন। ঈশ্বরের নিজেরও যদি খাবার খেতে হয়, তবে সে কেমন ঈশ্বর হলো?

তাওহীদের সহজ-সরল প্রমাণ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

قُلْ لَّوْ كَانَ مَعَهٗٓ اٰلِهَةٌ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذًا لَّابْتَغَوْا اِلٰى ذِى الْعَرْشِ سَبِيْلًا

'বলুন, তাদের কথামতো যদি আল্লাহর সঙ্গে আরও ইলাহ থাকত, তবে তারা আরশের মালিক (যিনি প্রকৃত ইলাহ, তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্য সেই) পর্যন্ত পৌঁছার কোনো পথ খুঁজত।'[১৮৪]

এটা তাওহীদের পক্ষে ও শিরকের বিরুদ্ধে এমন এক দলীল, যা যে কারও পক্ষেই বোঝা সহজ। দলীলটির সারমর্ম হলো, ইলাহ এমন সত্তাকেই বলা যায়, যিনি হবেন সর্বশক্তিমান, যেকোনো রকমের কাজ করার ক্ষমতা যার আছে এবং যিনি কারও অধীন হবেন না।

বিশ্বজগতে আল্লাহ তাআলা ছাড়া আরও ইলাহ থাকলে, প্রত্যেকেই এ গুণের অধিকারী হতো। ফলে প্রত্যেকেই অন্যের থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন হতো এবং প্রত্যেকেরই ক্ষমতা হতো পরিপূর্ণ। আর সে ক্ষেত্রে সব ইলাহ মিলে আরশের মালিক প্রকৃত ইলাহের ওপর প্রভাবও বিস্তার করতে সক্ষম হতো।

যদি বলা হয়, আল্লাহর ওপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা তাদের নেই; বরং তারা আল্লাহ তাআলার কর্তৃত্বাধীন, তবে তারা কেমন ইলাহ হলো?

কাজেই এর দ্বারা প্রমাণ হয়ে যায়, প্রকৃত ইলাহ একজনই। তিনি ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নন।

কুরআনে কারীমে আরও এসেছে,

وَمَا كَانَ مَعَهٗ مِنْ اِلٰهٍ اِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ اِلٰهٍۢ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ

'তাঁর সঙ্গে নেই অন্য কোনো ইলাহ। সে রকম হলে প্রত্যেক ইলাহ নিজ সৃষ্টি নিয়ে চলে যেত এবং একে অন্যের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করত।'[১৮৫]

---

১৮৪. সূরা বনী-ইসরাঈল, (১৭) : ৪২
১৮৫. সূরা মুমিনূন, (২৩) : ৯১

অর্থাৎ ইলাহ যদি একাধিক থাকত, তাহলে তাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ সৃষ্ট বস্তু নিয়ে পৃথক হয়ে যেত। এখন যদি প্রত্যেকে নিজ নিজ সৃষ্ট বস্তু নিয়ে পরস্পর পৃথক হতে না পারে এবং একে অন্যের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে না পারে, তবে তারা কেমন ইলাহ হলো?

তাওহীদের আরও একটি সহজ-সরল প্রমাণ :

ইরশাদ হয়েছে,

لَوْ كَانَ فِيهِمَآ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا

'যদি আসমান ও জমিনে আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য মাবুদ থাকত, তবে উভয়ই (আসমান ও জমিন) ধ্বংস হয়ে যেত।'[১৮৬]

এটা তাওহীদের আরও একটি সহজ-সরল প্রমাণ। এর ব্যাখ্যা হলো, বিশ্বজগতে যদি একের বেশি প্রভু থাকত, তবে প্রত্যেক প্রভু স্বতন্ত্র প্রভুত্বের অধিকারী হতো এবং কেউ কারও অধীন হতো না।

সে ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেকের সিদ্ধান্ত আলাদা হতে পারত, ফলে বিরোধ অনিবার্য হয়ে যেত। যখন দুজনের সিদ্ধান্তে বিরোধ দেখা দিত, তখন তাদের একজন কি অন্যজনের কাছে হার মানত? হার মানলে সে কেমন ঈশ্বর হলো, যে অন্যের বশ্যতা স্বীকার করে?

মনে করুন স্রষ্টা দুজন। স্বাভাবিকভাবে দুই জনের ইচ্ছা ও রুচি সব ক্ষেত্রে একই রকম হয় না। যেমন : একজন যদি কারও জীবিত থাকা কামনা করেন আর দ্বিতীয়জন তার মৃত্যু চান, তাহলে সেটার বাস্তবায়ন কী করে সম্ভব হবে? একই সাথে বিপরীতমুখী দুটি কাজ তো একটি বস্তুর ওপর কখনো একত্র হতে পারে না। এভাবে কেউ একটা সময়কে দিন করতে ইচ্ছা করবে, আরেকজন ওই একই সময়ে রাত করতে ইচ্ছা করবে। ফলে বিরোধ অনিবার্য।

---

১৮৬. সূরা আম্বিয়া, (২১) : ২২
আকীদা-বিশেষজ্ঞ ইমামগণ উক্ত আয়াত থেকে দলিলুত তামানু'র কথা বলেন।
দলিলুত তামানু'-এর তিন অবস্থা :
যদি বিশ্বজগতে একাধিক ইলাহ হতো, তাহলে অবশ্যই উভয়ের মাঝে মতপার্থক্য হতো। একজন বলবে একটা, অন্যজন বলবে আরেকটা। এমতাবস্থায় :
ক. হয়তো কারও ইচ্ছাই বাস্তবায়ন হবে না, তখন এদের কেউ ইলাহ হতে পারে না। কেননা, এ কেমন ইলাহ, যে নিজের ইচ্ছা বাস্তবায়ন করতে পারে না।
খ. অথবা একজনের ইচ্ছা বাস্তবায়ন হবে, অন্যজনেরটা হবে না। তখন দ্বিতীয়জনের অক্ষমতা সাব্যস্ত হয়। আর যুক্তিসংগত কথা হচ্ছে, যিনি নিজ ইচ্ছা বাস্তবায়নে সক্ষম হবেন, তিনিই ইলাহ হবেন।
গ. অথবা উভয়ের ইচ্ছা পূর্ণ হবে, যা কখনো সম্ভব না। কারণ, একই সাথে সাংঘর্ষিক দুটি বিষয় বাস্তবায়ন হতে পারে না। কাজেই যেকোনো একটা বাস্তবায়ন হবে। আর যারটা হবে তিনিই হবেন ইলাহ, অন্যজন নয়।

এখন যদি একজনের ইচ্ছা বাস্তবায়িত হয় আর দ্বিতীয়জনের ইচ্ছা অবাস্তবায়িত থেকে যায়, তাহলে দ্বিতীয়জনের অক্ষমতা প্রমাণিত হয়। আর যিনি প্রভু বা স্রষ্টা, তাঁর কোনো রকম দুর্বলতা বা অক্ষমতা থাকতে পারে না।

আর যদি কেউ হার না মানে; বরং প্রত্যেকেই আপন-আপন সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে সচেষ্ট হয়, তবে পরস্পরবিরোধী সিদ্ধান্ত কার্যকর করার দ্বারা আসমান-জমিনের শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হওয়া অনিবার্য।

সুতরাং যুক্তির নিরিখে প্রভু বা স্রষ্টা একজন হওয়াই সংগত এবং তা স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণিত হলো।

এ দলীলের অন্যরকম ব্যাখ্যাও করা যায়। অর্থাৎ যারা আসমান ও জমিনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ঈশ্বরের কথা বলে, তারা কি বিশ্বজগতের ব্যবস্থাপনার প্রতি দৃষ্টিপাত করে না? তা করলে তাদের এ আকীদা আপনা-আপনিই বাতিল সাব্যস্ত হতো।

কেননা, লক্ষ করলে দেখা যায়, সমগ্র জগৎ একই নিয়ম-নিগড়ে বাঁধা, একই সূত্রে গাঁথা। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র থেকে শুরু করে নদী-সাগর, পাহাড়-পর্বত, উদ্ভিদ ও জড়পদার্থ পর্যন্ত সবকিছুই সুসামঞ্জস্য; কোথাও একটু বৈসাদৃশ্য বা অমিল নেই।

এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে, এগুলো একই ইচ্ছার প্রতিফলন এবং একই পরিকল্পনার অধীনে এরা নিজ নিজ কাজে নিয়োজিত। আসমান ও জমিনের মালিক আলাদা হলে মহাবিশ্বের এই একতা সম্ভব হতো না, সর্বত্র এমন সাযুজ্য থাকত না; বরং নানা ক্ষেত্রে নানা রকম অসংগতি দেখা দিত। ফলে বিশ্বজগতে ঘটত মহাবিপর্যয়।[১৮৭]

তা ছাড়া স্রষ্টা যে একক ও অদ্বিতীয় হতে হয়, তা বোঝার জন্য বড় জ্ঞানী-বিজ্ঞানী হতে হবে না। কেননা, এক দেশে দুজন প্রধানমন্ত্রী হয় না। যদি হয় তাহলে কোনো দেশ সঠিক ও সুন্দর ব্যবস্থাপনায় চলতে পারে না; বরং বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়। কারণ, একজন চাইবেন এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে, আরেকজন চাইবেন অন্য প্রকল্প করতে। একজন বলবেন চালের দাম কমাতে, অন্যজন বলবেন তেলের দাম কমাতে।

এভাবে এক প্রতিষ্ঠানের যদি দুজন পরিচালক হন, তাহলে একজনের ইচ্ছা হবে এক আইন করার বা ছাত্রকে বহিষ্কার করার, অন্যজনের ইচ্ছা হবে উক্ত আইন না করার বা ছাত্রটাকে বহিষ্কার না করার।

একটু ভেবে দেখুন তো, কেমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে, শৃঙ্খলা কেমন বিপর্যস্ত হবে।

যদি কয়েক হাজার বর্গমাইলের একটা দেশ বা একটা প্রতিষ্ঠানে দুজন পরিচালক

---

১৮৭. দ্র. তাওযীহুল কুরআন।

থাকলে শৃঙ্খলা বিনষ্ট হয় ও বিপর্যয় দেখা দেয়, তাহলে অবশ্যই এত বিশাল আসমান-জমিনেরও শৃঙ্খলা বিনষ্ট হতো এবং বিশ্বজগতে মহাবিপর্যয় দেখা যেত।

সত্তাগত একত্বের দ্বিতীয় প্রধান দিক

আল্লাহ তাআলার সত্তাগত একত্বের দ্বিতীয় প্রধান দিক এবং তিনি এক ও অদ্বিতীয় হওয়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি কোনো মুরাক্কাব বা যৌগ সত্তা নন বা একাধিক উপাদান দ্বারা গঠিত নন; বরং তিনি স্বতন্ত্র ও অবিভাজ্য (যা ভাগ করা যায় না এমন) পরম একক সত্তা। সুতরাং তিনি কারও অংশ নন, তাঁরও কোনো অংশ নেই।

তিনি দেহ-শরীর, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সূরত-চেহারা-রূপ, আকার-আকৃতি, সীমা-পরিসীমা, স্থানের গণ্ডি ও দিকসমূহ থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

তিনি অন্য কোনো সত্তার সাথে একীভূত (ইত্তিহাদ) হওয়া, অন্য কারও ভেতরে প্রবিষ্ট (হুলূল) হওয়া কিংবা তাঁর সত্তার সাথে অন্য কেউ একীভূত হওয়া, তাঁর সত্তার ভেতরে অন্য কেউ প্রবিষ্ট হওয়া থেকে চিরপবিত্র।

ইমাম আবদুল কাহের বাগদাদী আশআরী শাফেয়ী রাহ. (মৃ. ৪২৯ হি.) বলেন,

وحقيقة الواحد: هو الشيء الذي لا ينقسم، فإذا كان أعضاء وجوارح: لم يكن شيئا واحدا، فلا يصح لهم إطلاق القول بأنه الواحد.

''এক' হওয়ার হাকীকত ও বাস্তবতা হলো, এমন বস্তু যা অবিভাজ্য তথা ভাগ করা যায় না। কাজেই তিনি যদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবিশিষ্ট হন, তাহলে তিনি 'এক' হবেন না এবং তাঁকে 'এক' বলা যাবে না।'[১৮৮]

[১৮৯]মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম মাতুরীদী হানাফী রাহ. (মৃ. ৮৬১ হি.) বলেন,

ولما ثبت انتفاءُ الجسمية: ثبت انتفاءُ لوازمها، فليس سبحانه بذي لونٍ ولا رائحةٍ، ولا صورة ولا شكلٍ، ولا مُتَنَاهٍ، ولا حالٍّ في شيء، ولا محلٍّ له.

[১৯০]হযরত মাওলানা যফর আহমদ উসমানী রাহ. (মৃ. ১৩৯৪ হি.) লেখেন,

فتلخص من هذا التفصيل أن أسباب الشرك متعددة... والرابع: اعتقاد كون الله تعالى جسما، وفي مكان.

[১৯১]অথচ তাঁকে নিয়ে জল্পনা-কল্পনার কোনো সুযোগ নেই। ইমাম তাহাবী রাহ. তাঁর

---

১৮৮. আল-আসমা ওয়াস সিফাত, বাগদাদী, ১/৪৭১ ও ৩৩৬, দারুত তাকওয়া দামেশক

১৮৯. শারহুল আকায়েদ, পৃষ্ঠা ৭২

১৯০. আল-মুসায়ারা, পৃষ্ঠা ৪০ (আল-মুসামারাসহ)

১৯১. ইমদাদুল আহকাম, ১/১২৮, টীকায়; আরও দেখুন, আকীদাতুত তাহাবীয়্যাহর ব্যাখ্যা : আন-নূরুল লামি', নাসিরী, পৃষ্ঠা ১৫৭; শারহুল আকীদাতিত তাহাবীয়্যাহ, বাবিরতী, পৃষ্ঠা ৩২

বিখ্যাত 'আকীদা' গ্রন্থে বলেছেন,

لا تَبْلُغُهُ الأَوْهَامُ، وَلا تُدْرِكُهُ الأَفْهَامُ. وَلا يُشْبِهُهُ الأَنَامُ.

এ ছাড়া ইমামগণ আল্লাহ্ তাআলার সিফাত 'ওয়াহিদ', 'আহাদ' ও 'সামাদ'-এর তাফসীর ও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উল্লিখিত তাঁর সত্তাগত একত্বের দ্বিতীয় প্রধান দিক ও অন্যতম বৈশিষ্ট্যগুলো লিখেছেন। কেননা, 'আল্লাহু আহাদ/ওয়াহিদ' অর্থ আল্লাহ্ পরম একক সত্তা। তিনি সব দিক থেকে এক ও অদ্বিতীয়। যার দাবি হলো, তিনি মাখলূক ও সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ও সদৃশ থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

কাজেই যিনি এক ও অদ্বিতীয়, কোনো বিষয়ে তাঁর কোনো সদৃশ থাকা অসম্ভব। কারণ, যে বিষয়ে যার সদৃশ থাকে, তিনি সে বিষয়ে এক ও অদ্বিতীয় নন।

এভাবে তিনি 'সামাদ' তথা কারও মুখাপেক্ষী নন, সবাই ও সবই তাঁর মুখাপেক্ষী। কাজেই তিনি সীমা-পরিসীমা, স্থান ও দিকের মুখাপেক্ষী নন, এগুলোর গণ্ডিতে আবদ্ধ নন; হতে পারেন না। এ কথাগুলো দুইয়ে দুইয়ে চারের মতো যে কেউ সহজেই বুঝতে পারে।

আল্লাহ্ তাআলার সাদৃশ্যহীনতা সম্পর্কে কুরআনে কারীমের দ্ব্যর্থহীন ও ব্যাপক বক্তব্য হচ্ছে,

[১৯২]মাখলূক ও সৃষ্টির সঙ্গে আল্লাহ্ তাআলার সব ধরনের সব রকমের সাদৃশ্যকে নাকচ করার জন্য এই আয়াতটি আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআহর একটি মূলনীতি। সাহাবা ও সালাফের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সকলেই এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

আর সূরা ইখলাসে এসেছে,

কুরআনে কারীমের দুটি বক্তব্যই দ্ব্যর্থহীন ও ব্যাপক অর্থবোধক। অর্থাৎ কেউই বা কোনো কিছুই কোনো দিক থেকেই তাঁর সদৃশ নয়, তাঁর মতো বলতে কিছুই নেই, থাকতে পারে না। আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআহর কেউ এর ব্যাপকতাকে অস্বীকার করেননি।

কাজেই 'তাঁর মতো বলতে কিছুই নেই এবং তাঁর সদৃশ কেউই নেই'—এ কথার অর্থ হলো, তাঁর সত্তা মাখলূক ও সৃষ্টির মতো নয়। আমরা দুই চোখ দিয়ে যা কিছু দেখি এবং অন্তর দিয়ে যা কিছু কল্পনা করি, তিনি সে রকম কিছু নন। তাঁর মতো বলতে কিছুই নেই, তিনি অনন্য। সুতরাং তিনি সৃষ্টির মতো দেহ ও অঙ্গবিশিষ্ট নন কিংবা সাকার, সূরত ও আকৃতিধারী নন এবং কোনো দিকে ও স্থানে নন।

---

১৯২. সূরা শূরা, (৪২) : ১১

কারও কারও প্রশ্ন হচ্ছে, আশআরী-মাতুরীদী ও কালামপন্থীরা আল্লাহ তাআলা দেহ ও অঙ্গবিশিষ্ট নন, সাকার-সূরত বা আকার-আকৃতিধারী নন এবং তিনি কোনো দিকে ও স্থানে নন ইত্যাদি বলে আল্লাহ তাআলার সিফাত ও গুণাবলি অস্বীকার করে কেন? আর এভাবে তাঁর পরিচিতি তুলে ধরার কারণ কী?

[১৯৩]সালাফ ও ইমামগণ তাঁকে দেহ-অঙ্গ, সূরত-আকৃতি এবং স্থান-কাল, দিক-সীমা ইত্যাদি থেকে পবিত্র সাব্যস্ত করতেন

আল্লাহ তাআলার সত্তা এবং তাঁর গুণাবলির একত্ব বা অনন্যতা ও সাদৃশ্যহীনতা সম্পর্কে আকীদা রাখা প্রত্যেক মুমিনের জন্য জরুরি। কেননা, একত্ব ও সাদৃশ্য পরস্পরবিরোধী দুটি বিষয়।

তাই আহলুস সুন্নাহ ও সালাফের অনুসারী সকলেই সর্বসম্মতিক্রমে আল্লাহ তাআলাকে সৃষ্টির সাদৃশ্য থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত ও চিরপবিত্র বিশ্বাস করেন এবং তাঁর অনন্যতা ও সাদৃশ্যহীনতার কথা সুস্পষ্টভাবে বলেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু সালাফের অনুসারী দাবিদার অনেক ভাই আল্লাহ তাআলার সত্তাগত একত্ব সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে উপরিউক্ত পদ্ধতিতে বিস্তারিতভাবে নফী ও নাকচ করাকে অপছন্দ করেন। অর্থাৎ ওপরে যেভাবে বিভিন্ন বস্তু ও বিষয়গুলো আল্লাহ তাআলা থেকে নফী ও নাকচ করে তাঁর পবিত্রতা ও সাদৃশ্যহীনতা তুলে ধরা হয়েছে, সেভাবে তাঁর অনন্যতা ও সাদৃশ্যমুক্ত হওয়ার বিবরণ তুলে ধরাকে অস্বীকার করেন; বরং এটাকে আশআরী-মাতুরীদী বা কালামশাস্ত্র চর্চাকারীদের আবিষ্কৃত বিদআতী পন্থা, এমনকি এটা আহলুস সুন্নাহর মতাদর্শ নয় এবং উম্মতের সালাফ ও ইমামগণের কারও থেকেই প্রমাণিত নয়ও বলেন।[১৯৪]

---

১৯৩. উদাহরণস্বরূপ দেখুন, সূরা শুআরা, (২৬) : ২৩-২৮; সূরা ত্বহা, (২০) : ৪৯-৫৩; সূরা বাকারা, (২) : ২১-২২, ১৬৩-১৬৪, ২৫৫, ২৫৭-২৫৮; সূরা হাশর, (৫৯) : ২২-২৪; সূরা মুলক, (৬৭) : ১-৬; সূরা আলে ইমরান, (৩) : ২৬-২৭; সূরা রূম, (৩০) : ১৯-২৮; সূরা আবাসা, (৮০) : ২৪-৪২; সূরা আর-রহমান, (৫৫) ও সূরা ওয়াকিয়ার (৫৬) অনেক আয়াত।

১৯৪. আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রাহ. (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেন,

وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله، ولا قول أحد من سلف الأمة وأئمتها: أنه ليس بجسم.

"কুরআন-সুন্নাহয় ও উম্মতের সালাফের কারও বক্তব্যে এবং কোনো ইমামের বক্তব্যে এ কথা নেই যে, 'তিনি (আল্লাহ তাআলা) দেহবিশিষ্ট নন।'" (বয়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ, ১/৩৭৩)

অন্যত্র লিখেছেন, "তাঁদের কেউ বলেননি, 'আল্লাহর দেহ আছে', আর না বলেছেন, 'আল্লাহর দেহ নেই।' কেউ বলেননি, 'আল্লাহ হলেন জওহর', আর না বলেছেন, 'আল্লাহ জওহর নন।'" (মাজমূউল ফাতাওয়া, ৫/৪৩৪; জামিউল মাসাইল, ৩/২০৬)

শায়খ বিন বায রাহ. (মৃ. ১৪২০ হি.) 'সাফওয়াতুত তাফাসীর' গ্রন্থের রচয়িতা শায়খ মুহাম্মাদ আলী সাবূনী রাহ.-কে খণ্ডন করতে গিয়ে লিখেছেন,

ثم ذكر الصابوني – هداه الله – تنزيه الله سبحانه عن الجسم والحدقة والصماخ واللسان والحنجرة، وهذا ليس بمذهب أهل السنة، بل هو من أقوال أهل الكلام المذموم وتكلفهم.

ফলে তাদের মতে আল্লাহ তাআলাকে 'জিসম' বা দেহধারী নন ও 'জওহর' বা স্বনির্ভর মৌলপদার্থ নন বলা যাবে না এবং তাঁকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সূরত-রূপ বা আকার-আকৃতি থেকে পবিত্র বলা যাবে না; বরং তাদের কেউ কেউ বলেন, 'আল্লাহ সাকার' বা 'তাঁর আকার রয়েছে' বলতে হবে। তাই নিম্নে এ বিষয়ে সালাফ ও ইমামগণ থেকে কিছু বক্তব্য নকল করছি।

সালাফ ও আহলুস সুন্নাহর ইমামগণ সর্বসম্মতিক্রমে বলেছেন, আল্লাহ তাআলা দেহ-শরীর, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সূরত-রূপ, সাকার বা আকার-আকৃতি, স্বনির্ভর মৌলপদার্থ ও অস্থায়ী কোনো বস্তু এবং স্থান-কাল, দিক-সীমা থেকে মুক্ত ও চিরপবিত্র।

ইমাম আবু হানীফা রাহ. (মৃ. ১৫০ হি.)-এর নামে প্রচলিত 'আল-ফিকহুল আকবার' গ্রন্থে রয়েছে,

وهو شيء لا كالأشياء، ومعنى الشيء: إثباته بلا جسم، ولا جوهر، ولا عرض. ولا حد له، ولا ضد له، ولا ند له، ولا مثل له.

'তিনি (আল্লাহ) বিদ্যমান বস্তু ও সত্তা, তবে অন্যান্য বিদ্যমান বস্তুর মতো নন। তিনি বিদ্যমান হওয়ার ব্যাখ্যা হচ্ছে, তাঁর ব্যাপারে স্বীকার করা যে, তিনি 'জিসম' বা শরীরী-দেহধারী নন, 'জওহর' বা স্বনির্ভর মৌলপদার্থ নন এবং 'আরয' বা পরনির্ভর অস্থায়ী কোনো বস্তু নন। তাঁর কোনো 'হদ' বা সীমা নেই, তাঁর কোনো বিরোধী নেই, তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই এবং তাঁর মতো বলতে কিছুই নেই।'[১৯৫]

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা, আল্লাহ তাআলা 'জিসম' বা দেহ-শরীরধারী নন। কারণ :

ক. দেহ বিভিন্ন অঙ্গ দ্বারা গঠিত হয়। খ. দেহের আকার-আকৃতি থাকে, যা সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। গ. দেহ বিভাজ্য তথা একত্র করা যায়, আবার পৃথকও করা যায়, যেটা সৃষ্টির নিদর্শন। ঘ. দেহ সীমা-পরিসীমা দ্বারা বেষ্টিত থাকে, সেটাও সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। এভাবে 'জওহর' ও 'আরয'-এর মধ্যে সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য মুখাপেক্ষিতা ও নশ্বরতা রয়েছে। কাজেই আল্লাহ তাআলা দেহ-শরীরসহ সব ধরনের সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শন থেকে মুক্ত ও চিরপবিত্র।

তবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ আল্লাহর জন্য 'শাই' (বস্তু/জিনিস) শব্দের ব্যবহার বৈধ মনে করেন। কারণ, কুরআনে আল্লাহ নিজেকে 'শাই' বলে ব্যক্ত করেছেন। কুরআনের ভাষ্য,

---

"অতঃপর সাবূনী হাদাহুল্লাহ আল্লাহ তাআলাকে দেহ, নয়নতারা, কর্ণকুহর, জিহ্বা ও বাগ্‌যন্ত্র থেকে মুক্ত ও পবিত্র বলে উল্লেখ করেছে। এটা আহলুস সুন্নাহর মতাদর্শ নয়; বরং এটা নিন্দনীয় কালামশাস্ত্র চর্চাকারীদের মতবাদ এবং তাদের বাড়াবাড়ি বক্তব্য।" (মাজমূউ ফাতাওয়া বিন বায, ৩/৬১)

১৯৫. আল-ফিকহুল আকবার, বি-রিওয়াতি হাম্মাদ, আকীদা নং ১২ ও ১৩-সূত্রে মাজমূউ কুতুব ওয়া রাসায়িল ওয়া ওসায়াল ইমামিল আযম, পৃষ্ঠা ২৫৯-২৬০, মাকতাবাতুল গানিম

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللهُ

'জিজ্ঞাসা করুন, কোন 'শাই' (বস্তু/জিনিস) সবচেয়ে বড় সাক্ষী? বলে দিন, 'আল্লাহ'।'[১৯৬]

তা ছাড়া 'শাই' শব্দটি মূলত আল্লাহ্ তাআলার বিদ্যমানতা ও অস্তিত্বশীলতা বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।

সারকথা, 'জিসম', 'জওহর' ও 'আরয' ইত্যাদি শব্দগুলো আল্লাহ তাআলার জন্য ব্যবহার করা যাবে না। কেননা প্রথমত, কুরআন-সুন্নাহয় তা আসেনি। দ্বিতীয়ত, এগুলো সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ও নিদর্শন বোঝায়, যা থেকে তিনি পবিত্র।

ইমাম আবু হানীফার নামে প্রচলিত 'আল-ফিকহুল আবসাত' গ্রন্থে এসেছে,

(يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِم) ليست كأيدي خلقه، وليست جارحة، وهو خالق الأيدي.

'(কুরআনে রয়েছে,) "আল্লাহর 'ইয়াদ' বা হাত তাদের হাতের ওপর", (কিন্তু) তাঁর হাত তাঁর সৃষ্টির হাতের মতো নয় এবং তা **অঙ্গ নয়**; বরং তিনি হস্তসমূহের স্রষ্টা।'[১৯৭]

তিনি অন্যত্র বলেন,

كان الله تعالى ولا مكان.

'আল্লাহ তাআলা ছিলেন, যখন কোনো 'স্থান' ছিল না।'[১৯৮]

এভাবে ইমাম তাহাবী রাহ. (মৃ. ৩২১ হি.)-এর বিখ্যাত 'আকীদা' গ্রন্থ, যা তিনি ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রাহ.-এর মাসলাক অনুসারে সংকলন করেছেন, এতে বলেন,

وَتَعَالَى اللهُ عَنِ الْحُدُودِ وَالْغَايَاتِ، وَالْأَرْكَانِ وَالْأَعْضَاءِ وَالْأَدَوَاتِ، لَا تَحْوِيهِ الْجِهَاتُ السِّتُّ كَسَائِرِ الْمُبْتَدَعَاتِ.

'আল্লাহ তাআলা সকল সীমা-প্রান্ত, দৈহিক সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং সকল উপায়-উপকরণ থেকে বহু ঊর্ধ্বে। আল্লাহ তাআলাকে জগতের ছয় দিক থেকে কোনো দিক বেষ্টন করতে পারে না, যেভাবে সৃষ্টবস্তুসমূহকে বেষ্টন করে।'

বলাবাহুল্য, ইমাম তাহাবীর এ বিখ্যাত আকীদাগ্রন্থটি আরব ও অনারব সকল দেশে ইসলামী আকীদার ব্যাপক মাকবূল ও গ্রহণযোগ্য কিতাব হিসেবে স্বীকৃত। এমনকি

---

১৯৬. সূরা আনআম, (৬) : ১৯

১৯৭. আল-ফিকহুল আকবার, বি-রিওয়াতি আবু মুতী' (প্রচলিত আল-ফিকহুল আবসাত), আকীদা নং ৪৭-সূত্রে মাজমুউ কুতুব ওয়া রাসায়িল ওয়া ওসায়াল ইমামিল আযম, পৃষ্ঠা ৩৩৫

১৯৮. প্রাগুক্ত, আকীদা নং ৪৮-সূত্রে মাজমুউ কুতুব ওয়া রাসায়িল ওয়া ওসায়াল ইমামিল আযম, পৃষ্ঠা ৩৩৬

ইমাম তাজুদ্দীন সুবকী রাহ. (মৃ. ৭৭১ হি.) বলেছেন,

وهذه المذاهب الأربعة – ولله الحمد – في العقائد واحدة، إلا من لحق منها بأهل الاعتزال والتجسيم. وإلا فجمهورها على الحق يقرون عقيدة أبي جعفر الطحاوي، التي تلقاها العلماء سلفا وخلفا بالقبول.

'আল্লাহর শোকর! চার মাযহাবের আকীদা এক ও অভিন্ন। তবে যারা মুতাযিলা বা দেহবাদীদের অনুসারী হয়েছে এরা ছাড়া। অন্যথায় (চার মাযহাবের) অধিকাংশ অনুসারী হকপন্থী এবং 'আকীদাতুত তাহাবী'র আকীদা পোষণকারী, যে কিতাবকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী উলামায়ে কেরাম ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছেন।'[১৯৯]

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর আকীদার বিখ্যাত তিন ধারার অন্যতম 'মাতুরীদী'র প্রধান হলেন ইমাম আবু মানসুর মাতুরীদী রাহ. (মৃ. ৩৩৩ হি.)। তিনিও ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম তাহাবীর মতো একই কথা ১০ খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর তাফসীরের বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন। এক স্থানে তিনি বলেন,

لا يفهم من ذكر اليد له: الجارحة من قوله: (بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ) ...ومن فهم ذلك فإنما يفهم لفساد في اعتقاده.

'কুরআনে এসেছে, "আল্লাহর দুই 'ইয়াদ' বা হাত প্রশস্ত।" এখানে 'আল্লাহর হাত' থেকে অঙ্গ বোঝা যাবে না। কেউ যদি এমন বোঝে, তাহলে সে তার আকীদায় ভ্রান্তি থাকার কারণে এমন বোঝে।'[২০০]

মাতুরীদী রাহ. তাঁর 'কিতাবুত তাওহীদ' গ্রন্থে লেখেন,

إن الله سبحانه كان ولا مكان.

'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ছিলেন, যখন কোনো স্থান ছিল না।'[২০১]

'আছারী' ধারার আকীদার প্রধান ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহ. (মৃ. ২৪১ হি.)-এর আকীদার বিবরণে এসেছে,

إنَّ للهِ تعالى يَدَيْنِ، وهُما صفةٌ لَه فِي ذاتِه، لَيْسَتَا بجَارِحَتَيْنِ، ولَيْستَا بمركَّبتَيْنِ، ولا جِسْمَ، ولا مِن جِنْسِ الأَجْسَام، وَلَا من جنس الْمَحْدُود والتركيب والأبعاض والجوارح، وَلَا يقَاس على ذَلِك، لَا مرفق وَلَا عضد، وَلَا فِيمَا يقْتَضِي ذَلِك من إِطْلَاق قَوْلهم: يَد، إِلَّا مَا نطق الْقُرْآن بِهِ أَو صحت عَن رَسُول الله ﷺ السّنة فِيهِ.

'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার দুটি 'ইয়াদ' বা হাতের কথা (কুরআনে) এসেছে,

---

১৯৯. মুঈদুন নি'আম, সুবকী, পৃষ্ঠা ২২-২৩
২০০. তাফসীরে মাতুরীদী, ৪/৪৬৪; আরও দেখুন, ৮/৬৩৬, ৮/৬৪৭, ৯/৫৭৪
২০১. কিতাবুত তাওহীদ, পৃষ্ঠা ৬৯

যা তাঁর সত্তাগত গুণ। **হস্তদ্বয় অঙ্গ নয়, যৌগিক বা দেহের অংশ নয়, দেহ নয়; এমনকি দেহজাতীয় বস্তুর কোনো প্রকার থেকেও নয়** এবং সীমা, সংযোজন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গজাতীয় কিছুই নয়। এ বিষয়ে কিয়াস-যুক্তি অচল। এতে কনুই, বাহু ইত্যাদি কোনো কিছুর অস্তিত্ব কল্পনার সুযোগ নেই। কুরআন ও সহীহ হাদীসে যতটুকু বলা হয়েছে, তার অতিরিক্ত মানুষের 'ইয়াদ' বা হাত শব্দের ব্যবহার থেকে কিছু সংযোজন করা যাবে না।'

ইমাম আহমদের আকীদা হলো,

أن لله عز وَجل وَجها، لَا كالصور المصورة، والأعيان المخططة، بل وجه وَصفه.

'মহান আল্লাহর একটি 'ওয়াজহ' বা চেহারা আছে, যা প্রতিচ্ছবি আকৃতির মতো নয় এবং আঁকানো বস্তুর মতোও নয়; বরং চেহারা তাঁর একটি গুণ।'

তাঁর আকীদার বিবরণে আরও এসেছে,

وَلَيْسَ معنى وَجْهٍ معنى جَسَدٍ عِنْده، وَلَا صُورَةَ وَلَا تخطيطَ، وَمَن قَالَ ذَلِك: فقد ابتَدَع.

[২০২]ইমাম ইবনে হামদান হাম্বলী (মৃ. ৬৯৫ হি.) তাঁর আকীদা নকল করেছেন যে,

---

২০২. দ্র. ই'তিকাদুল ইমামিল মুনাব্বাল আহমদ ইবনে হাম্বল, পৃষ্ঠা ৪৫, ২২, ১৭; তবাকাতুল হানাবিলা, ২/২৫৪।

অথচ যারা ইমাম আহমদ রাহ.-এর আকীদার অনুসারী বলে দাবি করেন, তারা কী বলে দেখুন :

১. আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রাহ. (মৃ. ৭২৮ হি.) বলেন, "নবী, সাহাবী, তাবেয়ী ও উম্মতের সালাফের কেউ বলেননি যে, 'আল্লাহ হলেন দেহবিশিষ্ট', আর না বলেছেন, **'আল্লাহ দেহবিশিষ্ট নন'**; বরং 'জিসম' বা 'দেহ' শব্দ উল্লেখ করা, না করা বিদআত।" অন্যত্র লিখেছেন, "তাঁদের কেউ বলেননি, 'আল্লাহ হলেন জওহর', আর না বলেছেন, 'আল্লাহ জওহর নন।'" (মাজমূউল ফাতাওয়া, ৫/৪৩৪; জামিউল মাসাইল, ৩/২০৬)

বরং তিনি বলেন,

وأن الموجود القائم بنفسه لا يكون إلا جسمًا، وما لا يكون جسمًا لايكون إلا معدومًا.

"স্বয়ংসম্পূর্ণ অস্তিত্বশীল সত্তা 'জিসম' বা 'দেহ' ছাড়া হতে পারে না। আর যিনি **দেহবিশিষ্ট নন, তিনি তো অস্তিত্বহীন ছাড়া কিছু নন।**" (বয়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ, ১/৩৫৯)

২. শায়খ বিন বায (মৃ. ১৪২০ হি.) সাবূনীকে খণ্ডন করতে গিয়ে লিখেছেন, "সে দেহ, নয়নতারা, কর্ণকুহর, জিহ্বা ও বাগ্‌যন্ত্র থেকে মহান আল্লাহ মুক্ত বলে উল্লেখ করেছে। এটা আহলুস সুন্নাহর মতাদর্শ নয়; বরং এটা নিন্দনীয় কালামশাস্ত্র চর্চাকারীদের মতবাদ এবং তাদের বাড়াবাড়ি বক্তব্য।" (মাজমূউ ফাতাওয়া বিন বায, ৩/৬১)

৩. মরহুম শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ উসাইমীন (মৃ. ১৪২১ হি.) বলেছেন,

مسالة الجسمية لم ترد لا في القرآن ولا في السنّة إثباتاً ولا نفياً، ولكن نقول بالنسبة للفظ: لا ننفي ولا نثبت، لا نقول: جسم وغير جسم.

"দেহবাদের মাসআলা কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত হয়নি। না বলা হয়েছে, 'এর অস্তিত্ব আছে', আর না বলা হয়েছে, 'এর অস্তিত্ব নেই।' তাই আমরা এটাকে সাব্যস্ত করি না, আবার নাকচও করি না। আমরা বলি না, 'আল্লাহর দেহ আছে।' আবার এও বলি না যে, 'আল্লাহর দেহ নেই।'" (শারহুল আকীদাতিস সাফফারীনিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ১৮, ৪৫৮)

৪. সৌদি ফতোয়া বোর্ড ও সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের সদস্য সালেহ ফাওযান বলেছেন,

لا نقول: جوارح، ولا نقول: غير جوارح. لأن لفظ (الجارحة) لم يرد نفيها ولا إثباتها في كتاب الله ولا في السنة. فنحن لا نتدخل فيه. نتوقف عما لم يرد نفيه ولا إثباته، نتوقف عنه. فلا نقول: هذه جوارح، ولا أنها غير جوارح، ما ندري.

والله فوق ذلك لا مكان ولا حد؛ لأنه كان ولا مكان.

[২০৩, ২০৪]তিনি অন্য কিতাবে বলেন,

وهذا يستحيل عليه أن تكون نفس الباري عز وجل جسما، أو جوهرا، أو محدودا، أو في مكان دون مكان... وأن له تعالى يدين مبسوطتين، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه من غير أن يكون جوارحا .

'আল্লাহ্ তাআলার সত্তা (জিসম) দেহধারী হওয়া বা (জওহর) স্বনির্ভর মৌলপদার্থ হওয়া কিংবা সীমাবদ্ধ হওয়া অথবা কোনো স্থানে থাকা অসম্ভব।...

আল্লাহ্ তাআলার আছে দুই প্রশস্ত হাত। আর গোটা পৃথিবী কিয়ামতের দিন তাঁর মুঠোর ভেতর থাকবে এবং আসমানসমূহ গোটানো অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে। তবে এ 'হাত' অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নয়।'[২০৫]

[২০৬,২০৭]اجتمعت الصوفية على أن الله واحد... ولا إله سواه، ليس بجسم، ولا شبح ولا صورة، ولا شخص ولا جوهر ولا عرض، لا اجتماع له ولا افتراق، لا يتحرك ولا يسكن، ولا ينقص ولا يزداد، ليس بذي أبعاض ولا أجزاء ولا جوارح ولا أعضاء، ولا بذي جهات ولا أماكن... لا يحويه مكان، ولا يجري عليه زمان، لا تجوز عليه المماسة ولا العزلة، ولا الحلول في الأماكن، لا تحيط به الأفكار.

সারাংশ : 'সূফীরা এ বিষয়ে একমত যে, আল্লাহ্ তাআলা এক, তিনি ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তিনি দেহ ও সূরতধারী নন। তিনি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবিশিষ্ট নন, দিক ও স্থানসমূহের গণ্ডিতে আবদ্ধ নন এবং তাঁকে কোনো স্থান বেষ্টন করতে পারে না।'[২০৮]

প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম খাত্তাবী রাহ. (মৃ. ৩৮৮ হি.) **প্রত্যেক মুসলিমের জন্য কেমন আকীদা রাখা জরুরি,** তা সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করে বলেন,

إن الذي يجب علينا وعلى كل مسلم: أن نعلم أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة؛ فإن الصورة تقتضي الكيفية، وهي عن الله وعن صفاته مَنفية.

"আমরা বলি না, 'এগুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।' আবার এও বলি না যে, 'এগুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নয়।' কেননা 'অঙ্গ' সাব্যস্তকরণ বা নাকচকরণ কোনোটাই আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাহয় বর্ণিত হয়নি। আমরা এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করি না। সাব্যস্তকরণ বা নাকচকরণ—কোনো দিক থেকেই যে বিষয়টি বর্ণিত হয়নি, সে ব্যাপারে আমরা তাওয়াককুফ (ক্ষান্ত) অবলম্বন করি। আমরা এ রকম বিষয়ে ক্ষান্ত থাকি। আমরা বলি না, এগুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। আবার এও বলি না যে, এগুলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নয়। কেননা, আমরা এ ব্যাপারে কিছুই জানি না।" (https://youtu.be/Ae_৫Bn_aY৮৮, শারহুল ফাতাওয়াল হামাবীয়্যাহর ১৯ নং অডিও ক্লিপ থেকে সংগৃহীত)

২০৩. নিহায়াতুল মুবতাদিয়ীন, পৃষ্ঠা ৩১
২০৪. মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন, পৃষ্ঠা ২১১
২০৫. রিসালাতুন ইলা আহলিছ-ছাগরি বিবাবিল আবওয়াব, পৃষ্ঠা ১২৪, ১২৭
২০৬. ই'তিকাদু আইম্মাতিল হাদীস, পৃষ্ঠা ২
২০৭. ই'তিকাদু আইম্মাতিল হাদীস, পৃষ্ঠা ৯
২০৮. আত-তাআররুফ লি-মাযহাবিত তাসাওউফ, পৃষ্ঠা ৩৪

'আমরা-সহ প্রত্যেক মুসলিমের এটা জেনে রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহ তাআলা সূরত বা আকার-আকৃতিবিশিষ্ট সত্তা নন। কেননা, তা থাকার দাবি হলো, 'ধরন' থাকা। অথচ আল্লাহ তাআলা ও তাঁর গুণাবলি 'ধরন'মুক্ত ও পবিত্র।'[২০৯]

তিনি অন্যত্র বলেন,

...لقيام الدليل على أنه ليس بذي صورة سبحانه (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ).

'আল্লাহ তাআলা সূরত বা আকৃতিবিশিষ্ট সত্তা নন। কেননা, এর স্বপক্ষে দলীল হলো, "(আল্লাহ তাআলার ইরশাদ) কোনো কিছুই তাঁর মতো বা সদৃশ নেই।"'[২১০]

হাদীসের আরেক বিখ্যাত ইমাম বায়হাকী রাহ. (মৃ. ৪৫৮ হি.) তাঁর 'আল-আসমা ওয়াস সিফাত' গ্রন্থে ইমাম খাত্তাবীর উভয় বক্তব্য নকল করে সমর্থন করেছেন।[২১১]

হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত উসূলবিদ ইমাম আলাউদ্দিন আবদুল আযীয বুখারী রাহ. (মৃ. ৭৩০ হি.) বলেন,

اللهُ تَعَالَى يُوصَفُ بِصِفَةِ الْوَجْهِ وَالْيَدِ، مَعَ تَنْزِيهِهِ جَلَّ جَلَالُهُ عَنِ الصُّورَةِ وَالْجَارِحَةِ؛ لِأَنَّ الْوَجْهَ وَالْيَدَ مِنْ صِفَاتِ الْكَمَالِ فِي الشَّاهِدِ؛ لِأَنَّ مَنْ لَا وَجْهَ لَهُ أَوْ لَا يَدَ يُعَدُّ نَاقِصًا، وَهُوَ تَعَالَى مَوْصُوفٌ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ، فَيُوصَفُ بِهِمَا أَيْضًا إِلَّا أَنَّ إِثْبَاتَ الصُّورَةِ وَالْجَارِحَةِ مُسْتَحِيلٌ، وَكَذَا إِثْبَاتُ الْكَيْفِيَّةِ.

'আল্লাহ তাআলা চেহারা ও হাতের গুণে গুণান্বিত, তবে সূরত-আকৃতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে পবিত্র। কেননা, বাহ্যত চেহারা ও হাত পূর্ণাঙ্গতার গুণের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, যার চেহারা ও হাত থাকে না, তাকে অপূর্ণাঙ্গ মনে করা হয়, আর আল্লাহ তাআলা পূর্ণাঙ্গতার সকল গুণের অধিকারী সত্তা। কাজেই তিনি উভয় গুণে গুণান্বিত। তবে (আল্লাহর গুণের ক্ষেত্রে) সূরত-আকৃতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত (আছে মনে) করা অসম্ভব। অনুরূপভাবে এসবের ধরন সাব্যস্ত (আছে মনে) করাও অসম্ভব।'[২১২]

ইমাম শাহ ওলীউল্লাহ দেহলবী রাহ. (মৃ. ১১৭৬ হি.) বলেন,

وهو بريء من الحدوث والتجدد من جميع الوجوه، ليس بجوهر ولا عرض، ولا جسم، ولا في حيز، ولا جهة.

'আল্লাহ তাআলা সব ধরনের নশ্বরতা ও নতুনত্ব থেকে পবিত্র। তিনি স্বনির্ভর মৌলপদার্থ নন, পরনির্ভর অস্থায়ী কোনো বস্তু নন এবং দেহধারী বস্তুও নন। তিনি

---

২০৯. আ'লামুল হাদীস শারহুল বুখারী, ১/৫২৯; দাফউ শুবাহিত তাশবীহ, ইবনুল জাওযী, পৃষ্ঠা ৩৫
২১০. সূরা শূরা, (৪২) : ১১; আ'লামুল হাদীস, ৩/২২২৮
২১১. দেখুন, আল-আসমা ওয়াস সিফাত, ২/৬৬, ৬২
২১২. কাশফুল আসরার আন উসূলিল বাযদাবী, ১/৬০

কোনো স্থানেও নন এবং কোনো দিকেও নন।'[২১৩]

শায়খুল ইসলাম শাব্বীর আহমদ উসমানী দেওবন্দী রাহ. (মৃ. ১৩৬৯ হি.) লেখেন,

مکان، جہت، جسم، صورت اور رنگ وغیرہ سمات حدوث سے اللہ کی ذات پاک ہے۔

[২১৪]এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নকল করে বিশিষ্ট মুহাদ্দিস কাযী ইয়ায রাহ. (মৃ. ৫৪৪ হি.) লেখেন,

اتفق المسلمون أهل السنة والجماعة: أن اليد هنا ليست بجارحة، ولا جسم، ولا صورة، ونزهوا الله تعالى عن ذلك؛ إذ هي صفات المحدثين، وأثبتوا ما جاء من ذلك إلى الله تعالى وآمنوا به ولم ينفوه.

'মুসলিমদের আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হলো, আল্লাহর ক্ষেত্রে 'হাত' অঙ্গ বা দেহ কিংবা সূরত-আকৃতি উদ্দেশ্য নয়। তারা এগুলো থেকে আল্লাহ তাআলাকে পবিত্র মনে করেন। কারণ, এগুলো মাখলূকের গুণ ও বৈশিষ্ট্য। তবে তারা আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করে যা কিছু এসেছে, তা সাব্যস্ত করেন ও ঈমান আনেন এবং তা নাকচ করেন না।'[২১৫]

একইভাবে হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেন,

ووقع ذكر اليد في القرآن والحديث مضافا إلى الله تعالى، واتفق أهل السنة والجماعة على أنه ليس المراد باليد: الجارحة التي هي من صفات المحدثات.

'কুরআন ও হাদীসে আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে 'ইয়াদ' বা 'হাত'-এর কথা এসেছে। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ এ বিষয়ে একমত যে, (আল্লাহর) হাত থেকে দৈহিক অঙ্গের হাত উদ্দেশ্য নয়। (কারণ,) তা মাখলূকের গুণ।'[২১৬]

এ ছাড়া আল্লাহর হাত ইত্যাদি থেকে যে দৈহিক অঙ্গের হাত উদ্দেশ্য নয় এবং এ-জাতীয় শব্দ থেকে যে আভিধানিক ও বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া যাবে না, তা উল্লিখিত ইমামগণ ছাড়াও খতীব বাগদাদী, ইবনে হাযম যাহেরী, আবুল লাইস সামারকান্দী, শাহরাস্তানী, ইবনুল জাওযী, গাযালী, মুফাসসির ও মুহাদ্দিস দুই কুরতুবী, তুরপুশতী, নববী, ইবনে কুদামাহ, ইবনে হামদান, ইবনে কাসীর, হাফেজ ইরাকী, বদরুদ্দীন ইবনে জামাআহ, যারকাশী, আইনী, ইবনুল হুমাম, কাসেম ইবনে কুতলুবুগা, ইবনে হাজার হাইতামী, সুয়ূতী, সাখাবী, মারয়ী কারমী, মোল্লা আলী কারী, সাফ্ফারীনী, সানাউল্লাহ পানিপথী, কাযী শাওকানী ও আলূসী রাহিমাহুমুল্লাহ-সহ অনেকের বক্তব্য থেকে দেখানো যাবে।

---

২১৩. আল-আকীদাতুল হাসানাহ, ২৬-৩২

২১৪. তাফসীরে উসমানী, পৃষ্ঠা ৪৮৯, সূরা নামলের ৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

২১৫. মাশারিকুল আনওয়ার, ২/৩০০

২১৬. ফাতহুল বারী, ১/২০৮

সুতরাং এখানে বিশেষভাবে এ কথা বলার আর অপেক্ষা রাখে না যে, আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পৃক্ত এ-জাতীয় শব্দগুলোর আভিধানিক ও বাহ্যিক অর্থ অনুযায়ী আকীদা পোষণ করা যাবে না। কেননা, ইমাম আবু হানীফার সুস্পষ্ট বক্তব্য, চার মাযহাবের হকপন্থীদের সর্বসম্মত আকীদার কিতাব 'আকীদাতুত তাহাবী'র ভাষ্য, আকীদার প্রসিদ্ধ তিন ধারার প্রধান তথা ইমাম আহমদ, ইমাম মাতুরীদী ও ইমাম আশআরী প্রমুখের ভ্রান্ত আকীদা থেকে সতর্কীকরণ, মুহাদ্দিসগণের ও সূফীদের আকীদার বিবরণ এবং সর্বোপরি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত থেকে পরিষ্কারভাবে এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা 'জিসম' বা দেহ-শরীর, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সূরত-রূপ বা আকার-আকৃতি এবং স্থান-কাল, দিক-সীমা থেকে মুক্ত ও চিরপবিত্র।

অথচ বর্তমানে ইমাম আহমদ রাহ.-সহ সালাফের আকীদার অনুসারী দাবি করে একদল লোক বলছেন, 'আল্লাহ তাআলাকে দেহ-শরীর, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং সূরত-রূপ ও আকার-আকৃতি থেকে মুক্ত ও পবিত্র বলা যাবে না।' কারণ, তাদের দাবি হলো, উম্মতের সালাফ ও ইমামগণের কারও থেকেই প্রমাণিত নয়! এবং আহলুস সুন্নাহর মতাদর্শও নয়!!

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ-জাতীয় ভুল তথ্য ও আকীদা থেকে হেফাজত করুন।

সারকথা, ইমামগণ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, কুরআন-হাদীসে বর্ণিত এসব শব্দের বাহ্যিক ও আভিধানিক অর্থ থেকে আল্লাহ তাআলা মুক্ত ও পবিত্র। কাজেই এসব শব্দ থেকে বাহ্যিক ও আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া যাবে না এবং এ শব্দগুলোর প্রকৃত ও আসল অর্থে আকীদা পোষণ করা যাবে না।

শব্দ বলা নিয়ে মতভেদ নেই, বরং উদ্দেশ্য দেখতে হবে

এখানে একটা বিষয় ভালোভাবে বুঝে নেওয়া দরকার যে, কুরআন-হাদীসে আল্লাহর হাত, চোখ, আরশের ওপর সমুন্নত এবং দুনিয়ার আসমানে অবতরণ ইত্যাদি বিষয় যেগুলো এসেছে, সেগুলো আরবী ভাষায় (কুরআন-হাদীসের শব্দে) বলা নিয়ে মতভেদ নেই; বরং সেগুলো থেকে আভিধানিক ও বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া এবং উক্ত অর্থে আকীদা পোষণ করার ক্ষেত্রে দেহবাদীদের সাথে মতভেদ।

ইমাম ইবনুল জাওযী হাম্বলী রাহ. (মৃ. ৫৯৭ হি.) সুস্পষ্ট করে বলেন,

وليس الخلاف في اليد، إنما الخلاف في الجارحة. وليس الخلاف في الوجه، وإنما الخلاف في الصورة الجسمية. وليس الخلاف في العين، وإنما الخلاف في الحدقة... وأهل السنة أثبتوا اليد ونفوا الجارحة، وأثبتوا الوجه ونفوا الصورة، وهو المذهب الحق.

‘(আরবী ভাষায়) হাত বলা নিয়ে মতভেদ নেই; বরং হাত থেকে অঙ্গ উদ্দেশ্য নেওয়ার ক্ষেত্রে মতভেদ। চেহারা বলা নিয়ে মতানৈক্য নেই; বরং চেহারা থেকে দৈহিক আকৃতি উদ্দেশ্য নিলে মতানৈক্য। চোখ বলা নিয়ে দ্বিমত নেই; বরং চোখ থেকে নয়নতারা উদ্দেশ্য নিলেই দ্বিমত। (তাই) আহলুস সুন্নাহ হাত সাব্যস্ত করেছেন, তবে অঙ্গ নাকচ করেছেন; চেহারা সাব্যস্ত করেছেন, তবে সূরত-আকৃতি নাকচ করেছেন। এটাই সত্য মাযহাব।’[২১৭]

প্রখ্যাত ইমাম বায়হাকী রাহ. (মৃ. ৪৫৮ হি.) বলেন,

وأن نفسه ليس بجسم، وأن وجهه ليس بصورة، وأن يده ليست بجارحة، وأن عينه ليست بحدقة.

‘আল্লাহ্ তাআলার সত্তা দেহ নয়। তাঁর চেহারা সূরত বা আকৃতি নয়। তাঁর হাত অঙ্গ নয়। তাঁর চোখ নয়নতারা নয়।’[২১৮]

ইমাম ইবনে কাসীর রাহ. (মৃ. ৭৭৪ হি.) আরশের ওপর ইস্তিওয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

وَالظَّاهِرُ الْمُتَبَادِرُ إِلَى أَذْهَانِ الْمُشَبِّهِيْنَ مَنْفِيٌّ عَنِ اللهِ.

‘এ থেকে বাহ্যিক যে অর্থ সাদৃশ্যবাদীদের মাথায় আসে, তা থেকে আল্লাহ্ তাআলা মুক্ত।’[২১৯]

আরও স্পষ্ট করে ইমাম শাহ ওলীউল্লাহ দেহলবী রাহ. (মৃ. ১১৭৬ হি.) বলেন,

وَهُوَ فَوْقَ الْعَرْشِ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ، وَلَكِنْ لَا بِمَعْنَى التَّحَيُّزِ وَلَا الْجِهَةِ.

‘তিনি আরশের ওপর (ইস্তিওয়া) করেছেন, যেভাবে স্বয়ং (কুরআনে) বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু তা স্থানগ্রহণ ও (ওপরের) দিকে থাকার অর্থে নয়।’[২২০]

সুতরাং কুরআন-হাদীসে এ-জাতীয় শব্দগুলো যেভাবে এসেছে, সেভাবে বলা নিয়ে মতভেদ নেই; বরং সেগুলো থেকে কী অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া হচ্ছে এবং কোন অর্থে আকীদা পোষণ করা হচ্ছে, সেটা হলো দেখার বিষয়।

আভিধানিক ও বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নেয় ভ্রান্ত দল

এ-জাতীয় শব্দগুলো থেকে আভিধানিক ও বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নেয় দেহবাদী ও সাদৃশ্যবাদীদের মতো ভ্রান্ত দলগুলো। যেমন : বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার আল্লামা ইবনে বাত্তাল মালেকী রাহ. (মৃ. ৪৪৯ হি.) বলেন,

---

২১৭. মাজালিসু ইবনিল জাওযী, পৃষ্ঠা ১৫৯, দারুল কুতুবিল ইলমিয়া
২১৮. আল-ই'তিকাদ ওয়াল হিদায়া ইলা সাবীলির রাশাদ, পৃষ্ঠা ১৫৭
২১৯. তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৩/৪২৬
২২০. আল-আকীদাতুল হাসানাহ, পৃষ্ঠা ২৫

قوله تعالى: (لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ) على إثبات يدين لله، هما صفتان من صفات ذاته، ليستا بجارحتين، بخلاف قول المجسمة المثبتة: أنهما جارحتان.

'কুরআনে আল্লাহ তাআলার দুটি হাতের কথা এসেছে, যা তাঁর সত্তাগত গুণ। এই হস্তদ্বয় দৈহিক অঙ্গ নয়। তবে দেহবাদীরা বলে, হস্তদ্বয় দৈহিক অঙ্গ।'[২২১]

তিনি আরও বলেন,

فَيَأْتِيهِمُ اللهُ فِي صُورَةٍ ...تمسك به المجسمة، فأثبتوا لله صورة.

'(হাদীসে এসেছে,) "তাদের কাছে আল্লাহ তাআলা সূরতধারী হয়ে আসবেন।" দেহবাদীরা এখান থেকে দলীল গ্রহণ করে আল্লাহর জন্য সূরত-রূপ বা আকার-আকৃতি সাব্যস্ত করেছে।'[২২২]

প্রসিদ্ধ হাদীস-ব্যাখ্যাকার হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী আশআরী শাফেয়ী রাহ. (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেন,

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي مَعْنَى النُّزُولِ عَلَى أَقْوَالٍ، فَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى ظَاهِرِهِ وَحَقِيقَتِهِ، وَهُمُ الْمُشَبِّهَةُ، تَعَالَى اللهُ عَنْ قَوْلِهِمْ.

'(দুনিয়ার আসমানে) নুযূল বা অবতরণের অর্থ নিয়ে অনেক মতানৈক্য হয়েছে। তাদের কেউ কেউ এটিকে বাহ্যিক ও আসল অর্থের ওপর গ্রহণ করেছে, আর তারাই মুশাব্বিহা তথা সাদৃশ্যবাদী। আল্লাহ তাদের কথা থেকে পবিত্র।'[২২৩]

উনার আগে ইমাম যারকাশী রাহ.-ও (মৃ. ৭৯৪ হি.) 'আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন' গ্রন্থে (২/৭৮) বাহ্যিক অর্থ গ্রহণকারীদের সাদৃশ্যবাদী বলেছেন,

حكم الآيات المتشابهات الواردة في الصفات .وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْوَارِدِ مِنْهَا فِي الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ عَلَى ثَلَاثِ فِرَقٍ، أَحَدُهَا: أَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِلتَّأْوِيلِ فِيهَا بَلْ تَجْرِي عَلَى ظَاهِرِهَا وَلَا تُؤَوَّلُ شَيْئًا مِنْهَا، وَهُمُ الْمُشَبِّهَةُ.

আমাদের সালাফী বন্ধুরা কাযী শাওকানী রাহ.-কে (মৃ. ১২৫০ হি.) অনুসরণ করে থাকেন। তিনিও 'ইরশাদুল ফুহূল' গ্রন্থে একই কথা বলেছেন,

...وصِفَات الْبَارِي عَزَّ وَجَلَّ، وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي هَذَا الْقِسْمِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ، الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِلتَّأْوِيلِ فِيهَا، بَلْ يَجْرِي عَلَى ظَاهِرِهَا، وَلَا يُؤَوَّلُ شيءٌ منها، وهذا قولُ المشبِّهَة.

'আল্লাহর সিফাত বিষয়ে তিন মাযহাব। প্রথম মাযহবের বক্তব্য হলো, এতে তাবীলের

২২১. শারহুল বুখারী, ১০/৪৩৬
২২২. ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার, ১৩/৪২৭; উমদাতুল কারী, আইনী, ২৫/১২৯
২২৩. ফাতহুল বারী, ৩/৩০

কোন সুযোগ নেই; বরং এগুলো বাহ্যিক অর্থের ওপর বহাল থাকবে এবং কোন তাবীল করা হবে না। এটা মুশাব্বিহা তথা সাদৃশ্যবাদীদের মত।'[২২৪]

বলাবাহুল্য, স্রষ্টার জন্য দেহ বা দেহের বৈশিষ্ট্য, যেমন : অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা আকার-আকৃতি ইত্যাদি, সাব্যস্তকারীকে দেহবাদী ও সাদৃশ্যবাদী বলা হয়। যদিও দেহবাদীরা দেহ বা দেহের বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করে শেষে বলে, তাঁর দেহ আমাদের মতো নয়। অথচ দেহ সাব্যস্ত করলেই দেহবাদী ও সাদৃশ্যবাদী উভয়টা হয়। কেননা, দেহ হলো কেবল সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। আর তা স্রষ্টার জন্য সাব্যস্ত করা মানেই স্রষ্টাকে সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য দেওয়া। কাজেই দেহবাদ ও সাদৃশ্যবাদ উভয়টা পাওয়া গেল। তবে দেহ বা দেহের বৈশিষ্ট্য ছাড়া সৃষ্টির অন্য কোনো বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করলে শুধু সাদৃশ্যবাদ হবে, দেহবাদ হবে না।

সিফাতের মাসআলায় খতীব বাগদাদী রাহ. (মৃ. ৪৬৩ হি.)-এর কথা খুব গুরুত্বের সাথে তুলে ধরা হয়। তিনি কী বলে দেখুন,

ويتجنَّبْ المحدثُ روايةَ ما لا تحتمِلُهُ عقولُ العوامِ؛ لما لا يؤمَنُ عليهِم فيه مِنْ دخولِ الخطأ والأَوهامِ، وأنْ يُشَبِّهُوا اللهَ تعالى بخلقِهِ، ويُلْحِقُوا بهِ ما يستحيلُ في وصفِهِ، وذلكَ نحوُ أحاديثِ الصفاتِ التي ظاهِرُها يقتضي التشبيهَ والتجسيمَ، وإثباتَ الجوارحِ والأعضاءِ للأزليِّ القديمِ، وإنْ كانَت الأحاديثُ صحاحا، ولها في التَّأويلِ طرقٌ ووُجوهٌ، إلاَّ أنَّ مِنْ حقِّها ألاَّ ترْوَى إلاَّ لأَهْلِها؛ خَوْفاً مِنْ أنْ يَضِلَّ بِهَا مَنْ جَهِلَ معانِيها، فيحمِلَهَا على ظاهِرِها، أو يستنكِرَها فيَرُدَّهَا ويُكذِّبَ رواتَهَا وَنقَلَتَهَا.

'মুহাদ্দিস সাহেব জনসাধারণের কাছে এমন সব হাদীস বর্ণনা থেকে বিরত থাকবেন, যা তাদের জ্ঞান-বোধের ঊর্ধ্বে। কারণ, এমন বর্ণনার ফলে ভুল-ভ্রান্তি ও সংশয়-সন্দেহ এবং আল্লাহকে তাঁর সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যকরণ ও আল্লাহর গুণ হিসেবে অসম্ভব জিনিস সাব্যস্ত করার মতো জঘন্য বিষয় অনুপ্রবেশ করার প্রবল সম্ভাবনা বিদ্যমান। যেমন : **সিফাতের এমন হাদীসসমূহ, যার বাহ্যিক অর্থ দেহবাদ ও সাদৃশ্যবাদের দিকে নিয়ে যায় এবং আল্লাহর জন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইছবাত (সাব্যস্ত করা) দাবি করে।** এসব হাদীস সনদের বিচারে বিশুদ্ধ হলেও এগুলোর বিভিন্ন তাবীল ও ব্যাখ্যা রয়েছে। তবে অনুপযুক্ত ব্যক্তির কাছে এগুলো বর্ণনা না করাটাই সংগত। কারণ, **এগুলোর (সঠিক) অর্থ না জানার ফলে বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করে পথভ্রষ্ট হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।** অথবা অবোধগম্যতার কারণে এগুলো প্রত্যাখ্যান করবে এবং বর্ণনাকারী ও নকলকারীদের অস্বীকার করবে।'[২২৫]

একই কথা নকল করেছেন এবং বলেছেন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হাফেজ যাইনুদ্দীন ইরাকী

---

২২৪. ইরশাদুল ফুহুল, ২/৩২

২২৫. আল-জামি' লি-আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামি', ২/১০৭

রাহ. (মৃ. ৮০৬ হি.) 'শারহুত তাবছিরা ওয়াত তাযকিরা' কিতাবে (২/৩৪), ইমাম সাখাবী রাহ. (মৃ. ৯০২ হি.) 'ফাতহুল মুগীসে' (৩/২৬৭) ও সুয়ূতী রাহ. (মৃ. ৯১১ হি.) 'তাদরীবুর রাবী' (২/১৩৮) গ্রন্থে।

সুতরাং এগুলোর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা পথভ্রষ্ট হওয়ার কারণ।

হাম্বলী মাযহাবের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উসূলের কিতাব হলো 'শারহুল কাওকাবিল মুনীর', যা রচনা করেছেন ইবনুন নাজ্জার হাম্বলী রাহ. (মৃ. ৯৭২ হি.)। উক্ত কিতাবে রয়েছে,

كَصِفَاتِ اللهِ تَعَالَى أَيْ: كَآيَاتِ الصِّفَاتِ وَأَخْبَارِهَا. فَاشْتَبَهَ الْمُرَادُ مِنْهَا عَلَى النَّاسِ. فَلِذَلِكَ قَالَ قَوْمٌ بِظَاهِرِهِ، فَشَبَّهُوا وَجَسَّمُوا. وَتَأَوَّلَ قَوْمٌ فَحَرَّفُوا وَعَطَّلُوا. وَتَوَسَّطَ قَوْمٌ: فَسَلَّمُوا، وَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ، وَأَئِمَّةُ السَّلَفِ الصَّالِحِ.

'আল্লাহ তাআলার সিফাত-সংবলিত আয়াত ও হাদীস থেকে কী উদ্দেশ্য, তা নিয়ে লোকদের কাছে অস্পষ্টতা দেখা দিল। অতঃপর **কিছু লোক এর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করল, ফলে সাদৃশ্যবাদ ও দেহবাদে জড়িয়ে পড়ল।** আবার কিছু লোক তাবীল বা অপব্যাখ্যা করল, ফলে বিকৃতিকারী ও অর্থহীন ধারণাকারীদের দলে গণ্য হলো। আর কিছু লোক মধ্যমপন্থা অলম্বন করল, ফলে মেনে নিল (তথা এগুলোর ওপর ঈমান আনল)। আর এরাই হলো আহলুস সুন্নাহ ও সালাফে সালেহের ইমামগণ।'[২২৬]

ইবনুন নাজ্জারের উপরিউক্ত কিতাবের মূল হলো কাযী আলাউদ্দীন মারদাবী হাম্বলী রাহ. (মৃ. ৮৮৫ হি.)-এর 'আত-তাহবীর' কিতাবটি। এতে আহলুস সুন্নাহর মেনে নেওয়ার কথাটির ব্যাখ্যাসহ রয়েছে। মারদাবী লেখেন,

وَتَوَسَّطَ قَوْمٌ فَسَلَّمُوا فَأَمَرُّوهُ كَمَا جَاءَ، مَعَ اعْتِقَادِ التَّنْزِيهِ، وهم أهل السّنة، وأئمة السّلف الصّالح.

'কিছু লোক মধ্যমপন্থা অবলম্বন করল, ফলে মেনে নিল তথা এগুলো যেভাবে এসেছে সেভাবে রেখে দিল এবং (বাহ্যিক অর্থ ও সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য থেকে আল্লাহ তাআলা) পবিত্র থাকার আকীদা রাখল। আর এরাই হলো আহলুস সুন্নাহ ও সালাফে সালেহের ইমামগণ।'[২২৭]

একই ব্যাখ্যা আরেক হাম্বলী ফকীহ নাজমুদ্দীন তূফী রাহ.-ও (মৃ. ৭১৬ হি.) করেছেন।[২২৮]

ইমাম ইবনে আকীল হাম্বলী রাহ. (মৃ. ৫১৩ হি.) লেখেন,

---

২২৬. শারহুল কাওকাবিল মুনীর, ২/১৪১, মাকতাবাতুল আবীকান
২২৭. আত-তাহবীর, ৩/১৩৯৬, মাকতাবাতুর রুশদ
২২৮. দেখুন, শারহু মুখতাছারির রওযাহ, ২/৪৪

أخبار الآحاد إذا جاءت بما ظاهره التشبيه... اختلف الأصوليون في ذلك على ثلاثة مذاهب: فقوم قالوا بظاهرها، وضعَّفَ بأن ظاهرها يعطي الأعضاء والانتقالات... فقال ابن غنيمة: وحملها على الظاهر يوجب التشبيه، فلم يبق إلا التأويل، أو حملها على ما جاءت، لا على الظاهر.

সারাংশ : 'এগুলো যেভাবে এসেছে, সেভাবে রেখে দেবে; বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নেবে না। কারণ, এগুলোর বাহ্যিক অর্থ 'অঙ্গ' ইত্যাদি বোঝায়।'[২২৯]

ইস্তিওয়া-সংক্রান্ত আয়াতগুলোর ব্যাপারে হানাফী ফকীহ ও মুফাসসির আবুল লাইস সামারকান্দী রাহ. (মৃ. ৩৭৫ হি.) ও প্রখ্যাত মুফাসসির ইমাম কুরতুবী মালেকী রাহ. (মৃ. ৬৭১ হি.) বলেন,

ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ، هَذِهِ الْآيَةُ مِنَ الْمُشْكِلَاتِ، وَالنَّاسُ فِيهَا وَمَا شَاكَلَهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ، قَالَ بَعْضُهُمْ: نَقْرَؤُهَا وَنُؤْمِنُ بِهَا وَلَا نُفَسِّرُهَا، وَذَهَبَ إِلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ، وَهَذَا كَمَا رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى. قَالَ مَالِكٌ: الِاسْتِوَاءُ غَيْرُ مَجْهُولٍ، وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ، وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ، وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، وَأَرَاكَ رَجُلَ سَوْءٍ! أَخْرِجُوهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَقْرَؤُهَا وَنُفَسِّرُهَا عَلَى مَا يَحْتَمِلُهُ ظَاهِرُ اللُّغَةِ. وَهَذَا قَوْلُ الْمُشَبِّهَةِ.

'অনেকে বলেছেন, "আমরা এগুলো পড়ব, এগুলোর প্রতি ঈমান আনব এবং এর তাফসীর বা ব্যাখ্যা করব না।" (কুরতুবী বলেন, এটা অনেক ইমামের মাযহাব।) যেমন : ইমাম মালেক রাহ. থেকে বর্ণিত হয়েছে, "ইস্তিওয়া (শব্দের অর্থ) অজানা নয়; ধরন বোধগম্য নয়। (অর্থাৎ শব্দটির বাহ্যিক অর্থ আল্লাহ তাআলার শানে অসম্ভব।) এর প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব। আর এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদআত।" আর কতক বলেছেন, "আমরা এগুলো পড়ব এবং এগুলোর বাহ্যিক যে অর্থ রয়েছে, সে মতে ব্যাখ্যা করব।" এটা মুশাব্বিহা তথা সাদৃশ্যবাদীদের কথা।'[২৩০]

এ ছাড়া ইমাম কুরতুবী রাহ. (মৃ. ৬৭১ হি.) তাঁর শায়খ আবুল আব্বাস কুরতুবী মালেকী রাহ. (মৃ. ৬৫৬ হি.)-এর 'আল-মুফহিম' থেকে নকল করেন,

وَقَدْ عُرِفَ أَنَّ مَذْهَبَ السَّلَفِ تَرْكُ التَّعَرُّضِ لِتَأْوِيلِهَا، مَعَ قَطْعِهِمْ بِاسْتِحَالَةِ ظَوَاهِرِهَا، فَيَقُولُونَ: أَمِرُّوهَا كَمَا جَاءَتْ.

'সালাফের মাযহাব হলো, এগুলোর তাবীলের পেছনে না পড়া এবং **তাঁরা এগুলোর বাহ্যিক অর্থ (আল্লাহ তাআলার জন্য) অসম্ভব মনে করতেন।** তাঁরা বলতেন, "এগুলো যেভাবে এসেছে সেভাবে রেখে দাও।"'[২৩১]

---

২২৯. দেখুন, আল-মুসাওদাহ, আলে তাইমিয়া, পৃষ্ঠা ২৪৮, ২৪৯; আরও দেখুন, দাফউ শুবাহিত তাশবীহ, ইবনুল জাওযী হাম্বলী, পৃষ্ঠা ৭

২৩০. দেখুন, তাফসীরে সামারকান্দী (বাহরুল উলূম), ১/৩৯; তাফসীরে কুরতুবী, ১/২৫৪

২৩১. আল-মুফহিম, ৬/৬৯৭; তাফসীরে কুরতুবী, ৪/১৪

আরও কিছু উদ্ধৃতি দেখুন :

ইমাম গাযালী রাহ. (মৃ. ৫০৫ হি.) বলেন, 'আল-মানখূল মিন তা'লীকাতিল উসূল' (পৃষ্ঠা ২৫১)

وقد تحزب الناس فيه، فضلّ فريقٌ وأجروه على الظاهر، وتبعهم آخرون...

শাহরাস্তানী রাহ. (মৃ. ৫৪৮ হি.) বলেন, 'আল-মিলাল' (১/৯৩)

ثم إن جماعة من المتأخرين زادوا على ما قاله السلف، فقالوا لابد من إجرائها على ظاهرها، فوقعوا في التشبيه الصرف، وذلك على خلاف ما اعتقده السلف.

'পরবর্তীদের একদল, সালাফ যতটুকু বলেছে এর ওপর বৃদ্ধি করে বলেছে, "এগুলোকে বাহ্যিক অর্থে ব্যবহার করা জরুরি।" ফলে তারা সাদৃশ্যবাদে পতিত হলো।'

ইমাম নববী রাহ. (মৃ. ৬৭৬ হি.) বলেন, 'শারহে মুসলিম' (১৬/১৬৬)

وَأَنَّ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ يُمْسِكُ عَنْ تَأْوِيلِهَا، وَيَقُولُ: نُؤْمِنُ بِأَنَّهَا حَقٌّ، وَأَنَّ ظَاهِرَهَا غَيْرُ مُرَادٍ، وَلَهَا مَعْنًى يَلِيقُ بِهَا، وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ السَّلَفِ.

'একদল উলামা এগুলোর ব্যাখ্যা থেকে বিরত থেকে বলেন, "আমরা এগুলো সত্য মনে করে ঈমান আনি, তবে এগুলোর বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং তাঁর শান উপযোগী এগুলোর অর্থ রয়েছে।" এটাই অধিকাংশ সালাফের মাযহাব।'

ইবনে জামাআহ রাহ. (মৃ. ৭২৭ হি.) বলেন, 'ঈযাহুদ দলীল' (পৃষ্ঠা ১১৯)

ومن انتحل قول السلف وقال بتشبيه، أو تكييف، أو حمل اللفظ على ظاهره مما يتعالى الله عنه من صفات المحدثين: فهو كاذب في انتحاله، بريء من قول السلف واعتداله.

ইবনে হাজার হাইতামী রাহ. (মৃ. ৯৭৪ হি.) লেখেন, 'ফাতহুল ইলাহ' (১/৪৪৭)

لإجماعهم على صرف اللفظ عن ظاهره. وقد نقله القاري أيضا في "المرقاة".

'শব্দ থেকে বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য না নেওয়াটা সকলের ইজমা'।'

মোল্লা আলী কারী রাহ. (মৃ. ১০১৪ হি.) বলেন,

أَنَّ الْمَذْهَبَيْنِ مُتَّفِقَانِ عَلَى صَرْفِ تِلْكَ الظَّوَاهِرِ، كَالْمَجِيءِ، وَالصُّورَةِ، وَالشَّخْصِ، وَالرِّجْلِ، وَالْقَدَمِ، وَالْيَدِ، وَالْوَجْهِ، وَالْغَضَبِ، وَالرَّحْمَةِ، وَالِاسْتِوَاءِ عَلَى الْعَرْشِ، وَالْكَوْنِ فِي السَّمَاءِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُفْهِمُهُ ظَاهِرُهَا، لِمَا يَلْزَمُ عَلَيْهِ مِنْ مُحَالَاتٍ قَطْعِيَّةِ الْبُطْلَانِ تَسْتَلْزِمُ أَشْيَاءَ يُحْكَمُ بِكُفْرِهَا بِالْإِجْمَاعِ، فَاضْطَرَّ ذَلِكَ جَمِيعَ الْخَلَفِ وَالسَّلَفِ إِلَى صَرْفِ اللَّفْظِ عَنْ ظَاهِرِهِ.

'সালাফ ও খালাফ উভয় মাযহাবের সকলে এসব আয়াত ও হাদীসের বাহ্যিক অর্থ

পরিত্যাগের ব্যাপারে একমত। যেমন : আগমন, সূরত (আকার), শাখস (ব্যক্তি), পা, হাত, চেহারা, রাগ, রহমত, আরশের ওপর ইসতিওয়া, আসমানে থাকা ইত্যাদি। (এই শব্দগুলো থেকে বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া যাবে না।) কেননা, আল্লাহর জন্য এগুলোর বাহ্যিক অর্থ সাব্যস্ত করা অসম্ভব ও অকাট্যভাবে বাতিল; বরং এতে এমন কিছু বিষয় আবশ্যক হয়, যা সকলের ঐকমত্যে কুফর। এ জন্য সালাফ ও পরবর্তীগণ বাহ্যিক অর্থ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন।'[২৩২]

মাহমুদ খাত্তাব সুবকী মালেকী রাহ. (মৃ. ১৩৫২ হি.) লেখেন,

وقامت الدلائل القاطعة على امتناع ظاهره في حق الله تعالى، ولذا أجمع السلف والخلف على تأويله تأويلا إجماليا بصرف اللفظ عن ظاهره المحال على الله تعالى؛ لقيام الأدلة القاطعة على أنه تعالى ليس كمثله شيء.

'এগুলো থেকে বাহ্যিক অর্থ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে অকাট্য দলীল প্রতিষ্ঠিত আছে। এ কারণেই সালাফ ও খালাফ উভয়ে একমত হয়েছেন যে, এগুলোর 'ইজমালী তাবীল' করা তথা আল্লাহ তাআলার জন্য অসম্ভব এই বাহ্যিক অর্থ থেকে শব্দকে ফেরানো।'[২৩৩]

উল্লেখ্য, এগুলো থেকে বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য না নেওয়া বা বাহ্যিক অর্থ থেকে এই শব্দগুলো ফেরানোকে কেউ কেউ 'ইজমালী তাবীল' পরিভাষায় ব্যক্ত করে থাকেন।

সারকথা, কুরআন-হাদীসে আল্লাহর হাত, চোখ এবং আরশের ওপর, আসমানে অবতরণ ইত্যাদি বিষয় যেগুলো এসেছে, সেগুলো আরবী ভাষায় হুবহু বলা যাবে এবং বিশ্বাস করতে হবে। তবে সেগুলো থেকে আভিধানিক ও বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া যাবে না এবং উক্ত অর্থে আকীদা পোষণ করা যাবে না।

এখন প্রশ্ন হলো, এগুলোর কোন অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া যাবে এবং কী অর্থে আকীদা পোষণ করা যাবে?

এখানে এর সংক্ষিপ্ত উত্তর হলো, এগুলোর ক্ষেত্রে 'তাফবীয' করা অথবা প্রয়োজন হলে তাবীল-ব্যাখ্যা করা। আর 'তাফবীয' হলো তিন জিনিসের নাম :

১. এ-জাতীয় শব্দগুলো যেভাবে এসেছে, কোনো বেশ-কম ছাড়া হুবহু সে শব্দগুলো বিশ্বাস করে পাঠ করা।

২. এ-জাতীয় শব্দগুলো থেকে আভিধানিক ও বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং এ ধরনের অর্থ থেকে আল্লাহ তাআলা চিরপবিত্র ও বহু ঊর্ধ্বে—এমন আকীদা রাখা।

---

২৩২. মিরকাতুল মাফাতীহ, ৩/৯২৪

২৩৩. ইতহাফুল কায়িনাত বি-বয়ানি মাযহাবিস সালাফ ওয়াল খালাফ ফীল মুতাশাবিহাত, পৃষ্ঠা ২০৯; একই কথা বলেছেন সাঈদ রমজান বূতীও 'কুবরাল ইকীনিয়্যাতিল কাওনিয়্যাহ' গ্রন্থে, পৃষ্ঠা ১৩৭

৩. এ-জাতীয় শব্দগুলো থেকে আল্লাহ তাআলা (ও তাঁর রাসূল) যে অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন, সেটার ওপর ঈমান আনা।

কেননা, আল্লাহ তাআলার শান উপযোগী এগুলোর অর্থ রয়েছে, যে সম্পর্কে আমরা জ্ঞাত নই; বরং তিনিই অবগত। কাজেই এগুলোর সংগত অর্থ সম্পর্কে তিনিই জানেন, এমন বিশ্বাস রেখে সেগুলোর বিষয় তাঁর ওপর হাওয়ালা করা।

তবে এগুলোর সংগত অর্থ জানা না থাকলেও, এগুলোর আগের-পরের বাক্যগুলো দেখলে আয়াত ও হাদীসের মূল উদ্দেশ্য এবং আমাদের করণীয় বোঝা যায়। এ বিষয়ে আরও বিশদভাবে সিফাতের আলোচনায় উপস্থাপন করা হবে।

প্রশ্ন: ইমাম খাত্তাবী রাহ.-সহ (মৃ. ৩৮৮ হি.) অনেকে বলেছেন,

كان مذهب السلف فيها الإيمان بها وإجراؤها على ظاهرها، ونفي الكيفية عنها.

'সালাফের মাযহাব হলো, এগুলোর ওপর ঈমান আনা এবং বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা।'

উত্তর: এর উদ্দেশ্য বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা নয়; বরং শব্দগুলো বাহ্যিকরূপে রেখে দেওয়া। যেমন : স্বয়ং ইমাম খাত্তাবী রাহ. অন্যত্র বলেছেন,

هَذَا الْحَدِيثُ مِمَّا تَهَيَّبَ الْقَوْلَ فِيهِ شُيُوخُنَا، فَأَجْرَوْهُ عَلَى ظَاهِرِ لَفْظِهِ، وَلَمْ يَكْشِفُوا عَنْ بَاطِنِ مَعْنَاهُ.

'এই হাদীস নিয়ে আমাদের শায়খগণ কথা বলতে ভয় করেছেন। ফলে তাঁরা এর শব্দ বাহ্যিকভাবে রেখে দিয়েছেন এবং এর অর্থের গভীরতা অনুসন্ধান করেননি।'[২৩৪]

খাত্তাবী রাহ. অন্য কিতাবে বলেন,

هذا الكلام إذا أُجْرِيَ على ظاهره كان فيه نوعٌ من الكيفية، والكيفية عن الله سبحانه وصفاتِه منفيةٌ.

'এই কথাটিকে বাহ্যিক অর্থে নিলে, এতে এক প্রকারের ধরন সাব্যস্ত হয়। অথচ আল্লাহ তাআলার সত্তা ও তাঁর সিফাত ধরন থেকে মুক্ত।'[২৩৫]

এভাবে ইমামুল হারামাইন জুয়াইনী রাহ. (মৃ. ৪৭৮ হি.) বলেন,

وَذَهَبَ أَئِمَّةُ السَّلَفِ إِلَى الِانْكِفَافِ عَنِ التَّأْوِيلِ، وَإِجْرَاءِ الظَّوَاهِرِ عَلَى مَوَارِدِهَا، وَتَفْوِيضِ مَعَانِيهَا إِلَى الرَّبِّ تَعَالَى.

'সালাফের মাযহাব হলো, এগুলোর ব্যাখ্যা থেকে বিরত থাকা। শব্দগুলো

---

২৩৪. আ'লামুল হাদীস, ৩/১৯৩০; আল-আসমা ওয়াস সিফাত, বায়হাকী ২/১৮০; শারহুস সুন্নাহ, বাগাভী ১৫/১৪২

২৩৫. মাআলিমুস সুনান, ৪/৩২৮

বাহ্যিকভাবে রেখে দেওয়া এবং এগুলোর অর্থ আল্লাহ তাআলার ওপর ন্যস্ত করা।'[২৩৬]

তাঁকে দেহ, অঙ্গ, সূরতধারী বা সাকার মনে করা বিদআত বা কুফর

ইমামগণ আল্লাহ তাআলাকে শুধু দেহ-শরীর, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং সূরত-রূপ ও আকার-আকৃতি বা সাকার থেকে মুক্ত ও পবিত্র বলে ক্ষান্ত হননি; বরং যারা এ ধরনের আকীদা রাখবে তাদেরকে বিদআতী বা কাফের হওয়ার ফতোয়া দিয়েছেন।

ইবনুল হুমাম রাহ. (মৃ. ৮৬১ হি.) 'খুলাসা' গ্রন্থ থেকে নকল করে বলেন,

وَالْمُشَبِّه إِذَا قَالَ: لَهُ تَعَالَى يَدٌ وَرِجْلٌ كَمَا لِلْعِبَادِ: فَهُوَ كَافِرٌ مَلْعُونٌ.

'সাদৃশ্যবাদী যদি বলে, বান্দার মতো আল্লাহ তাআলার হাত ও পা আছে, তাহলে সে অভিশপ্ত কাফের।'[২৩৭]

ফিকহে হানাফীর 'আদ-দুররুল মুখতার' গ্রন্থে রয়েছে,

(وَإِنْ) أَنْكَرَ بَعْضَ مَا عُلِمَ مِنَ الدِّينِ ضَرُورَةً (كَفَرَ بِهَا) كَقَوْلِهِ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى جِسْمٌ كَالْأَجْسَامِ.

'কেউ যদি জরুরিয়াতে দ্বীনের কোনো কিছু অস্বীকার করে, তাহলে কাফের হয়ে যাবে। যেমন : আল্লাহ তাআলাকে দেহসমূহের মতো দেহবিশিষ্ট বলা।'[২৩৮]

ফকীহ ইবনে নুজাইম মিসরী হানাফী রাহ. (মৃ. ৯৭০ হি.) লেখেন,

فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَكْفُرُ فِي لَفْظَيْنِ: هُوَ جِسْمٌ كَالْأَجْسَامِ، هُوَ جِسْمٌ، وَيَصِيرُ مُبْتَدِعًا فِي الثَّالِثِ هُوَ جِسْمٌ لَا كَالْأَجْسَامِ.

সারকথা : 'দুইভাবে বললে কাফের হয়ে যাবে। ১. আল্লাহ তাআলাকে অন্য দেহসমূহের মতো দেহবিশিষ্ট বলা, ২. তাঁকে শুধু দেহবিশিষ্ট বলা।

আর যদি বলে, আল্লাহ তাআলা দেহবিশিষ্ট তবে অন্য দেহসমূহের মতো নয়, তাহলে সে বিদআতী।'[২৩৯]

যারা আল্লাহ তাআলার জন্য সূরত সাব্যস্ত করেন বা সাকার বলেন, তাদের বিষয়ে ইমাম আবুল মুযাফফার ইসফারায়িনী রাহ. (মৃ. ৪৭১ হি.) সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত উল্লেখ করে 'আল-আওসাত' গ্রন্থে বলেন,

واتفقوا على أن من قال بالصورة والتركيب: فهو مشبه، مثل طبقة من اليهود.

---

২৩৬. আল-আকীদাতুন নিযামিয়্যাহ, জুয়াইনী, পৃষ্ঠা ৩২; ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার ১৩/৪০৭
২৩৭. ফাতহুল কাদীর, ১/৩৫০
২৩৮. ফাতাওয়া শামী, ১/৫৬১
২৩৯. আল-বাহরুর রায়েক, ১/৬১২

‘তাঁরা (ইমামগণ) এ বিষয়ে একমত যে, কেউ যদি (আল্লাহর) সূরত ও গঠন রয়েছে বলে, তাহলে সে মুশাব্বিহ বা সাদৃশ্যবাদী; যা ইহুদীদের একশ্রেণি বলে থাকে।’[২৪০]

ইমাম কুরতুবী রাহ. (মৃ. ৬৫৬ হি.) বলেন,

والغالب على اليهود أنهم يعتقدون الجسمية، وأن الله تعالى شخص ذو جوارح، كما تعتقده غلاة الحشوية في هذه الملة.

‘ইহুদীরা প্রবলভাবে দেহবাদে বিশ্বাসী। (তারা বিশ্বাস করে,) আল্লাহ তাআলা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবিশিষ্ট সত্তা। যেভাবে ইসলামে কট্টর হাশাবীরা এ আকীদায় বিশ্বাসী।’[২৪১]

প্রথমত : দেহ, অঙ্গ, সূরত বা আকার-আকৃতি এগুলো মাখলূক ও সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য এবং এগুলো মাখলূকের মুখাপেক্ষিতা ও নশ্বরতার প্রকাশ, যা থেকে খালেক ও স্রষ্টা চিরপবিত্র।

দ্বিতীয়ত : দেহ, অঙ্গ, সূরত বা আকার-আকৃতি এসব হলো সাদৃশ্যের দৃশ্যমান ও প্রকাশ্য দিক এবং তাঁকে নিয়ে কল্পনার জগতে প্রবেশের প্রধান রাস্তা ও বড় ক্ষেত্র।

অথচ সৃষ্টির কোনো কিছুই, কোনোভাবেই আল্লাহ তাআলার সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে না এবং তিনি ও তাঁর সত্তার হাকীকত এতটাই অনন্য যে, কল্পনার মাধ্যমে তাঁকে ধরা যায় না, অনুমান করা যায় না। যদিও কল্পনাশক্তি দিয়ে কত অবাস্তব বিষয়ের ছবি আঁকা যায় এবং অনুমান করা যায়; কিন্তু তাঁকে অনুমান করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। কেননা, তিনি তো অন্য কিছুর মতো নন, যার সাথে তুলনা করে তাঁকে অনুমান করা যাবে। তাই তো ইমাম তাহাবী রাহ. বলেছেন,

لَا تَبْلُغُهُ الْأَوْهَامُ، وَلَا تُدْرِكُهُ الْأَفْهَامُ. وَلَا يُشْبِهُهُ الْأَنَامُ.

‘(কারও) জল্পনা-কল্পনাসমূহ তাঁর কাছে পৌঁছাতে পারে না এবং (কারও) বোধ-বুদ্ধিসমূহ তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না। (কেননা,) মাখলূক ও সৃষ্টি (-এর কোনো কিছুই, কোনোভাবেই) তাঁর সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে না।’

এ কারণেই হাদীসে আল্লাহ ও তাঁর সত্তা নিয়ে চিন্তা করতে নিষেধ করা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে,

لَا تَفَكَّرُوا فِي اللهِ، وَتَفَكَّرُوا فِي خَلْقِ اللهِ.

‘তোমরা আল্লাহকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা কোরো না; বরং তাঁর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করো।’

---

২৪০. আল-কিতাবুল মুতাওয়াসসাত, ইবনুল আরবী, পৃষ্ঠা ১৩৮, টীকা ২; আরও দেখুন, আন-নূরুল লামি’, নাসিরী, পৃষ্ঠা ১৫৭; শারহুল আকীদাতিত তাহাবীয়্যাহ, বাবিরতী, পৃষ্ঠা ৩২

২৪১. আল-মুফহিম, ৭/৩৮৯

এভাবে ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন,

تفكّروا في كلّ شيء ولا تفكّروا في ذات الله.

'তোমরা সবকিছু নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করো, কিন্তু আল্লাহর সত্তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা কোরো না।'[২৪২]

সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর সত্তা নিয়ে চিন্তা ও কল্পনা করা নিষেধ।

কিন্তু কতক লোক আল্লাহকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে ও কল্পনা করে গোমরাহীর শিকার হয়েছে। আসমানী শরীয়তধারীদের মাঝে সর্বপ্রথম এই ভ্রান্তির শিকার হয়েছে ইহুদীরা। ফলে তারা মুজাসসিমাহ (দেহবাদী) হিসেবে প্রসিদ্ধ হয়েছে।

এভাবে এ উম্মতে মুসলিমাহর মধ্য থেকে মুজাসসিমাহ বা দেহবাদীরা আল্লাহকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও জল্পনা-কল্পনা করে পথভ্রষ্ট ও ভ্রান্ত দলসমূহের তালিকায় নাম লিখিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তিনটি প্রশ্নোত্তর[২৪৩]

১. প্রসঙ্গ : অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য বোঝায় এমন শব্দগুলোর অনুবাদ করা

প্রশ্ন: অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য বোঝায় এমন শব্দগুলোর সম্বন্ধ যদি আল্লাহর দিকে হয়, তাহলে শব্দগুলোর অনুবাদ করা বৈধ হবে কি না? যেমন : কুরআন-হাদীসে আল্লাহ তাআলার শানে যে 'ইয়াদ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, এর অনুবাদ হিসেবে 'হাত' বলা, তিনি আসমানে 'নুযূল' করেন—এর অনুবাদ হিসেবে 'অবতরণ' বলা ইত্যাদি।

উত্তর : হুবহু এই প্রশ্ন ও তার উত্তর সদরুল ইসলাম বাযদাবী হানাফী রাহ. (মৃ. ৪৯৩ হি.) তাঁর কিতাবে তুলে ধরেছেন। তিনি লেখেন,

وهل يجوز إطلاق هذه الصفات بلسان سوى لسان العرب؟ بعض أهل السنة والجماعة قالوا: يجوز ذلك ولكن بشرط أن لا يعتقد أنه جارحة، وبعضهم احتاطوا. وقالوا: لا يجوز. وهو الصحيح.

'এ শব্দগুলোর অনুবাদ অনারবী ভাষায় বলা যাবে কি না?

এ বিষয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর একদল বলেছেন, অঙ্গ মনে না করার শর্তে বলা বৈধ। আরেক দল সতর্কতাবশত অবৈধ বলেছেন। (বাযদাবী বলেন,

---

২৪২. দেখুন, হিলয়াতুল আওলিয়া, আসবাহানী, ৬/৬৬; আল-আসমা ওয়াস সিফাত, বায়হাকী, ২/৪৬। হাদীসটির বিশুদ্ধতা নিয়ে ইমামগণ কথা বললেও ইমাম সাখাবী রাহ. বলেন, হাদীসটি একাধিক দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে। ফলে একটি আরেকটিকে শক্তিশালী করে এবং এর অর্থ সঠিক। (আল-মাকাসিদুল হাসানাহ, হাদীস নং : ৩৪২)

২৪৩. ইলজামুল আওয়াম আন ইলমিল কালাম, পৃষ্ঠা ৫২

আমার কাছে) এটাই বিশুদ্ধ।'[২৪৪]

তবে উলামায়ে কেরামের তাআমুল হলো, অনুবাদ করা। তাই কুরআনের তাফসীরে এবং হাদীসের বঙ্গানুবাদে এগুলোর অনুবাদ দেখা যায়। সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে এ পর্যন্ত উলামায়ে কেরাম এর ওপরই আমল করে আসছেন। তাই এর বৈধতা উম্মতের ধারাবাহিক আমল দ্বারা প্রমাণিত।

আর আরবীতে 'ইয়াদ' বলে যদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উদ্দেশ্য নয়—এমন বলতে হয় (যেটা আহলুস সুন্নাহর সবাই বলেন), তো এটাকে বাংলায় শুধু 'ইয়াদ'-এর বাংলা প্রতিশব্দ 'হাত' হিসেবে অনুবাদ করে 'অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নয়' এমন সতর্কবাণী যোগ করে দিলেই হয়। ফলে আরবীতে যদি এটা বলা যায়, বাংলাসহ অন্যান্য ভাষায়ও অনুবাদ করতে পারা উচিত।

সুতরাং অনারবদেরকে বোঝানোর জন্য ভিন্ন ভাষায় সমার্থক শব্দে এসবের অনুবাদ করা বৈধ। তবে অনুবাদের ক্ষেত্রে সতর্কতা কাম্য। কেননা, ভাষাগত বিচারে এসব শব্দের একাধিক সহীহ্ অর্থের সম্ভাবনা আছে, কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে কোনো অর্থই সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত নয়, ফলে এগুলোর উদ্দিষ্ট অর্থ নির্ধারণ করা জটিল।

এ কারণেই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের কেউ কেউ সতর্কতাবশত এ ধরনের মুতাশাবিহ (দ্ব্যর্থবোধক) শব্দের কোনোরূপ অনুবাদ করা থেকেই বিরত থেকেছেন এবং হুবহু শব্দ উচ্চারণ করাকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। তবে আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআহ্র অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম উপযোগী শব্দে অনুবাদ করাকে নিষেধ করেননি। যদিও শব্দের অনুবাদের ক্ষেত্রে তাঁদের কেউ কেউ এসবের শাব্দিক ও মূলানুগ অনুবাদ করেছেন এবং কেউ ভাবানুবাদ করেছেন।

এ ধরনের প্রসিদ্ধ একটি বাক্য হলো,

اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ

এ বাক্যে কিছু আহলে ইলম সতর্কতাবশত অন্য ভাষায় এর অনুবাদ করা থেকে বিরত থেকেছেন এবং হুবহু আরবী শব্দ ব্যবহার করে অনুবাদ করেছেন, 'তিনি আরশে ইস্তিওয়া করেছেন।'

আর বাংলায় এর সম্ভাব্য অনুবাদ হতে পারে, তিনি আরশের ওপর সমুন্নত বা হুকুমতের তখ্‌তে অধিষ্ঠিত কিংবা আধিপত্য বা রাজত্ব কায়েম করলেন।

কিন্তু তিনি আরশে বসেছেন, আসীন হয়েছেন, আরশের ওপর উঠেছেন, আরোহণ করলেন ইত্যাদি অনুবাদ করা সঠিক নয়, বরং বিভ্রান্তিকর। যিনি সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য থেকে

---

২৪৪. উসূলুদ্দীন, পৃষ্ঠা ৩৯

চিরপবিত্র, তাঁর শানে এ ধরনের অনুবাদ চলে না।

উল্লেখ্য, যেসব শব্দ ও বিশেষণের অর্থ সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট, সেগুলোর সমার্থক শব্দে অনুবাদ করতে সমস্যা নেই। যেমন : কুদরত অর্থ শক্তি ও ক্ষমতা, ইলম অর্থ জ্ঞান, ইরাদাহ ও মাশিয়্যাত অর্থ ইচ্ছা, সামীউন অর্থ যিনি শোনেন, বাসীরুন অর্থ যিনি দেখেন এবং কালাম ও কওল অর্থ কথা বলা।[২৪৫]

অনুরূপ আল্লাহ্ তাআলার নামও অন্য ভাষায় অনুবাদ করা যাবে। যেমন : 'খোদা', 'গড' ইত্যাদি বলা। তবে উপযুক্ত শব্দে অনুবাদ করতে হবে।[২৪৬]

২. প্রসঙ্গ : এগুলো আলোচনার সময় হাত দেখিয়ে ইশারা করা বা অঙ্গভঙ্গি করা

প্রশ্ন : কুরআন-হাদীসে বর্ণিত আল্লাহ্ তাআলার হাত, চোখ, আঙুল ইত্যাদি আলোচনা করার সময় নিজের হাত দিয়ে ইশারা করা বা অঙ্গভঙ্গি করে ও দেহ সঞ্চালন করে ইঙ্গিত করার বিধান কী?

যেমন : বক্তা সাহেব আলোচনা করার সময় নিজের হাত দেখিয়ে বলা যে, আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, خَلَقْتُ بِيَدَيَّ 'আমি আমার দুই হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছি।'[২৪৭]

অথবা নিজের হাতের দুই আঙুল নাড়াতে নাড়াতে বলা যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'সমস্ত কলব আল্লাহর এই দুই আঙুলের মাঝে একটা কলবের মতো।'

অনুরূপ 'আল্লাহ্ দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন' বলার পর মিম্বার বা সিঁড়ি থেকে নেমে দেখানো, অথবা নিজের হাত দিয়ে ঝাঁকি দিয়ে বলা, 'আল্লাহ্ এ রকমভাবে আসমান-জমিন ঝাঁকাবেন।'

উত্তর : বয়ান ও আলোচনা করার সময় নিজের হাত দিয়ে ইশারা করা বা অঙ্গভঙ্গি করে ও দেহ সঞ্চালন করে ইঙ্গিত করা কঠিনভাবে নিষেধ। কেননা, এতে শ্রোতাদের কাছে আল্লাহ্ তাআলারও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য থাকার ধারণা হতে পারে এবং তারা তাশবীহের (সাদৃশ্যের) সংশয়ে পতিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই সালাফের অনেকেই এ ব্যাপারে কঠিন ভাষা ব্যক্ত করেছেন।

ইমাম মালেক রাহ. (মৃ. ১৭৯ হি.) বলেছেন,

---

২৪৫. দেখুন, ইলজামুল আওয়াম আন ইলমিল কালাম, গাযালী, পৃষ্ঠা ৬৬-৬৯, ৭৯-৮০; আল-আসনা, কুরতুবী, পৃষ্ঠা ২০; বয়ানুল কুরআন, থানভী (সূরা আলে ইমরানে বর্ণিত মুতাশাবিহা-সংক্রান্ত আয়াতের তাফসীর), বাওয়াদিরুন নাওয়াদির, ২/৬১৭, ৭৫২-৭৫৪; মাআরিফুস সুনান, বানূরী, ৪/১৫৬

২৪৬. দেখুন, লাওয়ামিউল বায়্যিনাত, ফখরুদ্দীন রাযী, পৃষ্ঠা ২১; শারহুল মাওয়াকিফ, ইজী, ৮/২৩২; বয়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ, ইবনে তাইমিয়া, ৪/৩৮৯

২৪৭. সূরা ছদ (৩৮) : ৭৫

مَنْ وَصَفَ شَيْئًا مِنْ ذَاتِ اللهِ مِثْلَ قَوْلِهِ: وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةٌ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى عُنُقِهِ، وَمِثْلَ قَوْلِهِ: وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، فَأَشَارَ إِلَى عَيْنَيْهِ أَوْ أُذُنِهِ أَوْ شَيْئًا مِنْ بَدَنِهِ: قُطِعَ ذَلِكَ مِنْهُ، لِأَنَّهُ شَبَّهَ اللهَ بِنَفْسِهِ.

'কেউ যদি আল্লাহর সত্তার কোনো কিছুর বিবরণ দিতে গিয়ে বলে, "ইহুদীরা বলেছে, আল্লাহর হাত রুদ্ধ।" এরপর নিজের হাত দিয়ে গলার দিকে ইশারা করে, অথবা বলে, "আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।" আর নিজের হাত বা কান কিংবা শরীরের অন্য কোনো দিকে ইশারা করে, তাহলে তার সেটা (হাত-কান) কেটে দেওয়া উচিত। কারণ, সে আল্লাহকে নিজ সত্তার সাথে তাশবীহ্ দিয়েছে।'[২৪৮]

আহমদ বিন ইয়াকুব বিন যাযান বলেন,

بلغني أن أحمد بن حنبل قرأ عليه رجل: وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، قَالَ: ثُمَّ أَوْمَأَ بِيَدِهِ، فَقَالَ لَهُ أَحْمَدُ: قَطَعَهَا اللهُ قَطَعَهَا اللهُ، ثُمَّ حَرَدَ وَقَامَ.

'আমার কাছে পৌঁছেছে যে, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহ. (মৃ. ২৪১ হি.)-এর সামনে এক ব্যক্তি এই আয়াত পড়ল, "তারা আল্লাহর যথোচিত সম্মান করেনি। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয় এবং আকাশমণ্ডলী ভাঁজ করা থাকবে তাঁর ডান হাতে।" এরপর সে তার হাত দিয়ে ইশারা করল। এটা দেখে ইমাম আহমদ বলে উঠলেন, "আল্লাহ্ ওই হাতকে কেটে নিন, আল্লাহ্ ওই হাতকে কেটে নিন।" তারপর তিনি রাগান্বিত হয়ে (সেখান থেকে) উঠে পড়লেন।'[২৪৯]

শাহরাস্তানী রাহ. (মৃ. ৫৪৮ হি.) কয়েকজন ইমামের নাম উল্লেখ করে বলেন,

وكانوا يحترزون عن التشبيه إلى غاية أن قالوا: من حرك يده عند قراءته قوله تعالى: (خَلَقْتُ بِيَدَيَّ) أو أشار بإصبعيه عند روايته: (قَلْبُ ابْنِ آدَمَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ): وجب قطع يده وقلع أصبعيه.

'তাঁরা (ইমামগণ) তাশবীহ্ তথা আল্লাহ্ তাআলার সাদৃশ্য দেওয়া থেকে বিরত থাকতেন। এমনকি তাঁরা বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার বাণী "আমি আমার দুই হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছি" বলার সময় তার হাত নড়াচড়া করবে অথবা নবীজীর হাদীস "মানুষের কলব আল্লাহর দুই আঙুলের মাঝে" বর্ণনা করার সময় তার আঙুল দ্বারা ইশারা-ইঙ্গিত করবে, তার হাত কেটে ফেলা ও আঙুল উপড়ে ফেলা আবশ্যক।'[২৫০]

প্রশ্ন হতে পারে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কিছু বিষয় বর্ণনার সময়

---

২৪৮. আত-তামহীদ, ইবনে আব্দিল বার, ৭/১৪৫

২৪৯. শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাহ, লালকায়ী, বর্ণনা নং ৭৩৯; সুরা যুমার (৩৯) : ৬৭

২৫০. আল-মিলাল ওয়ান-নিহাল, ১/১০৪

হাত দিয়ে ইশারা করেছেন, যেমন : দাজ্জালের ডান চোখ কানা হওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করতে গিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহীহ হাদীসে বলেন,

إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى عَيْنِهِ.

'নিশ্চয় আল্লাহ কানা নন। এটা বলে তিনি নিজের চোখের দিকে হাত দিয়ে ইশারা করলেন।'

এ ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী?

উত্তর : এ হাদীসের ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেন,

وَقَدْ سُئِلْتُ: هَلْ يَجُوزُ لِقَارِئِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنْ يَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَجَبْتُ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ: أَنَّهُ إِنْ حَضَرَ عِنْدَهُ مَنْ يُوَافِقُهُ عَلَى مُعْتَقَدِهِ، وَكَانَ يَعْتَقِدُ تَنْزِيهَ اللهِ تَعَالَى عَنْ صِفَاتِ الْحُدُوثِ، وَأَرَادَ التَّأَسِّي مَحْضًا: جَازَ، وَالْأَوْلَى بِهِ: التَّرْكُ؛ خَشْيَةَ أَنْ يُدْخِلَ عَلَى مَنْ يَرَاهُ شُبْهَةَ التَّشْبِيهِ، تَعَالَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ.

'আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, এই হাদীস পাঠকারীর জন্য এভাবে ইশারা করা বৈধ হবে কি না, যেভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়াসাল্লাম করেছেন (তথা নিজের চোখের দিকে ইশারা করা)।'

ইবনে হাজার রাহ. বলেন, 'আল্লাহর তাওফীকে আমি উত্তর দিয়েছি, যদি তার নিকট এমন ব্যক্তিরাই উপস্থিত থাকে, যারা তার মতো আকীদা রাখে তথা আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ) থেকে পবিত্র হওয়ার আকীদা রাখে, আর পাঠকারী যদি ইশারার দ্বারা কেবল আল্লাহর রাসূলের অনুসরণের ইচ্ছা করেন, তাহলে বৈধ হবে; তবে উত্তম হলো তরক করা। কেননা, যে ব্যক্তি এটা দেখবে, সে তাশবীহের (সাদৃশ্যের) সংশয়ে পতিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।'[২৫১]

অর্থাৎ রাসূলের অনুসরণ যদিও উত্তম কাজ, কিন্তু আকীদার হেফাজত করা জরুরি।

৩. প্রসঙ্গ : 'নিরাকার' বলা

প্রশ্ন : আল্লাহ তাআলা যেহেতু সাকার নন বা সূরত-রূপ ও আকার-আকৃতি থেকে পবিত্র, তাহলে তাঁকে 'নিরাকার' বলা যাবে কি না?

উত্তর : 'নিরাকার' শব্দটির দুটি অর্থ হতে পারে :

১. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও দৃশ্যমান আকারবিহীন হওয়া; যেমন : বাতাস, গ্যাস, বিদ্যুৎ বা এ-জাতীয় যত বস্তু আছে। এই অর্থে আল্লাহ তাআলাকে 'নিরাকার' বা 'আকারবিহীন'

---

২৫১. ফাতহুল বারী, ১৩/৩৯০

কিংবা তাঁর 'আকার নেই' বলার কোনো সুযোগ নেই।

২. 'নিরাকার'-এর আরেক অর্থ হলো, আল্লাহ্ তাআলা এমন এক পবিত্র সত্তা, যিনি দেহ ও সকল ধরনের আকার-আকৃতি-সূরত-রূপ ইত্যাদি থেকে মুক্ত ও পবিত্র। এমনকি তিনি দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং সময় ইত্যাদি—যা সৃষ্টির জন্য প্রযোজ্য—এসবেরও ঊর্ধ্বে। এই অর্থে আল্লাহ তাআলাকে 'নিরাকার' বলা যাবে, তবে না বলা ভালো।

আল্লাহ্ সাকার না হলে জান্নাতে তাঁর দর্শনলাভ কীভাবে হবে?

এখন প্রশ্ন হলো, আল্লাহ্ যদি সাকার না হন বা তাঁর সূরত-আকৃতি না থাকে, তাহলে জান্নাতে আল্লাহর দর্শনলাভ কীভাবে সম্ভব হবে?

উত্তর হচ্ছে, জান্নাতবাসীরা আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখতে পাবেন আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছানুযায়ী, যার কোনো ধরন নেই। ইমাম আবু হানীফা রাহ. বলেন,

ولقاءُ الله تعالى لأهلِ الجنَّةِ حقٌّ، بلا كيفيَّةٍ ولا تشبيهٍ ولا جِهَةٍ.

'জান্নাতবাসীর জন্য আল্লাহ্ তাআলার দর্শন সত্য, তবে কোনো ধরন, সাদৃশ্য ও দিক ব্যতীত।'[২৫২]

ইমাম তাহাবী রাহ. (মৃ. ৩২১ হি.) তাঁর বিখ্যাত 'আকীদা' গ্রন্থে বলেন,

وَالرُّؤْيَةُ حَقٌّ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ إِحَاطَةٍ وَلَا كَيْفِيَّةٍ، كَمَا نَطَقَ بِهِ كِتَابُ رَبِّنَا: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ () إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾، وَتَفْسِيرُهُ عَلَى مَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى وَعَلِمَهُ. وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَعْنَاهُ عَلَى مَا أَرَادَ.

'জান্নাতবাসীর জন্য আল্লাহর দর্শন সত্য—কোনো রকমের পরিবেষ্টন ও ধরন-স্বরূপ ব্যতীত। যেভাবে কুরআন বলেছে, "সেদিন অনেক চেহারা উজ্জ্বল হবে, যারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।"[২৫৩] আর এর ব্যাখ্যা তা-ই, যা আল্লাহ তাআলা উদ্দেশ্য নিয়েছেন এবং তিনিই এ বিষয়ে জানেন। এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত সহীহ্ হাদীসে যা এসেছে, তা তিনি যেমনটা বলেছেন এবং এর অর্থ সেটাই, যা তিনি উদ্দেশ্য নিয়েছেন।'

ইমাম আবু মানসুর মাতুরীদী রাহ.-ও (মৃ. ৩৩৩ হি.) ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম তাহাবীর মতো একই কথা বলেছেন। তিনি 'কিতাবুত তাওহীদ' গ্রন্থে লেখেন,

فإن قيل: كيف يرى؟ قيل: بلا كيف؛ إذ الكيفية تكون لذي صورة، بل يرى بلا وصف قيام وقعود، واتكاء وتعلق، واتصال وانفصال، ومقابلة ومدابرة، وقصير وطويل، ونور وظلمة، وساكن

---

২৫২. কিতাবুল ওসিয়্যাহ, আকীদা নং ২৪-এর সূত্রে মাজমুউ কুতুব ওয়া রাসায়িল ওয়া ওসায়াল ইমামিল আযম, পৃষ্ঠা ৪৬২

২৫৩. সূরা কিয়ামাহ, (৭৫) : ২২-২৩

ومتحرك، ومماس ومباين، وخارج وداخل. ولا معنى يأخذه الوهم أو يقدره العقل؛ لتعاليه عن ذلك.

'যদি প্রশ্ন করা হয়, (পরকালে) আল্লাহ্ তাআলাকে কীভাবে দেখা যাবে?

উত্তর হলো, কোনো কাইফ বা ধরন ছাড়া দেখা যাবে। কেননা, ধরন হয় সূরত বা আকৃতিবিশিষ্ট বস্তুর। আল্লাহর দর্শনলাভ হবে দাঁড়ানো বা বসা, হেলান দেওয়া বা যুক্ত থাকা, মিলিত বা পৃথক থাকা, সামনে বা পেছনে থাকা, লম্বা বা খাটো হওয়া, অন্ধকার বা আলোতে থাকা, স্থির বা গতিশীল হওয়া, স্পর্শে বা দূরত্বে থাকা, ভেতরে বা বাইরে থাকা (এ-জাতীয় সব ধরনের সৃষ্টির) গুণ-অবস্থা ব্যতিরেকে। (সৃষ্টিকে দেখতে হলে এসব সীমাবদ্ধতা থাকে, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার ক্ষেত্রে এগুলো কল্পনাও করা যাবে না।)

আমাদের ধারণা বা চিন্তাশক্তি (কোনো কিছু দেখার জন্য) যা কিছু কল্পনা করে, এসব থেকে আল্লাহ্ তাআলা চিরপবিত্র।'[২৫৪]

ইমাম আশআরী রাহ. (মৃ. ৩২৪ হি.)-এর ভাষ্যও একই। ইমাম ইবনে আসাকির রাহ. (মৃ. ৫৭১ হি.) লেখেন,

قالت الحشويّة المشبِّهة: إنّ الله سبحانه وتعالى يُرى مكيَّفًا محدودًا كسائر المرئيات، وقالت المعتزلة والجهمية والنجارية: إنّه سبحانه لا يُرى بحال من الأحوال، فسلك – الأشعري – رضي الله عنه طريقة بينهما فقال: يُرى من غير حلول، ولا حدود، ولا تكييف، كما يرانا هو سبحانه وتعالى، وهو غير محدود، ولا مكيَّف، فكذلك نراه وهو غير محدود ولا مكيَّف.

'সাদৃশ্যবাদী হাশাবিয়ারা বলে, নিশ্চয় অন্যান্য দৃশ্যমান বস্তুর মতো আল্লাহ্ তাআলাকে আকার-রূপধারণকৃত এবং সীমা-পরিসীমায় গণ্ডিবদ্ধ অবস্থায় (জান্নাতে) দেখা যাবে। অথচ মুতাযিলা, জাহমিয়া ও নাজ্জারিয়ারা বলে থাকে, আল্লাহ্ তাআলাকে কোনো অবস্থাতেই দেখা যাবে না!

আর ইমাম আশআরী রাহ. এই দুই ভ্রান্ত ফেরকার মাঝে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলাকে বিনা হুলূলে (সৃষ্টিজগতের মাঝে অনুপ্রবেশ ব্যতীত), কোনো প্রকার সীমাবদ্ধ হওয়া ব্যতীত ও কোনো প্রকার কাইফ (ধরন-ধারণ) ব্যতীত দেখা যাবে। যেমনটি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের দেখেন, অথচ তিনি অসীম ও কাইফ তথা আকার-রূপ-ধরন থেকে মুক্ত।'[২৫৫]

বিখ্যাত হানাফী ইমাম শামসুল আইম্মা সারাখসী রাহ. (মৃ. ৪৮৩ হি.) লিখেছেন,

أَن رُؤْيَة الله تَعَالَى بالأبصار فِي الْآخِرَة حق مَعْلُوم ثَابت بِالنَّص ...ثم هو موجود بصفة الكمال، وفِي

---

২৫৪. কিতাবুত তাওহীদ, পৃষ্ঠা ৮৫
২৫৫. তাবয়ীনু কাযিবিল মুফতারী, পৃষ্ঠা ৩০৬

كونه مرئيا لنفسه ولغيره معنى الكمال، إلا أن الجهة ممتنعة، فإن الله تعالى لا جهة له.

'পরকালে আল্লাহ্ তাআলাকে চোখে দেখা সত্য (কুরআন-সুন্নাহ্ দ্বারা প্রমাণিত)। আল্লাহ্ তাআলা পরিপূর্ণতার গুণে গুণান্বিত মহান সত্তা। তিনি নিজের ও অন্যের দৃষ্টিগ্রাহ্য হওয়াটা তার পরিপূর্ণতার অংশ। তবে তিনি দিক থেকে মুক্ত। কারণ, আল্লাহ্ তাআলার (বিশেষ) কোনো দিক নেই।'[২৫৬]

হাকীমুল ইসলাম কারী মুহাম্মাদ তায়্যিব দেওবন্দী রাহ. (মৃ. ১৪০৩ হি.) 'আকীদাতুত তাহাবী'র টীকায় বলেন,

والإحاطة موقوفة على الحدود والأطراف، والله منزه عن ذلك، وهكذا عن الكيف والكيفية، لأنها من خواص الأجسام.

'পরিবেষ্টন সীমা ও দিকনির্ভর। আর আল্লাহ্ তাআলা এগুলো থেকে পবিত্র। এভাবে ধরন-ধারণ থেকেও পবিত্র। কেননা, এগুলো দেহের বৈশিষ্ট্য।'

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্‌র মতো কিছুই নেই। তাই আল্লাহ-সংশ্লিষ্ট বিষয়কে কোনো কিছুর ওপর কিয়াস করার সুযোগ নেই। অবাক হতে হয় ওই সকল বন্ধুদের ওপর, যারা আমলের ক্ষেত্রে কিয়াসের ঘোর বিরোধিতা করে, অথচ আকীদার মাসআলায় কিয়াস করে ও যুক্তি প্রদান করে!

তাওহীদুস সিফাত সম্পর্কে আলোচনা

তাওহীদের দ্বিতীয় প্রকার হলো, 'তাওহীদুস সিফাত' তথা আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলি এবং গুণ-সংবলিত নামের একত্ববাদের ওপর ঈমান আনা।

আল্লাহ্ তাআলা নিজ সত্তা বা অস্তিত্বের দিক থেকে যেভাবে এক ও অদ্বিতীয়, তেমনই গুণ ও বৈশিষ্ট্যাবলির দিক থেকেও তিনি এক ও অনন্য। তাঁর গুণাবলির বৈশিষ্ট্য তাঁর সৃষ্টি থেকে ভিন্ন। সৃষ্টির মতো ও সাদৃশ্য হতে তিনি পবিত্র। এই বিশ্বাস দ্বারা মূলত 'তাশবীহ' বা সাদৃশ্যায়ন থেকে মুক্তি লাভ করা।

উদাহরণত বলা যায়, আল্লাহ্ তাআলার একটি গুণ ও বিশেষণ 'আলীম' তথা তিনি জ্ঞানী, চিরজ্ঞানী, মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞানী। কেননা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ছাড়া এই সুবিশাল, সুনিপুণ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ জগতের সৃষ্টি অসম্ভব।

তাই যিনি এই জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক, তিনি অবশ্যই প্রকৃত জ্ঞানের এবং অসীম জ্ঞানের অধিকারী হবেন। তাঁর জ্ঞান অবশ্যই পরিপূর্ণ, নিখুঁত ও নিশ্ছিদ্র। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সবকিছু সম্পর্কে তিনি পূর্ণ অবগত। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সবকিছু তাঁর

---

২৫৬. উসূলুস সারাখসী, ১/১৬৯, ১৭০

কাছে সমান। কোনো কিছু ঘটার আগেই তিনি সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনাদিকাল থেকেই জানেন। কোনো কিছুই তাঁর অজ্ঞাতসারে ঘটে না। তিনি যা কিছু বলেন এবং যা কিছু করেন, সবই তিনি তাঁর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুসারে করেন। পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি বস্তু ও কণার নড়াচড়া নিয়ে আছে তার পূর্ণ জানাশোনা। তিনি অজ্ঞতা, অনবগতি, বিস্মৃতি, সন্দেহ-সংশয় ইত্যাদি থেকে চিরপবিত্র।

বস্তুত তিনি জ্ঞান রাখেন, আমাদের জ্ঞানের মতো নয়। তাঁর জ্ঞান পূর্ণ, নিজস্ব, শাশ্বত ও সব ধরনের ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত। আর আমাদের জ্ঞান ক্ষীণ, ক্ষণস্থায়ী, সীমাবদ্ধতাযুক্ত ও আল্লাহপ্রদত্ত।

অনুরূপ আল্লাহ তাআলার দেখা, শোনা, কুদরতসহ যত গুণ আছে, সবগুলো সম্পর্কে এমন আকীদা-বিশ্বাস রাখতে হবে। তাহলে সাদৃশ্যায়ন ও সব ধরনের শিরক থেকে মুক্তি লাভ হবে।

সাদৃশ্য হতে পবিত্র হওয়ার দলীল

কুরআনে কারীমে যেমন তাঁর প্রশংসনীয় গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে, তেমনই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ও ব্যাপক অর্থবোধক শব্দে মাখলূকের সাথে তাঁর সাদৃশ্যকে সম্পূর্ণ নাকচ ও 'না' করা হয়েছে; বরং এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ একটি আয়াতে প্রথমেই সাদৃশ্যকে জোরালোভাবে নাকচ করা হয়েছে, এরপর তাঁর গুণ বর্ণিত হয়েছে।

আয়াতটি হচ্ছে,

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

'তাঁর মতো বা সদৃশ কিছু নেই। তিনিই সব কথা শোনেন, সবকিছু দেখেন।'[২৫৭]

সিফাতের অর্থ বোঝার ক্ষেত্রে এই আয়াতটি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর একটি মূলনীতি। মাখলূকের সঙ্গে আল্লাহ তাআলার সব ধরনের সাদৃশ্যকে নাকচ করার জন্য সাহাবা ও সালাফের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত সকলেই এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন।

লক্ষ করুন, এই আয়াতে সাদৃশ্যের নাকচ দ্ব্যর্থহীন ও সর্বব্যাপী। অর্থাৎ কেউই বা কোনো কিছুই কোনো দিক থেকেই কোনোভাবেই তাঁর সদৃশ নয়, তাঁর মতো কিছুই নেই, থাকতে পারে না। অন্যথায় তিনি ওই দিক থেকে সৃষ্টির মতো হয়ে যাবেন।

ইমাম আবু মানসুর মাতুরীদী রাহ. (মৃ. ৩৩৩ হি.) বলেন,

فَلَو وُصِف بالشَّبه بغيْره بجهة: فيصير من ذَلِك الْوَجْه كَأحد الخلق.

---

২৫৭. সূরা শূরা, (৪২) : ১১

‘কোনো দিক থেকেই যদি তাঁর সদৃশ থাকে, তাহলে তিনি ওই দিক থেকে সৃষ্টির মতো হয়ে যাবেন।’[২৫৮]

তাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর কেউ এর ব্যাপকতাকে অস্বীকার করেননি।

আয়াতটিতে প্রথমে সাদৃশ্যকে জোরালোভাবে নাকচ করা হয়েছে, এরপর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা হওয়ার গুণ বর্ণিত হয়েছে। কাজেই তাঁর গুণের আগে সাদৃশ্যকে নাকচ ও ‘না’ করা অত্যন্ত জরুরি।

এ বিষয়ে কুরআনে কারীমের আরও কিছু আয়াত লক্ষ করুন,

أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

‘যেই সত্তা (এতসব বস্তু) সৃষ্টি করেন, তিনি কি তার মতো হতে পারেন, যে কিছুই সৃষ্টি করে না? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না?’[২৫৯]

অর্থাৎ স্রষ্টা কখনো কোনোভাবেই সৃষ্টির মতো হতে পারেন না। না সত্তাগতভাবে, না সিফাত বা গুণাবলিতে, না অন্য কোনো ক্ষেত্রে।

ইমাম বায়হাকী রাহ. (মৃ. ৪৫৮ হি.) বলেন,

أَنَّ صَانِعَ الْعَالَمِ لا يُشْبِهُ شَيْئًا مِنَ الْعَالَمِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَشْبَهَ شيئًا مِنَ الْمُحْدَثَاتِ بِجِهَةٍ مِنَ الْجِهَاتِ: لَأَشْبَهَهُ فِي الْحُدُوثِ مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ، وَمُحَالٌ أَنْ يَكُونَ الْقَدِيمُ مُحْدَثًا، أَوْ يَكُونَ قَدِيمًا مِنْ جِهَةٍ حَدِيثًا مِنْ جِهَةٍ.

‘বিশ্বজগতের স্রষ্টা কোনোভাবেই সৃষ্টিজগতের মতো হতে পারেন না। কেননা, কোনো দিক থেকেই যদি সৃষ্টির সাথে তাঁর সদৃশ থাকে, তাহলে তিনি ওই দিক থেকে সৃষ্টির মতো হয়ে যাবেন। আর স্রষ্টা সৃষ্টির মতো হওয়া অসম্ভব।’[২৬০]

সূরা ইখলাসে এসেছে,

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

‘কেউই তাঁর সদৃশ নয়।’

এটা ব্যাপক অর্থবোধক। অর্থাৎ এই আয়াতে সব ধরনের সাদৃশ্যকে নাকচ করা হয়েছে।

অন্যত্র এসেছে,

رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا.

---

২৫৮. কিতাবুত তাওহীদ, পৃষ্ঠা ২৪
২৫৯. সূরা নাহল, ১৭
২৬০. আল-ই'তিকাদ, পৃষ্ঠা ৪২

'তিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর মালিক এবং এ দুইয়ের মাঝখানে যা আছে তারও। সুতরাং তুমি তাঁর ইবাদত করো এবং তাঁর ইবাদতে অবিচলিত থাকো। তোমার জানামতে তাঁর সমগুণসম্পন্ন কেউ আছে কি?'[২৬১]

অর্থাৎ তাঁর সমগুণসম্পন্ন কেউ নেই, থাকতে পারে না।

মুশরিকরা তাদের শিরকী বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডের পক্ষে যুক্তি দাঁড় করানোর জন্য আল্লাহ সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টান্ত পেশ করত। যেমন : তারা অনেক সময় এই দৃষ্টান্ত পেশ করত যে, দুনিয়ার কোনো বাদশাহ নিজে একা রাজত্ব চালায় না; বরং রাজত্বের বহু কাজই সহযোগীদের হাতে ছাড়তে হয়। এমনইভাবে আল্লাহ তাআলাও তাঁর প্রভুত্বের বহু কাজ দেব-দেবীদের হাতে ন্যস্ত করে দিয়েছেন। তারা সেসব কাজ স্বাধীনভাবে আঞ্জাম দেয় (নাউযুবিল্লাহ!)।

আল্লাহ তাআলা তাঁদের এই দৃষ্টান্ত ও উপমা বাতিল আখ্যা দিয়ে বলেছেন,

فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

'তোমরা আল্লাহর সম্পর্কে দৃষ্টান্ত-উপমা তৈরি কোরো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জানো না।'[২৬২]

এ আয়াতে মুশরিকদেরকে বলা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার জন্য দুনিয়ার রাজা-বাদশাহদের কিংবা যেকোনো মাখলূকের দৃষ্টান্ত পেশ করা চরম পর্যায়ের মূর্খতা।

প্রশ্ন :

আল্লাহ তাআলা তাঁর সম্পর্কে দৃষ্টান্ত-উপমা তৈরি না করতে বলেছেন। অথচ কিছু আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর সম্পর্কে দৃষ্টান্ত-উপমা তৈরি করা যাবে। যেমন : **وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى**

'আল্লাহর জন্যই সর্বোচ্চ উপমা।'[২৬৩]

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا مِصْبَاحٌ

'আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর নূর। তাঁর নূরের দৃষ্টান্ত যেন এক তাক, যাতে আছে এক প্রদীপ...।'[২৬৪]

উত্তর : আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে দৃষ্টান্ত-উপমা তৈরি না করার আদেশ থেকে উদ্দেশ্য হলো, এমন কোনো উপমা পেশ করা যাবে না, যা মাখলূকের সাথে সাদৃশ্য বোঝায়

---

২৬১. সূরা মারইয়াম, ৬৫
২৬২. সূরা নাহল, ৭৪
২৬৩. সূরা নাহল, ৬০
২৬৪. সূরা নূর, ৩৫

এবং তাঁর শান-মানের পরিপন্থী।[২৬৫]

কাজেই বোঝানোর জন্য এমন সুউচ্চ পর্যায়ের উপমা পেশ করা যেতে পারে, যা তাঁর শান-মানের পরিপন্থী নয় এবং সাদৃশ্য সৃষ্টিকারী নয়।

এ ধরনের সুউচ্চ পর্যায়ের উপমা দিয়ে আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেন,

ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

'তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকেই একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। আমি তোমাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে কেউ কি তাতে তোমাদের এমন অংশীদার আছে যে, তোমরা ও তারা তাতে সমান এবং তোমরা তাদেরকে ঠিক সে রকমই ভয় করো, যেমন ভয় করে থাকো তোমরা পরস্পর একে অন্যকে? যারা বুদ্ধিকে কাজে লাগায়, তাদের জন্য আমি এভাবেই নিদর্শনাবলি সুস্পষ্টরূপে বিবৃত করি।'[২৬৬]

সুতরাং আল্লাহ তাআলা সম্পর্কে কেবল এ ধরনের সর্বোচ্চ পর্যায়ের উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত-উপমা পেশ করা যেতে পারে, যার দ্বারা তাঁর সর্বোচ্চ মহিমা প্রকাশিত হবে এবং মাখলূকের সঙ্গে তাঁর শরীকানা ও সাদৃশ্য সর্বতোভাবে নাকচ হবে।

তিনি অঙ্গ ও উপায়-উপকরণের সাহায্য ছাড়াই সকল গুণে গুণান্বিত

গুণাবলিতে সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার সাদৃশ্যহীনতার, বান্দার সাথে আল্লাহ তাআলার তাশবীহমুক্ত হওয়ার তথা আল্লাহ তাআলার গুণাবলি কোনো দিক থেকেই কোনোভাবেই সৃষ্টির গুণাবলির মতো না হওয়ার আরেকটি দিক হলো, তিনি অঙ্গ, যন্ত্র, উপায়-উপকরণ ও যেকোনো মাধ্যমের সাহায্য ছাড়াই সকল গুণে গুণান্বিত।

ইমাম আযম আবু হানীফা রাহ. (মৃ. ১৫০ হি.) বলেন,

وصفاته كلها بخلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويسمع لا كسمعنا، ويتكلم لا ككلامنا. نحن نتكلم بالآلات والحروف، والله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف، والحروف مخلوقة، وكلام الله تعالى غير مخلوق.

'তাঁর সকল সিফাত ও গুণ সৃষ্টির গুণাবলির বিপরীত। তিনি জ্ঞান রাখেন, তবে আমাদের জ্ঞানের মতো নয়। তিনি ক্ষমতা রাখেন, তবে আমাদের ক্ষমতার মতো নয়। তিনি দেখেন, তবে আমাদের দেখার মতো নয়। তিনি শোনেন, তবে আমাদের শোনার মতো না। তিনি কথা বলেন, তবে আমাদের কথার মতো না।

---

২৬৫. দ্র. তাফসীরে কুরতুবী, ১০/১১৯; খুতবাতে হাকীমুল উম্মাত থানভী, ১৭/৪৩১
২৬৬. সূরা রূম, ২৮

(যেমন,) আমরা বাগ্‌যন্ত্র ও অক্ষরসমূহের সাহায্যে কথা বলি, কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা কোনো ধরনের যন্ত্র ও অক্ষরসমূহের সাহায্য ছাড়া কথা বলেন। (কেননা,) অক্ষর হচ্ছে সৃষ্ট। অথচ আল্লাহর তাআলার কালাম ও কথন সৃষ্ট নয়।'[২৬৭]

আর ইমাম তাহাবী রাহ. (মৃ. ৩২১ হি.)-এর এ বক্তব্য তো ওপরে গেছে যে,

وَتَعَالَى اللهُ عَنِ الْحُدُودِ وَالْغَايَاتِ، وَالْأَرْكَانِ وَالْأَعْضَاءِ وَالْأَدَوَاتِ.

'আল্লাহ্ তাআলা সকল সীমা-প্রান্ত, দৈহিক সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং সকল উপায়-উপকরণ থেকে বহু ঊর্ধ্বে।'

অনুরূপ ইমাম আবু মানসুর মাতুরীদী রাহ. (মৃ. ৩৩৩ হি.) বলেন,

وهو قادر بذاته، فاعل لا بآلة وسبب.

'তিনি সত্তাগতভাবে ক্ষমতাবান; কোনো ধরনের যন্ত্র ও উপায়-উপকরণের সাহায্য ছাড়াই সম্পাদনকারী ও সম্পন্নকারী।'[২৬৮]

ইমাম আবুল মুঈন নাসাফী মাতুরীদী হানাফী রাহ. (মৃ. ৫০৮ হি.) বলেন,

إنَّ الله تعالى سَمِيع بلا جارحة، بَصِير بلا عين، عالم بلا آلة، مريد بلا قلب، متكلم بلا لسان وشفتين.

'আল্লাহ্ তাআলা অঙ্গ ছাড়াই শোনেন, চক্ষু ব্যতীতই দেখেন, যেকোনো মাধ্যমবিহীন জানেন, অন্তর ব্যতীতই ইচ্ছা করেন এবং জিহ্বা ও ঠোঁটদ্বয় ছাড়াই কালাম করেন।'[২৬৯]

ইমাম আবুল হাসান আশআরী রাহ. (মৃ. ৩২৪ হি.) লেখেন,

وأجمعوا على أنه عز وجل يجيء يوم القيامة... وليس مجيئه حركة ولا زوالا، وإنما يكون المجيء حركة وزوالاً إذا كان الجائي جسما أو جوهرا، فإذا ثبت أنه عز وجل ليس بجسم ولا جوهر لم يجب أن يكون مجيئه نقلة أو حركة.

'সকলে এ বিষয়ে একমত যে, আল্লাহ্ তাআলা কিয়ামতের দিন আগমন করবেন। তবে তাঁর আগমন নড়াচড়া নয়, বিলুপ্তি নয়। কেননা, আগমনকারী দেহবিশিষ্ট বা মৌল উপাদান হলে নড়ন-চলন ও বিলুপ্তি হয়। যেহেতু আল্লাহ্ তাআলা দেহধারী ও মৌল উপাদান নন, এ জন্য তাঁর আগমন নড়াচড়া বা স্থানান্তর নয়।'[২৭০]

হাদীসের সুপ্রসিদ্ধ কিতাব 'সহীহ্ ইবনে হিব্বান' প্রণেতা ইমাম আবু হাতেম ইবনে হিব্বান রাহ. (মৃ. ৩৫৪ হি.) উক্ত কিতাবে আরও ব্যাখ্যা করে বলেন,

---

২৬৭. আল-ফিকহুল আকবার, বি-রিওয়াতি হাম্মাদ, আকীদা নং ১১-এর সূত্রে মাজমুউ কুতুব ওয়া রাসায়িল ওয়া ওসায়াল ইমামিল আযম, পৃষ্ঠা ২৫৮, মাকতাবাতুল গানিম।

২৬৮. তাবীলাতু আহলিস সুন্নাহ বা তাফসীরে মাতুরীদী, ৯/৩৬৭

২৬৯. বাহরুল কালাম, পৃষ্ঠা ১১৫

২৭০. রিসালাতুন ইলা আহলিস সাগর, পৃষ্ঠা ১২৮

صِفَاتُ اللهِ جَلَّ وَعَلَا لَا تُكَيَّفُ، وَلَا تُقَاسُ إِلَى صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ، فَكَمَا أَنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلَا مُتَكَلِّمٌ مِنْ غَيْرِ آلَةٍ: بِأَسْنَانٍ وَلَهَوَاتٍ وَلِسَانٍ وَشَفَةٍ كَالْمَخْلُوقِينَ، جَلَّ رَبُّنَا وَتَعَالَى عَنْ مِثْلِ هَذَا وَأَشْبَاهِهِ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَاسَ كَلَامُهُ إِلَى كَلَامِنَا، لِأَنَّ كَلَامَ الْمَخْلُوقِينَ لَا يُوجَدُ إِلَّا بِآلَاتٍ، وَاللهُ جَلَّ وَعَلَا يَتَكَلَّمُ كَمَا شَاءَ بِلَا آلَةٍ: كَذَلِكَ يَنْزِلُ بِلَا آلَةٍ، وَلَا تَحَرُّكٍ، وَلَا انْتِقَالٍ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ، وَكَذَلِكَ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ، فَكَمَا لَمْ يَجُزْ أَنْ يُقَالَ: اللهُ يُبْصِرُ كَبَصَرِنَا بِالْأَشْفَارِ وَالْحَدَقِ وَالْبَيَاضِ، بَلْ يُبْصِرُ كَيْفَ يَشَاءُ بِلَا آلَةٍ، وَيَسْمَعُ مِنْ غَيْرِ أُذُنَيْنِ، وَصِمَاخَيْنِ، وَالْتِوَاءٍ، وَغَضَارِيفَ فِيهَا، بَلْ يَسْمَعُ كَيْفَ يَشَاءُ بِلَا آلَةٍ، كَذَلِكَ يَنْزِلُ كَيْفَ يَشَاءُ بِلَا آلَةٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَاسَ نُزُولُهُ إِلَى نُزُولِ الْمَخْلُوقِينَ، كَمَا يُكَيَّفُ نُزُولُهُمْ، جَلَّ رَبُّنَا وَتَقَدَّسَ مِنْ أَنْ تُشَبَّهَ صِفَاتُهُ بِشَيْءٍ مِنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ.

'আল্লাহর সিফাতের কোনো ধরন সাব্যস্ত করা যাবে না এবং সৃষ্টির গুণাবলির ওপর কিয়াসও করা যাবে না। কাজেই আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকুলের ন্যায় কোনো অঙ্গ তথা দাঁত, জিহ্বা ও ঠোঁট ইত্যাদির সাহায্যে কথা বলেন না। আমাদের রব মহান, তিনি এগুলো থেকে এবং এ ধরনের সৃষ্টির গুণাবলি থেকে বহু ঊর্ধ্বে। তাঁর কালামকে (কথা) আমাদের কালামের ওপর অনুমান করা যাবে না। কারণ, সৃষ্টিকুলের কালাম বা কথাবার্তা যন্ত্র ও অঙ্গ ব্যতীত হতেই পারে না। অথচ আল্লাহ তাআলা কালাম করেন কোনো যন্ত্র-অঙ্গ ব্যতিরেকে, যেভাবেই তিনি চান। অনুরূপ আল্লাহ অবতরণ করেন কোনো ধরনের মাধ্যম, নড়াচড়া ও এক জায়গা থেকে অন্যত্র স্থানান্তর ছাড়া। একই কথা তাঁর দেখা ও শোনার ক্ষেত্রেও। সুতরাং আল্লাহর ব্যাপারে এমন বলার কোনো সুযোগ নেই যে, তিনি সৃষ্টিকুলের ন্যায় চোখের পাতা, নয়নতারা ও শুভ্রতা দ্বারা দেখেন; বরং তিনি যেভাবেই ইচ্ছা করেন কোনো অঙ্গ ব্যতিরেকে দেখেন। এবং তিনি নিজ ইচ্ছানুযায়ী কোনো যন্ত্র ছাড়া কান, কর্ণকুহর, মোড়-বাঁক ও কোমলাস্থি ব্যতিরেকে শ্রবণ করেন। এভাবে তিনি যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া যেভাবেই চান অবতরণ করেন। তাঁর অবতরণ সৃষ্টিকুলের অবতরণ ও তাদের ধরনের সাথে তুলনা করা যাবে না। (মোদ্দাকথা) আমাদের রব মহান, তাঁর সিফাত ও গুণাবলি সৃষ্টির যেকোনো গুণাবলির সদৃশ থেকে পবিত্র।'[২৭১]

প্রসিদ্ধ হাদীস-ব্যাখ্যাকার ইমাম খাত্তাবী শাফেয়ী রাহ. (মৃ. ৩৮৮ হি.) বলেন,

---

২৭১. সহীহ ইবনে হিব্বান, ৩/২০০-২০১, মুআসসাসাতুর রিসালাহ

قال خليل هراس في تعليقه على" توحيد ابن خزيمة" (ص ٦٣، دار الكتب العلمية سنة ١٤٠٣هـ): القبض إنما يكون باليد حقيقة لا بالنعمة، فإن قالوا: إن الباء هنا للسببية أي بسبب إرادته الإنعام. قلنا لهم وبماذا قبض؟ فإن القبض محتاج إلى آلة فلا مناص لهم لو انصفوا أنفسهم. انتهى فصرح في كلامه هذا بلفظين شنيعين وهما (محتاج) و (آلة).

وقال في (ص:٨٩): ومن اثبت الأصابع لله فكيف ينفي عنه اليد، والأصابع جزء من اليد. انتهى فصرح هنا بنسبة (الأجزاء) إلى الله. وقال في (ص ١٢٦): يعني أن نزوله إلى السماء الدنيا يقتضي وجوده فوقها، فإنه انتقال من علو إلى سفل. انتهى فصرح بنسبة الحركة والانتقال إلى الله، تعالى الله عما يقول الظالمون.

وضعه إصبعيه على أذنه وعينه عند قراءته: {سَمِيعًا بَصِيرًا} معناه: إثبات صفة السمع والبصر لله تعالى، لا إثبات الأذن والعين؛ لأنهما جارحتان. والله تعالى منزه عن الجارحة، فهو موصوف بصفاته، منفيٌّ عنه ما لا يليق به من صفات الآدميين ونعوتهم، ليس بذي جوارح، ولا بذي أجزاء وأبعاض.

'"আল্লাহ শোনেন ও দেখেন" বাক্যটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিলাওয়াত করার সময় নিজ কান ও চোখের ওপর অঙ্গুলি রাখার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার জন্য শোনা ও দেখার গুণ সাব্যস্ত করা। 'কান' ও 'চোখ' সাব্যস্ত করা নয়। কেননা, এগুলো অঙ্গ। আর আল্লাহ তাআলা অঙ্গ থেকে পবিত্র। তিনি তাঁর সকল গুণে গুণান্বিত, (তবে) মানুষের সকল গুণ ও বিশেষণ থেকে মুক্ত। তিনি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবিশিষ্ট নন এবং বিভাজ্য ও অংশবিশিষ্ট নন।'[২৭২]

ইমাম আবুল মুযাফফার ইসফারায়িনী রাহ. (মৃ. ৪৭১ হি.) বলেন,

فنحن إذا أثبتنا الصفة أثبتنا بَصَرا لا حَدَقَة، وسمعا لا أُذُنا، وكلاما لا لسانا، وحياة لا بِنيَة، وعلما لا قلبا، وإرادة لا صدرا.

'আমরা যখন (আল্লাহ তাআলার জন্য) গুণ সাব্যস্ত করি, তখন চোখের তারা ব্যতীতই দেখার গুণ সাব্যস্ত করি। কান ছাড়াই শোনার গুণ সাব্যস্ত করি। জিহ্বা ছাড়াই কালাম গুণ সাব্যস্ত করি। কাঠামো ছাড়াই হায়াত গুণ সাব্যস্ত করি। অন্তর ছাড়াই ইলম গুণ সাব্যস্ত করি। বক্ষ ছাড়াই ইচ্ছা গুণ সাব্যস্ত করি।'[২৭৩]

একই কথা আবু বকর ইবনুল আরবী মালেকী রাহ.-ও (মৃ. ৫৪৩ হি.) বলেছেন,

وصح أنه لا يلزَم من إثبات الصفات إثباتُ الجوارح والأدوات المقتضيات للمماثلة؛ فإنا نُثبِت سَمْعا لا بأُذُن، وبَصَرا لا بحَدَقَة، وكلاما لا بلسان، وحياة لا ببِنيَة، وعلما لا بقلب، وإرادة من غير شهوة.

ইমাম গাযালী আশআরী শাফেয়ী রাহ. (মৃ. ৫০৫ হি.) বলেন,

وكما عقل كونه فاعلا بلا جارحة، وعالما بلا قلب ودماغ: فليعقل كونه بصيرا بلا حدقة، وسميعا بلا أذن؛ إذ لا فرق بينهما.

'তিনি যেভাবে অঙ্গ ছাড়াই সম্পাদনকারী এবং অন্তর ও মগজ ছাড়াই সর্বজ্ঞানী হওয়াটা বোধগম্য, তদ্রূপ নয়নতারা ছাড়াই সর্বদ্রষ্টা এবং কান ছাড়াই সর্বশ্রোতা হওয়াটা বোধগম্য। কেননা, এ দুই বিষয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।'[২৭৪]

প্রশ্ন হতে পারে, দেখা ও শোনার জন্য তো 'চোখ' ও 'কান' আবশ্যক, এগুলো ছাড়া দেখা ও শোনা কীভাবে হতে পারে?

---

২৭২. মাআলিমুস সুনান, ৪/৩৩০, খাত্তাবী; শারহে ইবনে রাসালান, ১৮/৩১২
২৭৩. আল-কিতাবুল মুতাওয়াসসাত, ইবনুল আরবী, পৃষ্ঠা ১৩৮, টীকা ৪
২৭৪. ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন, ১/১০৯

উত্তর :

এগুলো আবশ্যক হলো সৃষ্টির জন্য, স্রষ্টার জন্য নয়। কেননা, তিনি সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী। ইরশাদ হয়েছে, اللهُ الصَّمَدُ 'আল্লাহ কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন, সবই তাঁর মুখাপেক্ষী।'

অন্যত্র এসেছে,

إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

'নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বজগতের সকল কিছু থেকে অমুখাপেক্ষী।'[২৭৫]

সুতরাং আল্লাহ তাআলা রূহ ও প্রাণের সাহায্য ছাড়াই চিরঞ্জীব। অন্তর ও কল্পনার সাহায্য ছাড়াই সর্ববিষয়ে তিনি সম্যক অবগত। উপায়-উপকরণ ব্যতীত তিনি সক্ষম, কর্ণ ব্যতীত শ্রোতা, চক্ষু ব্যতীত দ্রষ্টা, জিহ্বা ব্যতীত কথক। তাঁর কথন অক্ষর ও আওয়াজের সাহায্য ব্যতীত।

সিফাতের অর্থ ও মর্ম অনুধাবনের মূলনীতি

ইমাম তাহাবী রাহ. (মৃ. ৩২১ হি.) তাঁর বিখ্যাত 'আকীদা'র কিতাবে আল্লাহ তাআলার অনন্যতা সম্পর্কে বলেন,

لَا تَبْلُغُهُ الْأَوْهَامُ، وَلَا تُدْرِكُهُ الْأَفْهَامُ. وَلَا يُشْبِهُهُ الْأَنَامُ.

'(কারও) কল্পনা-ধারণা তাঁর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না এবং বোধ-বুদ্ধি তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না। এবং তিনি জগতের অন্য কোনো কিছুর মতো নন।'

সুতরাং আল্লাহ তাআলার সত্তা নিয়ে কল্পনা ও ধারণার কোনো সুযোগ নেই।

আল্লাহ তাআলার সিফাতের নীতি সম্পর্কে পূর্ববর্তী ইমামগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য হচ্ছে,

وَالأَصْلُ فِي هَذَا: أَنَّ الكَلَامَ فِي الصِّفَات فَرْعُ الكَلَامِ فِي الذَّات، وَيُحتذَى فِي ذَلِكَ حَذْوُهُ وَمثَالُه، فَإِذَا كَانَ معلُوماً أَن إِثبَاتَ رَبِّ العَالِمِين إِنَّمَا هُوَ إِثبَاتُ وَجُودٍ لاَ إِثبَاتُ كَيْفِيَة، فَكَذَلِكَ إِثبَاتُ صِفَاته إِنَّمَا هُوَ إِثبَاتُ وَجُودٍ، لاَ إِثبَاتُ تحديدٍ وَتكييف.

'এ ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, আল্লাহর সিফাতের আলোচনা তাঁর সত্তার আলোচনার অধীন। এ ক্ষেত্রে পদাঙ্ক অনুসরণ করা হবে। আর এ কথা সবার জানা যে, আল্লাহ তাআলার সত্তাকে ইছবাত (সাব্যস্ত) করার অর্থ হলো, কেবল/শুধু তাঁর অস্তিত্ব সাব্যস্ত করা; কাইফিয়্যাত বা স্বরূপ-ধরন সাব্যস্ত করা নয়। অনুরূপ তাঁর সিফাত

---

২৭৫. সূরা আনকাবূত, ৬

সাব্যস্ত করার উদ্দেশ্য হলো, কেবল/শুধু সিফাতের অস্তিত্ব সাব্যস্ত করা; সীমারেখা কিংবা স্বরূপ-ধরন সাব্যস্ত করা নয়।'[২৭৬]

ইমাম যাহাবী রাহ. (মৃ. ৭৪৮ হি.) বলেন,

وَإِنَّمَا الصِّفَةُ تَابِعَةٌ لِلْمَوْصُوفِ، فَإِذَا كَانَ المَوْصُوفُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ نَرَهُ، وَلاَ أَخْبَرَنَا أَحَدٌ أَنَّهُ عَايَنَهُ مَعَ قَوْلِهِ لَنَا فِي تَنْزِيْلِهِ: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، فَكَيْفَ بَقِيَ لأَذْهَانِنَا مَجَالٌ فِي إِثْبَاتِ كَيْفِيَّةِ البَارِئِ – تَعَالَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ – فَكَذَلِكَ صِفَاتُهُ المُقَدَّسَةُ، نُقِرُّ بِهَا وَنَعْتَقِدُ أَنَّهَا حَقٌّ، وَلاَ نُمَثِّلُهَا أَصْلاً وَلاَ نَتَشَكَّلُهَا.

'গুণ গুণান্বিত সত্তার অধীন। আর গুণান্বিত সত্তাকে যেহেতু আমরা দেখিনি এবং কেউ তাঁকে প্রত্যক্ষ করে আমাদের জানাতে পারেনি, তাহলে আমাদের মননে আল্লাহ্ তাআলার কাইফিয়্যাত বা স্বরূপ-ধরন সাব্যস্ত করার সুযোগ কোথায়? তিনি এ থেকে চিরপবিত্র। অনুরূপ তাঁর সিফাত ও গুণাবলি। আমরা এগুলো স্বীকার করব এবং এগুলো সত্য জেনে বিশ্বাস করব। এগুলোর কোনো উদাহরণ বা (কল্পিত) মূর্তি বানাব না এবং কোনো আকার-আকৃতি তৈরি করব না।'[২৭৭]

সুতরাং আল্লাহ্ তাআলার সত্তা নিয়ে যেমন কল্পনা ও ধারণার কোনো সুযোগ নেই, তেমনইভাবে তাঁর সিফাত নিয়েও কল্পনা ও ধারণার কোনো অবকাশ নেই।

কেননা, আল্লাহ্ তাআলার সত্তার হাকীকত ও বাস্তবতা যেভাবে জানা ও বোঝা সম্ভব না, একইভাবে তাঁর যত সিফাত ও গুণাবলি কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত হয়েছে, এগুলোরও হাকীকত ও বাস্তবতা মানুষের পক্ষে জানা ও বোঝা সম্ভব না। সুতরাং তাঁর সত্তার মতো তাঁর সিফাতের ক্ষেত্রেও কল্পনা, ধারণা, আন্দাজ, অনুমান কোনোটাই করা যায় না; বরং তিনি এসবের ঊর্ধ্বে। তবে তাঁর সত্তার মতো সিফাতের শুধু অস্তিত্ব জানা যায় ও উপলব্ধি করা যায়।

কাজেই আল্লাহ্ তাআলার সত্তার হাকীকত ও তাঁর গুণাবলির অর্থ ও মর্ম সম্পূর্ণ আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির ঊর্ধ্বের বিষয়।

আল্লাহ্ তাআলার সত্তা ও সিফাত কল্পনার ঊর্ধ্বে কেন?

এখন প্রশ্ন হলো, আল্লাহ্ তাআলার সত্তা ও সিফাত আমাদের কল্পনা ও ধারণার ঊর্ধ্বে কেন?

উত্তর :

প্রথমত, কল্পনাশক্তি দিয়ে মানুষ কোনো কিছুর সদৃশ ও মতো অনুমান করে। যখন

২৭৬. আল-কালাম আলাস সিফাত, খতীব বাগদাদী, পৃষ্ঠা ২০-২২; মাজমূউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া, ৫/৫৯; সিয়ারু আলামিন নুবালা, যাহাবী, ১৮/২৮৪
২৭৭. সিয়ারু আলামিন নুবালা, যাহাবী, ১০/৬১১

আল্লাহ তাআলার কোনো সাদৃশ্য নেই, মতো বলতে কিছুই নেই; তিনি জগতের কোনো কিছুর মতো নন, তিনি সৃষ্টির যেকোনো ধরনের সাদৃশ্য হতে পবিত্র, তখন তাঁকে কল্পনা ও ধারণা করাও অসম্ভব।

দ্বিতীয়ত, কল্পনার প্রধান উপাদান হলো ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত। মানুষ কল্পনার মাধ্যমে মূলত ইন্দ্রিয়লব্ধ পূর্ব-অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা করেই কোনো কিছু অনুমান করার চেষ্টা করে। পূর্ব-অভিজ্ঞতা ও স্মৃতিকে সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমেই কল্পনার জগৎকে গড়ে তোলে। তাই কল্পনা হলো স্মৃতিনির্ভর বিষয়। ফলে যার সম্পর্কে আমাদের কোনো স্মৃতি নেই, কিংবা যার সম্পর্কে আমাদের কোনো ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতা নেই, তাকে আমরা কল্পনা করতেও অক্ষম। এ কারণেই আমরা আল্লাহ তাআলার সত্তা বা সিফাতকে কল্পনা, ধারণা, আন্দাজ, অনুমান করতে অক্ষম। কেননা, তাঁর সত্তা ও সিফাত সম্পর্কে কিংবা এর সদৃশ সম্পর্কে আমাদের কোনো স্মৃতি বা অভিজ্ঞতা নেই।

তাঁর সিফাতের অস্তিত্ব ও বাস্তবতা কীভাবে জানি ও বুঝি?

এবার জানার বিষয় হলো, কল্পনা দিয়ে ও ধারণা করেও যদি আমরা তাঁকে অনুমান করতে না পারি, তাহলে আমরা আল্লাহ তাআলার সত্তার অস্তিত্ব এবং তাঁর সিফাতের অস্তিত্ব ও বাস্তবতা কীভাবে জানি-বুঝি ও উপলব্ধি করি?

উত্তর :

আমরা আল্লাহ তাআলার সত্তার অস্তিত্ব এবং তাঁর সিফাতের অস্তিত্ব ও বাস্তবতা জানি-বুঝি ও উপলব্ধি করি তাঁর সৃষ্টিকর্ম ও অন্যান্য গুণাবলির ফল দেখে এবং যুক্তিবোধ দিয়ে; কল্পনা ও ধারণা করে নয়।

যেমন ধরুন, আপনার মোবাইলে নতুন কোনো নম্বর থেকে রিংটোন বেজে উঠল। তখন আপনি কী বুঝবেন? নিশ্চয় আপনি মোবাইল ধরার আগেই বুঝবেন যে, কোনো একজন জীবন্ত ও বাক্শক্তির অধিকারী মানুষ আপনাকে কল করছে।

কিন্তু সেই মানুষটি পুরুষ নাকি নারী, মোটা নাকি চিকন, বেঁটে নাকি লম্বা, কালো নাকি ফর্সা, আলেম নাকি গায়রে আলেম এবং গাড়িতে নাকি জাহাজে, বাড়িতে নাকি প্রতিষ্ঠানে, বসে নাকি শোয়া অবস্থায় মোবাইল করছে—তা কি শুধু রিংটোন শুনে কল্পনা ও ধারণা করে বোঝা যাবে?

না, বোঝা যাবে না। তবে কোনো একজন জীবন্ত ও বাক্শক্তির অধিকারী মানুষই যে মোবাইল করছে—এতটুকু বিষয় আপনি নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পারবেন, মোবাইল ধরা ছাড়াই।

ঠিক তদ্রূপ, এ বিশ্বজগতে সৃষ্টিকর্ম ও অন্যান্য গুণাবলির ফল দেখে আমরা নিশ্চিত

বুঝতে পারি যে, সকল মহৎ-উৎকৃষ্ট গুণের অধিকারী বিশ্বজগতের একজন মহান সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন। কিন্তু তাঁর সত্তার অস্তিত্ব কেমন এবং সেসব গুণাবলি তাঁর সত্তায় কীভাবে বিদ্যমান এবং তা থেকে সৃষ্টিকর্ম ও গুণাবলির ফল কীভাবে প্রকাশিত হয়—তা আমরা জানি না, বুঝি না; আর তা সম্ভবও নয়।

তাই মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব এবং তাঁর গুণাবলির বাস্তবতা আমাদের কল্পনার বিষয় নয়। সুতরাং এ ক্ষেত্রে কল্পনা, ধারণা, আন্দাজ, অনুমান কোনোটাই করা যাবে না; বরং তিনি এসবের ঊর্ধ্বে।

এ জন্যই আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে বারংবার তাঁর সৃষ্টিকর্ম ও অন্যান্য গুণাবলির ফল দেখে একমাত্র তাঁকে মানতে বলেছেন এবং শুধুই তাঁর ইবাদত করতে বলেছেন। ইরশাদ করেছেন,

يَآيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ‎ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً ۖ وَّاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

‘হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ইবাদত করো, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো। (সেই পালনকর্তার,) যিনি তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদস্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসেবে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোনো শরীক স্থির কোরো না, যখন তোমরা এসব বিষয় জানো।’[২৭৮]

আরও ইরশাদ করেন,

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ

‘তোমরা কীভাবে আল্লাহর সাথে কুফরী করো? অথচ তোমরা ছিলে নিষ্প্রাণ। অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, আবার মৃত্যু দান করবেন। অতঃপর (পুনরায়) তোমাদেরকে জীবিত করবেন। তারপর তোমরা তারই কাছে ফিরে যাবে।’[২৭৯]

সূরা গাশিয়াতে এসেছে,

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ

২৭৮. সূরা বাকারা, ২২
২৭৯. সূরা বাকারা, ২২

‘আচ্ছা, ওরা কি উটের দিকে লক্ষ করে না যে, কীভাবে তা সৃষ্টি করা হয়েছে?’ (কারণ, এর আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য উভয়ই অন্যান্য জীবের চেয়ে আজীব ধরনের।)

وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ

‘এবং আসমানের দিকে লক্ষ করে না যে, কীভাবে তা উঁচুতে স্থাপন করা হয়েছে?’ (অর্থাৎ বাহ্যিক কোনো স্তম্ভ বা থাম ছাড়া ঊর্ধ্বে স্থাপন করা হয়েছে।)

وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ

‘এবং পাহাড়-পর্বতের দিকে লক্ষ করে না যে, কীভাবে তা দাঁড় করানো হয়েছে?’ (তথা এমনভাবে খাড়া রাখা হয়েছে যে, নিজ স্থান থেকে একটুও নড়েচড়ে না।)

وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

‘এবং জমিনের দিকে লক্ষ করে না যে, কীভাবে তা বিছানো হয়েছে?’ (অর্থাৎ নিজ বিশালত্বের কারণে গোলাকার হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবীকে সমতল মনে হয় এবং এ জন্যই পৃথিবীর বুকে বসবাস করা সহজ হয়েছে।)

এসব আল্লাহ তাআলার কুদরতের নিদর্শন। আশ্চর্য এই যে, এসব জিনিস দেখে আল্লাহ তাআলার কুদরত ও বিজ্ঞানময় ব্যবস্থাগুলোকে ওরা উপলব্ধি করছে না। যদি চিন্তা করে দেখত, তবে মৃত্যুর পর পুনর্জীবন দানে যে আল্লাহ তাআলা সক্ষম এবং পরজগতের আজীব ও বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনাগুলো যে সম্ভব, তা সহজেই বুঝতে পারত।

অন্যত্র ইরশাদ করেন,

فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

‘আল্লাহর রহমতের ফল লক্ষ করো, তিনি কীভাবে ভূমিকে তার মৃত্যুর পর জীবন দান করেন। বস্তুত তিনি মৃতদের জীবনদাতা এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।’[২৮০]

লক্ষ করুন, এ আয়াতগুলোতে তাঁর বিভিন্ন সৃষ্টিকর্ম, ক্ষমতা ও দয়া ইত্যাদি গুণাবলির ফল দেখিয়ে দিয়েছেন এবং এগুলোকে আল্লাহর রহমতের ফল ও নিদর্শনরূপে উল্লেখ করে তা পর্যবেক্ষণের আদেশ দিয়েছেন। তো এসব দেখে খুব সহজেই আল্লাহর সৃষ্টি, ক্ষমতা ও দয়া গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।

তা ছাড়া যুগে যুগে আল্লাহ তাআলা মানুষের হেদায়েতের জন্য যেসব নবী ও রাসূলকে প্রেরণ করেছেন, তাঁরাও সাধারণত আল্লাহ তাআলার কার্যাবলিকেই তাঁর গুণ ও মহিমার প্রমাণ হিসেবে পেশ করতেন।

---

২৮০. সূরা রূম, (৩০) : ৫০

যেমন : হযরত মুসা আলাইহিস সালামের বক্তব্য দেখুন, কুরআনে এসেছে,

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ

'ফেরাউন বলল, "রাব্বুল আলামীন" বা বিশ্বজগতের পালনকর্তা আবার কী?'

قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ

'মুসা বলল, তিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এ দুইয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।'

قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗۤ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ

'ফেরাউন তার আশপাশের লোকদেরকে বলল, তোমরা শুনছ কি না?'

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ

'মুসা বলল, তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রতিপালক।'[২৮১]

বলাবাহুল্য, ফেরাউন যে প্রশ্ন করেছিল তার সারমর্ম ছিল, 'রাব্বুল আলামীন'-এর স্বরূপ কী, তা ব্যাখ্যা করো। আর হযরত মুসা আলাইহিস সালামের দেওয়া উত্তরের সারমর্ম হলো, আল্লাহ্ তাআলার সত্তা কেমন, তাঁর স্বরূপ কী, তা জানা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। হ্যাঁ, তাঁকে জানা ও চেনা যায় তাঁর সিফাত বা গুণাবলির দ্বারা। তাই হযরত মুসা আলাইহিস সালাম উত্তরে আল্লাহ্ তাআলার সিফাতই উল্লেখ করেছেন।

এখান থেকে প্রমাণিত হয় যে, মহিমান্বিত আল্লাহর স্বরূপ জানা সম্ভবপর নয়। কেননা, ফেরাউনের প্রশ্ন ছিল আল্লাহর স্বরূপ সম্পর্কে। মুসা আলাইহিস সালাম স্বরূপ বর্ণনা না করে আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলি বর্ণনা করেছেন। এতে ইঙ্গিত করেছেন যে, আল্লাহ্ তাআলার স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভবপর নয় এবং এরূপ প্রশ্ন করাই অবাস্তব।

এভাবে ওপরে কুরআনে কারীম থেকে আল্লাহ তাআলা সম্বন্ধে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ও তাঁর যুগের শাসক নমরুদের সাথে সংঘটিত এক বিতর্কের কথা উল্লেখ হয়েছে। এতেও হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কথা দেখুন,

'যখন ইবরাহীম বলল, "তিনি আমার প্রতিপালক, যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান", সে বলল, "আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই।" ইবরাহীম বলল, "আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক হতে উদিত করান, তুমি একে পশ্চিম দিক হতে উদিত

---

২৮১. সূরা শুআরা, (২৬) : ২৩-২৮; আরও দেখুন, এ সূরার : ৭৯-৮২; সূরা ত্বহা, (২০) : ৪৯-৫৩; সূরা ফাতির, (৩৫) : ১৩-১৭

করাও তো।" এরপর যে কুফরী করেছিল সে নিরুত্তর হয়ে গেল।'[২৮২]

এখানে হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সে যুগের কাফের বাদশাহর সামনে আল্লাহ্ তাআলার রুবূবিয়্যাতের প্রমাণ হিসেবে তাঁর সৃষ্টিকর্ম ও ক্ষমতাকেই উপস্থাপন করেছিলেন। এই আয়াতের তাফসীরে হানাফী ফকীহ্ ইমাম আবু বকর জাসসাস রাহ. (মৃ. ৩৭০ হি.) বলেন,

وَتَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللهَ تَعَالَى لا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ، وَأَنَّ طَرِيقَ مَعْرِفَتِهِ مَا نَصَبَ مِنَ الدَّلَائِلِ عَلَى تَوْحِيدِهِ؛ لِأَنَّ أَنْبِيَاءَ اللهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ إِنَّمَا حَاجُّوا الْكُفَّارَ بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَلَمْ يَصِفُوا اللهَ تَعَالَى بِصِفَةٍ تُوجِبُ التَّشْبِيهَ، وَإِنَّمَا وَصَفُوهُ بِأَفْعَالِهِ وَاسْتَدَلُّوا بِهَا عَلَيْهِ.

'এ আয়াত এ কথা নির্দেশ করে যে, আল্লাহ তাআলার মতো কোনো কিছু নেই, আর আল্লাহ্ তাআলার পরিচয় জানার উপায় হলো, তাওহীদের পক্ষে (সৃষ্টিজগতে) তাঁর উত্থাপনকৃত প্রমাণসমূহ। কেননা, নবীগণ এসব সৃষ্টিজাগতিক প্রমাণাদি দ্বারাই কাফেরদের বিরুদ্ধে প্রমাণ উপস্থাপন করতেন। তাঁরা আল্লাহকে এমন বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করতেন না, যা সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যায়ন আবশ্যক করে তোলে। তাঁরা আল্লাহ্ তাআলাকে তাঁর কার্যাবলি দ্বারাই বিশেষিত করতেন এবং এর দ্বারাই তাঁর ব্যাপারে প্রমাণ উপস্থাপন করতেন।'[২৮৩]

সারকথা, আল্লাহ তাআলার বিভিন্ন রকম সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কে জেনে তা থেকে পরোক্ষভাবে আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলির অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে হয়।

বস্তুত কর্ম ও ফলাফল দেখে গুণের পরিচয় লাভ করা সহজ। যেমন দেখুন, আমরা কোনো ব্যক্তিকে জীবিত বলি, কারণ আমরা তার মাঝে জীবনের লক্ষণ দেখতে পাই; সরাসরি 'রূহ'-কে নয়। কোনো ব্যক্তিকে জ্ঞানী বা ন্যায়বান বলি, কারণ তার থেকে জ্ঞান ও ন্যায়-ইনসাফ প্রকাশ পায়। আবার কাউকে জালেম বলে থাকি, কারণ তার থেকে জুলুমের আচরণ প্রকাশ পায়।

তদ্রূপ আমরা যদিও আল্লাহর সত্তা ও তাঁর গুণাবলির স্বরূপ সরাসরি দেখতে পাই না; বরং তা মানবীয় জ্ঞান-বুদ্ধির ধরা-ছোঁয়ার ঊর্ধ্বে; কিন্তু আমরা তাঁর সৃষ্টি, কুদরত, রহমত ও দয়া ইত্যাদি বহু গুণের ফল ও প্রকাশ সৃষ্টিজগতে দেখে ও পর্যবেক্ষণ করে তাঁর গুণাবলির অস্তিত্বকে জানি-বুঝি ও উপলব্ধি করি।

আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলি অনাদি ও অনন্ত এবং পরিবর্তন থেকে মুক্ত

সিফাতের অর্থ ও মর্ম অনুধাবনের আরেকটি নীতি হলো, আল্লাহ্ তাআলার গুণাবলি অনাদি ও অনন্ত মনে করা এবং সব ধরনের পরিবর্তন থেকে মুক্ত বিশ্বাস করা। অর্থাৎ

---

২৮২. সূরা বাকারা, (২) ২৫৮

২৮৩. আহকামুল কুরআন, জাসসাস, ১/৫৫২; আরও দেখুন, তাফসীরে মাতুরীদী, ৮/৭০৪

তিনি যেমন চির-অনাদি, যার অস্তিত্বের শুরু নেই এবং তিনি অনন্ত, অবিনশ্বর, চিরস্থায়ী; একইভাবে তাঁর গুণাবলিও চির-অনাদি, অনন্ত, যার কোনো শেষ নেই। জীবন, জ্ঞান, সামর্থ্য, শ্রবণ, দর্শন, ইচ্ছা, কথন, সৃজন, রিযিক দান, জীবন ও মৃত্যু দান—সবই তাঁর গুণ; যেগুলো তাঁর সত্তার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সেগুলো তাঁর হুবহু সত্তাও নয়, আবার তাঁর সত্তার বাইরেরও কিছু নয়।[২৮৪] তিনি তাঁর যাবতীয় গুণাবলিসহ চিরন্তন ও চিরস্থায়ী। তাঁর গুণাবলির কোনো কিছু সাময়িক নয় এবং সৃষ্টি থেকে অর্জিত নয়।

ইমাম তাহাবী রাহ. (মৃ. ৩২১ হি.) তাঁর বিখ্যাত 'আকীদা' গ্রন্থে বলেন,

مَا زَالَ بِصِفَاتِهِ قَدِيمًا قَبْلَ خَلْقِهِ، وَلَمْ يَزْدَدْ بِكَوْنِهِمْ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُمْ مِنْ صِفَتِه. وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ أَزَلِيًّا كَذَلِكَ لا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبَدِيًّا. لَيْسَ مُنْذُ خَلَقَ الْخَلْقَ اسْتَفَادَ اسْمَ الْخَالِقِ، وَلَا بِإِحْدَاثِهِ الْبَرِيَّةَ اسْتَفَادَ اسْمَ الْبَارِئِ، [بل] لَهُ مَعْنَى الرُّبُوبِيَّةِ وَلَا مَرْبُوب، وَمَعْنَى الْخَالِقِيَّةِ وَلَا مَخْلُوق. وَكَمَا أَنَّهُ مُحْيِي الْمَوْتَى بَعْدَ مَا أَحْيَاهُم، اسْتَحَقَّ هَذَا الاسْمَ قَبْلَ إِحْيَائِهِمْ، كَذَلِكَ اسْتَحَقَّ اسْمَ الْخَالِقِ قَبْلَ إِنْشَائِهِمْ. ذَلِكَ بِأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَيْهِ فَقِيرٌ، وَكُلُّ أَمْرٍ عَلَيْهِ يَسِيرٌ.

'তিনি মাখলূক সৃষ্টি করার আগ থেকেই তাঁর যাবতীয় অনাদি গুণসহ বিদ্যমান (অর্থাৎ তিনি সর্বদা তাঁর সকল গুণের অধিকারী)। মাখলূক সৃষ্টির পর তাঁর মাঝে নতুন কোনো গুণের সংযোজন ঘটেনি, যা মাখলূকের (অস্তিত্বের) আগে ছিল না। অনাদিকাল থেকেই যেমন তিনি তাঁর সকল গুণে গুণান্বিত, তেমনই অনন্তকালও তিনি সকল গুণে গুণান্বিত থাকবেন।

এমন নয় যে, মাখলূক সৃষ্টির পর তিনি 'খালেক' (সৃষ্টিকর্তা) গুণটি অর্জন করেছেন। আবার এমনও নয় যে, সৃষ্টিজগৎকে অস্তিত্বে আনার পর তিনি 'বারী' (উদ্ভাবক)

---

২৮৪. এটাকে আরবীতে বলে, لا عين ذاته ولا غيرها

قال الملا علي القاري (المتوفى: ١٠١٤هـ) في «مرقاة المفاتيح» ١٥٦١/٤: وَاعْلَمْ أَنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنَّ صِفَاتِ اللهِ لَيْسَتْ عَيْنَ ذَاتِهِ؛ لِمَا أَنَّ الْمَعَانِيَ تُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الصِّفَاتِ لُغَةً وَعَقْلًا... فَثَبَتَ أَنَّهَا لَيْسَتْ عَيْنَ الذَّاتِ، وَلَيْسَتْ غَيْرَهَا أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْغَيْرَيْنِ هُمَا اللَّذَانِ يُمْكِنُ انْفِكَاكُ أَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرِ. انتهى.

وقال ابن كمال باشا (المتوفى: ٩٤٠هـ) في «المنيرة» ص ٣٩: وأن الله تعالى بجميع صِفاتِهِ واسمائِهِ قديمٌ أزليّ، لكن صفاته واسماءه لا هو ولا غيره، كالواحد من العشرة، ولو قُلنا بأنّ هذه الصّفاتِ عين الله تعالى: فيؤدي إلى أن يكون إلهين، وذلك مُحال، ولو قلنا بأنّ هذه الصفات غير الله تعالى: لكانت هذه الصفاتُ مُحْدَثةً لا قديمة، وهذا غير جائز.

সারমর্ম, 'আইন' মানে দুটি বিষয় এমনভাবে অভিন্ন হওয়া, যাতে করে বিষয়-দুটির মাঝে কোনো পার্থক্য না থাকে। যেমন : খালেদ নাম এবং খালেদের সত্তা; উভয়টি সর্বাবস্থায় এক ও অভিন্ন। 'গাইর' মানে দুটি বিষয়ের মধ্যে একটির অস্তিত্ব অন্যটি ছাড়া সম্ভব হওয়া। যেমন : 'জ্ঞান' খালেদ ছাড়া রহীমের কাছে থাকা সম্ভব।
আল্লাহ তাআলার সিফাতসমূহ তাঁর 'আইনে যাত' তথা স্বয়ং সত্তা বা অভিন্ন না হওয়ার কারণ হলো, সত্তা ও সিফাত দুটি দুই বিষয়, যা বলার অপেক্ষা রাখে না। আবার 'গাইরে যাত' তথা ভিন্ন সত্তাও নয়। কেননা, আল্লাহর সত্তা কখনো সিফাতে কামাল তথা পূর্ণাঙ্গতার গুণ থেকে মুক্ত হওয়া অসম্ভব। অন্যথায় তাঁর সিফাতসমূহ তাঁর সত্তার মতো কাদীম ও অনাদি হবে না, যা অসম্ভব।

গুণটি অর্জন করেছেন। প্রতিপালনের গুণ তো তাঁর সেই সময়ও ছিল, যখন কোনো প্রতিপাল্যই ছিল না। এবং সৃষ্টিকর্তার গুণও তাঁর তখন থেকেই ছিল, যখন সৃষ্টি বলতে কোনো কিছু ছিল না। তিনি মৃতদের জীবন দান করার পর যেভাবে 'জীবন দানকারী', তেমনই তাদের জীবন দান করার আগেই তিনি এই (জীবন দানকারী) নামের অধিকারী ছিলেন। অনুরূপভাবে তিনি সৃষ্টিকুলের সৃষ্টি করার পূর্বেই 'খালেক' (সৃষ্টিকর্তা) নামের অধিকারী ছিলেন।

কারণ, তিনি সবকিছুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান এবং প্রতিটি বস্তু তাঁর মুখাপেক্ষী। আর সবকিছুই তাঁর জন্য সহজ। তিনি কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন।'

অর্থাৎ আমরা যেমন লেখালেখি করলে বা বই লিখলে 'লেখক' গুণে আখ্যায়িত হই বা কেরাত পড়লে 'কারী' গুণের অধিকারী হই, আল্লাহ তাআলা আমাদের মতো এভাবে গুণাবলির অধিকারী নন এবং কোনো গুণে আখ্যায়িত নন।

ইমাম আকমালুদ্দীন বাবিরতী রাহ. (মৃ. ৭৮৬ হি.) এর ব্যাখ্যায় লেখেন,

أراد بهذا الكلام أن الله تعالى موصوف بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أزلا وأبدا، سواء كانت صفات الذات كالحياة والقدرة والعلم والإرادة والمشيئة والسمع والبصر، أو صفات الأفعال كالتخليق والتكوين والإحياء والإماتة، فإن كلها صفات له قائمة بذاته، قديمات مصونات عن الزوال.

'এ কথা দ্বারা (ইমাম তাহাবীর) উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তাআলা তাঁর সুন্দর নাম ও সুমহান গুণাবলিতে অনাদিকাল থেকে গুণান্বিত এবং অনন্তকাল পর্যন্ত গুণান্বিত থাকবেন। চাই সেটা তাঁর সত্তাগত সিফাত বা গুণ হোক, যেমন : জীবন, ক্ষমতা, জ্ঞান, ইরাদা-ইচ্ছা, শোনা ও দেখা; অথবা তাঁর কর্মগত সিফাত হোক, যেমন : সৃষ্টি করা, জীবন ও মৃত্যু দান করা প্রভৃতি। এগুলো সবই তাঁর সিফাত, যা তাঁর সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত এবং তা অনাদি আর বিলুপ্তি থেকে সুরক্ষিত।'[২৮৫]

ইমাম নূরুদ্দীন সাবূনী মাতুরীদী রাহ. (মৃ. ৫৮০ হি.) বলেন,

قال أهل السنة: إن الله تعالى موصوف بصفات الكمال، منزه عن النقيصة والزوال، ليست بأعراض تحدث وتنعدم، بل هي أزلية أبدية قديمة قائمة بذاته، لا تشبه صفات الخلق بوجه من الوجوه.

'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর মতে আল্লাহ তাআলা সকল পূর্ণতা-গুণে গুণান্বিত এবং দোষ-ত্রুটি ও ক্ষণস্থায়িত্ব থেকে চিরপবিত্র। তাঁর গুণাবলি এমন কোনো অবস্থার নাম নয়, যা নির্দিষ্ট কোনো ক্ষণে আপতিত হয় এবং পরে একসময় তা আবার বিলুপ্ত হয়; বরং তাঁর সকল গুণ অনাদি ও অনন্ত, তাঁর গুণ তাঁর সত্তায় স্থায়ীভাবে বিদ্যমান। তাঁর গুণাবলি কোনো দিক থেকেই কোনোভাবেই সৃষ্টি ও

---

২৮৫. শারহুল আকীদাতিত তাহাবিয়া, পৃষ্ঠা ৪২

মাখলূকের গুণাবলির মতো নয়।'[২৮৬]

উল্লেখ্য, আল্লাহ্ তাআলার সকল সিফাত অনাদি বটে, কিন্তু সিফাতের সাথে সম্পৃক্ত বস্তু বা সিফাতের প্রকাশটা সৃষ্ট। যেমন : অনাদিকাল থেকে তিনি সৃষ্টিকর্তার গুণে গুণান্বিত, কিন্তু সৃষ্টিগুণের সাথে সম্পৃক্ত বা প্রকাশ বস্তু হচ্ছে মাখলূক, এটা সৃষ্ট। তিনি অনাদিকাল থেকেই রিযিকদাতার গুণে গুণান্বিত, কিন্তু রিযিক দানের গুণটির সাথে সম্পৃক্ত ও প্রকাশ বস্তু হচ্ছে রিযিক, তা সৃষ্ট।

মোটকথা, তাঁর কোনো সিফাত-গুণ সৃষ্ট নয়, কিন্তু সিফাতের প্রকাশটা সৃষ্ট।

কাজেই তাঁর সিফাত অনাদি হওয়ার কারণে সিফাতের সাথে সম্পৃক্ত বস্তুকেও অনাদি মনে করা যাবে না।

আর এমন আকীদাও রাখা যাবে না যে, সৃষ্টির পূর্বে তাঁর কোনো গুণে পূর্ণতা ছিল না; বরং সৃষ্টির পর পূর্ণতা এসেছে কিংবা কোনো ধরনের রূপান্তর ও পরিবর্তন সম্পৃক্ত হয়েছে। অথবা সৃষ্টির পর তাঁর কোনো গুণ অর্জিত হয়েছে, যা পূর্বে ছিল না। যেমন : আসমান-জমিন প্রভৃতি সৃষ্টির পর তাঁর আরশে ওঠা বা অবস্থান করা।

ইমাম আহমদ রাহ. (মৃ. ২৪১ হি.)-এর আকীদার বিবরণে এসেছে,

ولم يزل الله تعالى عاليا رفيعا قبل أن يخلق عرشه، فهو فوق كل شيء والعالي على كل شيء ... والله تعالى لم يلحقه تغير ولا تبدل، ولا تلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش.

'মহান আল্লাহ্ আরশ সৃষ্টির পূর্ব থেকেই সুউচ্চ ও সমুন্নত। তিনি সবকিছুর ঊর্ধ্বে এবং সমস্ত কিছুর ওপরে। আল্লাহ্র সঙ্গে কোনো ধরনের রূপান্তর ও পরিবর্তন সম্পৃক্ত হয়নি। এবং না আরশ সৃষ্টির পূর্বে তাঁর সঙ্গে সীমা-পরিধি যুক্ত হয়েছে, আর না আরশ সৃষ্টির পরে যুক্ত হয়েছে।'[২৮৭]

সিফাত ও নামসমূহ প্রমাণিত হওয়ার মূলনীতি

কোনো গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সর্বোচ্চ স্তর, যার ঊর্ধ্বে আর কোনো স্তর থাকতে পারে না, তা শুধু মহান পালনকর্তা আল্লাহ্ তাআলার জন্যই নির্দিষ্ট। তাঁকে ছাড়া কোনো সৃষ্টির পক্ষে এই স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব নয়।

তাই আল্লাহ তাআলার 'আল-আসমাউল হুসনা' (সুন্দর নামসমূহ) এবং সিফাত (গুণাবলি) 'তাওকীফী' তথা কুরআন, সুন্নাহ্ ও ইজমা'র ওপর নির্ভরশীল এবং এতে কোনো কিয়াস চলে না।

অর্থাৎ কোনো শব্দ 'আল-আসমাউল হুসনা'র অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য শব্দটি হুবহু

---

২৮৬. আল-বিদায়াহ ফী উসূলুদ্দীন, পৃষ্ঠা ৪৯
২৮৭. ই'তিকাদুল ইমামিল মুনাব্বাল, আহমদ ইবনে হাম্বল, তামীমী, পৃষ্ঠা ৩৮

আল্লাহ্ তাআলার নামরূপে কুরআন বা সহীহ্ হাদীসে স্পষ্টভাবে থাকতে হবে কিংবা ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। শুধু কিয়াস বা যুক্তির ভিত্তিতে বা অন্য কিছুর ভিত্তিতে অর্থগত বিচারে কোনো শব্দকে 'আল-আসমাউল হুসনা'র অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। এমনকি যে শব্দরূপটি কুরআন বা হাদীসে সরাসরি নামরূপে ব্যবহৃত হয়নি; বরং ফেয়েল ও ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হয়েছে, সেটাকে নামের রূপ দিয়ে 'আল-আসমাউল হুসনা'র অন্তর্ভুক্ত করা যায় না।

যেমন : আল্লাহ্ তাআলার ক্রিয়ারূপে কুরআনে এসেছে,

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ...

'নিশ্চয় আল্লাহ্ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবীর প্রতি সালাত প্রেরণ করেন।...'

وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ الثَّمَرَٰتِ ...

'তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন, তোমাদের জন্য ফসল উৎপাদন করেন।'

এখান থেকে আল্লাহ্ তাআলাকে 'মুসল্লী', 'মুনযিল' ও 'মুখরিজ' নামের রূপ দিয়ে 'আল-আসমাউল হুসনা'র অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

সুতরাং আল্লাহর নামের ব্যাপারে কারোরই এমন কোনো অধিকার নেই, যে যা ইচ্ছা নাম রাখবে। এ কারণেই আল্লাহকে 'কারীম' বলা যাবে, কিন্তু নাম হিসেবে 'সখী' বলা যাবে না। 'নূর' বলা যাবে, কিন্তু নাম হিসেবে 'জ্যোতি' বা 'আলো' বলা যাবে না। 'শাফী' বলা যাবে, কিন্তু নাম হিসেবে 'তবীব' বা 'চিকিৎসক' বলা যাবে না। কারণ, এই দ্বিতীয় শব্দগুলো প্রথম শব্দের সমার্থক হলেও কুরআন-হাদীসে বর্ণিত হয়নি এবং ইজমা'ও হয়নি।

অনুরূপ আল্লাহ্ তাআলার সিফাত ও গুণ বর্ণনার ক্ষেত্রেও কুরআন বা সহীহ্ হাদীসে স্পষ্টভাবে গুণবাচক যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা ব্যবহার করা চাই; বরং আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআহর একদলের মতে এ ক্ষেত্রেও হুবহু কুরআন-সুন্নাহর শব্দ ব্যবহার করা জরুরি। তবে আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআহর অনেকেই শুধু সিফাতের ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহর বাইরের শব্দ দ্বারাও আল্লাহ্ তাআলার গুণ ব্যক্ত করা বৈধ মনে করেন এই শর্তে যে, সেই শব্দটি যদি কুরআন বা সুন্নাহয় বর্ণিত গুণবাচক শব্দের সমার্থক হয় এবং ভুল কোনো অর্থের বা ভ্রান্ত কোনো আকীদার ভ্রম ও সন্দেহ তৈরি না করে। যেমন : আরবীতে আলেমগণ 'মাওজূদ', 'কাদীম' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে থাকেন।[২৮৮]

---

২৮৮. দেখুন, শা'নুদ-দুআ, খাত্তাবী, পৃষ্ঠা ১১১-১১৩; মাকালাতুল আশআরী, ইবনে ফূরাক, পৃষ্ঠা ৪২; শারহুল বুখারী, ইবনে বাত্তাল, ১০/১৪১; ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার, ১১/২১৭ ও ১৩/৩৫৭; আল-ইনসাফ, বাকিল্লানী, পৃষ্ঠা ৩৯; উসূলুদ্দীন, আব্দুল কাহের বাগদাদী, পৃষ্ঠা ১১৬; আল-মাকসিদুল আসনা ফী শারহি মাআনী

সারকথা, আল্লাহ তাআলার নামসমূহ ও গুণাবলির শব্দ কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা' দ্বারা প্রমাণিত হতে হবে। তবে সিফাতের ক্ষেত্রে অনেকেই কুরআন-সুন্নাহর বাইরের শব্দ দ্বারাও আল্লাহ তাআলার গুণ ব্যক্ত করা বৈধ বলেছেন।

'কাদীম' শব্দের ব্যবহার

ইবনে আবীল ইয, শায়খ বিন বায ও আলবানীসহ সালাফী শায়খরা 'কাদীম' শব্দটির ব্যবহার নিয়ে আপত্তি ও অস্বীকৃতি জানিয়েছেন।

কিন্তু আল্লাহ তাআলার শানে এটার ব্যবহার নিয়ে আপত্তি করা ঠিক নয়। ইমামগণ এটাকে সিফাত-গুণ ও নাম হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

হাম্বলী ইমাম খাল্লাল লেখেন, ইমাম আহমদ রাহ. বলতেন,

إن الله تعالى قديم بصفاته.

ইমাম তাহাবী রাহ. তাঁর বিখ্যাত 'আকীদা'র কিতাবে লেখেন,

قَدِيمٌ بِلَا ابْتِدَاءٍ.

শায়খ সাফ্‌ফারীনী হাম্বলী রাহ. (মৃ. ১১৮৮ হি.) বলেন,

)القديم(نعتٌ لله، وهو اسمٌ من أسمائه.

'কাদীম' শব্দটি আল্লাহ তাআলার সিফাত-গুণ এবং তাঁর অন্যতম নাম।'

ইমাম বায়হাকী রাহ. (মৃ. ৪৫৮ হি.) হাদীস থেকে এর প্রমাণ দেখিয়েছেন। তিনি এর জন্য শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে,

باب ذكر الأسماء... منها:)القديم(، وذلك مما يؤثَر عن رسول الله ﷺ.

এ ছাড়া ইবনে ফূরাক রাহ. (মৃ. ৪০৬ হি.), ইবনুল আরবী রাহ. (মৃ. ৫৪৩ হি.) ও তাফতাযানী রাহ. (মৃ. ৭৯৩ হি.)-সহ অনেকে 'কাদীম' শব্দটি গুণ বা নাম হিসেবে ব্যবহারের পক্ষে ইজমা' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলেছেন।[২৮৯]

আল্লাহর নাম বিকৃতি সাধনের কয়েকটি দিক

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

আসমাইল্লাহিল হুসনা, গাযালী, পৃষ্ঠা ১৫৪; আল-আসনা ফী শারহি আসমাইল্লাহিল হুসনা, কুরতুবী, পৃষ্ঠা ২০, ২৬-৩১; বাদায়িউল ফাওয়াইদ, ইবনুল কায়্যিম, ১/১৬২; শারহুল জাওহারাহ, বাজূরী, পৃষ্ঠা ১৪৮

২৮৯. দেখুন, আল-আকীদাহ, খাল্লাল, পৃষ্ঠা ১১২; লাওয়ামিউল আনওয়ারিল বাহিয়্যা, ১/৩৮; আল-আসমা ওয়াস সিফাত, বায়হাকী, ১/৩৬; মাকালাতুল আশআরী, ইবনে ফূরাক, পৃষ্ঠা ৪৩; আল-আমাদুল আকসা ফী শারহি আসমাইল্লাহিল হুসনা ওয়া সিফাতিহিল উলা, ইবনুল আরবী, ১/৪৭৯; শারহুল আকায়েদ, পৃষ্ঠা ৮৯; শারহুল ফিকহিল আকবার, মোল্লা আলী কারী, পৃষ্ঠা ৪১; রুহুল মাআনী, আলূসী, ৫/১১৩ (সূরা আ'রাফ ১৮০)

وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থাৎ 'সে সমস্ত লোকের কথা ছাড়ুন, যারা তাঁর আসমায়ে হুসনার ব্যাপারে বাঁকা পথ অবলম্বন করে। তারা তাদের কৃত বক্রতার প্রতিফল পেয়ে যাবে।'

অভিধান অনুযায়ী 'ইলহাদ' অর্থ ঝুঁকে পড়া এবং মধ্যপন্থা থেকে সরে পড়া। এ কারণেই বগলী কবরকে 'লাহদ' বলা হয়। কারণ, তাতেও লাশ ভেতরে সরিয়ে রাখা হয়। কুরআনের পরিভাষায় 'ইলহাদ' বলা হয়, কুরআনের সঠিক অর্থ ছেড়ে তাতে মনগড়া এদিক-সেদিকের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জুড়ে দেওয়া।

এ আয়াতে বলা হয়েছে, এমন সব লোকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে, যারা আল্লাহ তাআলার আসমায়ে হুসনার ব্যাপারে বাঁকা পথ তথা অপব্যাখ্যা ও বিকৃতি করে থাকে। আর আল্লাহর নামের অপব্যাখ্যা ও বিকৃতির কয়েকটি পন্থা হতে পারে। এগুলো সবই এ আয়াতের হুঁশিয়ারির অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহর নামসমূহ বিকৃতি সাধনের কয়েকটি দিক :

১. আল্লাহ তাআলার জন্য এমন কোনো নাম ব্যবহার করা, যা কুরআন-হাদীস বা ইজমা' দ্বারা প্রমাণিত নয়। অথবা যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেভাবে হুবহু ব্যবহার না করা।

২. আল্লাহর যে সমস্ত নাম কুরআন-হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, সেগুলোর মধ্যে কোনো নামকে অশোভন মনে করে বা অন্য কোনো কারণে বর্জন বা পরিহার করা। এতে সেই নামের প্রতি বেয়াদবি বা অবজ্ঞা প্রদর্শন বোঝা যায়।

৩. তাঁর নাম ও সিফাতের মধ্য থেকে কোনো কিছু হ্রাস করা।

৪. আল্লাহর নাম ও সিফাতের মধ্যে নিজের থেকে কিছু বৃদ্ধি করা। যেমন : আল্লাহর নাম ও সিফাতের অর্থের মধ্যে সৃষ্টির সঙ্গে সাদৃশ্য বৃদ্ধি করে দেহত্ব, অঙ্গত্ব ও নশ্বরত্বের ভাব বৃদ্ধি করা।

৫. আল্লাহর জন্য নির্ধারিত নাম কোনো মানুষের জন্য ব্যবহার করা।

আল্লাহ তাআলার নামে মানুষের নাম রাখার বিধান

আসমায়ে হুসনা বা আল্লাহর নামসমূহ দুই প্রকার :

এক.

কিছু নাম এমন রয়েছে, যেগুলো আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারও জন্য ব্যবহার করার নযির কুরআন-হাদীসে নেই। যেমন : রহমান, সুবহান, রাযযাক, খালেক, গাফফার, কুদ্দুস প্রভৃতি। সুতরাং এগুলো একমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। আল্লাহ

ছাড়া অন্য কারও জন্যই এগুলোর ব্যবহার করা উল্লিখিত 'ইলহাদ' তথা বিকৃতি সাধনের অন্তর্ভুক্ত এবং নাজায়েয ও হারাম। নিম্নে এ প্রকারের নামসমূহ আরবীতে উল্লেখ করে দেওয়া হলো :

الله، الرحمن، الأحد، الصمد، القدوس، الجبّار، المتكبّر، الخالق، البارئ، المصوّر، الرزّاق، الغفّار، القهّار، التوّاب، الوهّاب، الخلّاق، الفتّاح، القيُّوم، الرب، المحيط، المالك، الغفور، الحق، القادر، المحيي، الأول، الآخر، الباطن، علّام الغيوب.

তদুপরি এই নির্দিষ্ট নামগুলো যদি আল্লাহ ছাড়া অপর কারও ক্ষেত্রে এমন কোনো ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে হয় যে, যাকে এসব শব্দের দ্বারা সম্বোধন করা হচ্ছে, তাকেই যদি খালেক কিংবা রাযযাক মনে করা হয়, তাহলে তা সম্পূর্ণ কুফর। আর বিশ্বাস যদি ভ্রান্ত না হয়, শুধু অমনোযোগিতা কিংবা না বোঝার দরুন কাউকে খালেক, রাযযাক, রহমান কিংবা সুবহান বলে ডেকে থাকে, তাহলে তা যদিও কুফর নয়, কিন্তু কঠিন গুনাহ হবে।

বলাবাহুল্য, উল্লিখিত নামসমূহের পূর্বে 'আবদ' শব্দ যুক্ত করে মানুষের জন্য ব্যবহার করা জায়েয, যেমন : আব্দুল্লাহ, আবদুল কুদ্দুস, আবদুর রাযযাক, আবদুল গাফফার ইত্যাদি; বরং সহীহ মুসলিমের হাদীসে আছে, 'আল্লাহ তাআলার নিকট প্রিয় নাম হলো, আব্দুল্লাহ ও আবদুর রহমান।'[২৯০]

মাসআলা :

আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর সাথে 'আবদ' শব্দ যুক্ত করে ব্যবহার করা হারাম। যেমন : আব্দুল মুস্তফা, আব্দুন্নবী ইত্যাদি নাম রাখা নিষেধ। হাদীসে এসেছে,

لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَأَمَتِي كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللهِ، وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللهِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ غُلَامِي وَجَارِيَتِي وَفَتَايَ وَفَتَاتِي.

'তোমরা কেউ (নিজেদের গোলাম ও বাঁদিকে) আবদী ও আমাতী বোলো না। তোমরা পুরুষরা সকলেই আল্লাহর 'আবদ' (বান্দা) এবং নারীরা সকলেই আল্লাহর 'আমাত' (বান্দী)। কিন্তু তোমরা বলতে পারো, গোলামি ও জারিয়াতী, ফাতাইয়া ও ফাতাতী।'[২৯১]

উক্ত হাদীসের অন্য এক বর্ণনায় আছে,

وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ: رَبِّي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: سَيِّدِي.

'কোনো গোলাম যেন (মালিককে) রাব্বী না বলে; বরং সে যেন বলে, সায়্যিদী।'

---

২৯০. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১৩২
২৯১. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১৪৯

মাসআলা :

যাদের নাম আবদুর রহমান, আবদুল কুদ্দুস, আবদুর রাযযাক প্রভৃতি রাখা হয়েছে, তাতে সংক্ষেপণ করে পূর্ণ নামের বদলে রহমান, খালেক, রাযযাক, গাফফার সম্বোধন করা বা খেতাব করা হারাম। এভাবে 'কুদরতুল্লাহ'কে 'আল্লাহ্ সাহেব' আর 'কুদরতে খোদা'কে 'খোদা সাহেব' নামে ডাকা হারাম; বরং কবীরা গুনাহ। এসব শব্দ যতবার ব্যবহার করা হবে, ততবারই কবীরা গুনাহ হবে।

দুই.

আল্লাহ্ তাআলার কিছু নাম এমনও আছে, যেগুলো স্বয়ং কুরআন ও হাদীসে অন্যের জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে, অথবা উরফ ও সালাফদের মাঝে মানুষের নাম রাখা হয়েছে। যেমন : রাহীম, রাশীদ, আলী, কারীম, রঊফ, আজীয প্রভৃতি।

এসব নাম আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে অর্থ ভিন্ন মনে করতে হবে। অর্থাৎ এগুলোর আভিধানিক অর্থ বান্দার ক্ষেত্রে সাধারণভাবে প্রযোজ্য হলেও আল্লাহ্ তাআলার ক্ষেত্রে তাঁর শান অনুযায়ী হবে। কাজেই এ সকল নাম যদিও আল্লাহ্ তাআলার জন্য সাব্যস্ত হয়, তবে এগুলোর সাধারণ অর্থে মানুষের জন্য নাম রাখাতে সমস্যা নেই।

এ প্রকারের নামসমূহ আরবীতে দেওয়া হলো,

عزيز، علي، كريم، رحيم، كبير، عظيم، رشيد، بديع، كفيل، هادي، واسع، حكيم.

আর যে সকল নাম সাধারণ অর্থে মানুষের জন্য ব্যবহার হতে পারে, তবে কুরআন ও হাদীসে বা উরফ ও সালাফদের মাঝে মানুষের জন্য ব্যবহৃত হয়নি, সেগুলো দিয়ে নাম রাখা থেকে বিরত থাকা।[২৯২]

পরিতাপের বিষয় হলো, কিছু লোক ইসলামী নাম রাখাই ছেড়ে দিয়েছে। তাদের আকার-অবয়ব ও স্বভাব-চরিত্রে তাদেরকে মুসলমান বলে বোঝা এমনিতেই কঠিন হয়ে পড়েছিল, যা-ও নামের দ্বারা বোঝা যাচ্ছিল, তা-ও নতুন কায়দায় নাম রাখা হচ্ছে। যেমন : ছেলেদের নাম বিপ্লব, সুমন, পেয়ারু; আর মেয়েদের নাম পপি, শাহনায, পারভীন হয়ে যাচ্ছে।

---

২৯২. দেখুন, মাআরিফুল কুরআন, মুফতী শফী (সূরা আ'রাফ, (৭) : ১৮০ নং আয়াতের তাফসীর); ফাতাওয়া উসমানী, তাকী উসমানী, ১/৫২-৫৩; আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়েতিয়্যাহ, ১১/৩৩৫-৩৩৬
উল্লেখ্য, 'ইসমে আযম' নাম কোনটি? এ বিষয়ে আলেমদের মাঝে বড় ইখতেলাফ রয়েছে। হাফেজ ইবনে হাজার রাহ. 'ফাতহুল বারী' গ্রন্থে 'ইসমে আযম' নির্ধারণের বিষয়ে প্রায় ১৪টি মত উল্লেখ করেছেন। তবে নির্ভরযোগ্য কথা হচ্ছে, নির্দিষ্টভাবে কোনো একটি নামকে 'ইসমে আযম' বলার মতো কোনো দলীল শরীয়তের মাঝে পাওয়া যায় না, ফলে তাঁকে তাঁর সুন্দর সুন্দর সকল নামেই ডাকা।

তাঁর সুন্দর নামসমূহ ও আমাদের করণীয়

আল্লামা ইবনে বাত্তাল রাহ. (মৃ. ৪৪৯ হি.) বলেন,

الْإِحْصَاءُ يَقَعُ بِالْقَوْلِ وَيَقَعُ بِالْعَمَلِ، فَالَّذِي بِالْعَمَلِ أَنَّ لِلَّهِ أَسْمَاءً يَخْتَصُّ بِهَا كَالْأَحَدِ وَالْمُتَعَالِ وَالْقَدِيرِ وَنَحْوِهَا، فَيَجِبُ الْإِقْرَارُ بِهَا وَالْخُضُوعُ عِنْدَهَا، وَلَهُ أَسْمَاءٌ يُسْتَحَبُّ الِاقْتِدَاءُ بِهَا فِي مَعَانِيهَا كَالرَّحِيمِ وَالْكَرِيمِ وَالْعَفُوِّ وَنَحْوِهَا، فَيُسْتَحَبُّ لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَحَلَّى بِمَعَانِيهَا، لِيُؤَدِّيَ حَقَّ الْعَمَلِ بِهَا، فَبِهَذَا يَحْصُلُ الْإِحْصَاءُ الْعَمَلِيُّ، وَأَمَّا الْإِحْصَاءُ الْقَوْلِيُّ فَيَحْصُلُ بِجَمْعِهَا وَحِفْظِهَا وَالسُّؤَالِ بِهَا.

'(হাদীসে বর্ণিত আল্লাহর নামসমূহের) আয়ত্ত কথার সাথে আমলের মাধ্যমেও করা যায়। আমলের মাধ্যমে আয়ত্ত করার অর্থ হলো, আল্লাহর কিছু নাম এমন রয়েছে, যেগুলো তাঁর জন্য নির্ধারিত। যেমন : আহাদ, মুতাআল, কাদীর-সহ এ-জাতীয় যা আছে; এগুলো স্বীকার করা এবং এগুলোর সামনে নত হওয়া আবশ্যক।

এ ছাড়া আল্লাহর কিছু নাম এমন রয়েছে, অর্থগত দিক থেকে যেগুলোর অনুসরণ কাম্য। যেমন : রহমান (সকলের প্রতি দয়াবান), রাহীম (পরম দয়ালু), কারীম (মহানুভব), আফুওউ (ক্ষমাশীল) এবং অন্যান্য নাম। কাজেই বান্দার জন্য মুস্তাহাব হলো, এগুলোর অর্থে নিজেকে সুসজ্জিত করা, যাতে আমলের হক আদায় হয়। আর এর মাধ্যমে 'আমলী ইহসা' হবে।

আর কথার মাধ্যমে আয়ত্ত করার অর্থ হলো, নামগুলো জমা করা, মুখস্থ করা এবং সেগুলোর মাধ্যমে ডাকা বা দুআ করা।'[২৯৩]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ اَسْمَآئِهٖ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

'আল্লাহর জন্য রয়েছে সুন্দরতম নামসমূহ। সুতরাং তাঁকে সেসব নামেই ডাকবে। যারা তাঁর নামের ব্যাপারে বক্র পথ অবলম্বন করে, তাদেরকে বর্জন করুন। তারা যা কিছু করছে, তাদেরকে এর বদলা দেওয়া হবে।'[২৯৪]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলাকে তাঁর 'আল-আসমাউল হুসনা' বা গুণবাচক সুন্দরতম নামসমূহ দ্বারা ডাকার আদেশ করা হয়েছে।

আর আল্লাহ তাআলার সুন্দরতম নামসমূহ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তাঁর রব ও ইলাহী বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক সেসব গুণবাচক শব্দ ও বিশেষণ, যেগুলো তিনি নিজেই তাঁর নাম হিসেবে বর্ণনা করেছেন কিংবা তাঁর পক্ষ থেকে তাঁর নবী-রাসূলগণ বর্ণনা করেছেন।

---

২৯৩. ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার, ১৩/৩৭৮

২৯৪. সূরা আ'রাফ, (৭) : ১৮০; বনী ইসরাঈল, (১৭) : ১১০; ত্ব-হা (২০) : ৮; হাশর, (৫৯) : ২৪

যখন জানা গেল, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কিছু আসমায়ে হুসনা রয়েছে এবং সেই সমস্ত আসমা বা নাম একমাত্র আল্লাহর সত্তার সাথেই নির্দিষ্ট, তখন আল্লাহকে যখনই ডাকবে, এসব নামে ডাকাই কর্তব্য।

ডাকা কিংবা আহ্বান করা হলো 'দুআ' শব্দের অর্থ। আর 'দুআ' শব্দটি কুরআনে দুই অর্থে ব্যবহৃত হয় : ১. আল্লাহর জিকির, প্রশংসা ও তাসবীহ-তাহলীলের সাথে যুক্ত, ২. নিজের অভীষ্ট বিষয় প্রার্থনা এবং বিপদাপদ থেকে মুক্তি আর সকল জটিলতার নিরসনকল্পে সাহায্যের আবেদন সম্পর্কিত। এ আয়াতে فَادْعُوهُ بِهَا শব্দটি উভয় অর্থেই ব্যাপক।

অতএব আয়াতের মর্ম হলো হামদ, সানা, গুণ ও প্রশংসাকীর্তন, তাসবীহ-তাহলীলের যোগ্যও শুধু তিনিই এবং বিপদাপদে মুক্তি দান আর প্রয়োজন মেটানোও শুধু তাঁরই ক্ষমতায়। কাজেই যদি প্রশংসা বা গুণকীর্তন করতে হয়, তবে তাঁরই করবে। আর নিজের প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য সিদ্ধি কিংবা বিপদমুক্তির জন্য ডাকতে হলে, সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে শুধু তাঁকেই ডাকবে, তাঁরই কাছে সাহায্য চাইবে।

আর ডাকার সে পদ্ধতিও বলে দেওয়া হয়েছে যে, এসব 'আল-আসমাউল হুসনা' বা সুন্দর নামে ডাকবে, যা আল্লাহর নাম বলে প্রমাণিত।

কুরআন মাজীদের প্রায় সূরায় 'আল-আসমাউল হুসনা' রয়েছে। যেমন : সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াতে, সূরা হাদীদের তিন নং আয়াতে, সূরা ইখলাস ও আয়াতুল কুরসীর শুরুতে রয়েছে। আর সহীহ বুখারীতে যে আল্লাহ তাআলার নিরানব্বইটি নাম আয়ত্তের ফযীলতের কথা উল্লেখ হয়েছে, সে নামসমূহ ইমাম তিরমিযী 'সুনান' গ্রন্থে ও ইমাম হাকিম 'মুসতাদরাক' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, যা বিভিন্ন ইসলামিক ক্যালেন্ডার ও বই ইত্যাদিতে দেখা যায়। তবে সেই নামসমূহ-সংবলিত বর্ণনাটি সহীহ হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

দুআ নিয়ে কিছু কথা

এ আয়াতের মাধ্যমে গোটা মুসলিম-জাতি দুআ প্রার্থনা বিষয়ে দুটি হেদায়েত বা দিকনির্দেশ লাভ করেছে। প্রথমত, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্তাই প্রকৃত হামদ-সানা কিংবা বিপদমুক্তি বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ডাকার যোগ্য নয়। দ্বিতীয়ত, তাঁকে ডাকার জন্য মানুষ এমন মুক্ত নয় যে, যেকোনো শব্দে ইচ্ছা ডাকতে থাকবে; বরং আল্লাহ বিশেষ অনুগ্রহ-পরবশ হয়ে আমাদের সেসব শব্দসমষ্টিও শিখিয়ে দিয়েছেন, যা তাঁর মহত্ত্ব ও মর্যাদার উপযোগী। সেই সাথে এ সমস্ত শব্দেই তাঁকে ডাকার জন্য আমাদের বাধ্য করে দিয়েছেন, যাতে আমরা নিজের মতে শব্দের পরিবর্তন না করি।

আর উদ্দেশ্য সিদ্ধি কিংবা জটিলতা বা বিপদমুক্তির জন্য দুআ ছাড়া অন্য কোনো

পন্থা এমন নেই, যাতে কোনো না কোনো ক্ষতির আশঙ্কা থাকবে না এবং ফল লাভ নিশ্চিত হবে। নিজের প্রয়োজনে আল্লাহ্ তাআলার নিকট প্রার্থনা করাতে কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নেই। তদুপরি একটা নগদ লাভ হলো এই যে, দুআ যে একটি ইবাদত তার সাওয়াব দুআকারীর আমলনামায় তখনই লেখা হয়ে যায়।

মানুষ যে উদ্দেশ্যে দুআ করে, অধিকাংশ সময় হুবহু সে উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হয়ে যায়। আবার কোনো কোনো সময় এমনও হয়, যে বিষয়টিকে প্রার্থনাকারী নিজের উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করেছিল তা তার পক্ষে কল্যাণকর নয় বলে আল্লাহ্ স্বীয় অনুগ্রহে সে দুআকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেন, যা তার জন্য একান্ত উপকারী ও কল্যাণকর। আর আল্লাহর হামদ ও সানার মাধ্যমে জিকির করা হলো ঈমানের খোরাক। এর দ্বারা আল্লাহ তাআলার প্রতি মানুষের মহব্বত ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং তাতে সামান্য পার্থিব দুঃখ-কষ্ট উপস্থিত হলেও শীঘ্রই সহজ হয়ে যায়।

সে জন্যই বুখারী-মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে লোক চিন্তা-ভাবনা, পেরেশানী কিংবা কোনো জটিল বিষয়ের সম্মুখীন হবে, সে যেন নিম্নলিখিত বাক্যগুলো পড়ে,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمُ.

এ ছাড়া 'মুসতাদরাকে হাকিম'-এ সহীহ হাদীসে এসেছে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ফাতিমা রাযি.-কে বলেন, আমার ওসীয়তগুলো শুনে নিতে (এবং সে-মতে আমল করতে) তোমার বাধা কীসে? সে ওসীয়তটি হলো এই যে, সকাল-সন্ধ্যায় এই দুআটি পড়ে নেবে,

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ.

সারকথা, উল্লিখিত আয়াতে উম্মতকে যেকোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এবং যেকোনো বিপদ থেকে মুক্তি লাভের জন্য শুধু আল্লাহকে ডাকতে বলা হয়েছে; কোনো সৃষ্টিকে নয়। আর তাঁকে সে নামেই ডাকবে, যা আল্লাহ্ তাআলার নাম হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে; তার শব্দের কোনো পরিবর্তন করবে না। কারণ, আল্লাহর গুণ-বৈশিষ্ট্যে সব দিক লক্ষ রেখে তাঁর মহত্ত্বের উপযোগী শব্দ চয়ন করতে পারা মানুষের সাধ্যের ঊর্ধ্বে।

আল্লাহ্ তাআলার নাম ও গুণাবলির সংখ্যা

আল্লাহ্ তাআলা সকল প্রকারের দোষ-ত্রুটি থেকে চিরপবিত্র হওয়ার সাথে সাথে সমস্ত ভালো, মহৎ ও উৎকৃষ্ট গুণে গুণান্বিত। তাই তাঁর গুণবাচক নাম অসংখ্য এবং গুণ ও বিশেষণ অগণিত। যার কোনো শেষ নেই, সীমা নেই। তাই তো নবীজী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি দুআয় আল্লাহ তাআলার হামদ ও প্রশংসা এভাবে করেছেন,

لا أُحْصِيْ ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

'আমি আপনার গুণগান করে শেষ করতে পারব না। আপনি তো ওই প্রশংসারই উপযুক্ত, যা স্বয়ং নিজের সম্বন্ধে করেছেন।'[২৯৫]

ইমাম নূরুদ্দীন সাবূনী মাতুরীদী রাহ. (মৃ. ৫৮০ হি.) বলেন,

فهو حي، عالم، قادر، سميع، بصير، مريد، متكلم إلى ما لا يتناهى من صفات الكمال.

'তিনি চিরজীবী, সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, ইচ্ছাময়, কালাম বা কথনগুণের অধিকারী এবং এ ছাড়াও অসংখ্য প্রশংসনীয় গুণের অধিকারী।'[২৯৬]

আশআরী-মাতুরীদীরা কি ৭/৮টি সিফাত ছাড়া বাকিগুলো অস্বীকার করে?

যদি আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নাম ও গুণ অসংখ্য ও অগণিত হয়, তাহলে আশআরী-মাতুরীদীরা শুধু ৭/৮টি সিফাতের কথা বলে বাকিগুলো অস্বীকার করে কেন?

উত্তর :

আল্লাহ তাআলার সকল সিফাত ও গুণাবলির প্রতি সংক্ষেপে ঈমান আনা জরুরি। অর্থাৎ এই বিশ্বাস থাকা যে, আল্লাহ তাআলা সকল মহৎ-উৎকৃষ্ট গুণের অধিকারী এবং সকল দোষ-ত্রুটি থেকে চিরপবিত্র।

আর বিস্তারিতভাবে তাঁর প্রতিটি গুণ এবং প্রতিটি গুণবাচক নাম সম্পর্কে জানা সকলের ওপর ফরজ নয়।

তবে তাঁর মৌলিক কিছু সিফাত ও গুণ রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে জানা সকলের ওপর ফরজ; কমপক্ষে এগুলো সবার জানা থাকা জরুরি। সেগুলো হলো, 'সিফাতে আকলিয়্যাহ'-এর ৭/৮টি সিফাত। অর্থাৎ রব ও ইলাহ হওয়ার জন্য যেসব সিফাত থাকার আবশ্যকতা ও অপরিহার্যতা সাধারণ যুক্তি-বুদ্ধি দ্বারাই বোধগম্য এবং যেগুলো কুরআনে কারীমের মুহকাম আয়াতে দ্ব্যর্থহীনভাবে বর্ণিত হয়েছে। (বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে)

ইসলামী আকীদা বিষয়ে কালামশাস্ত্রের গ্রন্থাবলিতে সিফাত-সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনাকে সাধারণত উক্ত ৭/৮টি সিফাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়। কারণ,

---

২৯৫. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৮৬; আরও দেখুন, মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৩৭১২
২৯৬. আল-বিদায়াহ ফী উসূলুদ্দীন, পৃষ্ঠা ৪৯

কালামশাস্ত্র হলো ইসলামী আকীদার বুদ্ধিবৃত্তিক উপস্থাপন। তাই সিফাত-সংক্রান্ত আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁরা বিশেষভাবে ওইসব সিফাত সম্পর্কে আলোচনা করেন, যেগুলো কোনো সত্তা রব ও ইলাহ্ হওয়ার জন্য আবশ্যকভাবে থাকাটা সহজেই যুক্তি-বুদ্ধি দ্বারা সমর্থিত ও বোধগম্য।

আর এখান থেকে কিছু লোক আশআরী-মাতুরীদীদের বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে এমন অপবাদ দিয়ে থাকে।

অথচ তাঁরা ৭/৮টি সিফাতের কথা বলে বাকিগুলো অস্বীকার করেন না। কেননা, এগুলো ছাড়া আরও ৪০০-এর বেশি সিফাত রয়েছে, যা সবার পক্ষে জানা সম্ভব না বা সহজ না। মাতুরীদী ইমাম নূরুদ্দীন সাবূনীর বক্তব্যে উল্লেখ হয়েছে যে,

فهو حي، عالم، قادر، سميع، بصير، مريد، متكلم إلى ما لا يتناهى من صفات الكمال.

অর্থাৎ তিনি ৭টি সিফাত উল্লেখ করার পর বলেছেন, 'এ ছাড়াও তিনি অসংখ্য প্রশংসনীয় গুণের অধিকারী।'

কাজেই মূলত ৭/৮টি সিফাত বলা থেকে তাঁদের উদ্দেশ্য হলো, তাঁরা মৌলিক ও প্রধান অপরিহার্য সিফাত হিসেবে এগুলো বলে থাকে।[২৯৭]

তা ছাড়া আল্লাহর সিফাত ও নামসমূহের ব্যাপারে কালামশাস্ত্রের ইমামগণের স্বতন্ত্র কিতাব রয়েছে। যেমন : আব্দুল কাহের বাগদাদীর (মৃ. ৪২৯ হি.) 'আল-আসমা ওয়াস সিফাত', ইমাম গাযালীর (মৃ. ৫০৫ হি.) 'আল-মাকসিদুল আসনা', ইবনুল আরবীর (মৃ. ৫৪৩ হি.) 'আল-আমাদুল আকসা ফী শারহি আসমাইল্লাহিল হুসনা ওয়া সিফাতিহিল উলা', ইমাম কুরতুবীর (মৃ. ৬৭১ হি.) 'আল-আসনা ফী শারহি আসমাইল্লাহিল হুসনা'-সহ অনেক কিতাব।

প্রশ্ন :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক হাদীসে ইরশাদ করেছেন,

لِلّٰهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ اسْمًا، مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدًا، لا يَحْفَظُهَا أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ الجَنَّةَ.

'আল্লাহ্ তাআলার ৯৯টি এমন নাম রয়েছে, যে তা আয়ত্ত করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[২৯৮]

এ হাদীস থেকে কি আল্লাহ্ তাআলার নাম ৯৯টিতে সীমিত হওয়া প্রমাণিত হয়?

---

২৯৭. দেখুন : আল-মাকসিদুল আসনা, গাযালী, পৃষ্ঠা ১৩৩; ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন, যাবীদী, ২/১৪৪; আবকারুল আফকার, আমিদী, ১/৪৩৯; শারহুল মাকাসিদ, তাফতাযানী, ৪/১৬৫; আল-আসমা ওয়াস সিফাত, বাগদাদী, ১/৯০ (মুকাদ্দামাতুল মুহাক্কিক)

২৯৮. সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং ৬৪১০

উত্তর : উপরিউক্ত হাদীসে ৯৯টি নামের বিশেষ ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। মোট নামের সংখ্যা ৯৯টি, তা বলা হয়নি।

তাই আব্দুল কাহের বাগদাদী রাহ. (মৃ. ৪২৯ হি.) বলেন,

وإذا جُمع بين ما اتفقتْ عليه الروايات من أسمائه عز وجل، وبين ما زاد من أسمائه في كل واحدة منهما: زاد عدد أسمائه على مئة وأربعين اسما.

'আল্লাহ তাআলার গুণবাচক নাম-সংবলিত বর্ণনাগুলো একত্র করলে তাঁর নামের সংখ্যা ১৪০ থেকে বেশি হয়।'[২৯৯]

তবে অন্যরা তাঁর নামের মোট সংখ্যা আরও বেশি বলেছেন।

সিফাতের বিভিন্ন প্রকার ও বিধান

আল্লাহ তাআলার সিফাত ও গুণাবলির বিভিন্ন ভাগ ও প্রকার রয়েছে।

প্রথমত, সিফাত দুই ভাগে বিভক্ত : 'সিফাতে সালবিয়্যাহ' (صفات سلبية) ও 'সিফাতে ছুবুতিয়্যাহ' (صفات ثبوتية)।

দ্বিতীয়ত, 'সিফাতে ছুবুতিয়্যাহ' দুই প্রকার : 'সিফাতে যাতিয়্যাহ' ذاتية)) ও 'সিফাতে ফে'লিয়্যাহ' (فعلية)।

তৃতীয়ত, 'যাতিয়্যাহ' ও 'ফে'লিয়্যাহ' প্রত্যেকটা আবার দুই প্রকার : 'সিফাতে আকলিয়্যাহ' (عقلية) ও 'সিফাতে খাবরিয়্যাহ' (خبرية)।

এবার প্রতিটি ভাগ ও প্রকার নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা।

সিফাতে সালবিয়্যাহ সম্পর্কে আলোচনা

আল্লাহ তাআলার কিছু পবিত্রতাসূচক গুণাবলি রয়েছে, যেগুলো তাঁর জন্য অনুপযোগী এবং দোষ-ত্রুটি বোঝায় এমন বিষয়কে তাঁর থেকে নাকচ করে। এগুলোকে পরিভাষায় 'সিফাতে সালবিয়্যাহ' বলা হয় এবং 'সিফাতে তানযীহ' ও 'সিফাতে তাকদীস'-ও বলা হয়। 'সিফাতে সালবিয়্যাহ'-এর প্রধান হলো পাঁচটি :

১. আল্লাহ এক ও একক সত্তা, তাঁর কোনো শরীক নেই।

২. চির নির্মুখাপেক্ষিতা তথা তিনি নিজেই সুপ্রতিষ্ঠিত ও সবকিছুর রক্ষাকর্তা।

৩. তিনি (আওয়াল বা কাদীম) অনাদি, যার কোনো শুরু নেই।

৪. তিনি (আখির বা দায়িম) অনন্ত, যার কোনো শেষ নেই।

---

২৯৯. আল-আসমা ওয়াস সিফাত, বাগদাদী, ১/৪৫৪, দারুত তাকওয়া দামেশক

৫. সাদৃশ্যহীনতা তথা আল্লাহর মতো বলতে কিছুই নেই।

এগুলো একসাথে সূরা ইখলাসের মাঝে রয়েছে। কেননা, 'আহাদ' শব্দটি তাঁর একত্ব বোঝায়। 'সমাদ' শব্দটি তাঁর স্বয়ংসম্পূর্ণতা ও নির্মুখাপেক্ষিতা বোঝায়। لَمْ يَلِدْ 'জন্ম দেননি' কথাটি 'অনন্ত হওয়া' বোঝায়। কেননা, তাঁর কোনো সন্তান না থাকার অন্যতম কারণ হলো, তিনি অনন্ত অসীম এবং নির্মুখাপেক্ষী। وَلَمْ يُوْلَدْ 'তিনি জন্মগ্রহণ করেননি' কথাটি বোঝায়, তিনি অনাদি ও চিরন্তন, তাঁর কোনো শুরু নেই। আর وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ 'কোনো কিছু তাঁর সদৃশ নয়' কথাটি বোঝায়, তিনি সৃষ্টি ও মাখলূকের সাদৃশ্য থেকে চিরপবিত্র।

উপরিউক্ত পাঁচ প্রকার 'সিফাতে সালবিয়্যাহ' মূলত সর্বতোভাবে নফী বা নাকচ করে আল্লাহ তাআলার সাথে সর্বপ্রকার শিরক ও সাদৃশ্যকে, সর্বপ্রকার দোষ-ত্রুটিকে। মোটকথা তাঁর শান ও মানের পরিপন্থী সব বিষয়কে নাকচ করে।

বলাবাহুল্য, সিফাতে সালবিয়্যাহ বা না-বাচক গুণাবলি পাঁচ সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তবে উপরিউক্ত পাঁচটি বিষয় হলো এমন মৌলিক ও ব্যাপক অর্থবোধক, যার অধীনে আরও অসংখ্য 'সিফাতে সালবিয়্যাহ' শামিল রয়েছে। আর এ কারণে কালাম-শাস্ত্রবিদগণ উপরিউক্ত পাঁচ প্রকার সিফাতে সালবিয়্যাহ বিশেষভাবে আলোচনা করে থাকেন। কেননা, তাঁরা গবেষণা করে দেখেছেন যে, কুরআন ও হাদীসে পবিত্রতাসূচক যত গুণাবলি বর্ণিত হয়েছে, তা সবই উপরিউক্ত পাঁচ প্রকারের কোনো না কোনোটার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সিফাতে ছুবুতিয়্যাহ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা

আল্লাহ তাআলার অসংখ্য প্রশংসনীয় গুণাবলি রয়েছে, যেগুলোকে পরিভাষায় 'সিফাতে ছুবুতিয়্যাহ' বলা হয়। অর্থাৎ যেগুলো হ্যাঁ-বাচক অর্থ প্রকাশ করে এবং উৎকৃষ্ট কোনো গুণ বিদ্যমান থাকা বোঝায়। এ 'সিফাতে ছুবুতিয়্যাহ' আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পৃক্ততার ধরন হিসেবে দুই প্রকার : ১. 'সিফাতে যাতিয়্যাহ' (ذاتية) তথা 'সত্তাগত গুণাবলি', ২. 'সিফাতে ফে'লিয়্যাহ' (فعلية) তথা 'কর্মগত গুণাবলি'। কাজেই প্রথম প্রকার আল্লাহ তাআলার সত্তার সাথে সম্পৃক্ত, আর দ্বিতীয় প্রকার তাঁর কার্যাবলির সাথে সম্পৃক্ত বা কর্মগত সিফাত। যেমন : সৃষ্টি করা, রিযিক দেওয়া, জীবিত বা মৃত করা।

উল্লেখ্য, কর্মগত সিফাতের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় হলো, তিনি অনাদিকাল থেকেই কর্মগত সকল গুণে গুণান্বিত। তবে এ কর্মগত গুণের প্রকাশ যে বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত হয়, তা সৃষ্ট।

অতঃপর 'যাতিয়্যাহ' ও 'ফে'লিয়্যাহ' প্রত্যেকটা প্রমাণ হওয়ার ক্ষেত্রে নকলী দলীল

থাকার সাথে সাথে আকলী দলীল থাকা হিসেবে দুই প্রকার :

১. 'সিফাতে আকলিয়্যাহ' (عقلية), ২. 'সিফাতে খাবরিয়্যাহ' (خبرية)। 'সিফাতে আকলিয়্যাহ' মানে যা যুক্তি-বুদ্ধি দ্বারাও সমর্থিত। অর্থাৎ এগুলোর প্রমাণ হওয়ার দলীল হিসেবে কুরআন-হাদীসের সাথে যুক্তি-বুদ্ধিও রয়েছে। কারণ, এগুলো যুক্তি-বুদ্ধির বিচারেও রব ও ইলাহের জন্য আবশ্যকীয়। যেমন : জ্ঞানী হওয়া ও কুদরত থাকা ইত্যাদি।

আর 'সিফাতে খাবরিয়্যাহ' যেগুলোর আভিধানিক ও বাহ্যিক অর্থ আল্লাহর ক্ষেত্রে বোধগম্য নয়, তবে কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন : আল্লাহর হাত-চেহারা ও আসমানে অবতরণ, আরশের ওপর ওঠা/সমাসীন হওয়া ইত্যাদি।

এই আভিধানিক ও বাহ্যিক অর্থ আল্লাহর ক্ষেত্রে বোধগম্য নয়। কেননা, এ অর্থ তাঁর দেহ-অঙ্গ থাকা প্রমাণ করে এবং তিনি ওঠা-নামা বা স্থানে থাকা বোঝায়, যা সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য এবং যেগুলো থেকে তিনি চিরপবিত্র। কাজেই 'সিফাতে খাবরিয়্যাহ'র আভিধানিক ও বাহ্যিক অর্থ আল্লাহর ক্ষেত্রে বোধগম্য নয়, তবে কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হওয়ায় সেগুলো অস্বীকার করা যাবে না।

সুতরাং বোঝা গেল, প্রথম প্রকার তথা 'সিফাতে আকলিয়্যাহ' প্রমাণ হওয়ার দলীল হিসেবে কুরআন-হাদীসের সাথে যুক্তি-বুদ্ধি দ্বারাও সমর্থিত, আর দ্বিতীয় প্রকার তথা 'সিফাতে খাবরিয়্যাহ' যুক্তি-বুদ্ধি ছাড়া শুধু কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

বলাবাহুল্য, এখানে 'সিফাতে ছুবুতিয়্যাহ'-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ তথা যাতিয়্যাহ-ফে'লিয়্যাহ এবং আকলিয়্যাহ-খাবরিয়্যাহ একসাথে মিলে সর্বমোট হবে চার প্রকার :

১. সিফাতে যাতিয়্যাহ আকলিয়্যাহ (صفات ذاتية عقلية)। যেমন : জীবন, জ্ঞান, শক্তি, শোনা, দেখা, ইচ্ছা, কালাম বা কথন প্রভৃতি গুণ।

২. সিফাতে ফে'লিয়্যাহ আকলিয়্যাহ (صفات فعلية عقلية)। যেমন : সৃষ্টি করা, রিযিক দেওয়া, জীবন বা মৃত্যু দান করা, ক্ষমা বা শাস্তি প্রদান করা।

৩. সিফাতে যাতিয়্যাহ খাবরিয়্যাহ (صفات ذاتية خبرية)। যেমন : আল্লাহর হাত, চেহারা ও সূরত ইত্যাদি।

৪. সিফাতে ফে'লিয়্যাহ খাবরিয়্যাহ (صفات فعلية خبرية)। যেমন : আসমানে অবতরণ করা, আরশের ওপর ওঠা ইত্যাদি (আভিধানিক অর্থ অনুযায়ী)।

এ চার প্রকারের প্রথম প্রকারকে কালাম-শাস্ত্রবিদদের পরিভাষায় বলা হয়, 'সিফাতুল মাআনী' (صفات المعاني) তথা সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত প্রশংসনীয় গুণ। দ্বিতীয় প্রকারকে 'সিফাতুল আফআল' তথা 'কর্মগত গুণাবলি' বলা হয়। আর

তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকারকে বলা হয়, 'সিফাতে মুতাশাবিহা' (صفات متشابهة)।

সিফাতের প্রকারগুলোর বিধান

আল্লাহ্ তাআলার সিফাত বা তাঁর সাথে সম্পৃক্ত ও সম্বন্ধকৃত শব্দগুলোর আভিধানিক ও বাহ্যিক অর্থ হিসেবে এগুলোর প্রতি কী হুকুম আরোপ করা হবে বা এগুলোর বিষয়ে কেমন আকীদা রাখতে হবে, সে হিসেবে তিন প্রকার :

১. 'কামালে মাহায' (كمال محض), ২. 'নাকসে মাহায' (نقص محض) এবং ৩. 'সিফাতে মুতাশাবিহা' (متشابهة صفات)।

প্রত্যেক প্রকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা

প্রথম প্রকার : 'কামালে মাহায' তথা যে শব্দগুলোর আভিধানিক ও বাহ্যিক অর্থ আল্লাহ্ তাআলাকে মহৎ-উৎকৃষ্ট গুণে গুণান্বিত ও প্রশংসনীয় গুণের অধিকারী বোঝায়। এ প্রকারের উদাহরণ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা, এই প্রকার আর 'সিফাতে যাতিয়্যাহ্ আকলিয়্যাহ্' একই, যেগুলোকে পরিভাষায় 'সিফাতুল মাআনী' বলা হয়।

এ প্রকারের হুকুম হলো, এ শব্দগুলোর আভিধানিক ও বাহ্যিক অর্থ পূর্ণতা ও ব্যাপকতার সাথে আল্লাহ্ তাআলার শান অনুযায়ী সাব্যস্ত হবে। যেমন : জানা বা জ্ঞান গুণটি আল্লাহ্ তাআলার জন্য এভাবে সাব্যস্ত হবে যে, তিনি চিরজ্ঞানী, মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞানী। তাঁর জ্ঞান অবশ্যই পরিপূর্ণ, নিখুঁত ও নিশ্ছিদ্র। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সবকিছু সম্পর্কে তিনি পূর্ণ অবগত। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সবকিছু তাঁর কাছে সমান। কোনো কিছু ঘটার আগেই তিনি সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনাদিকাল থেকেই জানেন। কোনো কিছুই তাঁর অজ্ঞাতসারে ঘটে না। তিনি যা কিছু বলেন এবং যা কিছু করেন, সবই তিনি তাঁর অসীম জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুসারে করেন। পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি বস্তু ও কণার নড়াচড়া নিয়ে আছে তাঁর পূর্ণ জানাশোনা।

বস্তুত তিনি জ্ঞান রাখেন, আমাদের জ্ঞানের মতো নয়। তাঁর জ্ঞান পূর্ণ, নিজস্ব, শাশ্বত এবং সব ধরনের ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত। আর আমাদের জ্ঞান ক্ষীণ, ক্ষণস্থায়ী, সীমাবদ্ধতাযুক্ত ও আল্লাহ্প্রদত্ত।

অনুরূপ আল্লাহ্ তাআলার কুদরত বা ক্ষমতা আছে, মানুষেরও ক্ষমতা আছে। কিন্তু উভয়ের মাঝে পার্থক্য হলো, মানুষের ক্ষমতা সকল কিছুর ওপর নয় এবং নিজস্ব নয়; বরং আল্লাহ্প্রদত্ত। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার ক্ষমতা সকল কিছুর ওপর এবং নিজস্ব, শাশ্বত ও সব ধরনের ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতামুক্ত।

সারকথা, এই প্রকারের সিফাত যেমন আল্লাহ্ তাআলার সাথে ব্যবহার হয়,

তেমনই মানুষের সাথেও ব্যবহার হয়। কিন্তু উভয়ের মাঝে পার্থক্য হলো, এগুলোর আভিধানিক অর্থ নিজস্ব, শাশ্বত ও সব ধরনের ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত থেকে পূর্ণতার সাথে আল্লাহ তাআলার শান অনুযায়ী তাঁর সাথে সাব্যস্ত হবে; আর মানুষের সাথে অপূর্ণতা, ক্ষীণ, ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতাযুক্ত হয়ে প্রযোজ্য হবে।

দ্বিতীয় প্রকার : 'নাকসে মাহায' তথা যেগুলোর আভিধানিক ও বাহ্যিক অর্থ আল্লাহ তাআলার মাঝে কোনো ত্রুটি বা অসম্মান বোঝাবে, কিংবা আল্লাহ তাআলার শানে অপ্রযোজ্য হবে।

যেমন : সূরা আনফালের ৩০ নং আয়াতে এসেছে,

وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

'আল্লাহ তাআলা সর্বোত্তম চক্রান্তকারী।'

সূরা বাকারার ১৫ নং আয়াতে এসেছে,

اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ

'আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে উপহাস করেন।'

সূরা তাওবার ৬৭ নং আয়াতে এসেছে,

نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِيَهُمْ

'তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহও তাদের ভুলে গেছেন।'

এ সকল আয়াতে আল্লাহ তাআলার সাথে ত্রুটি বা অসম্মান প্রকাশ করে এমন শব্দ ব্যবহার হয়েছে, যা থেকে আল্লাহ তাআলা চিরপবিত্র।

এই দ্বিতীয় প্রকারের হুকুম হলো, এগুলোর আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা যাবে না; বরং এগুলোর অবশ্যই তাবীল বা ব্যাখ্যা করতে হবে। কাজেই উপরিউক্ত আয়াতগুলোর তাবীল বা ব্যাখ্যা করে উপযোগী অর্থ গ্রহণ করতে হবে।

তৃতীয় প্রকার : 'সিফাতে মুতাশাবিহা', যা 'সিফাতে যাতিয়্যাহ খাবরিয়্যাহ' ও 'সিফাতে ফে'লিয়্যাহ খাবরিয়্যাহ' নামে ওপরে উল্লেখ হয়েছে। যেমন : আল্লাহর হাত-চেহারা এবং আসমানে অবতরণ ও আরশের ওপর সমাসীন হওয়া ইত্যাদি।

'সিফাতে মুতাশাবিহা' অর্থ দ্ব্যর্থবোধক ও অস্পষ্ট গুণাবলি। এর কারণ হচ্ছে, এ শব্দগুলোর আভিধানিক ও বাহ্যিক অর্থ সুস্পষ্ট হলেও আল্লাহর ক্ষেত্রে বোধগম্য না হওয়ার কারণে অস্পষ্ট। কেননা, হাত ও চেহারার আভিধানিক অর্থ দেহের অংশ ও অঙ্গ। অথচ আল্লাহ তাআলা দেহ ও অঙ্গ থেকে মুক্ত ও পবিত্র। এভাবে আসমানে অবতরণ করা ও আরশের ওপর ওঠা বা সমাসীন হওয়ার আভিধানিক ও বাহ্যিক

অর্থ থেকে অবস্থার পরিবর্তন, স্থানান্তর ও স্থানে থাকা ইত্যাদি বোঝায়। অথচ আল্লাহ তাআলা এসব থেকে চিরপবিত্র।

কাজেই এগুলোর আভিধানিক ও বাহ্যিক অর্থ আল্লাহর ক্ষেত্রে বোধগম্য না হওয়ার কারণে দ্ব্যর্থবোধক ও অস্পষ্ট।

তবে বোধগম্য না হলেও এগুলোর প্রতি ঈমান আনতে হবে এবং বাহ্যিক অর্থ নিয়ে কল্পনা থেকে দূরে থাকতে হবে। এ কারণেই হাদীসের সুপ্রসিদ্ধ ইমাম তিরমিযী রাহ. (মৃ. ২৭৯ হি.) উল্লেখ করেছেন যে, সালাফের অনেক ইমাম এ-জাতীয় সিফাত বা আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পৃক্ত শব্দগুলোর মূলনীতি সম্পর্কে বলেছেন,

وَقَدْ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِي هَذَا الحَدِيثِ وَمَا يُشْبِهُ هَذَا مِنَ الرِّوَايَاتِ مِنَ الصِّفَاتِ: وَنُزُولِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالُوا: قَدْ تَثْبُتُ الرِّوَايَاتُ فِي هَذَا وَيُؤْمَنُ بِهَا وَلا يُتَوَهَّمُ وَلاَ يُقَالُ: كَيْفَ؟

'এ-জাতীয় সিফাতের হাদীস এবং প্রতি রাতে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি ঈমান রাখতে হবে। কিন্তু কল্পনা করা যাবে না এবং বলা যাবে না, তাঁর সিফাতটি কেমন?'[৩০০]

এই তৃতীয় প্রকারের হুকুম হলো, 'তাফবীয' (**تفويض**) বা 'তাবীল' (**تأويل**)।[৩০১]

উল্লেখ্য, এই তৃতীয় প্রকারকে ইবনুল জাওযী হাম্বলী রাহ. (মৃ. ৫৯৭ হি.)-সহ অনেকে সিফাত বলেন না; বরং আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত ও সম্বন্ধকৃত শব্দ বলেন।

তাফবীয ও তাবীল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার আগে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া জরুরি মনে করছি।

গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন : প্রথম ও তৃতীয় প্রকারের হুকুম একই হলো না কেন?

প্রথম ও তৃতীয় প্রকারের হুকুম একই হলো না কেন? অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা শোনেন, দেখেন, জানেন প্রভৃতি গুণাবলির আভিধানিক অর্থ যেভাবে তাঁর শান অনুযায়ী সাব্যস্ত হয়, তেমনই আল্লাহর হাত ও চেহারা-সূরত এবং আসমানে অবতরণ করা ও আরশের ওপর ওঠা/সমাসীন হওয়া ইত্যাদির আভিধানিক অর্থও তাঁর শান অনুযায়ী সাব্যস্ত হবে।

কাজেই আমরা যেভাবে বলি, আল্লাহ তাআলা শোনেন তাঁর মতো, তিনি দেখেন

---

৩০০. দ্র. তিরমিযী শরীফ, ৬৬২ নং হাদীসের অধীনে

৩০১. দেখুন, আল-ফিকহুল আকবার, বি-রিওয়াতি হাম্মাদ, আকীদা নং ৫, ৬, ৭-সূত্রে মাজমুউ কুতুব ওয়া রাসায়িল ওয়া ওসায়াল ইমামিল আযম, পৃষ্ঠা ২৫২-৫৪; আল-ই'তিকাদ, বায়হাকী, পৃষ্ঠা ৭০-৭২; আল-আওয়াসিম মিনাল কাওয়াসিম, ইবনুল আরবী, পৃষ্ঠা ২২৮; আস-সিফাতুল খাবরিয়্যাহ, আইয়াশ কুবাইসী, পৃষ্ঠা ৫০; আল-কওলুত তামাম, সাইফ আছরী, পৃষ্ঠা ৮২-৯২

তাঁর মতো। কিংবা আল্লাহ যেমন তাঁর শোনাও তেমন, দেখাও তেমন ইত্যাদি, যা আমাদের শোনা বা দেখার মতো নয়।

একইভাবে বলব, আল্লাহর হাত ও চেহারা এবং আসমানে অবতরণ ও আরশের ওপর ওঠা ইত্যাদির আভিধানিক ও বাহ্যিক অর্থও তাঁর শানমতো বা তিনি যেমন, এগুলোর অর্থও তেমন, যা আমাদের মতো নয়।

উত্তর :

প্রথম ও তৃতীয় প্রকারের হুকুম একই না হওয়ার কারণ হলো, উভয় প্রকারের মাঝে কিছু পার্থক্য রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হলো,

- তৃতীয় প্রকারের আভিধানিক ও মূল অর্থ দৃশ্যমান ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, যা সরাসরি দেখা যায়, অন্যকে দেখানো যায় এবং তা সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যও বটে। যেমন : দেহ, অঙ্গ, আকার-আকৃতি, স্থান, দিক, বসা, অবতরণ ইত্যাদি।

আর এসব হলো সাদৃশ্যের দৃশ্যমান ও প্রকাশ্য দিক এবং তাঁকে নিয়ে কল্পনার জগতে প্রবেশের প্রধান রাস্তা ও বড় ক্ষেত্র। এ কারণেই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর সকলেই আল্লাহ তাআলাকে এসব থেকে মুক্ত ও পবিত্র বলেছেন, যা সবিস্তারে ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে।

- পক্ষান্তরে প্রথম প্রকার তথা 'সিফাতুল মাআনী' হলো, সত্তার সাথে প্রতিষ্ঠিত প্রশংসনীয় গুণ, যেগুলোর আভিধানিক ও মূল অর্থ দৃশ্যমান ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনো বস্তু নয়। কেননা জীবন, জ্ঞান, শক্তি, দেখা, শোনা প্রভৃতি এমন গুণ, যা সরাসরি কখনো দেখা যায় না, কাউকে দেখানো যায় না। যেভাবে মাথাব্যথা বা মিষ্টির স্বাদ কখনো দেখা যায় না, কাউকে দেখানো যায় না।

সুতরাং আমরা কোনো ব্যক্তিকে জীবিত বলি, কারণ আমরা তার দেহের মাঝে জীবনের লক্ষণ দেখতে পাই; কিন্তু সরাসরি জীবন কী, তা দেখা যায় না। এভাবে কাউকে দেখা বা শোনার গুণে গুণান্বিত করি, কারণ তার চোখ-কানের মাঝে দেখা-শোনার লক্ষণ দেখতে পাই; কিন্তু সরাসরি দেখা বা শোনা কী জিনিস, তা দেখা যায় না, কাউকে দেখানো যায় না, স্পর্শও করা যায় না।

স্মর্তব্য, সৃষ্টিকুলের ক্ষেত্রে জীবন ও শক্তি গুণদ্বয় দেহের সাথে এবং দেখা ও শোনা গুণদ্বয় চোখ ও কান অঙ্গদ্বয়ের সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু আল্লাহ তাআলা দেহ, অঙ্গ, যন্ত্র, উপায়-উপকরণ ও যেকোনো মাধ্যমের সাহায্য ছাড়াই এসব গুণে গুণান্বিত। যেমন : ইমাম আবু হানীফা রাহ. (মৃ. ১৫০ হি.) বলেন,

ويتكلم لا ككلامنا، نحن نتكلم بالآلات والحروف، والله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف.

'তিনি (আল্লাহ্ তাআলা) কালাম করেন, তবে আমাদের কালামের মতো না। আমরা যন্ত্র-অঙ্গ ও অক্ষরসমূহের সাহায্যে কথা বলি, আর আল্লাহ্ তাআলা কোনো ধরনের যন্ত্র ও অক্ষরসমূহের সাহায্য ছাড়া কথা বলেন।'[৩০২]

ইমাম খাত্তাবী রাহ. (মৃ. ৩৮৮ হি.) বলেন,

معناه: إثبات صفة السمع والبصر لله تعالى، لا إثبات الأذن والعين؛ لأنهما جارحتان. والله تعالى منزه عن الجارحة، فهو موصوف بصفاته، منفيٌّ عنه ما لا يليق به من صفات الآدميين ونعوتهم.

'এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তাআলার জন্য শোনা ও দেখার গুণ সাব্যস্ত করা। 'কান' ও 'চোখ' সাব্যস্ত করা নয়। কেননা, এগুলো অঙ্গ। আর তিনি অঙ্গ থেকে পবিত্র। তিনি তাঁর সকল গুণে গুণান্বিত; মানুষের গুণ ও বিশেষণ থেকে মুক্ত।'[৩০৩]

এ বিষয়ে অন্য ইমামগণের বক্তব্য কিছু পূর্বে উল্লেখ হয়েছে।

উভয় প্রকারের মাঝে এ পার্থক্যের প্রতি ইঙ্গিত করে প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা মাহমুদ আলূসী বাগদাদী হানাফী রাহ. (মৃ. ১২৭০ হি.) লেখেন,

صفاته المتعالية وأسماؤه الحسنى قسمان: قسم يناسب ما عندنا من الصفات نوع مناسبة، وإن كانت بعيدة... وقسم ليس كذلك، وهو المشار إليه بقوله:ﷺ «أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ»... فيذكر تارة اليد والنزول والقدم ونحو ذلك من المخيلات، مع العلم البرهاني والشهود الوجداني بتنزهه تعالى عن كل كمال يتصوره الإنسان ويحيط به، فضلا عن النقصان.

সারাংশ : 'আল্লাহ্ তাআলার নাম ও গুণাবলি দুই প্রকার : ১. এক প্রকার যা আমাদের গুণাবলির সাথে এক ধরনের মিল আছে, যদিও তা অনেক দূরবর্তী হিসেবে। ২. আরেক প্রকার যা এমন নয়। যেমন : হাত, অবতরণ ইত্যাদি, যা থেকে তিনি পবিত্র।'[৩০৪]

অর্থাৎ তিনি প্রথম প্রকার বলে এমন গুণাবলি উদ্দেশ্য নিয়েছেন, যা আল্লাহ্ তাআলার সাথে যেভাবে ব্যবহার হয়, মানুষের সাথেও ব্যবহার হয়। যেমন : জীবন, জ্ঞান, শক্তি, দেখা, শোনা প্রভৃতি। এদিক থেকে আমাদের গুণাবলির সাথে মিল, কিন্তু তাও অনেক দূরবর্তী হিসেবে। কেননা, এসব গুণ তাঁর ক্ষেত্রে নিজস্ব, শাশ্বত ও সব ধরনের ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত থেকে পূর্ণতার সাথে আল্লাহ্ তাআলার শান অনুযায়ী তাঁর সাথে সাব্যস্ত হবে; কিন্তু মানুষের সাথে অপূর্ণতা, ক্ষীণ, ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতাযুক্ত হয়ে প্রযোজ্য হবে।

---

৩০২. আল-ফিকহুল আকবার, বি-রিওয়াতি হাম্মাদ, আকীদা নং ১১-এর সূত্রে মাজমুউ কুতুব ওয়া রাসায়িল ওয়া ওসায়াল ইমামিল আযম, পৃষ্ঠা ২৫৮

৩০৩. মাআলিমুস সুনান, ৪/৩৩০, খাত্তাবী; শারহে ইবনে রাসালান, ১৮/৩১২

৩০৪. তাফসীরে রুহুল মাআনী, ২/৮৬, সূরা আলে ইমরানের তিন নং আয়াতের তাফসীর

আর দ্বিতীয় প্রকার থেকে তিনি এমন গুণাবলি উদ্দেশ্য নিয়েছেন, যা অনেক দূরবর্তী হিসেবেও আমাদের গুণাবলির সাথে মিল নেই। কেননা, আমাদের ক্ষেত্রে 'হাত' ও 'চেহারা-সূরত' অর্থ হলো অঙ্গ, আর 'বসা' ও 'অবতরণ' মানে যা আমাদের দেহের সাথে সম্পাদিত হয়। অথচ আল্লাহ তাআলা অঙ্গ ও দেহ থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। সুতরাং অনেক দূরবর্তী হিসেবেও আমাদের গুণাবলির সাথে মিল হওয়ার কোনো অবকাশ নেই।[৩০৫]

আর প্রথম প্রকার গুণাবলির ক্ষেত্রে 'তিনি শোনেন-দেখেন তাঁর শানমতো, যা আমাদের শোনা-দেখার মতো নয়' বলতে হয়। কেননা, এসব গুণ যেহেতু মানুষের সাথে অপূর্ণতা, ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতাযুক্ত হয়ে প্রযোজ্য হয়, তাই উক্ত অপূর্ণতা, ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতাকে আল্লাহ তাআলা থেকে নাকচ করে, এসব গুণ পূর্ণতার সাথে তাঁর শান অনুযায়ী তাঁর সাথে সাব্যস্ত করতে হয়।

কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার গুণাবলির ক্ষেত্রে এমন বলারই সুযোগ নেই। কেননা 'হাত', 'চেহারা-সূরত', 'বসা' ও 'অবতরণ' ইত্যাদির আভিধানিক ও বাহ্যিক অর্থ অঙ্গ ও দেহ-সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে উক্ত অর্থটাই আল্লাহ তাআলা থেকে নাকচ ও প্রত্যাখ্যাত। তো যেখানে মূল অর্থটাই নাকচ হয়ে আছে, সেখানে অর্থ-সংশ্লিষ্ট অন্যকিছু নাকচ করার সুযোগ কোথায়?

উভয় প্রকারের মাঝে এমন গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য থাকার কারণে আল্লাহ তাআলা শোনেন-দেখেন প্রভৃতি গুণাবলির আভিধানিক অর্থ যেভাবে তাঁর শান অনুযায়ী সাব্যস্ত হয়, সেভাবে আল্লাহর হাত ও চেহারা-সূরত এবং আসমানে অবতরণ ও আরশের ওপর ওঠা/সমাসীন হওয়া ইত্যাদির আভিধানিক ও বাহ্যিক অর্থ তাঁর শান অনুযায়ী সাব্যস্ত হতে পারে না; হওয়ার কোনো অবকাশ নেই।

তবে হ্যাঁ, এগুলোর আভিধানিক ও বাহ্যিক অর্থ থেকে আল্লাহ তাআলাকে পবিত্র সাব্যস্ত করে এভাবে বলার সুযোগ আছে যে, আল্লাহ তাআলার উপযোগী বা তাঁর শানের উপযুক্ত এগুলোর অর্থ আছে, যা তিনিই ভালো জানেন।

যেমন : মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম হানাফী রাহ. (মৃ. ৮৬১ হি.) বলেন,

إن اليد وكذا الإصبع وغيره صفة له تعالى، لا بمعنى الجارحة، بل على وجه يليق به، وهو سبحانه أعلم به.

'হাত, অঙ্গুলি ইত্যাদি আল্লাহ তাআলার সিফাত, তবে এর অর্থ অঙ্গ নয়; বরং তাঁর উপযোগী এর অর্থ আছে, যা আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।'[৩০৬]

---

৩০৫. এ ছাড়া উভয় প্রকারের মাঝে আরও কিছু পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যগুলো জানতে দেখুন, আস-সিফাতুল খাবরিয়্যাহ, আইয়াশ কুবাইসী, পৃষ্ঠা ১১৯-১২২; আল-কওলুত তামাম, সাইফ আছরী, পৃষ্ঠা ৯২-৯৮

৩০৬. আল-মুসায়ারাহ, পৃষ্ঠা ৪৭

মোল্লা আলী কারী রাহ. (মৃ. ১০১৪ হি.) নুযূলের বিষয়ে লেখেন,

إنه سبحانه وتعالى له نزول يليق بشأنه، مع اعتقاد التنزيه له عن انتقال وتغير ووجود مكان وزمان في ذاته، وكذا الحكم في الآيات المتشابهات وسائر الأحاديث المشكلات.

'আল্লাহ্ তাআলার অবতরণ হয়, যা তাঁর শানের উপযুক্ত। তবে এর সাথে তানযীহ তথা তাঁর সত্তাকে স্থানান্তর, পরিবর্তন, স্থান ও কাল থেকে পবিত্র থাকার আকীদা রাখতে হবে। এ ধরনের অন্যান্য আয়াত ও হাদীসের ব্যাপারেও একই হুকুম।'[৩০৭]

এভাবে 'ইস্তিওয়া আলাল আরশের' ক্ষেত্রে বলা হয়,

استواء يليق به/كما يليق بشأنه.

'এমন ইস্তিওয়া, যা তাঁর উপযোগী বা তাঁর শানের উপযুক্ত।'

'হাশিয়াতুল জামালে' আল্লামা সুলাইমান শাফেয়ী রাহ. (মৃ. ১২০৪ হি.) বলেন,

استواء يليق به، هذه طريقة السلف الذين يفوِّضون علم المتشابه إلى الله بعد صرفه عن ظاهره.

'এমন ইস্তিওয়া, যা তাঁর উপযোগী। এটি সালাফের পদ্ধতি। তাঁরা এর বাহ্যিক অর্থ থেকে ফেরানোর পর এর জ্ঞান আল্লাহ্ তাআলার কাছে ন্যস্ত করে।'[৩০৮]

সারকথা, আল্লাহ্ তাআলা শোনেন-দেখেন তাঁর শানমতো কিংবা আল্লাহ্ যেমন তাঁর শোনা-দেখাও তেমন ইত্যাদি কথা আমরা যেভাবে বলি, সেভাবে আল্লাহর হাত এবং আসমানে অবতরণ ইত্যাদির আভিধানিক-বাহ্যিক অর্থও তাঁর শানমতো কিংবা তিনি যেমন এগুলোর অর্থও তেমন—এ ধরনের বলার সুযোগ নেই।

প্রিয় পাঠক, আমাদের সালাফী শায়খ ও বন্ধুরা উভয় প্রকার সিফাত ও গুণাবলির মাঝে এ পার্থক্যটি মানতে চান না। ফলে তারা 'তিনি শোনেন-দেখেন তাঁর শানমতো, যা আমাদের শোনা-দেখার মতো নয়' যেভাবে বলেন, একইভাবে এটাও বলেন যে, 'আল্লাহর হাত ও চেহারা-সূরত এবং আসমানে অবতরণ ও আরশের ওপর ওঠা ইত্যাদিও তাঁর শানমতো, যা আমাদের শোনা বা দেখার মতো নয়!'

অথচ এটা যে কত বড় ভুল ও ভ্রান্তি, তা আশা করি বুঝতে পেরেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের ভাইদেরকে সঠিক বুঝ দান করুন।

প্রশ্ন :

এখন কেউ যদি প্রশ্ন করে (যা সালাফী শায়খরাও করে থাকে), মানুষ তো জীবনবিশিষ্ট সত্তা এবং দেখে ও শুনে। এখন যদি আল্লাহ্ তাআলাকে জীবনবিশিষ্ট সত্তা বলা হয়

---

৩০৭. শারহুশ শিফা, ২/৪৬২
৩০৮. আল-ফুতূহাতুল ইলাহিয়্যাহ, ৩/৪৮

এবং তিনি দেখেন ও শোনেন মানা হয়, তাহলে তো এগুলোর ক্ষেত্রে সৃষ্টির সাথে আল্লাহ তাআলার সদৃশ (বা মিছ্‌ল) সৃষ্টি হয়। অথচ তিনি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, 'কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ (মিছ্‌ল) নেই।'

এরপরও আল্লাহ তাআলা থেকে জীবনবিশিষ্ট হওয়াকে এবং দেখা ও শোনার গুণ নাকচ করা হয় না কেন?

উত্তর :

উল্লিখিত বিষয়গুলোতে সদৃশ (মিছ্‌ল) সৃষ্টি হওয়ার প্রশ্ন তখন আসত, যদি জীবন, দেখা ও শোনার মতো গুণাবলি হাত ও চেহারা-সূরত এবং আসমানে অবতরণ ও আরশের ওপর ওঠা ইত্যাদির মতো দৃশ্যমান ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কিছু হতো। অথচ কেউ কিছু দেখলে তিনি দেখার যন্ত্র চোখ এবং কী দেখছে তা দেখাতে পারলেও, কীভাবে দেখছে সে গুণটি দেখাতে পারে না। যেভাবে মিষ্টি দেখানো গেলেও এর স্বাদ কখনো দেখানো যায় না।

কাজেই সেগুলো দৃশ্যমান ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু না হওয়ার কারণে সদৃশ (মিছ্‌ল) সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ নেই। কেননা, যার দৃশ্যমান ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনো অস্তিত্বই নেই, এতে সদৃশ সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ কোথায়? তাই এটা আল্লাহ তাআলার তানযীহ ও পবিত্রতার সাথেও সাংঘর্ষিক নয়।

হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী হানাফী রাহ. (মৃ. ১৩৬২ হি.) বলেন,

علم وقدرت وغیرہ اپنے حقیقی مفہومات متبادرہ کے اعتبار سے مادیت کو مقتضی نہیں اور ید وقدم وغیرہما مادیت کو مقتضی ہیں، قسم اول تنزیہ کے منافی نہیں اور دوسری قسم اس کے منافی ہے۔

'জ্ঞান, শক্তি ইত্যাদি শব্দের আভিধানিক ও মূল অর্থ হিসেবে যা মনে উদয় হয়, তা দৃশ্যমান ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনো কিছু দাবি করে না। কিন্তু 'হাত' ইত্যাদি শব্দ শুনলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্র ভেসে ওঠে। প্রথম প্রকার তানযীহ ও পবিত্রতার সাথে সাংঘর্ষিক নয়, তবে দ্বিতীয় প্রকার সাংঘর্ষিক।'[৩০৯]

অর্থাৎ 'হাত' ইত্যাদির আভিধানিক ও মূল অর্থটাই যেহেতু দৃশ্যমান ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু, তাই 'হাত' শব্দ শোনার সাথে সাথে এর একটি চিত্র ভেসে ওঠে। তা হলো, মানুষের দেহের ওপরের অংশের একটি অঙ্গ, যা দিয়ে সে বিভিন্ন কাজ করে। ফলে দেহের অংশ ও অঙ্গ হওয়ার দিক থেকে সদৃশ (মিছ্‌ল) হয়।

কিন্তু জ্ঞান, শক্তি ইত্যাদি শব্দের আভিধানিক ও মূল অর্থ যেহেতু দৃশ্যমান ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনো বস্তু নয়, তাই সদৃশ (মিছ্‌ল) সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ নেই। কেননা

---

৩০৯. ইমদাদুল ফাতাওয়া, ১২/১৫৪

জীবন, দেখা ও শোনার মতো গুণাবলি এগুলোর আভিধানিক ও মূল অর্থ দেহ ছাড়া হতে পারে। অথচ 'হাত' ইত্যাদির আভিধানিক ও মূল অর্থটাই দেহ ছাড়া হতে পারে না, যা থেকে আল্লাহ্ তাআলা চিরপবিত্র।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, জীবন, দেখা ও শোনার জন্য তো দেহ, চোখ ও কান আবশ্যকীয় বিষয়, যা ছাড়া এসব গুণ অস্তিত্বে আসতে পারে না। তাহলে এ গুণগুলোও তো আল্লাহ্ তাআলার জন্য মানা যায় না।

উত্তর : একটা হলো শব্দের আভিধানিক ও মূল অর্থ। আরেকটা হচ্ছে, মূল অর্থ নয়; বরং এর জন্য আবশ্যকীয় বিষয়। যেমন : জীবন বা শোনার মূল অর্থ দেহ বা কান-অঙ্গ নয়; বরং এর জন্য দেহ বা কান আবশ্যকীয়।

ইতিপূর্বে সবিস্তারে উল্লেখ হয়েছে যে, সৃষ্টিকুলের ক্ষেত্রে এসব গুণের জন্য দেহ বা অঙ্গ আবশ্যকীয়। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা দেহ, অঙ্গ, অবতরণ, ওঠা, বসা ইত্যাদি থেকে পবিত্র এবং তিনি যেকোনো উপায়-উপকরণ ও মাধ্যমের সাহায্য ছাড়াই এসব গুণে গুণান্বিত। কারণ, তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, اللّٰهُ الصَّمَدُ তথা 'আল্লাহ্ কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন, সবই তাঁর মুখাপেক্ষী।'

সারকথা, প্রথম প্রকার ও তৃতীয় প্রকার সিফাত-গুণাবলির মাঝে পার্থক্য থাকায় উভয় প্রকারের হুকুম একই হয়নি।

তাফবীয সম্পর্কে আলোচনা

আমরা জেনেছি যে, আল্লাহ্ তাআলার তৃতীয় প্রকার সিফাত-গুণাবলি তথা আল্লাহর হাত ও চেহারা-সূরত এবং আসমানে অবতরণ ও আরশের ওপর ওঠা ইত্যাদির ক্ষেত্রে হুকুম হলো 'তাফবীয' বা 'তাবীল'।

এখন জানার বিষয় হলো, 'তাফবীয' কী বা এর পদ্ধতি কী?

'তাফবীয'-এর আভিধানিক অর্থ হলো, অন্যের ওপর ন্যস্ত বা হাওয়ালা করা।

আর 'তাফবীয'-এর কাছাকাছি দুটি পদ্ধতি রয়েছে।

প্রথম পদ্ধতি হলো, এ-জাতীয় (তৃতীয় প্রকার) সিফাতের প্রতি ঈমান এনে তানযীহের আকীদা (তথা সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ও সদৃশ থেকে আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র থাকার বিশ্বাস) রাখার পর কুরআন-হাদীসে এগুলো যেভাবে এসেছে, সেভাবে শুধু তিলাওয়াত করা বা পাঠ করা। এর কোনো অর্থ-ব্যাখ্যা কোনো কিছুই না বলা, না করা; বরং চুপ থাকা। এই পদ্ধতিই সালাফ থেকে বেশি বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আবু হানীফার অন্যতম প্রধান শাগরিদ ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইমাম মুহাম্মাদ বিন হাসান শাইবানী রাহ. (মৃ. ১৮৯ হি.) 'নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা দুনিয়ার আসমানে

অবতরণ করেন’ এ-জাতীয় হাদীসসমূহ সম্পর্কে বলেন,

إِنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ قَدْ رَوَتْهَا الثِّقَاتُ، فَنَحْنُ نَرْوِيهَا، وَنُؤْمِنُ بِهَا، وَلَا نُفَسِّرُهَا.

‘এ হাদীসগুলো বিশ্বস্ত ব্যক্তিরা বর্ণনা করেছেন। তাই আমরা সেগুলো বর্ণনা করি, সেগুলোর প্রতি ঈমান আনি এবং সেগুলোর তাফসীর বা ব্যাখ্যা করি না।’

তিনি আরও বলেন,

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ كُلُّهُمْ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ عَلَى الْإِيمَانِ بِالْقُرْآنِ وَالْأَحَادِيثِ الَّتِي جَاءَ بِهَا الثِّقَاتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي صِفَةِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ، مِنْ غَيْرِ تَغْيِيرٍ وَلَا وَصْفٍ وَلَا تَشْبِيهٍ، فَمَنْ فَسَّرَ الْيَوْمَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ: فَقَدْ خَرَجَ مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَصِفُوا وَلَمْ يُفَسِّرُوا، وَلَكِنْ آمَنُوا بِمَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، ثُمَّ سَكَتُوا. فَمَنْ قَالَ بِقَوْلِ جَهْمٍ فَقَدْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ وَصَفَهُ بِصِفَةِ لَا شَيْءَ.

‘পূর্ব থেকে পশ্চিমের সকল ফকীহ একমত যে, মহান আল্লাহর বিশেষণ সম্পর্কে কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ সনদে বর্ণিত হাদীসসমূহ বিশ্বাস করতে হবে, কোনোরূপ পরিবর্তন, বিবরণ এবং তুলনা ব্যতিরেকে।

কেউ যদি আজ (১৩৫-১৮৯ হি.) সেগুলোর কোনো কিছুর ব্যাখ্যা করে, তাহলে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ ও পদ্ধতি থেকে বের হয়ে গেল এবং জামাআহ থেকে বিচ্ছিন্ন হলো। কারণ, তাঁরা এগুলোর বিবরণ দেননি এবং ব্যাখ্যাও করেননি; বরং **তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহয় যা কিছু আছে, সেগুলোর ওপর ঈমান এনেছেন, অতঃপর চুপ থেকেছেন।**

কাজেই যে ব্যক্তি জাহম (বিন সাফওয়ান)-এর মত গ্রহণ করল, সে জামাআহর পথ পরিত্যাগ করল। কারণ, সে মহান আল্লাহর গুণ অস্বীকার করে।’[৩১০]

ইমাম মুহাম্মাদ রাহ.-এর বক্তব্যদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয়, সিফাতের বিষয়ে সালাফের আদেশ হচ্ছে চুপ থাকা, কোনো কথা বলা থেকে বিরত থাকা। ইমাম ইবনে কুদামাহ হাম্বলী রাহ. (মৃ. ৬২০ হি.) বলেন,

وقد نقل عن جماعة منهم: الأمر بالكف عن الكلام في هذا، وإمرار أخبار الصفات كما جاءت.

‘সালাফের এক দল থেকে এ বিষয়ে আলোচনা থেকে বিরত থাকার এবং সিফাতের হাদীসগুলো যেভাবে এসেছে সেভাবে ‘ইমরার’ করার আদেশ বর্ণিত হয়েছে।’

---

৩১০. শারহু উসূলি ই’তিকাদি আহলিস সুন্নাহ, লালকায়ী, বর্ণনা নং ৭৪০ ও ৭৪১; যাম্মুত তাবীল, ইবনে কুদামাহ, পৃষ্ঠা ১৪; আল-আরশ, যাহাবী, ২/২৫০; মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া, ৪/৫; ইজতিমাউল জুয়ূশিল ইসলামিয়া, ইবনুল কায়্যিম, ২/২২৩; মুখতাছারুল উলূ, তাহকীক, আলবানী, পৃষ্ঠা ১৫৯

অতঃপর তিনি এর স্বপক্ষে ইমাম মুহাম্মাদের এ বক্তব্যদ্বয় উল্লেখ করেছেন।[৩১১]

'ইমরার' শব্দের অর্থ হলো, সিফাতের আয়াত-হাদীসগুলো যেভাবে এসেছে, সেভাবে কোনো বেশ-কম ছাড়া রেখে পাঠ করা, এগুলোর অর্থ ও উদ্দেশ্য জানা না থাকায় কোনো ধরনের তাফসীর-ব্যাখ্যা না করে বিশ্বাস করা। সাথে তানযীহের আকীদা তথা সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ও সদৃশ থেকে আল্লাহ তাআলাকে পবিত্র থাকার আকীদা রাখা। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেন,

وَمَعْنَى الْإِمْرَارِ: عَدَمُ الْعِلْمِ بِالْمُرَادِ مِنْهُ مَعَ اعْتِقَادِ التَّنْزِيهِ.

'ইমরার'-এর অর্থ হলো, (সিফাতের ক্ষেত্রে) তানযীহের আকীদা (সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ও সদৃশ থেকে আল্লাহ তাআলা পবিত্র) রাখার সাথে সিফাতের অর্থ ও উদ্দেশ্য জানা না থাকা।'[৩১২]

এটা ভালোভাবে মনে রাখি, কারণ 'ইমরার' শব্দটি সামনে আরও আসবে।

ইমাম ওলীদ বিন মুসলিম রাহ. (মৃ. ১৯৪ হি.) বলেন, 'আমি আওযায়ী (মৃ. ১৫৭ হি.), সুফিয়ান সাওরী (মৃ. ১৬১ হি.), (ইমাম) মালেক (মৃ. ১৭৯ হি.) ও লাইস ইবনে সা'দ (মৃ. ১৭৫ হি.) রাহ.-কে সিফাতের হাদীসগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তাঁরা সকলে বলেছেন,

فَكُلُّهُمْ قَالَ: أَمِرُّوهَا كَمَا جَاءَتْ بِلَا تَفْسِيرٍ.

"এগুলো যেভাবে এসেছে ওভাবেই 'ইমরার' করবে, কোনো ধরনের তাফসীর বা ব্যাখ্যা ছাড়া।"'[৩১৩]

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রাহ. (মৃ. ১৯৮ হি.) বলেন,

كُلُّ مَا وَصَفَ اللهُ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ: فَتَفْسِيرُهُ تِلَاوَتُهُ، وَالسُّكُوتُ عَنْهُ.

'আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে তাঁর সত্তা-সংক্রান্ত যে সকল গুণ উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর তাফসীর হলো তিলাওয়াত করা এবং চুপ থাকা।'[৩১৪]

ইমাম তিরমিযী রাহ. বিভিন্ন ইমামের মাযহাব সম্পর্কে নকল করেন যে,

وَالْمَذْهَبُ فِي هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ مِنَ الأَئِمَّةِ مِثْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، وَوَكِيعٍ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ رَوَوْا هَذِهِ الأَشْيَاءَ، ثُمَّ قَالُوا: تُرْوَى هَذِهِ الأَحَادِيثُ وَنُؤْمِنُ بِهَا، وَلَا

---

৩১১. যাম্মুত তাবীল, ইবনে কুদামাহ, পৃষ্ঠা ১৪

৩১২. ফাতহুল বারী, ৬/৪০

৩১৩. আশ-শারীআহ; আজুররী, বর্ণনা নং ৭২০; আল-ইবানাতুল কুবরা, ইবনে বাত্তাহ, বর্ণনা নং ১৮৩; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, যাহাবী, ৮/১০৫

৩১৪. আল-ই'তিকাদ, বায়হাকী, পৃষ্ঠা ১১৮, সনদ সহীহ; ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার, ১৩/৪০৬

يُقَالُ: كَيْفَ؟ وَهَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ الحَدِيثِ أَنْ يَرْوُوا هَذِهِ الأَشْيَاءَ كَمَا جَاءَتْ، وَيُؤْمَنُ بِهَا، وَلَا تُفَسَّرُ، وَلَا تُتَوَهَّمُ، وَلَا يُقَالُ: كَيْفَ؟ وَهَذَا أَمْرُ أَهْلِ العِلْمِ الَّذِي اخْتَارُوهُ وَذَهَبُوا إِلَيْهِ.

'এ ধরনের সিফাতের হাদীস বিষয়ে সুফিয়ান সাওরী (মৃ. ১৬১ হি.), (ইমাম) মালেক (মৃ. ১৭৯ হি.), ইবনুল মুবারক (মৃ. ১৮১ হি.) ও সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (মৃ. ১৯৮ হি.) রাহ.-সহ অন্য আহলে ইলমের মাযহাব হলো, তাঁরা এগুলো বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এ হাদীসগুলো বর্ণনা করা হবে এবং এর প্রতি আমরা ঈমান রাখি। তবে বলা যাবে না, তাঁর সিফাতটি কেমন?

আর মুহাদ্দিসগণও এটা পছন্দ করেছেন যে, এগুলো যেভাবে এসেছে, সেভাবে বর্ণনা করবেন এবং এগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখবেন। আর এগুলোর তাফসীর করা হবে না, কল্পনাও করা যাবে না এবং বলা যাবে না, এটি কেমন?

এটা আহলে ইলমের মাযহাব এবং তাঁদের পছন্দনীয় অভিমত।'

ইমাম তিরমিযী রাহ. (মৃ. ২৭৯ হি.) অন্যত্র বলেন,

نُؤْمِنُ بِهِ كَمَا جَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفَسَّرَ، أَوْ يُتَوَهَّمَ، هَكَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ...

'এর প্রতি আমরা ঈমান রাখি, যেভাবে তা এসেছে। তবে এর তাফসীর বা ব্যাখ্যা করা হবে না, কল্পনাও করা যাবে না।'[৩১৫]

সহীহ সূত্রে প্রমাণিত ইমাম মালেক রাহ. (মৃ. ১৭৯ হি.) বলেন,

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ، وَلَا يُقَالُ: كَيْفَ، وَكَيْف عَنْهُ مَرْفُوعٌ.

'রহমান আরশের ওপর ইস্তিওয়া করেছেন, যেমনটা তিনি নিজের গুণ বয়ান করেছেন। (তবে) এর 'কাইফ' বা ধরন নিয়ে প্রশ্ন করা যাবে না। (কারণ,) তাঁর থেকে ধরন নাকচ বা তিনি ধরন থেকে মুক্ত।'[৩১৬]

এ ছাড়া অনেক সনদে মজবুতভাবে প্রমাণিত যে, ইমাম মালেক রাহ. বলেন,

الِاسْتِوَاءُ غَيْرُ مَجْهُولٍ، وَالْكَيْفُ غَيْرُ مَعْقُولٍ، وَالْإِيمَانُ بِهِ وَاجِبٌ، وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ.

'ইস্তিওয়া অজানা নয়। ধরন বোধগম্য নয়। এর প্রতি ঈমান আনা ওয়াজিব। এ সম্পর্কে প্রশ্ন করা বিদআত।'[৩১৭]

---

৩১৫. দ্র. তিরমিযী শরীফ, ২৫৫৭ ও ৩০৪৫ নং হাদীসের অধীনে।

৩১৬. আল-আসমা ওয়াস সিফাত, বায়হাকী, ২/৩০৪; ইমাম যাহাবী রাহ. 'আল-উলূ' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ১৩৮) এটাকে সহীহ বলেছেন এবং ইবনে হাজার রাহ. 'ফাতহুল বারী'তে (১৩/৪৯৮) এর সনদ জায়্যিদ বলেছেন।

৩১৭. আল-আসমা ওয়াস সিফাত, বায়হাকী, ২/৩০৫, ৩০৬; আল-ই'তিকাদ, বায়হাকী, পৃষ্ঠা ১১৬

رواه الأصبهاني في "طبقات المحدثين" ٢/٢١٤ من طريق محمد بن النعمان، والصابوني في "عقيدة السلف" ص ١٨٢ من طريق جعفر بن عبد الله، والبيهقي في "الأسماء والصفات" ٢/٣٠٥ و"الاعتقاد" ص ١١٦ من طريق يحيى بن يحيى. فقد ثبت أن لفظة:

এটা ইমাম মালেকের শায়খ রাবীআতুর রায় রাহ. (মৃ. ১৩৬ হি.) থেকে সহীহ সূত্রে এবং হযরত উম্মে সালামা রাযি. থেকেও যয়ীফ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা :

-'ইস্তিওয়া অজানা নয়।'

ইমাম ইবনে কুদামাহ হাম্বলী রাহ. (মৃ. ৬২০ হি.) এর ব্যাখ্যায় লেখেন,

أي: غير مجهول الوجود؛ لأن الله تعالى أخبر به، وخبره صدق يقينا، لا يجوز الشك فيه ولا الإرتياب فيه، فكان غير مجهول لحصول العلم به، وقد روي في بعض الألفاظ: الاستواء معلوم.

'ইস্তিওয়ার কথা আল্লাহ তাআলা (কুরআনে) বলেছেন, এতে সংশয়-সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কাজেই এ সম্পর্কে ইলম হাসিল হওয়ার কারণে ইস্তিওয়া অজানা নয়।' অর্থাৎ 'ইস্তিওয়া' কুরআনে আছে, আর তা সকলে জানে।[৩১৮]

এর আরেকটা ব্যাখ্যা এটাও হতে পারে যে, ইস্তিওয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ অজানা নয়। অর্থাৎ বসা, ওপরে ওঠা, অবস্থান করা, সমুন্নত হওয়া প্রভৃতি; তবে শেষ অর্থটি ছাড়া বাকিগুলো আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে অসম্ভব।

-'ধরন বোধগম্য নয়।'

প্রসিদ্ধ মালেকী ইমাম কারাফী রাহ. (মৃ. ৬৮৪ হি.) এর ব্যাখ্যায় বলেন,

معناه: أن ذات الله تعالى لا توصف بما وضعت العرب له «كَيف»، وهو الأحوال المتنقلة والهيآت الجسيمة من التربع وغيره، فلا يعقل ذلك في حقه تعالى؛ لاستحالته في جهة الربوبية.

'অর্থাৎ 'কাইফ' শব্দটি আরবী ভাষায় যা বোঝানোর জন্য নির্ধারিত, তা আল্লাহর শানে ব্যবহৃত হতে পারে না। (কারণ,) এ শব্দটি পরিবর্তনশীল অবস্থা (যেমন : ভালো-মন্দ) ও দেহের গঠন (যেমন : বসার ধরন) ইত্যাদি বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। আর তা আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে অসম্ভব হওয়ার কারণে বোধগম্য নয়।'[৩১৯]

একই কথা ইবনুল লাব্বান রাহ.-ও (মৃ. ৭৪৯ হি.) বলেছেন,

أي: «كيف» من صفات الحوادث، وكل ما كان من صفات الحوادث فإثباته في صفات الله تعالى ينافي ما يقتضيه العقل، للجزم بنفيه عن الله تعالى.

«والكيف غير معقول» صحيحة قوية ثابتة من طرق عن الإمام مالك. قال ابن عبد الهادي في "الاستواء" ص ٥١: صحيح ثابت عن مالك، رواه البيهقي وغيره. اهـ. وقال الذهبي في "العلو" ص ٨١: هذا القول محفوظ عن جماعة: كربيعة الرأي، ومالك الإمام، وأبي جعفر الترمذي، فأما عن أم سلمة رضي الله عنها فلا يصح.

৩১৮. যাম্মুত তাবীল, ইবনে কুদামাহ, পৃষ্ঠা ২৬

৩১৯. আয-যাখীরাহ, কারাফী, ১৩/২৪৩

'কাইফ শব্দটি অস্থায়ী (হাদেস) বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট গুণ বোঝায়। কাজেই তা আল্লাহ তাআলার গুণাবলির ক্ষেত্রে বোধগম্য নয়। কারণ, তা থেকে নিশ্চিত আল্লাহ তাআলা মুক্ত।'[৩২০]

ইমাম মালেকের বক্তব্যটির ব্যাখ্যায় আল্লামা আহমদ যাররুক (زَرُّوق) মালেকী রাহ. (মৃ. ৮৯৯ হি.) সংক্ষিপ্তভাবে এভাবে বলেছেন,

(والكيف غير معقول) نفي لما يتوهم فيه من محتملاته الحسية؛ إذ لا تعقل في حقه تعالى.

'"কাইফ বা ধরন বোধগম্য নয়" এই কথার মাধ্যমে বিভিন্নভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল ধারণাকে আল্লাহ্ তাআলার ক্ষেত্রে নাকচ করা হয়েছে। কারণ, তা আল্লাহ্ তাআলার ক্ষেত্রে বোধগম্য নয়।'[৩২১]

তাই ইবনুল জাওযী হাম্বলী রাহ. (মৃ. ৫৯৭ হি.) বলেছেন,

والكيف في حقه محال.

'আল্লাহ্ তাআলার শানে 'কাইফ' বা ধরন অসম্ভব।'[৩২২]

উল্লেখ্য, এ বিষয়ে একটি প্রসিদ্ধ শব্দ হলো, والكيف مجهول তথা 'ধরন অজানা'। এটি ইমাম মালেক রাহ. থেকে সহীহ্ সূত্রে প্রমাণিত নয়।

এরপরও কেউ যদি উক্ত শব্দ বলে, তাহলে এর ব্যাখ্যা কী হবে, তা ইমাম ইবনুল আরবী মালেকী রাহ. (মৃ. ৫৪৩ হি.) বলেছেন। তিনি লেখেন,

وأما أن لا يفسر كما قال مالك وغيره: أن الاستواء معلوم، يعني مورده في اللغة، والكيفية التي أراد الله مما يجوز عليه من معاني الاستواء مجهولة، فمن يقدر أن يعينها؟... فتحصل لك من كلام إمام المسلمين مالك أن الاستواء معلوم، وإن ما يجوز على الله غير متعين، وما يستحيل عليه هو منزه عنه.

'এগুলোর তাফসীর-ব্যাখ্যা করা হবে না, যেমনটা (ইমাম) মালেক রাহ. ও অন্যরা বলেছেন। অর্থাৎ ইস্তিওয়ার আভিধানিক অর্থ তো জানা আছে। তবে ইস্তিওয়ার অর্থসমূহের মধ্য থেকে যা আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য হতে পারে, সে ক্ষেত্রে যে কাইফিয়াত বা ধরন আল্লাহ্ তাআলা উদ্দেশ্য নিয়েছেন, তা অজানা। আর এমন কে আছে, যে এটাকে নির্দিষ্ট করতে পারে?

কাজেই ইমাম মালেকের বক্তব্যটি থেকে বোঝা গেল, ইস্তিওয়ার অর্থ তো জানা

---

৩২০. ইযালাতুশ শুবুহাত আনিল মুতাশাবিহাত, ইবনুল লাব্বান, পৃষ্ঠা ২৬২; ইতহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন, যাবীদী।

৩২১. শারহুর রিসালাহ, ১/৪৫

৩২২. আল-মুদহিশ, পৃষ্ঠা ১৩৭

আছে। তবে যা আল্লাহর জন্য প্রযোজ্য হতে পারে, তা অনির্দিষ্ট। আর যা তাঁর ক্ষেত্রে অসম্ভব, তা থেকে তিনি চিরপবিত্র।'[৩২৩]

ইমাম ইবনে সুরাইজ শাফেয়ী রাহ. (মৃ. ৩০৬ হি.) বলেন,

يجب على المسلم الإيمان بكل واحد منه كما ورد، وأن السؤال عن معانيها بدعة، والجواب كفر وزندقة، مثل قوله تعالى :{الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} {وَجَاء رَبُّكَ} ونظائرها مما نطق بها القرآن كالفوقية، والنفس، واليدين، والسمع، والبصر، وصعود الكلام الطيب إليه، والضحك، والتعجب، والنزول كل ليلة.

'এসবের ওপর ঈমান আনা ওয়াজিব। এগুলোর অর্থ জিজ্ঞেস করা বিদআত। আর উত্তর প্রদান করা কুফর ও যানদাকাহ।'[৩২৪]

ইমাম আবু উবাইদ কাসিম ইবনে সাল্লাম রাহ. (মৃ. ২২৪ হি.) বলেন,

نَحْنُ نَرْوِي هَذِهِ الْأَحَادِيثَ وَلَا نُرِيغُ لَهَا الْمَعَانِيَ.

'আমরা এসব হাদীস বর্ণনা করি, কিন্তু এগুলোর অর্থ খুঁজি না।'[৩২৫]

এখানে তিনি স্পষ্ট বললেন, আমরা এগুলোর অর্থ তালাশ করি না।

আবু উবাইদ রাহ. আরও বলেন,

إِذَا سُئِلْنَا عَنْ تَفْسِيرِهَا، قُلْنَا: مَا أَدْرَكْنَا أَحَدًا يُفَسِّرُ مِنْهَا شَيْئًا، وَنَحْنُ لَا نُفَسِّرُ مِنْهَا شَيْئًا، نُصَدِّقُ بِهَا وَنَسْكُتُ.

'আমাদেরকে যখন এসব হাদীসের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হয় তখন আমরা বলি, আমরা এমন কাউকে পাইনি, যিনি এগুলোর ব্যাখ্যা করতেন। তাই আমরাও এর কোনো ব্যাখ্যা করি না। এসব হাদীসকে সত্য মনে করি এবং চুপ থাকি।'[৩২৬]

ইমাম যাহাবী রাহ. (মৃ. ৭৪৮ হি.) এটা নকল করার পর বড় সুন্দর মন্তব্য করেছেন,

قُلْتُ: قَدْ فَسَّرَ عُلَمَاءُ السَّلَفِ الْمُهِمَّ مِنَ الأَلْفَاظِ وَغَيْرَ الْمُهِمِّ، وَمَا أَبْقَوْا مُمْكِنًا، وَآيَاتُ الصِّفَاتِ وَأَحَادِيثُهَا لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِتَأْوِيْلِهَا أَصْلاً، وَهِيَ أَهَمُّ الدِّيْنِ، فَلَو كَانَ تَأْوِيْلُهَا سَائِغًا أَوْ حَتْمًا: لَبَادَرُوا إِلَيْهِ، فَعُلِمَ قَطْعًا أَنَّ قِرَاءتَهَا وَإِمرَارَهَا عَلَى مَا جَاءتْ هُوَ الحَقُّ، لاَ تَفْسِيرَ لَهَا غَيْرُ ذَلِكَ، فَنُؤْمِنُ بِذَلِكَ، وَنَسْكُتُ اقْتِدَاءً بِالسَّلَفِ، مُعْتَقِدِيْنَ أَنَّهَا صِفَاتٌ للهِ تَعَالَى اسْتَأْثَرَ اللهُ بِعِلْمِ حَقَائِقِهَا... فَعَلَيْنَا الإِيْمَانُ وَالتَّسْلِيْمُ لِلنُّصُوْصِ.

---

৩২৩. আরিযাতুল আহওয়াযী, ২/২৩৬, নুযূলের হাদীসের ব্যাখ্যায়; আল-মাসালিক, ৩/৪৫২
৩২৪. আল-আরশ, যাহাবী, ২/২৫২; আল-উলূ, যাহাবী, পৃষ্ঠা ২০৮
৩২৫. দ্র. আ'লামুল হাদীস, খাত্তাবী, ১/৬৩৯; আল-আসমা ওয়াস সিফাত, বায়হাকী, ২/১৯২
৩২৬. শারহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাহ, লালকায়ী, বর্ণনা নং ৯২৮

‘সালাফের আলেমগণ গুরুত্বপূর্ণ ও গুরুত্বহীন সবকিছুরই ব্যাখ্যা করেছেন, তবে সিফাতের আয়াত-হাদীসসমূহ গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার পরও এগুলোর কোনো ব্যাখ্যা করেননি। সুতরাং নিশ্চিত বোঝা গেল, এগুলো যেভাবে এসেছে সেভাবে পাঠ করা ও ইমরার করাই হক (সঠিক পদ্ধতি), এ ছাড়া এগুলোর কোনো ব্যাখ্যা নেই। কাজেই আমরা এগুলোর প্রতি ঈমান আনি এবং সালাফের অনুসরণে চুপ থাকি। (কারণ,) আমরা এগুলো আল্লাহ তাআলার সিফাত বিশ্বাস করি, যেগুলোর হাকীকত ও বাস্তবতার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর রয়েছে। সুতরাং আমাদের জন্য আবশ্যক হলো, ঈমান আনা এবং মেনে নেওয়া।’[৩২৭]

সকলের বক্তব্যের সারকথা হলো, তানযীহ করার পর ঈমান আনা, এগুলোর কোনো ব্যাখ্যা না করে চুপ থাকা ও ইমরার করা। তথা এগুলোর অর্থ ও উদ্দেশ্য জানা না থাকায় এগুলো যেভাবে এসেছে সেভাবে পাঠ করা। এটা হচ্ছে তাফবীযের প্রথম পদ্ধতি।

তাফবীযের দ্বিতীয় পদ্ধতি

তাফবীযের দ্বিতীয় পদ্ধতিও একই, তবে উপরিউক্ত বিষয়গুলোর সাথে এতটুকু যোগ করা যে, এগুলোর অর্থ-জ্ঞান ও তাফসীর-ব্যাখ্যা আল্লাহই ভালো জানেন বা আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল যা উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

ইমাম তাহাবী রাহ. (মৃ. ৩২১ হি.) তাঁর বিখ্যাত ‘আকীদা’র কিতাবে ইমাম আবু হানীফা থেকে এ-জাতীয় বিষয়ে আকীদা রাখার ব্যাপারে বলেন,

وَنَقُولُ: اللهُ أَعْلَمُ فِيمَا اشْتَبَهَ عَلَيْنَا عِلْمُهُ.

‘আমাদের কাছে অস্পষ্ট বিষয়ে আমরা বলি, **আল্লাহই ভালো জানেন।**’

অন্যত্র বলেন,

وَالرُّؤْيَةُ حَقٌّ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ إِحَاطَةٍ وَلَا كَيْفِيَّةٍ، كَمَا نَطَقَ بِهِ كِتَابُ رَبِّنَا: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ. إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾، وَتَفْسِيرُهُ عَلَى مَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى وَعَلِمَهُ. وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَعْنَاهُ عَلَى مَا أَرَادَ.

‘জান্নাতবাসীর জন্য আল্লাহর দর্শন সত্য, যার জন্য কোনো রকমের পরিবেষ্টন নেই এবং ধরন-স্বরূপও নেই। যেভাবে কুরআন বলেছে, “সেদিন অনেক চেহারা উজ্জ্বল হবে, যারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।”[৩২৮] **আর এর তাফসীর-ব্যাখ্যা তা-ই, যা আল্লাহ তাআলা উদ্দেশ্য নিয়েছেন এবং তিনিই এ বিষয়ে জানেন।**

---

৩২৭. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১০/৫০৬
৩২৮. সূরা কিয়ামাহ, (৭৫) : ২২-২৩

এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসে যা এসেছে, তিনি যেমনটা বলেছেন তেমনই (বিশ্বাস করি)। আর **এর অর্থ হলো সেটাই, তিনি যা উদ্দেশ্য নিয়েছেন।'**

ইমাম মাতুরীদী রাহ.-ও (মৃ. ৩৩৩ হি.) একই কথা বলেছেন,

وَأما الأَصْل عندنَا فِي ذَلِك: أَن الله تَعَالَى قَالَ: لَيۡسَ كمثله شَيۡء، فنفى عَن نَفسه شبه خلقه، وَقد بَينا أَنه فِي فعله وَصفته متعالٍ عَن الْأَشْبَاه، فَيجب القَول بِـٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ، على مَا جَاءَ بِهِ التَّنْزِيل، وَثَبت ذَلِك فِي الْعقل، ثمَّ لَا نقطع تَأْوِيله على شَيْء؛ لاحْتِمَاله غَيره مِمَّا ذكرنَا، واحتماله أَيْضا مَا لم يبلغنَا مِمَّا يعلم أَنه غير مُحْتَمل شبه الْخلق، ونؤمن بِمَا أَرَادَ الله بِهِ. وَكَذَلِكَ فِي كل أَمر ثَبت التَّنْزِيل فِيهِ، نَحْو الرُّؤْيَة وَغير ذَلِك يجب نفي الشّبَه عَنهُ، وَالْإِيمَان بِمَا أَرَادَهُ، من غير تَحْقِيق على شَيْء دون شَيْء.

'এ ক্ষেত্রে আমাদের মূলনীতি হলো, আল্লাহ তাআলার মতো কিছু নেই যেমনটা তিনি বলেছেন—"তাঁর মতো কিছু নেই।" আল্লাহ তাঁর সকল কর্ম ও গুণে সাদৃশ্য থেকে পবিত্র। সুতরাং আমরা বলব, "রহমান আল্লাহ আরশের ওপর ইস্তিওয়া করেছেন"—যেমনটা কুরআনে এসেছে। এরপর আমরা তার সুনিশ্চিত কোনো তাবীল করব না। কারণ, তখন (আমরা যে শব্দে তাবীল করলাম) সেটার বাইরে আরও ভিন্ন শব্দেও তাবীল করা যাবে।

আর **এ থেকে আল্লাহ যা উদ্দেশ্য নিয়েছেন, তাতে আমরা ঈমান রাখি।** এটা ছাড়া আল্লাহর দর্শনসহ কুরআনে বর্ণিত অন্যান্য (সিফাতের) ক্ষেত্রেও আল্লাহর সাদৃশ্য নাকচ করতে হবে এবং **আল্লাহ যা উদ্দেশ্য নিয়েছেন তাতে বিশ্বাস রাখতে হবে।** সে ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত কোনো তাবীল করা যাবে না।'[৩২৯]

ইমাম আবুল মুইন নাসাফী মাতুরীদী রাহ. (মৃ. ৫০৮ হি.) বলেন,

وكذلك اليد من الصفات الأزلية بلا كيف ولا تشبيه ولا جارحة، فنقر باليد، والمراد به: ما أراده الله تعالى.

'অনুরূপ 'হাত' কোনো ধরন, উপমা ও অঙ্গ ছাড়াই অনাদি সিফাতের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আমরা 'হাত'কে (সিফাত হিসেবে) স্বীকার করি, তবে 'হাত' থেকে উদ্দেশ্য সেটাই, যা **আল্লাহ তাআলা উদ্দেশ্য নিয়েছেন।'**[৩৩০]

মাতুরীদী ধারার ও হানাফী মাযহাবের অন্যতম ইমাম আবুল বারাকাত নাসাফী রাহ. (মৃ. ৭১০ হি.) বলেন,

---

৩২৯. কিতাবুত তাওহীদ, পৃষ্ঠা ৭৪

৩৩০. বাহরুল কালাম, পৃষ্ঠা ৪০

مذهب السلف: أن نصدقها ونفوض تأويلها إلى الله تعالى مع التنزيه عن التشبيه، ولا نشتغل بتأويلها، بل نعتقد أن ما أراد الله تعالى بها حق.

'সালাফের মাযহাব হলো, আমরা এগুলো সত্যায়ন করব এবং তাঁকে সদৃশ থেকে পবিত্র মনে করে **এগুলোর ব্যাখ্যা আল্লাহ তাআলার কাছে তাফবীয করব।** এগুলোর ব্যাখ্যায় লিপ্ত হব না; বরং **এ বিশ্বাস রাখব যে, এগুলো থেকে আল্লাহ তাআলা যা উদ্দেশ্য নিয়েছেন, তা-ই সত্য।**'[৩৩১]

এখান থেকেও প্রমাণিত হয়, ইমাম আবু হানীফার আকীদার সাথে ইমাম তাহাবীর ও মাতুরীদী আকীদার পার্থক্য নেই।

ইমাম আশআরী রাহ. (মৃ. ৩২৪ হি.) বলেন,

وأن الله تعالى استوى على العرش على الوجه الذي قاله، وبالمعنى الذي أراده، استواء منزها عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال.

'আল্লাহ তাআলা ওভাবেই আরশে ইস্তিওয়া করেছেন, যেমনটা তিনি বলেছেন এবং ওই অর্থে (ইস্তিওয়া করেছেন), যা তিনি উদ্দেশ্য নিয়েছেন। তাঁর ইস্তিওয়া সংস্পর্শ, অবস্থান করা, স্থির হওয়া, প্রবিষ্ট হওয়া ও স্থানান্তর থেকে পবিত্র।'[৩৩২]

কাযী ইয়ায মালেকী রাহ. (মৃ. ৫৪৪ হি.) লেখেন,

وقيل: استوى من المشكل الذي لا يَعلَم تأويلَه إلا الله، وعلينا الإيمان به والتصديق والتسليم، وتفويض علمه إلى الله تعالى، وهو صحيح مذهب الأشعري وعامة الفقهاء والمحدثين، والصواب إن شاء الله.

'ইস্তিওয়ার ব্যাখ্যা একমাত্র আল্লাহ জানেন। আমাদের জন্য আবশ্যক হলো, ঈমান আনা, সত্যায়ন করা ও মেনে নেওয়া। এবং **এর জ্ঞান আল্লাহ তাআলার কাছে তাফবীয করা।** এটাই (ইমাম) আশআরীর বিশুদ্ধ মাযহাব এবং সাধারণ ফকীহ ও মুহাদ্দিসের মত। আর এটাই সঠিক, ইনশাআল্লাহ।'[৩৩৩]

চার মাযহাবের অন্যতম ইমাম শাফেয়ী রাহ. (মৃ. ২০৪ হি.) বলেন,

آمَنت بِمَا جَاءَ عَن الله على مُرَاد الله، وَبِمَا جَاءَ عَن رَسُول الله على مُرَاد رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.

'আল্লাহর পক্ষ থেকে যা এসেছে, এর ওপর আমি ঈমান আনি আল্লাহর উদ্দেশ্যমতে

---

৩৩১. আল-ই'তিমাদ ফীল ই'তিকাদ, পৃষ্ঠা ১২২

৩৩২. আল-ইবানাহ আন উসূলিদ দিয়ানাহ, পৃষ্ঠা ২১, দারুল আনসার কাহেরা; একই কথা ইমাম গাযালী রাহ. ও ইয্যুদ্দীন ইবনে আব্দিস সালাম রাহ.ও বলেছেন।

৩৩৩. মাশারিকুল আনওয়ার, ২/২৩২

এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে যা বর্ণিত হয়েছে, তাঁর উদ্দেশ্যমতে আমি ঈমান আনি।'[৩৩৪]

প্রায় একই ভাষ্যে ইমাম ইবনুস সালাহ রাহ.-ও (মৃ. ৬৪৩ হি.) বলেছেন,

وليقولوا عن اعتقاد جازم آمنا بالله وبما قال الله على المعنى الذي أراده، وآمنا بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي أراده رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.[৩৩৫]

প্রসিদ্ধ আছারী হাম্বলী ইমাম ইবনে কুদামাহ রাহ. (মৃ. ৬২০ হি.) বলেন,

أَمِرُّوهَا كَمَا جَاءَتْ، ورُدُّوا علمَها إلى قَائِلِها ومَعْنَاها إلى الْمُتَكَلِّم بها.

'এগুলো যেভাবে এসেছে, সেভাবে ইমরার করো। আর এগুলোর জ্ঞান তার উক্তিকারীর প্রতি ন্যস্ত করো এবং এগুলোর অর্থ বক্তার (আল্লাহ ও রাসূলের) ওপর হাওয়ালা করো।'

তিনি 'তাহরীমুন নযর' কিতাবে বলেন,

وَأما إِيمَانُنَا بِالْآيَاتِ وأخبار الصِّفَات: فَإِنَّمَا هُوَ إِيمَان بِمُجَرَّد الْأَلْفَاظ الَّتِي لَا شكّ فِي صِحَّتهَا وَلَا ريب فِي صدقهَا، وقائلها أعلم بمعناها، فآمَنَّا بهَا على الْمَعْنى الَّذِي أَرَادَ رَبنا تبَارك وَتَعَالَى.

'আল্লাহর সিফাত-বিষয়ক আয়াত ও হাদীসের ব্যাপারে আমাদের ঈমানের স্বরূপ হলো কেবল ওই শব্দগুলো বিশ্বাস করা, যা সঠিকভাবে প্রমাণিত এবং যা সত্য হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। আর **এগুলোর অর্থ এর উক্তিকারী ভালো জানেন। সুতরাং আমরা সেই শব্দগুলোর প্রতি ওই অর্থের ওপর ঈমান আনলাম, যে অর্থ আল্লাহ উদ্দেশ্য নিয়েছেন।**'[৩৩৬]

ইমাম যাহাবী আছারী রাহ. (মৃ. ৭৪৮ হি.) সিফাতের হাদীস সম্পর্কে বলেন,

فقَولُنَا فِي ذَلِكَ وَبَابِهِ: الإِقرَارُ، وَالإِمْرَارُ، وَتفْوِيضُ مَعْنَاهُ إِلَى قَائِلِه الصَّادِقِ المَعْصُومِ.

'এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হলো, স্বীকৃতি প্রদান করা ও ইমরার করা এবং এর অর্থকে রাসূলের নিকট তাফবীয বা ন্যস্ত করা, যিনি নিষ্পাপ সত্যবাদী।'[৩৩৭]

তাফবীযের দলীল :

আল্লাহ তাআলা সূরা আলে ইমরানে ইরশাদ করেন,

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ۭ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ

---

৩৩৪. যাম্মুত তাবীল, ইবনে কুদামাহ, পৃষ্ঠা ১১
৩৩৫. ফাতাওয়া ইবনিস সালাহ, পৃষ্ঠা ১১৫
৩৩৬. দেখুন : যাম্মুত তাবীল, পৃষ্ঠা ১২; তাহরীমুন নযর ফী কুতুবিল কালাম, পৃষ্ঠা ৫৯
৩৩৭. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৮/১০৫

زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۗ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

'তিনিই সেই সত্তা, যিনি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন, যার কিছু আয়াত মুহকাম (সুস্পষ্ট), সেগুলোই কিতাবের মূল। এবং অন্য আয়াতগুলো মুতাশাবিহ (অস্পষ্ট)। আর যাদের অন্তরে বক্রতা আছে, তারা সেই মুতাশাবিহ আয়াতসমূহের পেছনে পড়ে থাকে ফিতনার খোঁজে এবং এর (মনগড়া) তাবীলের উদ্দেশ্যে। অথচ সেসব আয়াতের ব্যাখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আর পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারীরা বলে, আমরা এর (সেই ব্যাখ্যার) প্রতি বিশ্বাস রাখি (যা একমাত্র আল্লাহ তাআলা জানেন)। সবকিছুই আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে। আর উপদেশ কেবল তারাই গ্রহণ করে, যারা বুদ্ধিমান।'[৩৩৮]

আয়াতের ব্যাখ্যা :

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন যে, যারা সুস্থ স্বভাবসম্পন্ন, তারা অস্পষ্ট আয়াত নিয়ে তথ্যানুসন্ধান ও ঘাঁটাঘাঁটি করে না; বরং তারা সংক্ষেপে বিশ্বাস স্থাপন করে যে, এ আয়াতটিও আল্লাহর সত্য কালাম। তবে তিনি কোনো বিশেষ হেকমতের কারণে এর অর্থ সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেননি। প্রকৃতপক্ষে এ পন্থাই বিপদমুক্ত ও সতর্কতাযুক্ত। এর বিপরীতে কিছুসংখ্যক লোক এমনও আছে, যাদের অন্তর বক্রতাসম্পন্ন। তারা সুস্পষ্ট আয়াত থেকে চক্ষু বন্ধ করে অস্পষ্ট আয়াত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটিতে লিপ্ত থাকে এবং তা থেকে নিজ মতলবের অনুকূলে অর্থ বের করে মানুষকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পায়। এরূপ লোকদের থেকে হাদীসে দূরে থাকতে বলা হয়েছে।

হযরত আয়েশা রাযি. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

تَلا رَسُول الله صلى الله عليه وَسلم هَذِه الْآيَة... قَالَت: قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: إِذَا رَأَيْتُمْ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ: فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللهُ، فَاحْذَرُوهُمْ.

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই আয়াত তিলাওয়াত করে বলেছেন, "অস্পষ্ট আয়াতসমূহের পেছনে পড়ে থাকা ব্যক্তিকে তোমরা দেখলে তাদের থেকে দূরে থাকবে। (কুরআনে) আল্লাহ তাআলা এদের কথাই বলেছেন।"'[৩৩৯]

এখানে একটা বাস্তবতা উপলব্ধি করে নেওয়া জরুরি। তা এই যে, এই জগতে এমন বহু বিষয় আছে, যা মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির ঊর্ধ্বে। এমনইভাবে আল্লাহ তাআলার

---

৩৩৮. সূরা আলে ইমরান, (৩) : ৭

৩৩৯. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪২৭৩; মুসলিম, হাদীস নং ২৬৬৫; শারহু মুশকিলিল আছার, তাহাবী, ৬/৩৩৪-৩৩৮; আরও দেখুন আয়াতটির ব্যাখ্যায়, তাফসীরে তাবারী; ইবনে কাসীর; আদ-দুররুল মানছুর।

অস্তিত্ব ও তাঁর একত্ব তো এমন এক সত্য, যা প্রতিটি মানুষ নিজ জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করতে পারে; কিন্তু তাঁর সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কিত বিস্তারিত জ্ঞান মানুষের সীমিত বুদ্ধি দ্বারা আহরণ করা সম্ভব নয়। কেননা, তা মানব-বুদ্ধির বহু ঊর্ধ্বের বিষয়। কোনো লোক যদি সেই সকল গুণের হাকীকত ও সত্তাসারের দার্শনিক অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়, তবে তার হয়রানি ও গোমরাহী ছাড়া আর কিছুই অর্জিত হবে না। কেননা, সে তার সীমিত জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা আল্লাহ্ তাআলার অসীম গুণাবলির রহস্য আয়ত্ত করতে চাচ্ছে, যা তার উপলব্ধির বহু ঊর্ধ্বের। উদাহরণত কুরআন মাজীদ কয়েক জায়গায় ইরশাদ করেছে, আল্লাহ্ তাআলার একটি আরশ আছে এবং সেই আরশে তিনি ইস্তিওয়া করেছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আরশ কেমন? আর তাঁর ইস্তিওয়ার দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? এসব এমন প্রশ্ন, যার উত্তর মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির বাইরের জিনিস।

তা ছাড়া মানবজীবনের কোনো ব্যবহারিক মাসআলা এর ওপর নির্ভরশীলও নয়। এ-জাতীয় বিষয় যেসব আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, তাকে 'মুতাশাবিহ' আয়াত বলে। এমনইভাবে বিভিন্ন সূরার শুরুতে যে পৃথক পৃথক হরফ নাযিল করা হয়েছে (যেমন : 'আলিফ-লাম-মীম', যাকে 'আল-হুরুফুল মুকাত্তাআ' বলা হয়), তাও 'মুতাশাবিহা'-এর অন্তর্ভুক্ত।

সারকথা, 'মুতাশাবিহ' সম্পর্কে এ আয়াত নির্দেশনা দিয়েছে যে, এর ব্যাখ্যা ও তত্ত্ব-তালাশের পেছনে না পড়ে বরং এর প্রতি ঈমান আনতে হবে; আর এর ব্যাখ্যা ও জ্ঞান আল্লাহ্র কাছে ন্যস্ত ও হাওয়ালা করতে হবে।[৩৪০]

---

৩৪০. মুতাশাবিহ সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষা দেওয়া তো জরুরি ছিল, কিন্তু এখানে বিষয়টিকে স্পষ্ট করার বিশেষ কারণ ছিল এই যে, নাজরানের একটি খ্রিষ্টান প্রতিনিধিদল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে 'ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহ্র পুত্র' এ দাবির পক্ষে বিভিন্ন দলীল পেশ করেছিল, যেমন : খোদ কুরআন তাঁকে 'কালিমাতুল্লাহ' (আল্লাহ্র কালিমা) ও 'রূহুম মিনাল্লাহ' (আল্লাহ্র পক্ষ হতে আগত রূহ) নামে অভিহিত করেছে। এর দ্বারা বোঝা যায়, তিনি আল্লাহ্র বিশেষ গুণ 'কালাম' ও আল্লাহ্র রূহ ছিলেন।
এ আয়াত তার জবাব দিয়েছে যে, কুরআন মাজীদই বিভিন্ন স্থানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে, আল্লাহ্ তাআলার কোনো পুত্র-কন্যা থাকতে পারে না এবং হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে 'আল্লাহ' বা 'আল্লাহ্র পুত্র' বলা শিরক ও কুফরের নামান্তর। এসব সুস্পষ্ট আয়াত ছেড়ে দিয়ে 'কালিমাতুল্লাহ' শব্দটিকে ধরে বসে থাকা এবং এর ভিত্তিতে এমন সব তাবীল ও ব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়া, যা কুরআন মাজীদের মুহকাম আয়াতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী, এটা অন্তরের বক্রতারই পরিচায়ক। প্রকৃতপক্ষে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে 'কালিমাতুল্লাহ' বলার অর্থ কেবল এই যে, তিনি পিতার মাধ্যম ছাড়া আল্লাহ্ তাআলার 'কুন' (হও) কালিমা (শব্দ) দ্বারা জন্মলাভ করেছিলেন (যেমন : কুরআন মাজীদের এ সূরারই ৫৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে)। আর তাঁকে 'রূহুম মিনাল্লাহ' বলা হয়েছে এ কারণে যে, তাঁর রূহ আল্লাহ্ তাআলা সরাসরি সৃষ্টি করেছিলেন। অবশ্য 'কুন' শব্দ দ্বারা সৃষ্টি করার অবস্থাটা কেমন ছিল, এটা মানব-বুদ্ধির ঊর্ধ্বের বিষয়। এমনিভাবে তাঁর রূহ সরাসরি কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তাও আমাদের বুদ্ধির অতীত। এসব বিষয় 'মুতাশাবিহা'-এর অন্তর্ভুক্ত। তাই এর তত্ত্ব-তালাশের পেছনে পড়া নিষেধ, (যেহেতু এসব জিনিস মানুষ বুঝতে সক্ষম নয়)। অনুরূপ এর মনগড়া তাবীল করে এর থেকে 'আল্লাহ্র পুত্র' থাকার ধারণা উদ্ভাবন করাও টেড়া মেজাজের পরিচায়ক। (দ্র. তাওযীহুল কুরআন)

সহীহ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

وَإِنَّمَا نَزَلَ كِتَابُ اللهِ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا، فَلَا تُكَذِّبُوا بَعْضَهُ بِبَعْضٍ، فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ فَقُولُوهُ، وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَكِلُوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

'নিশ্চয় আল্লাহর কিতাব এভাবে নাযিল হয়েছে যে, যার একাংশ অন্য অংশকে সত্যায়ন করে। কাজেই তোমরা একাংশ দ্বারা অন্য অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কোরো না। সুতরাং **কুরআনের যা তোমরা জ্ঞাত হতে পারো, তা বলো। আর যা জানতে পারো না, তা এর জ্ঞানীর কাছে ন্যস্ত করো।**'[৩৪১]

এ ছাড়া ন্যস্ত করার বিষয়টি অনেক সাহাবা ও মনীষী থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

'মুতাশাবিহ'-এর বিধান :

ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. (মৃ. ৮৬১ হি.) বলেন,

وحكم المتشابه: انقطاع رجاء معرفة المراد منه في هذه الدار، وإلا لكان قد علم.

'মুতাশাবিহ-এর হুকুম হলো, এ জগতে এর উদ্দেশ্য জানার আশা না করা। অন্যথায় তা অবশ্যই জানিয়ে দেওয়া হতো।'[৩৪২]

ইমাম সারাখসী হানাফী রাহ. (মৃ. ৪৮৩ হি.) লেখেন,

وَأما الْمُتَشَابه: فَهُوَ اسْم لما انْقَطع رَجَاء معرفَة الْمُرَاد مِنْهُ لمن اشْتبهَ فِيهِ عَلَيْهِ، وَالْحكم فِيهِ اعْتِقَاد الحقية وَالتَّسْلِيم بترك الطّلب والاشتغال بِالْوُقُوفِ على الْمُرَاد مِنْهُ.. وَأَنه لَيْسَ لَهُ مُوجب سوى اعْتِقَاد الحقية فِيهِ وَالتَّسْلِيم كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وَمَا يعلم تَأْوِيله إِلَّا الله}، فالوقف عندنَا فِي هَذَا الْموضع، ثمَّ قَوْله تَعَالَى: {والراسخون فِي الْعلم} ابْتِدَاء بِحرف الْوَاو لحسن نظم الْكَلَام وَبَيَان أَن الراسخ فِي الْعلم من يُؤمن بالمتشابه، وَلَا يشْتَغل بِطَلَب الْمُرَاد فِيهِ، بل يقف فِيهِ مُسلما، هُوَ معنى قَوْله تَعَالَى: {يَقُولُونَ آمنا بِهِ كل من عِنْد رَبنَا}.

---

৩৪১. মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস নং ২০৩৬৭; মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৬৭৪১, সনদ হাসান।

ورواه البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص: (٦٣) من طريق عبد الرزاق به، ثم قال البخاري: «وَكُلُّ مَنِ اشْتَبَهَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَأَوْلَى أَنْ يَكِلَهُ إِلَى عَالِمِهِ»، كما قال عبد الله بن عمرو ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «وَمَا أَشْكَلَ عَلَيْكُمْ فَكِلُوهُ إِلَى عَالِمِهِ، وَلَا يَدْخُلُ فِي الْمُتَشَابِهَاتِ إِلَّا مَا بَيَّنَ لَهُ». ورواه ابن سعد في «الطبقات» ١٩٢/٤ بلفظ: «فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ، وَمَا تَشَابَهَ عَلَيْكُمْ فَآمِنُوا بِهِ». وسنده حسن. انظر: هامش «سير أعلام النبلاء» ٧٨/٣.

وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» في كتاب فضائل القرآن تحت عنوان: في القرآن إذا اشتبه ٤٦٩/١٥-٤٧٠ آثارا، فروى عن أبي بن كعب أنه قال: »كِتَابُ اللهِ مَا اسْتَبَانَ مِنْهُ فَاعْمَلْ بِهِ، وَمَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ فَآمِنْ بِهِ وَكِلْهُ إِلَى عَالِمِهِ«. وعن عبد الله بن مسعود أنه قال: »إِنَّ لِلْقُرْآنِ مَنَارًا كَمَنَارِ الطَّرِيقِ، فَمَا عَرَفْتُمْ فَتَمَسَّكُوا بِهِ، وَمَا اشْتَبَهَ عَلَيْكُمْ فَذَرُوهُ«. وعن مُعاذ أنه قال: »فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَلا تَسْأَلُوا عَنْهُ أَحَدًا، وَمَا شَكَكْتُمْ فِيهِ فَكِلُوهُ إِلَى عَالِمه«.

৩৪২. আল-মুসায়ারাহ, পৃষ্ঠা ৩৬

'মুতাশাবিহ্ হলো ওই বিষয়, যার উদ্দেশ্য জানার আশা করতে পারে না ওই ব্যক্তি, যার কাছে বিষয়টি অস্পষ্ট হয়েছে। এ ক্ষেত্রে হুকুম হলো, এগুলো সত্য হওয়ার বিশ্বাস রাখা এবং উদ্দেশ্য জানার চেষ্টা ও তলব ছেড়ে দিয়ে মেনে নেওয়া। এগুলো সত্য হওয়ার আকীদা রাখা এবং মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। যেমনটা আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, "এর ব্যাখ্যা আল্লাহ্ ছাড়া কেউ জানে না।"

সুতরাং আমাদের মতে إلا الله বলে ওয়াকফ করা। এরপর والراسخون বলে 'ওয়াউ' দিয়ে নতুন কথা শুরু হয়েছে কালামের সৌন্দর্যের জন্য, আর এ কথা বয়ান করার জন্য যে, পরিপক্ব জ্ঞানীরা মুতাশাবিহ্-এর প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং তাঁরা এগুলোর উদ্দেশ্য বুঝতে ব্যস্ত হন না; বরং তারা এগুলো মেনে নিয়ে স্থির থাকেন। আর এটাই আল্লাহ্ তাআলার বাণী "তারা বলে, আমরা এর প্রতি বিশ্বাস রাখি, সবই আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে"—আয়াতটি থেকে উদ্দেশ্য।'[৩৪৩]

ইমাম ইবনে কুদামাহ্ হাম্বলী রাহ. (মৃ. ৬২০ হি.) লেখেন,

والصحيح: أن المتشابه: ما ورد في صفات الله سبحانه مما يجب الإيمان به، ويحرم التعرض لتأويله. كقوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} {بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ}. فهذا اتفق السلف رحمهم الله على الإقرار به، وإمراره على وجهه وترك تأويله... ولأن في الآية قرائن تدل على أن الله سبحانه منفرد بعلم تأويل المتشابه، وأن الوقف الصحيح عند قوله تعالى: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ} له لفظًا ومعنى... ولأن قولهم {آمَنَّا بِهِ} يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه.

'বিশুদ্ধ মত হলো, আল্লাহর সিফাতের ব্যাপারে যে সকল মুতাশাবিহ্ বিবৃত হয়েছে, তা বিশ্বাস করা আবশ্যক এবং এর তাবীল করা হারাম। যেমন : "রহমান আরশে ইস্তিওয়া করেছেন", "আল্লাহর উভয় হাত প্রসারিত", "আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি।"... সালাফ এসব আয়াত স্বীকার করা, ইমরার করা এবং তাবীল পরিত্যাগ করার ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

আয়াতটিতে এ কথার প্রতি ঈঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহ্ তাআলা মুতাশাবিহ্-এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে একচ্ছত্র জ্ঞাত। আর শাব্দিক ও অর্থগত কারণে إلا الله বলে ওয়াকফ করা সহীহ্ ওয়াকফ হিসেবে বিবেচিত।... তাদের স্বীকারোক্তি "আমরা এর প্রতি বিশ্বাস রাখি" এই কথার প্রমাণ বহন করছে যে, তারা এমন বিষয়ের তাফবীয ও তাসলীম করছেন, যার অর্থ তারা জানতে পারেননি।'

এমন বিষয় কেন দেওয়া হলো, যার অর্থ-ব্যাখ্যা জানতে অক্ষম?

---

৩৪৩. উসূলুশ শারাখসী, ১/১৬৯

প্রশ্ন : আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে এমন বিষয় কেন দিলেন, যা তাদের জ্ঞান-বোধের ঊর্ধ্বে কিংবা তারা জানতে পারে না, অবগত হতে পারে না?

উত্তর :

ইবনে কুদামাহ হাম্বলী রাহ. স্বয়ং নিজেই এ প্রশ্ন উত্থাপন করে এর উত্তরে বলেন,

قلنا: يجوز أن يكلفهم الإيمان بما لا يطلعون على تأويله؛ ليختبر طاعتهم، كما قال تعالي: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِين ... وكما اختبرهم بالإيمان بالحروف المقطعة مع أنه لا يعلم معناها.

'হতে পারে বান্দাদের আনুগত্য পরীক্ষা করার লক্ষ্যে তাদেরকে এমন বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস রাখার মুকাল্লাফ বা ভারার্পিত করেছেন, যার ব্যাখ্যা সম্পর্কে তারা অবগত নয়। যেমন : আল্লাহ তাআলা বলেন, "(হে মুসলিমগণ!) আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যাতে দেখে নিতে পারি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদকারী ও ধৈর্যশীল।"[৩৪৪] যেমনইভাবে তিনি "হুরুফে মুকাত্তাআত"-এর প্রতি ঈমান আনার পরীক্ষা করেছেন, এর অর্থ না জানা সত্ত্বেও।'[৩৪৫]

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা বিভিন্ন সূরার শুরুতে মানুষের জ্ঞান-বোধের ঊর্ধ্বের বিষয় দিয়েছেন, যার অর্থ আমরা জানি না। এগুলোর অর্থ-ব্যাখ্যা তিনি আমাদেরকে না জানানোর কারণ হলো, মানুষ যেন তার সীমাবদ্ধতা, অযোগ্যতা, অপারগতা, অক্ষমতা উপলব্ধি করতে পারে। মানুষ চাইলেই সবকিছু জানতে পারবে না, বুঝতে পারবে না; তার সীমাবদ্ধতা রয়েছে, সক্ষমতার বাইরেও বিষয় আছে। এমনকি মানুষ তার নিজের রূহ বা আত্মা কী, সেটাই জানতে-বুঝতে পারে না। যে তার আত্মাকে জানতে পারে না, সে আত্মার স্রষ্টা ও তাঁর গুণাবলি কীভাবে বুঝে ফেলবে? যে আল্লাহর কালামকে বুঝতে অক্ষম, সে কালামওয়ালাকে কীভাবে বুঝবে? এভাবে মানুষ তার অক্ষমতা উপলব্ধি করবে।

বলাবাহুল্য, একটা হচ্ছে সিফাতের শব্দগুলোকে অর্থহীন বা কোনো অর্থ নেই মনে করা কিংবা তাঁর গুণ অস্বীকার করা; আরেকটা হলো তাঁর শান উপযোগী শব্দগুলোর অর্থ আছে, তবে এই জগতে তা অবগত হতে না পারা, জানতে-বুঝতে সক্ষম না হওয়া—দুটো কথা এক নয়। প্রথমটা বাতিল ফেরকা 'মুআত্তিলা' ও 'জাহমিয়া'-এর মতাদর্শ, আর দ্বিতীয়টা সালাফ ও আহলুস সুন্নাহর মাযহাব।

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম ইবনুস সালাহ রাহ. (মৃ. ৬৪৩ হি.) বলেন,

وسبيل من أراد سلوك سبيلهم في هذه الأمور وفي سائر الآيات المشتبهات والأخبار المشتبهة:

---

৩৪৪. সূরা মুহাম্মাদ, ৩১; আরও দেখুন, বনী-ইসরাঈল, ৬০; বাকারা, ১৪৩
৩৪৫. দেখুন : রাওযাতুন নাযির, ১/২১৫-২১৭

أن يقول: هذه لها معنى يليق بجلال الله وكماله وتقديسه المطلق، الله العالم به، وليس البحث عنه من شأني، ثم يلازم السكوت في ذلك، ولا يسأل عن معنى ذلك ولا يخوض فيه، ويعلم أن سؤاله عنه بدعة.

'যে ব্যক্তি মুশতাবিহ আয়াত ও হাদীসসমূহের ব্যাপারে সালাফের পদ্ধতি গ্রহণ করতে চাইবে, সে বলবে, **আল্লাহ তাআলার যথাযথ শান উপযোগী এগুলোর অর্থ রয়েছে।** এ নিয়ে অনুসন্ধান করা আমার কাজ না। অতঃপর এ বিষয়ে চুপ থাকা আবশ্যক করে নেবে। আর **এর অর্থ সম্পর্কে প্রশ্ন করবে না** এবং এতে নিমগ্ন হবে না। (কেননা,) এ নিয়ে প্রশ্ন করা বিদআত মনে করবে।'[৩৪৬]

ইমাম নববী রাহ. (মৃ. ৬৭৬ হি.) বলেন,

مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: نُؤْمِن بِهَا، وَلَا نَتَكَلَّم فِي تَأْوِيله، وَلَا نَعْرِف مَعْنَاهُ، لَكِنْ نَعْتَقِد أَنَّ ظَاهِرهَا غَيْر مُرَاد، وَأَنَّ لَهَا مَعْنًى يَلِيق بِاللهِ تَعَالَى، وَهَذَا مَذْهَب جَمَاهِير السَّلَف وَطَوَائِف مِنْ الْمُتَكَلِّمِينَ.

'একদল আলেম বলেন, এগুলোর প্রতি আমরা ঈমান রাখি, এর ব্যাখ্যা নিয়ে কিছু বলি না এবং **এর অর্থ জানি না। তবে আমরা বিশ্বাস করি, এর বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয় এবং আল্লাহ তাআলার শান উপযোগী এগুলোর অর্থ রয়েছে।** এটা অধিকাংশ সালাফ ও অনেক কালামপন্থীদের মাযহাব।'

তিনি অন্যত্র লেখেন,

اعْلَمْ أَنَّ لِأَهْلِ العِلمِ فِي أَحَادِيثِ الصِّفَاتِ وَآيَاتِهَا قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: وَهُوَ مَذْهَبُ مُعْظَمِ السَّلَفِ أَوْ كُلِّهِمْ أَنَّهُ لَا يُتَكَلَّمُ فِي مَعْنَاهَا، بَلْ يَقُولُونَ: يَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نُؤْمِنَ بِهَا، وَنَعْتَقِدَ لَهَا مَعْنًى يَلِيقُ بِجَلَالِ اللهِ تَعَالَى وَعَظَمَتِهِ، مَعَ اعْتِقَادِنَا الْجَازِمِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وَأَنَّهُ مُنَزَّهٌ عَنِ التَّجَسُّمِ وَالِانْتِقَالِ وَالتَّحَيُّزِ فِي جِهَةٍ وَعَنْ سَائِرِ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِ، وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ مَذْهَبُ جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ، وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ مُحَقِّقِيهِمْ، وَهُوَ أَسْلَمُ.

'জেনে রাখো, সিফাত-সংক্রান্ত আয়াত ও হাদীস সম্পর্কে আলেমদের দুটি মত রয়েছে। তন্মধ্যে প্রথমটি অধিকাংশ সালাফ বা তাদের সকলের মাযহাব। তা হলো, এগুলোর অর্থ সম্পর্কে কোনো কথা না বলা; বরং তাঁরা বলতেন, "আমাদের জন্য এগুলোর প্রতি ঈমান আনা আবশ্যক এবং **আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ তাআলার শান উপযোগী এগুলোর অর্থ রয়েছে।**

সেই সাথে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, আল্লাহ তাআলার মতো বলতে কিছুই নেই। তিনি দেহধারণ, স্থানান্তর, কোনো দিকে স্থানগ্রহণ এবং অন্য সকল সৃষ্টির গুণাবলি

৩৪৬. ফাতাওয়া ইবনিস সালাহ, পৃষ্ঠা ১১৬

থেকে পবিত্র। এ মতটিই একদল কালামপন্থীদের মাযহাব এবং কালামী মুহাক্কিকদের এক জামাআত তা গ্রহণ করেছেন, আর এটাই নিরাপদ।'[৩৪৭]

শুধু তাঁর সাথে সম্পৃক্ত শব্দটির অর্থ-ব্যাখ্যা অজানা, পুরো বাক্যের নয়

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি। তা হলো, কেবল আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পৃক্ত শব্দগুলোর অর্থ-ব্যাখ্যা আমাদের কাছে অজানা, পুরো বাক্যের নয়। যেমন : 'আল্লাহর হাত', 'তিনি আসমানে অবতরণ করেন', 'আরশে ইস্তিওয়া করেছেন' ইত্যাদি শব্দগুলোর শুধু অর্থ-ব্যাখ্যা আমরা জানতে-বুঝতে পারি না, তাই এ শব্দগুলোর অর্থ-ব্যাখ্যা তাফবীয করি।

কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, পুরো বাক্য তথা শব্দগুলোর আগে-পরে (সিয়াক-সিবাক) পুরো আয়াত বা হাদীস মিলালেও এর কোনো কিছুই বুঝে আসে না কিংবা এগুলো থেকে কী উদ্দেশ্য ও নির্দেশনা সেটা ধরা যায় না; বরং শব্দগুলোর আগে-পরে মিলিয়ে যদি আয়াত বা হাদীসের পুরো বাক্য দেখা হয়, তখন এগুলো থেকে মোটামুটিভাবে একটা উদ্দেশ্য ও নির্দেশনা বুঝে আসে।

যেমন : আসমানে অবতরণের হাদীসটা পুরো দেখুন, হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ فَيَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ.

'প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকলে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন। আর বলেন, কে আছ আমার নিকট দুআ করবে? আমি তার দুআ কবুল করব। কে আছ আমার নিকট কিছু চাইবে? আমি তাকে সেটা প্রদান করব। কে আছ আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে? আমি তাকে ক্ষমা করে দেবো।'[৩৪৮]

এই পুরো হাদীসটা দেখলে এর একটা উদ্দেশ্য ও নির্দেশনা বুঝে আসে। তা হলো, শেষ রাতে বিশেষভাবে আল্লাহ তাআলার রহমতের দুয়ার খুলে যায়, বান্দাকে তিনি অবারিত অনুগ্রহ দান করেন। তাই সে সময় বান্দাকে বিভিন্নভাবে ডেকে বলতে থাকেন, হে বান্দা! এখন তুমি আমার অভিমুখী হও, তোমার যাবতীয় প্রয়োজন

---

৩৪৭. শারহে মুসলিম, ১২/২১১, ৩/১৯

وقد نقله مَرْعِي الكرمي في «أقاويل الثقات» ص ١٦٠، والسفاريني في «لوامع الأنوار البهية»، والسهارنفوري في «بذل المجهود» ٥٥٨/٥. وكذا قال الخازن (ت: ٧٤١هـ) في «لباب التاويل» ٢٨٥/٢، وابن الملَقِّن (ت: ٨٠٤هـ) في «التوضيح» ١٨٠/٢٣، والعيني في «عمدة القاري» ١٨٨/١٩، وابن العراقي في «طرح التثريب» ١٨/٨، والسيوطي في «الديباج»، وابن علّان في «الفتوحات الربانية» ٧٧/٣.

৩৪৮. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৪৯৪; মুসলিম, হাদীস নং ৭৫৮

আমার থেকে চেয়ে নাও, আমার কাছে ইস্তিগফার করো, আমার সাথে বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তুলো, আমার সাথে বিশেষভাবে সময় দাও ইত্যাদি।

এ হাদীসে 'তিনি আসমানে অবতরণ করেন' শুধু এ কথাটির অর্থ-ব্যাখ্যা আমরা জানতে-বুঝতে পারি না। কেননা, তিনি ওঠা-নামা ও স্থানান্তর ইত্যাদি সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য থেকে পবিত্র। তাই এর অর্থ-ব্যাখ্যা তাফবীয করতে হয়। তবে পুরো হাদীস দেখলে হাদীসের উদ্দেশ্য এবং আমাদের করণীয় কী, তা সুস্পষ্ট।

সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফগণ এ ধরনের আয়াত-হাদীস থেকে এর মূল উদ্দেশ্য ও করণীয় বুঝে নিতেন এবং সে অনুযায়ী আমলের চেষ্টা করতেন। তাঁরা এর কী অর্থ, তিনি কীভাবে আসমানে অবতরণ করেন—এগুলোর পেছনে পড়তেন না; বরং পুরো হাদীস থেকে করণীয় কী, এর উদ্দেশ্য কী, তা বুঝে নিতেন।

এ প্রসঙ্গে ইমাম বায়হাকী রাহ. (মৃ. ৪৫৮ হি.) লেখেন,

فَأَمَّا الْمُتقَدِّمُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا فَإِنَّهُمْ فَهِمُوا مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَا وَقَعَ التَّرْغِيبُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الْأَعْمَالِ، وَمَا وَقَعَ الْخَبَرُ عَنْهُ مِنْ فَضْلِ اللهِ سُبْحَانَهُ، وَلَمْ يَشْتَغِلُوا بِتَفْسِيرِ الضَّحِكِ مَعَ اعْتِقَادِهِمْ أَنَّ اللهَ لَيْسَ بِذِي جَوَارِحٍ.

'আমাদের পূর্ববর্তীগণ এই হাদীসসমূহ থেকে কেবল আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের কথা এবং যে সকল আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, তা বুঝেছেন। তাঁরা (আল্লাহ তাআলার) হাসির তাফসীর বা ব্যাখ্যায় লিপ্ত হননি। সাথে তাঁদের আকীদা ছিল, আল্লাহ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গধারী নন।'[৩৪৯]

অনুরূপ ইমাম বাগাভী রাহ. (মৃ. ৫১৬ হি.) বলেন,

وَالْمُتقَدِّمُونَ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ فَهِمُوا مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ مَا وَقَعَ التَّرْغِيبُ فِيهِ مِنَ الأَعْمَالِ، وَالإِخْبَارِ عَنْ فَضْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَثْبَتُوا هَذِهِ الصِّفَاتِ للهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلَمْ يَشْتَغِلُوا بِتَفْسِيرِهَا، مَعَ اعْتِقَادِهِمْ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُنَزَّهٌ عَنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ. {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: ١١].

'পূর্ববর্তী মুহাদ্দিসগণ এই হাদীসসমূহ থেকে আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহের কথা এবং যে সকল আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, তা বুঝেছেন। তাঁরা আল্লাহ তাআলার এই সিফাতগুলো সাব্যস্ত করেছেন, এর ব্যাখ্যায় লিপ্ত হননি। সাথে তাঁদের আকীদা ছিল, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির গুণাবলি থেকে পবিত্র।'[৩৫০]

সুতরাং আমরাও এভাবে বুঝে নিতে পারি, কিন্তু আমরা এটা করি না; বরং 'আল্লাহ

---

৩৪৯. আল-আসমা ওয়াস সিফাত, ২/৪১৩

৩৫০. শারহুস সুন্নাহ, ৫/৮৮

অবতরণ করার অর্থ কী?', 'তিনি যদি অবতরণ করেন, তাহলে আরশে থাকেন কি না?'—এ ধরনের অপ্রয়োজনীয়, বরং নিষিদ্ধ তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়ে আসল উদ্দেশ্য থেকে সরে যাই। ফলে আমাদের উদাহরণ হয়ে গেছে ওই দুই ব্যক্তির মতো, যারা আমগাছের নিচে বসে আম না খেয়ে, বরং আম নিয়ে বিতর্কে মেতে উঠল। একজন বলল, আমের স্বাদ এমন; আরেকজন বলল, না। এভাবে আম-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কিছুক্ষণ বিতর্ক করে দুজনেই সেখান থেকে উঠে চলে গেল। কিন্তু একজনও আম খেয়ে দেখল না।

তো আমরাও আমলী দিককে ভুলে গিয়ে এগুলোকে বিতর্কের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নিয়েছি। এটা আসলেই অনেক দুঃখজনক বাস্তবতা। আল্লাহর সিফাতগুলো ছিল আমাদের শিক্ষার ও আমলের জন্য। আমরা সেটা ছেড়ে দিয়ে এগুলো নিয়ে তর্ক করাকেই আসল বানিয়ে ফেলেছি!

আরেকটা উদাহরণ দেখুন। সহীহ হাদীসে এসেছে, 'আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালামকে তাঁর সূরত বা আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।'

ব্যস, আমরা আলোচনা বা বিতর্কের দলীল পেয়ে গেলাম যে, আল্লাহর সূরত-রূপ বা আকার-আকৃতি আছে, না থাকলে কি এমনি উক্ত আকৃতিতে আদমকে সৃষ্টি করার কথা বলেছেন?

অথচ সালাফগণ আল্লাহ তাআলাকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং সৃষ্টির গুণাবলি থেকে পবিত্র মনে করে এ হাদীস থেকে করণীয় কী তা বুঝে নিয়েছেন। যেমন : সহীহ মুসলিমে এ হাদীসের শুরুতে এসেছে, 'তোমাদের কেউ যদি কাউকে হত্যা করে, তাহলে চেহারায় আঘাত করবে না।' আর মুসনাদে আহমদের বর্ণনায় এসেছে, 'যদি তোমাদের কেউ মারে, তাহলে চেহারায় মারবে না। আর এমনও বলবে না যে, আল্লাহ তোমার চেহারাকে কুৎসিত করুক। কেননা, আল্লাহ আদমকে তাঁর সূরত বা আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।'

তো পুরো হাদীস থেকে মানুষের চেহারার বিশেষ একটা সম্মান বোঝা যায়। তাই এই হাদীসের উদ্দেশ্য ও নির্দেশনা হলো, আমাদের কেউ যাতে কারও চেহারায় আঘাত না করে, না মারে, কারও চেহারাকে লক্ষ্য করে মন্দ কিছু না বলে।

এ রকম যতগুলো 'মুতাশাবিহ' আছে, সেগুলোর আগে-পরে পুরো আয়াত-হাদীস মিলালে অথবা পুরো আয়াতের তাফসীর ও হাদীসের ব্যাখ্যা দেখলে এর উদ্দেশ্য ও নির্দেশনা এবং আমাদের করণীয় কী, সেটা পরিষ্কার হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। আর মুতাশাবিহ শব্দটির অর্থ-ব্যাখ্যা তাফবীয করতে হবে।

প্রিয় পাঠক! ইমাম আবু হানীফা রাহ., ইমাম শাফেয়ী রাহ. ও তাহাবী রাহ. এবং

মাতুরীদী ধারা, আশআরী ধারা, আছারী ধারা ও হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী মাযহাবের বেশ কয়েকজন ইমামের বক্তব্য, আর তাফবীযের দলীলের আয়াতের ব্যাখ্যা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, তৃতীয় প্রকার সিফাতের অর্থ-ব্যাখ্যা ও জ্ঞান (আমাদের কাছে অবোধগম্য ও অস্পষ্ট হওয়ার কারণে, তা) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ন্যস্ত ও হাওয়ালা করে এগুলোর যে অর্থ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল উদ্দেশ্য নিয়েছেন, এর ওপর ঈমান আনা। পরিভাষায় যাকে 'তাফবীয' বলে। কাজেই 'তাফবীয'-এর মূল ক্ষেত্র হচ্ছে সিফাতের অর্থ-ব্যাখ্যা ও জ্ঞান 'তাফবীয' বা ন্যস্ত ও হাওয়ালা করা।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রাহ.-সহ বর্তমান সালাফী আকীদার শায়খ ও বন্ধুরা এই 'তাফবীয' মানেন না; বরং এর কঠোর সমালোচনা করেন। ইবনে তাইমিয়া রাহ. (মৃ. ৭২৮ হি.) লেখেন,

إن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد!

'নিজেদেরকে সুন্নাহ্ ও সালাফের অনুসারী ধারণাকারী তাফবীযপন্থীদের বক্তব্য বিদআতী ও মুলহিদদের বক্তব্যের থেকেও নিকৃষ্টতর।'[৩৫১]

তাঁর অনুসারীদেরও এ বিষয়ে কঠিন মন্তব্য ও বক্তব্য রয়েছে।

অথচ আমরা দেখেছি যে, আহলুস সুন্নাহর আকীদার প্রধান তিন ধারার এবং চার মাযহাবের ইমামগণ এই 'তাফবীয' মানেন এবং এর স্বপক্ষে বলেছেন। এখানে মনে হচ্ছে এ বিষয়ে আরও কিছু ইমামের বক্তব্য তুলে ধরলে আরও মজবুত হতো।

তবে এর আগে আহলুস সুন্নাহর সাথে ইবনে তাইমিয়া রাহ. ও তাঁর অনুসারীদের মতভেদের ক্ষেত্রগুলো ভালোভাবে জেনে নেওয়া দরকার। যাতে ইমামগণের বক্তব্য থেকে সেগুলোর জবাব চিহ্নিত করে নেওয়া যায়।

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে সবিস্তারে আলোচনা দেখানো হয়েছে যে, 'সালাফের মাযহাব' ও বর্তমান 'সালাফী মাযহাব' এক নয়। এটা ভালোভাবে মনে রাখবেন।

সিফাতের অর্থ বিষয়ে ইবনে তাইমিয়া ও সালাফীদের মতভেদ দুই ক্ষেত্রে

১. সিফাতের তৃতীয় প্রকারটি 'মুতাশাবিহ' নয়; বরং এগুলো মুহকাম, এর অর্থ ও জ্ঞান সুস্পষ্ট। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. (মৃ. ৮৫২ হি.) লেখেন,

وَفِيهِ الرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ عَلَى الْعَرْشِ بِذَاتِهِ.

---

৩৫১. দারউ তাআরুযিল আকলি ওয়ান নাকল, ১/২০৫

'হাদীসটির মাঝে ওই ব্যক্তির খণ্ডন নিহিত রয়েছে, যে আল্লাহ তাআলাকে সত্তাগতভাবে আরশে আছেন বিশ্বাস করে।'

এ বক্তব্যের খণ্ডন করে শায়খ বিন বায রাহ. 'ফাতহুল বারী'র টীকায় বলেন,

ليس في الحديث رد على من أثبت استواء الرب سبحانه على العرش بذاته؛ لأن النصوص من الآيات والأحاديث في إثبات استواء الرب سبحانه على العرش بذاته محكمة قطعية واضحة، لا تحتمل أدنى تأويل.

'হাদীসটির মাঝে ওই ব্যক্তির খণ্ডন নিহিত নেই, যে আল্লাহ তাআলাকে সত্তাগতভাবে আরশের ওপর সাব্যস্ত করে। কারণ, **আল্লাহ তাআলাকে সত্তাগতভাবে আরশের ওপর সাব্যস্ত করার ব্যাপারে অনেক আয়াত-হাদীস এমন মুহকাম অকাট্য ও সুস্পষ্ট যে, তা সামান্যতম ব্যাখ্যার সম্ভাবনা রাখে না।**'[৩৫২]

ইবনে হাজার রাহ. অন্যত্র বলেন,

قَوْله: اسْتَوَى على الْعَرْش: هُوَ من الْمُتَشَابه الَّذِي يفَوَّضُ عِلْمُه إلى الله تعَالى.

'ইস্তাওয়া আলাল আরশ' হলো 'মুতাশাবিহ'-এর অন্তর্ভুক্ত। (ফলে) এর জ্ঞান আল্লাহ তাআলার নিকট তাফবীয বা সোপর্দ করা হবে।'[৩৫৩]

এর খণ্ডনে 'আল-মুখালাফাতুল আকদিয়্যাহ ফী ফাতহুল বারী' গ্রন্থে লেখা হয়েছে,

هذا ليس صحيحا؛ إذ نصوص الصفات وآيات الاستواء من النصوص المحكمة المعلومة المعنى والمعقولة المراد.

'এ কথা সঠিক নয়। কেননা, **সিফাতের নস বা বক্তব্যগুলো ও ইস্তিওয়ার আয়াতসমূহ মুহকাম, যেগুলোর অর্থ জ্ঞাত এবং উদ্দেশ্য বোধগম্য।**'[৩৫৪]

২. এগুলোর অর্থ যেহেতু সুস্পষ্ট ও জ্ঞাত, তাই এর অর্থ সাব্যস্ত করা; তবে এর 'কাইফ' বা ধরন অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত হওয়ার কারণে তা তাফবীয করা। পরিভাষায় এটাকে তারা 'এছবাতুল মা'না ওয়া তাফবীযুল কাইফিয়াহ' বলে।

শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ উসাইমীন (মৃ. ১৪২১ হি.) বলেন,

نحن نعلم معاني صفات الله، ولكننا لا نعلم الكيفية. وقال في "القواعد المثلى": القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة لنا. وقال أيضا في "شرح العقيدة الواسطية": وعلى كل حال لا شك أن الذين يقولون: إن مذهب

---

৩৫২. ফাতহুল বারী, ১/৫০৮, দারুল ফিকর

৩৫৩. ফাতহুল বারী, ১/১৩৬

৩৫৪. আল-মুখালাফাতুল আকদিয়্যাহ ফী ফাতহুল বারী, পৃষ্ঠা ১৭

أهل السنة هو التفويض، أنهم أخطأوا؛ لأن مذهب أهل السنة هو: إثبات المعنى وتفويض الكيفية.

'আমরা আল্লাহ তাআলার সিফাতের বাহ্যিক অর্থ জানি, তবে 'ধরন' জানি না। আর তাফবীযপন্থীরা ভুলে নিপতিত; বরং (তাঁর মতে) আহলুস সুন্নাহর মাযহাব হলো, **অর্থ সাব্যস্ত করা এবং কাইফিয়াত বা ধরন তাফবীয করা।**'[৩৫৫]

বলাবাহুল্য, সালাফী বন্ধুদেরকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, আপনারা যে সিফাতের বাহ্যিক অর্থ জানার দাবি করেন, সেই অর্থটা কী? বা সেই অর্থটা আমাদেরকেও জানিয়ে দিন, তখন স্পষ্ট করে তারা কোনো কিছু বলতে পারে না।

বলতে না পারার কারণ হলো, উদাহরণস্বরূপ 'আল্লাহর হাত'-এর বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে অঙ্গ ও দেহের অংশ, যা থেকে তিনি চিরপবিত্র। এখন যদি তারা 'বাহ্যিক অর্থ' থেকে অঙ্গ ও দেহের অংশ উদ্দেশ্য নেয়, তাহলে আল্লাহকে অঙ্গ ও দেহবিশিষ্ট বলা আবশ্যক হয়ে পড়ে। আর যদি এটা উদ্দেশ্য না নেয়, তাহলে বলার মতো কোনো অর্থ তাদের কাছে থাকে না। ফলে তারা সিফাতের বাহ্যিক অর্থ জানার দাবি করলেও সেই অর্থটা কী, তা স্পষ্ট করে বলতে পারে না।

পক্ষান্তরে সিফাতের অর্থ বিষয়ে তাদের উক্ত দুই দাবির বিপরীতে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর মাযহাব হলো, সিফাতের তৃতীয় প্রকারটি 'মুতাশাবিহ'-এর অন্তর্ভুক্ত। তথা এর অর্থ ও জ্ঞান অস্পষ্ট হওয়ার কারণে তা অজ্ঞাত ও অজানা। ফলে এগুলোর অর্থ ও জ্ঞান তাফবীয করা। আর আল্লাহ তাআলা যেহেতু 'কাইফিয়াহ' বা ধরন থেকে মুক্ত ও পবিত্র, তাই তা 'নফী' বা নাকচ করা। পরিভাষায় এটাকে 'তাফবীযুল মা'না ওয়া নাফয়ুল কাইফিয়াহ' বলা হয়।

এখন এর স্বপক্ষে ইমামগণের বক্তব্যে 'মুতাশাবিহ' বা অস্পষ্ট, 'তাফবীযুল মা'না' বা অর্থ ও জ্ঞান ন্যস্ত করা এবং 'নাফয়ুল কাইফিয়াহ' বা ধরন থেকে মুক্ত ও পবিত্র—এ তিনটি বিষয় লক্ষ করবেন।

মুতাশাবিহ, তাফবীযুল মা'না এবং নাফয়ুল কাইফিয়াহ-এর প্রমাণ

প্রখ্যাত ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী রাহ. (মৃ. ৯১১ হি.) বলেন,

مِنَ الْمُتَشَابِهِ آيَاتُ الصِّفَاتِ.. نَحْوَ: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى... وَجُمْهُورُ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنْهُمُ السَّلَفُ وَأَهْلُ الْحَدِيثِ عَلَى الْإِيمَانِ بِهَا وَتَفْوِيضِ مَعْنَاهَا الْمُرَادِ مِنْهَا إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَلَا نُفَسِّرُهَا مَعَ تَنْزِيهِنَا لَهُ عَنْ حَقِيقَتِهَا.

'সিফাতের আয়াতসমূহ **'মুতাশাবিহ'-এর অন্তর্ভুক্ত। অধিকাংশ আহলুস সুন্নাহর**

৩৫৫. মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসায়িল, ৫/১৮৫; শারহু লুমআতুল ই'তিকাদ, পৃষ্ঠা ৯; শারহুল আকীদাতিল ওয়াসিতিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ৯৩; মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া, ৫/১৮১

মতে—যাদের মধ্যে সালাফ ও মুহাদ্দিসগণও রয়েছেন—এগুলোর প্রতি ঈমান আনা এবং এগুলো থেকে যে অর্থ উদ্দেশ্য, তা 'তাফবীয' করা তথা আল্লাহ তাআলার ওপর হাওয়ালা করা। আর আমরা এগুলোর ব্যাখ্যা করব না এবং এগুলোর হাকীকত তথা বাহ্যিক অর্থ থেকে আল্লাহ তাআলাকে পবিত্র মনে করব।'[৩৫৬]

এগুলো 'মুতাশাবিহ' হওয়া এবং সালাফের মাযহাবমতে এগুলোর অর্থ 'তাফবীয' করার কথা শায়খ মারয়ী কারমী হাম্বলী রাহ. (মৃ. ১০৩৩ হি.), সাফ্ফারীনী হাম্বলী রাহ. (মৃ. ১১৮৮ হি.), আব্দুল আজীয ফারহারী রাহ. (মৃ. ১২৩৯ হি.) ও আব্দুল আজীম যুরকানী রাহ.-ও (মৃ. ১৩৬৭ হি.) বলেছেন।[৩৫৭]

আল্লামা সাফ্ফারীনী হাম্বলী রাহ. অন্যত্র বলেন,

وَنَكِلُ مَعْنَاهُ لِلْعَزِيزِ الْحَكِيمِ... فَهَذَا اعْتِقَادُ سَائِرِ الْحَنَابِلَةِ كَجَمِيعِ السَّلَفِ، فَمَنْ عَدَلَ عَنْ هَذَا الْمَنْهَجِ الْقَوِيِّ: زَاغَ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ وَانْحَرَفَ.

'আমরা এর অর্থ আল্লাহর নিকট ন্যস্ত করি। এটা সমস্ত সালাফের মতো সকল হাম্বলীর আকীদা। কাজেই এ পথ থেকে যে বিচ্যুত হবে, সে পথভ্রষ্ট হবে।'[৩৫৮]

শায়খ মারয়ী কারমী রাহ. (মৃ. ১০৩৩ হি.) বলেন,

فمذهب السلف أسلم... فلم يكونوا يخوضون في حقيقة الذات، ولا في معاني الأسماء والصفات، ويؤمنون بمتشابه القرآن، وينكرون على من يبحث عن ذلك من فلانة وفلان.

'সালাফের মাযহাব নিরাপদ। তাঁরা আল্লাহর সত্তার হাকীকত, **তাঁর সিফাত ও নামের অর্থ বিষয়ে নিমগ্ন হননি।** তাঁরা **কুরআনের মুতাশাবিহর প্রতি ঈমান রাখতেন** এবং এ নিয়ে বিভিন্নজন থেকে অনুসন্ধানকারীদের বিরোধিতা করতেন।'

তিনি আরও বলেন,

وهذا المذهب هو الذي نقل الخطابي وغيره أنه مذهب السلف، ومنهم الأئمة الأربعة، وبهذا المذهب قال الحنفية والحنابلة وكثير من الشافعية وغيرهم، وهو إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها، مع نفي الكيفية والتشبيه عنها.

'সালাফ, চার ইমাম, হানাফী, হাম্বলী ও অনেক শাফেয়ীসহ অন্যদের মাযহাব হলো, সিফাতের আয়াত ও হাদীসসমূহকে আপন অবস্থায় রেখে দেওয়া এবং **কাইফিয়াত বা ধরন ও সাদৃশ্যকে 'নফী' বা নাকচ করা।**'[৩৫৯]

---

৩৫৬. আল-ইতকান ফী উলূমিল কুরআন, ৩/১৪
৩৫৭. দেখুন : আকাবীলুছ ছিকাত, পৃষ্ঠা ৫৫, ৬০, ৬৫; লাওয়ামিউল আনওয়ারিল বাহিয়্যা, ১/২১৯; আন-নিবরাস, পৃষ্ঠা ২৬৪; মানাহিলুল ইরফান, ২/২২৬
৩৫৮. লাওয়ামিউল আনওয়ারিল বাহিয়্যা, ১/১০৭
৩৫৯. আকাবীলুছ ছিকাত, পৃষ্ঠা ৪৬, ৬০, ৬৫

প্রিয় পাঠক! আমরা আরও একটু ইসলামের প্রাথমিক যুগের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করি। ইতিপূর্বে আমরা তাফবীযের স্বপক্ষে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী, তাহাবী রাহ.-সহ অনেক ইমামের সুস্পষ্ট বক্তব্য দেখেছি। তাই সেগুলো আর উল্লেখ করছি না; বরং অন্যান্য ইমামের মতামত উল্লেখ করছি।

আছারী ধারার প্রধান ইমাম আহমদ রাহ. (মৃ. ২৪১ হি.) বলেন,

نُؤمِن بِهَا ونُصدِّق بِهَا، وَلَا كَيفَ وَلَا معنى، وَلَا نرُدُّ مِنْهَا شَيْئًا.

'আমরা এগুলোর ওপর ঈমান রাখি এবং বিশ্বাস করি, তবে (এগুলোর) কোনো 'কাইফিয়াত' বা ধরন নেই এবং অর্থ নেই (বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়)।'[৩৬০]

ইমাম আহমদ রাহ. আরও বলেন,

أَحَادِيثُ الصِّفَاتِ تُمَرُّ كَمَا جَاءَتْ مِنْ غَيْرِ بَحْثٍ عَنْ مَعَانِيهَا.

'সিফাতের হাদীসসমূহের **অর্থ অনুসন্ধান না করেই** ইমরার করা হবে।'

সাফ্ফারীনী হাম্বলী রাহ. (মৃ. ১১৮৮ হি.) এটা নকল করার পর বলেন,

وَهَذَا مَذْهَبُ السَّلَفِ الْأَثَرِيَّةِ فَهُوَ الْحَقُّ، وَبِاللهِ التَّوفِيقُ.

'এটা আছারী সালাফের মাযহাব এবং এটাই হক।'[৩৬১]

ইমাম ইবনে কুদামাহ হাম্বলী রাহ. (মৃ. ৬২০ হি.) বলেন,

وما أَشْكَلَ مِنْ ذلك وَجَبَ إِثْباتُه لفْظا، وتَرْكُ التَّعَرُّضِ لِمعْناه، ونرُدُّ عِلْمَه إلى قائله.

'আল্লাহর যে সকল সিফাতের অর্থ অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য মনে হবে, সেগুলোর বর্ণিত শব্দ সাব্যস্ত করতে হবে এবং সেগুলোর অর্থের পেছনে পড়া যাবে না। আর সেগুলোর জ্ঞান আমরা উক্তিকারীর (আল্লাহর) ওপর ন্যস্ত করব।'

তিনি আরও চমৎকারভাবে বলেন,

لا حاجة لنا إلى علم معنى ما أراد الله تعالى من صفاته جلّ وعزّ؛ فإنه لا يُراد منها عمل، ولا يتعلق بها تكليف سوى الإيمان بها، ويمكن الإيمان بها من غير علم معناها؛ فإن الإيمان بالجهل صحيح، فإن الله تعالى أمَر بالإيمان بملائكته وكتبه ورسله وما أنزل إليهم، وإن كنا لا نعرف من ذلك إلا التسمية. ..وهي الإيمان بالألفاظ والآيات والأخبار بالمعنى الذي أراده الله تعالى، والسكوت عما لا نعلمه من معناها، وترك البحث عما لم يكلفنا الله البحث عنه من تأويلها، ولم يطلعنا على علمه، واتباع طريق الراسخين الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين حين قالوا: آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا.

৩৬০. লুমআতুল ই'তিকাদ, ইবনে কুদামাহ, পৃষ্ঠা ৬; ইবতালুত তাবীলাত, আবু ইয়ালা, পৃষ্ঠা ৪৫

৩৬১. নিহায়াতুল মুবতাদিয়ীন, ইবনে হামদান, পৃষ্ঠা ৩৩; লাওয়ামিউল আনওয়ারিল বাহিয়্যা, ১/২৪১

'আল্লাহ তাআলা তাঁর সিফাত থেকে কী অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন, তা আমাদের জানার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা, এগুলো থেকে আমল উদ্দেশ্য নয়। এতে ঈমান আনা ছাড়া অন্য কিছুর সম্পর্ক নেই। আর এগুলোর অর্থ জানা ব্যতীত ঈমান আনা সম্ভব। কারণ, অজ্ঞতার সাথে ঈমান আনা বিশুদ্ধ। যেভাবে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর ফেরেশতা, কিতাব, রাসূলগণ ও তাঁদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, এগুলোর ওপর ঈমান আনতে আদেশ করেছেন, অথচ এগুলোর নাম ছাড়া আমরা অন্য কিছু জানি না।

শব্দ, আয়াত ও হাদীসগুলোর প্রতি **ওই অর্থে ঈমান আনা, যা আল্লাহ তাআলা উদ্দেশ্য নিয়েছেন এবং এগুলোর অর্থের ব্যাপারে চুপ থাকা, যা আমরা জানি না। আর এগুলোর ব্যাখ্যা অনুসন্ধান তরক করা, যা আল্লাহ আমাদের দায়িত্ব দেননি এবং এর জ্ঞান সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেননি।** এ ক্ষেত্রে ওই সকল গভীর জ্ঞানীদের পদ্ধতির অনুসরণ করা, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা তাঁর কিতাবে প্রশংসা করেছেন এই বলে যে, "আমরা এর প্রতি ঈমান এনেছি।"'[৩৬২]

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. (মৃ. ৮৫২ হি.) লেখেন,

ومنهم من أجراه على ما ورد، مؤمنا به على طريق الإجمال، منزها الله تعالى عن الكيفية والتشبيه، وهم جمهور السلف، ونقله البيهقي وغيره عن الأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين والأوزاعي والليث وغيرهم.

'অধিকাংশ সালাফ এগুলো যেভাবে এসেছে তা বহাল রেখে সংক্ষিপ্তভাবে ঈমান আনতেন এবং **আল্লাহ তাআলাকে 'কাইফিয়াত' বা ধরন ও সাদৃশ্য থেকে পবিত্র মনে করতেন।** বায়হাকী রাহ. ও অন্যরা এটি চার ইমাম (আবু হানীফা, মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ রাহ.), সুফিয়ান সাওরী (১৬১ হি.), সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (১৯৮ হি.), হাম্মাদ বিন সালামাহ (১৬৭ হি.), হাম্মাদ বিন যায়দ (১৭৯ হি.), আওযায়ী (মৃ. ১৫৭ হি.) ও লাইস (মৃ. ১৭৫ হি.) রাহ.-সহ আরও অনেক থেকে নকল করেছেন।'[৩৬৩]

ইবনে আব্দিল বার রাহ. বলেন, ইমাম মালেক রাহ. (মৃ. ১৭৯ হি.) বলেছেন,

لِأَنَّ اللهَ كَلَّفَ عَبِيدَهُ الْإِيمَانَ بِالتَّنْزِيلِ، وَلَمْ يُكَلِّفْهُمُ الْخَوْضَ فِي التَّأْوِيلِ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ.

'আল্লাহ তাঁর বান্দাকে নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান আনতে বলেছেন, তিনি ওই ব্যাখ্যায় নিমগ্ন হওয়ার দায়িত্ব দেননি, যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।'[৩৬৪]

ইমাম বায়হাকী রাহ. (মৃ. ৪৫৮ হি.) এগুলোর ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনে কেরামের

---

৩৬২. দেখুন : লুমআতুল ই'তিকাদ, পৃষ্ঠা ৪; তাহরীমুন নযর ফী কুতুবিল কালাম, পৃষ্ঠা ৫১-৫২, ৫৪
৩৬৩. ফাতহুল বারী, ৩/৩০
৩৬৪. আত-তামহীদ, ইবনে আব্দিল বার, ৭/১৫২

কর্মপদ্ধতি কী ছিল, তার বিবরণ দিয়ে বলেন,

وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ فِيمَا وَرَدَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ مِنْ أَمْثَالِ هَذَا، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فِي تَأْوِيلِهِ.. عَلَى قِسْمَيْنِ: مِنْهُمْ مَنْ قَبِلَهُ وَآمَنَ بِهِ وَلَمْ يُؤَوِّلْهُ وَوَكَلَ عِلْمَهُ إِلَى اللهِ، وَنَفَى الْكَيْفِيَّةَ وَالتَّشْبِيهَ عَنْهُ.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَبِلَهُ وَآمَنَ بِهِ، وَحَمَلَهُ عَلَى وَجْهٍ يَصِحُّ اسْتِعْمَالُهُ فِي اللُّغَةِ وَلَا يُنَاقِضُ التَّوْحِيدَ.

'সাহাবা ও তাবিয়ীনের কেউ এর (আসমানে অবতরণ করার হাদীসটির) তাবীল-ব্যাখ্যা নিয়ে আলোচনা করেননি। আর মুহাদ্দিসগণ কুরআন-হাদীসে বর্ণিত এ-জাতীয় সিফাতের বিষয়ে দুই দলে বিভক্ত হয়েছেন :

১. একদল যারা এগুলো গ্রহণ করে ঈমান এনেছেন। আর তাবীল করেননি; বরং এগুলোর জ্ঞান আল্লাহর কাছে 'তাফবীয' বা হাওয়ালা করেছেন এবং ধরন ও সদৃশ 'নফী' বা নাকচ করেছেন।

২. আরেকদল এগুলো গ্রহণ করে ঈমান এনেছেন। আর এগুলোর এমন তাবীল করেছেন, যার প্রচলন উক্ত ভাষায় পাওয়া যায় এবং যা তাওহীদ-পরিপন্থী নয়।'[৩৬৫]

লক্ষ করুন, মুহাদ্দিসীনে কেরামের একদল এগুলোর ওপর ঈমান এনে এর জ্ঞান আল্লাহর কাছে তাফবীয করে এগুলোর ধরন ও সদৃশ 'নফী' করেছেন। কাজেই তাঁরা এগুলোর জ্ঞান দাবি করে তাফবীযুল কাইফিয়াহর প্রবক্তা ছিলেন না; বরং তাফবীযুল মা'না ও নাফয়ুল কাইফিয়াহর প্রবক্তা ছিলেন।

ইমাম খাত্তাবী রাহ. (মৃ. ৩৮৮ হি.) সুস্পষ্টভাবে বলেন,

كان مذهب السلف فيها الإيمان بها وإجراؤها على ظاهرها، ونفي الكيفية عنها.

'সালাফের মাযহাব হলো, এগুলোর ওপর ঈমান আনা ও (শব্দগুলো) বাহ্যিকভাবে রেখে দেওয়া এবং **'নাফয়ুল কাইফিয়াহ' বা ধরন নাকচ করা।**'[৩৬৬]

খাত্তাবীর উক্ত বক্তব্য ইমাম যাহাবী রাহ. (মৃ. ৭৪৮ হি.) 'কিতাবুল আরবায়ীন' গ্রন্থে নকল করে জোরালোভাবে তা সমর্থন করেছেন।[৩৬৭]

এ ছাড়া ইমাম যাহাবী রাহ. খতীব বাগদাদী রাহ. (মৃ. ৪৬৩ হি.) থেকেও একই বক্তব্য নকল করেছেন,

---

৩৬৫. আল-ই'তিকাদ, বায়হাকী, পৃষ্ঠা ১৬৪-১৬৫, তাহকীক : আনাস শারফাবী, দারুত তাকওয়া দামেশক; মুখতাছারুল ই'তিকাদিল বায়হাকী, শা'আরানী, পৃষ্ঠা ২২৪

৩৬৬. আ'লামুল হাদীস, ১/৬৩৭

৩৬৭. দ্রষ্টব্য : কিতাবুল আরবায়ীন ফী সিফাতি রাব্বিল আলামীন, পৃষ্ঠা ৯৩

مذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها.[৩৬৮]

ইমামুল হারামাইন জুয়াইনী রাহ. (মৃ. ৪৭৮ হি.) বলেন,

وَذَهَبَ أَئِمَّةُ السَّلَفِ إِلَى الِانْكِفَافِ عَنِ التَّأْوِيلِ، وَإِجْرَاءِ الظَّوَاهِرِ عَلَى مَوَارِدِهَا، وَتَفْوِيضِ مَعَانِيهَا إِلَى اللهِ تَعَالَى.

'সালাফের ইমামগণের মাযহাব হলো, এগুলোর ব্যাখ্যা না করা ও বাহ্যিকভাবে রেখে দেওয়া এবং এগুলোর অর্থ আল্লাহ তাআলার ওপর তাফবীয করা।'[৩৬৯]

মুহাদ্দিস ইমাম বাগাভী রাহ. (মৃ. ৫১৬ হি.) বলেন,

وَعَلَى هَذَا مَضَى سَلَفُ الْأُمَّةِ وَعُلَمَاءُ السُّنَّةِ، تَلَقَّوْهَا جَمِيعًا بِالْإِيمَانِ وَالْقَبُولِ، وَتَجَنَّبُوا فِيهَا عَنِ التَّمْثِيلِ وَالتَّأْوِيلِ، وَوَكَلُوا الْعِلْمَ فِيهَا إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، كَمَا أَخْبَرَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنِ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ...

'এটাই সালাফ ও আহলুস সুন্নাহর উলামার পদ্ধতি। তাঁরা সকলেই এগুলোর প্রতি ঈমান এনেছেন এবং কবুল করেছেন। তাঁরা এতে সাদৃশ্য ও ব্যাখ্যা থেকে দূরে থেকেছেন এবং **এগুলোর জ্ঞানকে আল্লাহর দিকে ন্যস্ত করেছেন।** যেমনটা আল্লাহ তাআলা পরিপক্ক জ্ঞানীদের সম্পর্কে বলেছেন, "পরিপক্ক জ্ঞানীরা বলে, আমরা এর ওপর ঈমান এনেছি এবং এ সবকিছুই আমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে।"'[৩৭০]

শায়খ ইসমাইল সাবূনী রাহ.-ও (মৃ. ৪৪৯ হি.) একই কথা বলেছেন,

ويكلون علمه إلى الله تعالى، ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، كما أخبر الله عن الراسخين...

'তাঁরা (মুহাদ্দিসগণ) **এর জ্ঞান আল্লাহর দিকে ন্যস্ত করেন। এবং স্বীকার করেন যে, এর ব্যাখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।** যেমনটা আল্লাহ তাআলা পরিপক্ক জ্ঞানীদের সম্পর্কে বলেছেন।'[৩৭১]

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম ইবনুস সালাহ রাহ. (মৃ. ৬৪৩ হি.) বলেন,

ينطق بها كما جاءت واكلا علمها إلى من أحاط بها وبكل شيء علما، هذا سبيل السلامة ومنهج الاستقامة.

'**এগুলোর জ্ঞানকে আল্লাহর দিকে ন্যস্ত করা।** এটাই নিরাপদ।'[৩৭২]

---

৩৬৮. দ্রষ্টব্য : তাযকিরাতুল হুফফায : ৩/২২৫
৩৬৯. আল-আকীদাতুন নিযামিয়্যাহ, জুয়াইনী, পৃষ্ঠা ৩২; ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার, ১৩/৪০৭
৩৭০. শারহুস সুন্নাহ, বাগাভী ১/১৭০; সূরা আলে ইমরান (৩) : ৭
৩৭১. আকীদাতুস সালাফ ওয়া আসহাবিল হাদীস, পৃষ্ঠা ৩৯
৩৭২. ফাতাওয়া ইবনিস সালাহ, পৃষ্ঠা ১১৬

আছারী ধারার প্রখ্যাত ইমাম যাহাবী (মৃ. ৭৪৮ হি.) বলেন,

مَنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ تَصْدِيقا لِكِتَابِ اللهِ وَلأَحَادِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَآمَنَ بِهِ، مُفَوِّضا مَعْنَاهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَلَمْ يَخُضْ فِي التَّأْوِيْلِ وَلاَ عَمَّقَ: فَهُوَ الْمُسْلِمُ الْمُتَّبِعُ.

'যে ব্যক্তি কুরআন ও হাদীসকে সত্যরূপে বিশ্বাস ও স্বীকার করে **এর অর্থকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে তাফবীয বা হাওয়ালা করে** এবং তাবীলে লিপ্ত হয় না ও গভীরে প্রবেশ করে না, সে-ই একনিষ্ঠ মুসলিম।'

কিছুদূর এগিয়ে বলেন,

وَأَمَّا السَّلَفُ: فَمَا خَاضُوا فِي التَّأْوِيْلِ، بَلْ آمَنُوا وَكَفُّوا، وَفَوَّضُوا عِلْمَ ذَلِكَ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِه.

'সালাফ তাবীলে লিপ্ত হননি; বরং তাঁরা (সিফাতের শব্দের ওপর) ঈমান এনেছেন এবং (অর্থ নির্ধারণ করা থেকে) বিরত থেকেছেন। আর **এর জ্ঞান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে তাফবীয করেছেন।**'[৩৭৩]

আল্লামা ইবনুল মুনায়্যির মালেকী রাহ. (মৃ. ৬৮৩ হি.) বলেন,

وَلِأَهْلِ الْكَلَامِ فِي هَذِهِ الصِّفَاتِ كَالْعَيْنِ وَالْوَجْهِ وَالْيَدِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ... وَالثَّالِثُ: إِمْرَارُهَا عَلَى مَا جَاءَتْ مُفَوَّضًا مَعْنَاهَا إِلَى اللهِ تَعَالَى.

'এই (তৃতীয় প্রকার) সিফাত বিষয়ে কালামপন্থীদের তিনটি মত রয়েছে। তন্মধ্যে তৃতীয় মতটি হলো, **এগুলোর অর্থকে আল্লাহ তাআলার কাছে তাফবীয বা হাওয়ালা করে,** এগুলো যেভাবে এসেছে সেভাবে ইমরার করা।'[৩৭৪]

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ইমাম ইবনে রজব হাম্বলী রাহ. (মৃ. ৭৯৫ হি.) বলেন,

اتفق السلف الصالح على إمرار هذه النصوص كما جاءت من غير زيادة ولا نقص، وما أشكل فهمه منها، وقصر العقل عن إدراكه: وكل إلى عالمه.

'সালফে সালেহীন এই সিফাতগুলো কোনো বেশ-কম ছাড়া যেভাবে এসেছে, সেভাবে ইমরার করার বিষয়ে একমত। আর যা বোঝা অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য মনে হবে এবং আকল বুঝতে অক্ষম হবে, সেগুলো এর জ্ঞানীর কাছে ন্যস্ত করা হবে।'[৩৭৫]

ইমাম যারকাশী শাফেয়ী রাহ. (মৃ. ৭৯৪ হি.) লেখেন,

صِفَات الْبَارِي الْمُوهِمَة، وَقَدْ اخْتَلَفُوا فِيهِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَذَاهِب: أَحَدُهَا: أَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِلتَّأْوِيلِ فِيهَا، بَلْ تَجْرِي عَلَى ظَاهِرِهَا وَلَا يُؤَوَّلُ شَيْءٌ مِنْهَا، وَهُمْ الْمُشَبِّهَةُ. وَالثَّانِي: أَنَّ لَهَا تَأْوِيلًا، وَلَكِنَّا نُمْسِك عَنْهُ

৩৭৩. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৪/৩৭৩, ৩৭৬
৩৭৪. ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার, ১৩/৩৯০
৩৭৫. ফাতহুল বারী, ইবনে রজব হাম্বলী, ৩/১১৭-১১৮

مَعَ تَنْزِيهِ اعْتِقَادِنَا عَنْ التَّشْبِيهِ وَالتَّعْطِيلِ، لِقَوْلِهِ تعالى: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلا اللهُ}، قَالَ ابْنُ بَرْهَان: وَهَذَا قَوْلُ السَّلَفِ.

'আল্লাহর এমন সিফাত, যা (মাখলূকের সাথে সদৃশের) ধারণা সৃষ্টিকারী (তথা তৃতীয় প্রকার সিফাত)। এ বিষয়ে তিন মাযহাব : প্রথমটি হলো, এতে তাবীলের কোনো সুযোগ নেই; বরং এগুলো বাহ্যিক অর্থের ওপর বহাল থাকবে এবং কোনো তাবীল করা হবে না। এটা মুশাব্বিহা তথা সাদৃশ্যবাদীদের মত।

দ্বিতীয় মাযহাবের বক্তব্য হচ্ছে, আমাদের আকীদা হলো, আল্লাহ্ সদৃশ ও গুণহীন থেকে পবিত্র এবং **এগুলোর ব্যাখ্যা রয়েছে, তবে আমরা তা থেকে বিরত থাকব। কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "এর ব্যাখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না।"** ইবনে বারহান রাহ. (মৃ. ৫১৮ হি.) বলেন, **"এটি সালাফের বক্তব্য।"**'[৩৭৬]

হুবহু একই কথা কাযী শাওকানী রাহ.-ও (মৃ. ১২৫০ হি.) বলেছেন। এটা বলার পর তিনি এর ওপর মন্তব্য করে লেখেন,

قُلْتُ: وَهَذَا هُوَ الطَّرِيقَةُ الْوَاضِحَةُ، وَالْمَنْهَجُ الْمَصْحُوبُ بِالسَّلَامَةِ عَنِ الْوُقُوعِ فِي مهَاوِي التَّأْوِيلِ، لِمَا لَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ، وَكَفَى بِالسَّلَفِ الصَّالِحِ قُدْوَةً لِمَنْ أَرَادَ الِاقْتِدَاءَ، وَأُسْوَةً لِمَنْ أَحَبَّ التَّأَسِّيَ...

'এটাই সুস্পষ্ট পথ। তাবীলের গর্তে পতিত হওয়া থেকে নিরাপদ মানহাজ। কেননা, **এর ব্যাখ্যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না**। অনুসরণের জন্য সালাফ যথেষ্ট।'[৩৭৭]

'হাশিয়াতুল জামালে' আল্লামা সুলাইমান শাফেয়ী রাহ. (মৃ. ১২০৪ হি.) বলেন,

هذه طريقة السلف الذين يفوِّضون علم المتشابه إلى الله بعد صرفه عن ظاهره.

'এটি সালাফের পদ্ধতি, তাঁরা 'মুতাশাবিহ'কে তার বাহ্যিক অর্থ থেকে ফেরানোর পর এর জ্ঞান আল্লাহ তাআলার কাছে তাফবীয করে।'[৩৭৮]

কাযী সানাউল্লাহ পানিপথী হানাফী রাহ. (মৃ. ১২২৫ হি.) বলেন,

وكلام السلف الصالح يأبى عن سبيل التأويل، بل المختار عندهم: الايمان بتلك الآيات وتفويض علمه إلى الله تعالى، والتحاشى عن البحث عنه.

'সালাফের বক্তব্য তাবীলের পদ্ধতিকে অস্বীকার করে; বরং তাঁদের নিকট পছন্দনীয় হলো, সিফাতের আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনা এবং **এর জ্ঞান আল্লাহ তাআলার**

---

৩৭৬. আল-বাহরুল মুহীত ফী উসূলিল ফিকহ, ৩/২৮; আল-বুরহান ফী উলূমিল কুরআন, ২/৭৮
৩৭৭. ইরশাদুল ফুহূল, ২/৩২-৩৩
৩৭৮. আল-ফুতূহাতুল ইলাহিয়্যাহ, ৩/৪৮, সূরা আ'রাফের ৫৪ নং আয়াতের তাফসীর

কাছে তাফবীয করা এবং এ বিষয়ে অনুসন্ধান থেকে বিরত থাকা।'[৩৭৯]

প্রখ্যাত মুফাসসির মাহমুদ আলূসী হানাফী রাহ. (মৃ. ১২৭০ হি.) লেখেন,

وأكثر السلف الصالح جعلوا ذلك من المتشابه الذي لا يحيطون به علما، وفوضوا علمه إلى الله تعالى.

وقال أيضا: وأنت تعلم أن المشهور من مذهب السلف في مثل ذلك: تفويض المراد منه إلى الله تعالى.

'অধিকাংশ সালাফ এটাকে **'মুতাশাবিহ'-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং** তাঁরা **এর জ্ঞান আল্লাহ তাআলার কাছে তাফবীয করেছেন।'** 'এ বিষয়ে সালাফের প্রসিদ্ধ মাযহাব হলো, **এর থেকে যা উদ্দেশ্য, তা আল্লাহ তাআলার কাছে তাফবীয করা।'**[৩৮০]

শায়খুল ইসলাম শাব্বীর আহমদ উসমানী দেওবন্দী রাহ. (মৃ. ১৩৬৯ হি.) লেখেন,

«یمین» وغیرہ الفاظ متشابہات میں سے ہیں جن پر بلا کیف ایمان رکھنا واجب ہے۔ بعض احادیث میں ہے «فكلتا يديه يمين» (اس کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں) اس سے تجسم، تحیز اور جہت وغیرہ کی نفی ہوئی ہے۔

'(তাঁর) ডান হাত প্রভৃতি শব্দ 'মুতাশাবিহ'-এর অন্তর্ভুক্ত, কোনো কাইফ বা ধরন ছাড়াই এর প্রতি ঈমান রাখা ওয়াজিব। কোনো কোনো হাদীসে (মুসলিম হা. ১৮২৭) আছে, "তাঁর উভয় হাত ডান।" এ দ্বারা তাঁর থেকে দেহ, সীমা ও দিক ইত্যাদি নাকচ হয়ে যায়। (অর্থাৎ তিনি এগুলো থেকে পবিত্র বোঝা যায়।)'[৩৮১]

সারকথা, 'তাফবীয' হলো তিন জিনিসের নাম :

১. তৃতীয় প্রকারের সিফাতের শব্দগুলো যেভাবে এসেছে, কোনো বেশ-কম ছাড়া হুবহু সে শব্দগুলো বিশ্বাস করে পাঠ করা ও চুপ থাকা।

২. এ-জাতীয় শব্দগুলো থেকে আভিধানিক ও বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং এ ধরনের অর্থ থেকে আল্লাহ তাআলা চিরপবিত্র ও বহু ঊর্ধ্বে—এমন আকীদা রাখা।

৩. এ-জাতীয় শব্দগুলো থেকে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল যে অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন, সেটার ওপর ঈমান আনা। কেননা, আল্লাহ তাআলার শান উপযোগী এগুলোর অর্থ রয়েছে, যে সম্পর্কে আমরা জ্ঞাত নই; বরং তিনিই অবগত। কাজেই এগুলোর সংগত অর্থ সম্পর্কে তিনিই জানেন—এমন বিশ্বাস রেখে সেগুলোর বিষয় তাঁর ওপর ন্যস্ত ও হাওয়ালা করা।

---

৩৭৯. তাফসীরে মুযহিরী, ৫/৬, সূরা ইউনুসের তিন নং আয়াতের তাফসীর

৩৮০. রূহুল মাআনী, ২/১১, সূরা বাকারার ২৫৫ নং আয়াতের তাফসীর ও ৪/৩৫, সূরা আ'রাফের ৭ নং আয়াত

৩৮১. দ্র. তাফসীরে উসমানী পৃ. ৬০৩, সূরা যুমারের ৬৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

তবে এ শব্দগুলোর অর্থ জানা না থাকলেও এগুলোর আগের-পরের বাক্যগুলোসহ দেখলে আয়াত ও হাদীস থেকে একটা উদ্দেশ্য ও নির্দেশনা এবং আমাদের করণীয় বোঝা যায়। সুতরাং এসব নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত না হয়ে এতে যে আমলের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, তাতে মনোযোগী হওয়া চাই।

প্রখ্যাত ইমাম ইবনে আব্দিল বার রাহ. (মৃ. ৪৬৩ হি.) বলেন,

وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالسُّنَنِ وَالْفِقْهِ وَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ عَنِ الْكَفِّ عَنِ الْجِدَالِ وَالْمُنَاظَرَةِ فِيمَا سَبِيلُهُمُ اعْتِقَادُهُ بِالْأَفْئِدَةِ مِمَّا لَيْسَ تَحْتَهُ عَمَلٌ، وَعَلَى الْإِيمَانِ بِمُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ وَالتَّسْلِيمِ لَهُ، وَلِمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي أَحَادِيثَ الصِّفَاتِ كُلِّهَا، وَمَا كَانَ فِي مَعْنَاهَا، وَإِنَّمَا يُبِيحُونَ الْمُنَاظَرَةَ فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَمَا كَانَ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا... فروى بسنده عن مَالِك: إِنَّ أَهْلَ بَلَدِنَا يَكْرَهُونَ الْجِدَالَ وَالْكَلَامَ وَالْبَحْثَ وَالنَّظَرَ إِلَّا فِيمَا تَحْتَهُ عَمَلٌ، وَأَمَّا مَا سَبِيلُهُ الْإِيمَانُ بِهِ وَاعْتِقَادُهُ وَالتَّسْلِيمُ لَهُ: فَلَا يَرَوْنَ فِيهِ جِدَالًا وَلَا مُنَاظَرَةً.

'আহলুস সুন্নাহর মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ এ বিষয়ে একমত যে, আমল ব্যতীত যে সকল বিষয়ে শুধু আকীদার কথা রয়েছে, সে সমস্ত বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক থেকে বিরত থাকা এবং কুরআনের মুতাশাবিহ ও সিফাতের সকল হাদীসের প্রতি ঈমান আনা ও মেনে নেওয়া। তাঁরা শুধু হালাল-হারাম ও যে সকল ক্ষেত্রে আমল করা ওয়াজিব, তাতে বিতর্ক করা বৈধ মনে করতেন।'

ইমাম মালেক রাহ. (মৃ. ১৭৯ হি.) বলেছেন, 'আমাদের শহরবাসী (মদীনাবাসী) আমলের বিষয় ছাড়া অন্য বিষয়ে বিতর্ক, আলোচনা ও বাহাস অপছন্দ করতেন। তাঁরা ঈমান আনা, আকীদা রাখা ও মেনে নেওয়ার যে সকল বিষয় রয়েছে, তাতে তর্ক-বিতর্ক করার পক্ষে মত দিতেন না।'[৩৮২]

জনসাধারণের সামনে মুতাশাবিহর আলোচনা অনুচিত

সহীহ বুখারীতে এসেছে, হযরত আলী রাযি. বলেন,

حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ.

'লোকদের সাথে তাদের বোধ-উপলব্ধি অনুপাতে কথা বলো।'

হফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. (মৃ. ৮৫২ হি.) ও আল্লামা আইনী রাহ. (মৃ. ৮৫৫ হি.) এর ব্যাখ্যায় বলেন,

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُتَشَابِهَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يذكر عِنْد الْعَامَّة.

'এতে এ কথার দলীল রয়েছে যে, 'মুতাশাবিহ' জনসাধারণের সামনে আলোচনা

---

৩৮২. আল-ইসতিযকার, ৮/১১৮

করা অনুচিত।’

এরপর উভয়ে বলেন, সহীহ মুসলিমে আছে, ইবনে মাসউদ রাযি. বলেছেন,

مَا أَنْتَ مُحَدِّثًا قَوْمًا حَدِيثًا لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُهُمْ، إِلَّا كَانَ لِبَعْضِهِمْ فِتْنَةً.

‘তুমি যদি লোকদের কাছে এমন হাদীস বর্ণনা করো, যা তাদের বুঝের ধারণক্ষমতার বাইরে, তাহলে সেটা কতকের জন্য ফিতনার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।’[৩৮৩]

এ জন্য খতীব বাগদাদী রাহ. (মৃ. ৪৬৩ হি.) বলেন, ‘মুহাদ্দিস সাহেব জনসাধারণের কাছে এমন সব হাদীস বর্ণনা থেকে বিরত থাকবেন, যা তাদের জ্ঞান-বোধের ঊর্ধ্বে।... যেমন : সিফাতের হাদীস, যার বাহ্যিক অর্থ দেহবাদ ও সাদৃশ্যবাদ এবং আল্লাহর জন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাব্যস্ত করার দিকে নিয়ে যায়।’[৩৮৪]

একই কথা নকল করেছেন এবং বলেছেন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হাফেজ যাইনুদ্দীন ইরাকী রাহ. (মৃ. ৮০৬ হি.) ‘শারহুত তাবছিরা ওয়াত তাযকিরা’ কিতাবে (২/৩৪), ইমাম সাখাবী রাহ. (মৃ. ৯০২ হি.) ‘ফাতহুল মুগীসে’ (৩/২৬৭) ও সুয়ূতী রাহ. (মৃ. ৯১১ হি.) ‘তাদরীবুর রাবী’ (২/১৩৮) গ্রন্থে।

বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ

তাফবীযের আলোচনার শুরুতে ইমাম মুহাম্মাদের বক্তব্যের একটি অংশ ছিল,

آمَنُوا بِمَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، ثُمَّ سَكَتُوا.

‘তাঁরা কুরআন ও সুন্নাহয় যা কিছু আছে, সেগুলোর ওপর ঈমান এনেছেন, অতঃপর চুপ থেকেছেন।’

এখানের آمَنُوا (তাঁরা ঈমান এনেছেন) শব্দটিকে ইবনে তাইমিয়া রাহ. أَفْتَوْا (তাঁরা ফতোয়া দিয়েছেন) শব্দে উল্লেখ করেছেন তাঁর ‘আল-ফাতাওয়াল কুবরা’ (৬/৩৩৫) গ্রন্থে। অতঃপর এর ওপর ভিত্তি করে তিনি লিখেছেন,

فَقَدْ ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْإِجْمَاعَ عَلَى وُجُوبِ الْإِفْتَاءِ فِي بَابِ الصِّفَاتِ بِمَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ... فَمَنْ قَالَ: لَا يُتَعَرَّضُ لِأَحَادِيثِ الصِّفَاتِ وَآيَاتِهَا عِنْدَ الْعَوَامِّ، وَلَا يُكْتَبُ بِهَا إِلَى الْبِلَادِ، وَلَا فِي الْفَتَاوَى الْمُتَعَلِّقَةِ بِهَا: فَقَدْ خَالَفَ هَذَا الْإِجْمَاعَ.

‘মুহাম্মাদ বিন হাসান রাহ. কুরআন-সুন্নাহয় যে সকল সিফাত আছে, সেগুলোর ব্যাপারে ফতোয়া দেওয়া ওয়াজিব হওয়ার ওপর ইজমা’ উল্লেখ করেছেন। কাজেই যে ব্যক্তি সিফাতের আয়াত ও হাদীস জনসাধারণের সামনে বলা থেকে বিরত থাকার

---

৩৮৩. ফাতহুল বারী, ১/২২৫; উমদাতুল কারী, ২/২০৫

৩৮৪. আল-জামি’ লি-আখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামি’, ২/১০৭

কথা বলেছেন,... তিনি এ ইজমা'র বিরোধিতা করেছেন।'

অথচ বাস্তবতা হলো, এটি آمنُوا শব্দেই লালকায়ী রাহ. (মৃ. ৪১৮ হি.) থেকে নিজ সনদে ইবনে কুদামাহ রাহ. (মৃ. ৬২০ হি.) বর্ণনা করেছেন। অনুরূপ ইমাম যাহাবী রাহ. (মৃ. ৭৪৮ হি.) 'আল-আরশ' কিতাবে ও ইবনুল কায়্যিম রাহ. (মৃ. ৭৫১ হি.) 'ইজতিমাউল জুয়ূশিল ইসলামিয়া' গ্রন্থে এভাবেই উল্লেখ করেছেন। এমনকি খোদ ইবনে তাইমিয়া রাহ.-ও 'মাজমুউল ফাতাওয়া'তে এভাবেই এনে তা মুহাম্মাদ বিন হাসান রাহ. থেকে প্রমাণিত বলেছেন।[৩৮৫]

তা ছাড়া এর পরের বাক্য হলো, 'অতঃপর চুপ থেকেছেন' অর্থাৎ 'সেগুলোর ওপর ঈমান এনেছেন, অতঃপর চুপ থেকেছেন' কথাটি যথাযথ হয়। কিন্তু 'ফতোয়া দিয়েছেন, অতঃপর চুপ থেকেছেন' কথাটি যথাযথ হয় না। কেননা, ফতোয়া দিয়ে চুপ থাকার কী অর্থ?

সুতরাং এতেও বোঝা যায়, এটি آمنُوا (ঈমান এনেছেন) শব্দেই হবে।

আর ইবনে তাইমিয়া রাহ.-এর বর্ণনাকৃত শব্দটি যেহেতু সঠিক নয়, কাজেই উক্ত শব্দের ওপর ভিত্তি করে তিনি যে বলেছেন, "যে ব্যক্তি সিফাতের আয়াত ও হাদীস জনসাধারণের সামনে বলা থেকে বিরত থাকার কথা বলেছেন, তিনি এ ইজমা'র বিরোধিতা করেছেন"—কথাটির ভিত্তি এবং গ্রহণযোগ্যতা থাকল না।

তাবীল সম্পর্কে আলোচনা

আল্লাহ তাআলার তৃতীয় প্রকার সিফাত-গুণাবলি তথা আল্লাহর হাত ও চেহারা-সূরত এবং আসমানে অবতরণ ও আরশের ওপর ওঠা ইত্যাদির ক্ষেত্রে হুকুম হলো, 'তাফবীয' বা 'তাবীল'। 'তাফবীয' সম্পর্কে জানার পর আমরা এখন 'তাবীল' সম্পর্কে আলোচনা করব।

তাবীলের অর্থ হলো ব্যাখ্যা করা, বিশ্লেষণ করা।

জেনে রাখা দরকার, তাবীলের ক্ষেত্রেও প্রথমে সিফাতের প্রতি ঈমান এনে তানযীহের আকীদা তথা সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ও সদৃশ থেকে আল্লাহ তাআলা পবিত্র থাকার বিশ্বাস রাখতে হবে। এরপর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা।

ইমাম ইবনে দাকীকুল ঈদ রাহ. (মৃ. ৭০২ হি.) বলেন,

الْمُنَزِّهُونَ لله تعالى/ أَهْلُ التَّنْزِيهِ فِي مِثْلِ هَذَا عَلَى قَوْلَيْنِ: إِمَّا سَاكِتٌ عَنِ التَّأْوِيلِ، وَإِمَّا مُؤَوِّلٌ.

'এ-জাতীয় সিফাতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে তানযীহের আকীদা

---

৩৮৫. দেখুন : যাম্মুত তাবীল, ইবনে কুদামাহ, পৃষ্ঠা ১৪; আল-আরশ, যাহাবী ২/২৫০; মাজমুউল ফাতাওয়া, ৪/৫; ইজতিমাউল জুয়ূশিল ইসলামিয়া, ২/২২৩; মুখতাছারুল উলূ, তাহকীক, আলবানী, পৃষ্ঠা ১৫৯

লালনকারীরা দুটি পদ্ধতি অবলম্বন করে। হয় তাবীল না করে চুপ থাকে (তথা তাফবীয করে), অথবা তাবীল করে।'[৩৮৬]

তাবীলের দুটি ধরন

তাবীলের ধরনদ্বয় আলোচনার আগে একটু স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, এই তৃতীয় প্রকার সিফাত-গুণাবলির ভাগটির দ্বিতীয় প্রকার ছিল 'নাকসে মাহায' তথা যেগুলোর আভিধানিক ও বাহ্যিক অর্থ আল্লাহ তাআলার মাঝে কোনো ত্রুটি বা অসম্মান বোঝাবে কিংবা আল্লাহ তাআলার শানে অপ্রযোজ্য হবে। যেমন : কুরআনে এসেছে, 'আল্লাহ তাআলা সর্বোত্তম চক্রান্তকারী।' সহীহ বুখারীর হাদীসে আছে, 'আমি বান্দার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শোনে; আমি বান্দার চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে।'

তো এই 'নাকসে মাহায'-এর হুকুম জেনেছিলাম যে, এর আভিধানিক অর্থ গ্রহণ করা যাবে না; বরং অবশ্যই এর তাবীল ও ব্যাখ্যা করতে হবে।

আর এই নাকসে মাহাযের তাবীল ব্যতীত আরও দুই ধরনের তাবীল রয়েছে :

১. **'তাবীলে কারীব'** তথা আরবী ভাষার আলাপ ও ব্যবহার থেকেই স্বাভাবিকভাবে যে তাবীল ও ব্যাখ্যা বুঝে আসে। যেমন :

কুরআন মাজীদে সূরা মূলকের প্রথম আয়াতে এসেছে,

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ

'বরকতময় সেই সত্তা, যাঁর 'হাতে' (সর্বময়) রাজত্ব।'

আরবী ভাষার সাথে যাদের মোটামুটি পরিচিতি আছে, তারা উক্ত আয়াত থেকে স্বাভাবিকভাবে এই তাবীল ও ব্যাখ্যা বুঝে থাকেন যে, আয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে 'সমস্ত রাজত্ব ও কর্তৃত্ব আল্লাহ তাআলার এবং গোটা বিশ্বে একমাত্র তাঁরই আধিপত্য চলে।' এই আয়াতে কখনো আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য এটা বোঝানো নয় যে, 'হে বান্দা, জেনে রাখো, আমার 'হাত' আছে...।'

আমাদের বাংলা ভাষায়ও এটা ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়, 'এলাকার রাজত্ব এখন আপনার হাতে।' এই কথার উদ্দেশ্য মোটেও এটা নয় যে, 'আপনার হাত আছে' তা বোঝানো; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, পুরো এলাকার রাজত্ব ও কর্তৃত্ব এখন আপনার 'হাতে'।

---

৩৮৬. ইহকামুল আহকাম, ১/৩৫৩; আরও দেখুন, মিরকাতুল মাফাতীহ, মোল্লা আলী কারী, ১/৭৬

وقد نقله الحافظ في "فتح الباري» ٥٣١/٢، ٣٩٩/١٣، والعيني في «عمدة القاري» ٧١/٧، والسيوطي في «حاشية النسائي ١٣٣/٣»، والزرقاني في «شرح الموطا» ٦٣٢/١.

এভাবে কুরআনে কারীমের সূরা দাহরের ৯ নং আয়াত হলো,

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ

'আমরা আল্লাহর চেহারার জন্য তোমাদের আহার করাই।'

অথচ এ আয়াতে স্বাভাবিকভাবে এই তাবীল ও ব্যাখ্যা বোঝা যায়, 'আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমরা তোমাদের আহার করাই।' কেউ এখান থেকে 'আল্লাহর চেহারা' বুঝবে না।

সূরা যুমারের ৫৬ নং আয়াতে এসেছে,

يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ

'আল্লাহর হকের ব্যাপারে আমি ক্রটি করেছি, তার ওপর আফসোস!'

এখানে 'আল্লাহর হক'-এর আরবী হচ্ছে 'জানবিল্লাহ', যার বাহ্যিক অর্থ হলো, 'আল্লাহর পার্শ্ব'। কিন্তু আরবী জানা কোনো ব্যক্তি এখান থেকে তা বুঝবে না। কারণ, আরবী ভাষায় এটা 'কারও হক' বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

সূরা হুদের ৩৭ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا

'(হে নূহ,) আমার চোখসমূহের সামনে নৌকা তৈরি করো।'

কেউ কেউ এখান থেকে 'আল্লাহর চোখ' প্রমাণের চেষ্টা করেছে। অথচ তাফসীরে তাবারী ও তাফসীরে ইবনে কাসীরসহ তাফসীরের কিতাবসমূহে এর অর্থ করা হয়েছে, 'আমার সম্মুখে বা তত্ত্বাবধানে নৌকা তৈরি করো।' আর আয়াত থেকে স্বাভাবিকভাবে এই তাবীল ও ব্যাখ্যা বুঝে আসে।

ইমাম ইবনে দাকীকুল ঈদ রাহ. (মৃ. ৭০২ হি.) বলেন,

وما كان معناه من صفة الألفاظ ظاهرا مفهوما في تخاطب العرب: قلنا به من غير توقف كما في قوله تعالى: يَا حَسْرَتَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ، فنحمله على حق الله وما يجب له أو على قريب من هذا المعنى، ولا نتوقف فيه. وكذلك قوله عليه السلام: «قَلْبُ ابْنِ آدَمَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ» نحمله على أن إرادات القلب واعتقاداته متصرفة بقدرة الله تعالى وما يوقعه في القلوب، وهكذا سائر الأمور الظاهرة المعنى المفهوم عند سامعيها ممن يفهم كلام العرب.

'(সিফাতের শব্দের) তাবীল যদি আরবী ভাষা থেকে স্পষ্ট বোধগম্য হয়, তাহলে আমরা কোনো দ্বিধা ছাড়া সেটিই গ্রহণ করব। যেমন : কুরআনে এসেছে, 'আমি আল্লাহর হকের ব্যাপারে যে ক্রটি করেছি, তার ওপর আফসোস!' এখানে 'আল্লাহর

পার্শ্ব' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহর হক বা এর কাছাকাছি অর্থ। অনুরূপভাবে "আদমসন্তানের অন্তর আল্লাহর দুই আঙুলের মাঝে"—এ হাদীস থেকে উদ্দেশ্য হলো, বান্দার অন্তরের ইচ্ছা আল্লাহর কুদরত ও ইচ্ছার অধীন। এভাবে অন্যান্য স্পষ্ট বোধগম্য অর্থ, যা আরবী জানা ব্যক্তিরা বুঝে থাকে।'

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. (মৃ. ৮৫২ হি.) এটা নকল করে বলেন,

وَهُوَ تَفْصِيلٌ بَالِغٌ، قَلَّ مَنْ تَيَقَّظَ لَهُ.

'এটি চমৎকার বিশ্লেষণ, যার প্রতি স্বল্পসংখ্যক লোক মনোযোগী হয়।'[৩৮৭]

সুতরাং বোঝা গেল, আরবী ভাষার আলাপ ও ব্যবহার থেকেই স্বাভাবিকভাবে কিছু শব্দের তাবীল ও ব্যাখ্যা বুঝে আসে। আর এটাকে 'তাবীলে কারীব' বলা হয়। এই তাবীলকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। কাজেই 'নাকসে মাহায'-এর তাবীল অপরিহার্য এবং 'তাবীলে কারীব' অনস্বীকার্য।

২. **'তাবীলে বায়ীদ'** তথা আরবী ভাষার ব্যবহার থেকে স্বাভাবিকভাবে যে তাবীল ও ব্যাখ্যা বুঝে আসে না। যেমন : 'ইস্তিওয়া' শব্দের তাবীল 'ইস্তাওলা' দ্বারা করা অথবা 'আল্লাহর নুযূল/অবতরণ' থেকে 'তাঁর রহমত বর্ষণ' বোঝা।

উল্লেখ্য, এটা অসম্ভব নয় যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাবীলটি 'তাবীলে কারীব' বা 'তাবীলে বায়ীদ' প্রকারদ্বয়ের কোন প্রকারে অন্তর্ভুক্ত হবে, সেটা নিয়ে দ্বিধা বা মতভেদ দেখা দিতে পারে।

'তাবীলে বায়ীদ'-এর হুকুম

যেহেতু 'নাকসে মাহায'-এর তাবীল অপরিহার্য এবং 'তাবীলে কারীব' অনস্বীকার্য, তাই এ নিয়ে আর কিছু বলার প্রয়োজন নেই। এখন জানা দরকার, 'তাবীলে বায়ীদ' সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত?

সহীহ বুখারীর হাদীসে এসেছে, 'আল্লাহ তাআলা হাসেন...।'

ইমাম বুখারী রাহ. (মৃ. ২৫৬ হি.) আল্লাহ তাআলার হাসার তাবীল করে বলেন,

معنى الضحك: الرحمة.

'হাসার অর্থ হলো, দয়া ও অনুগ্রহ।'

ইমাম খাত্তাবী রাহ. (মৃ. ৩৮৮ হি.) ইমাম বুখারীর তাবীল উল্লেখ করে বলেন,

وتأويله على معنى الرضا أقرب وأشبه.

---

৩৮৭. দেখুন, নাজমুল মুহতাদী ওয়া রাজমুল মু'তাদী, ইবনুল মুআল্লিম কুরাশী, ২/২৫৯-৬০; ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার, ১৩/৩৮৩

'হাসার তাবীল সন্তুষ্টির অর্থে করা নিকটতম ও অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।'[৩৮৮]

ইমাম বুখারী ও ইমাম খাত্তাবী উভয়ের এই তাবীল হলো 'তাবীলে বায়ীদ'।

ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. (মৃ. ৮৫২ হি.) উভয়ের এই 'তাবীলে বায়ীদ' নকল করার পর বলেন, ইমাম ইবনুল জাওযী রাহ. (মৃ. ৫৯৭ হি.) বলেছেন,

أَكْثَرُ السَّلَفِ يَمْتَنِعُونَ مِنْ تَأْوِيلِ مِثْلِ هَذَا.

'অধিকাংশ সালাফ এ ধরনের তাবীল থেকে বিরত থাকতেন।'[৩৮৯]

অর্থাৎ আহলুস সুন্নাহর কিছু সালাফ থেকে 'তাবীলে বায়ীদ' প্রমাণিত হলেও অধিকাংশ সালাফ এ ধরনের 'তাবীলে বায়ীদ' থেকে বিরত থাকতেন।

মোল্লা আলী কারী রাহ. (মৃ. ১০১৪ হি.) বলেন,

مَذْهَبُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْخَلَفِ تَأْوِيلٌ تَفْصِيلِيٌّ.

'অধিকাংশ খালাফ তথা পরবর্তীদের মাযহাব হলো, বিস্তারিত তাবীল করা।'[৩৯০]

এ কথা ইমাম নববী রাহ.-সহ আরও অনেকে বলেছেন।

সুতরাং বোঝা গেল, আহলুস সুন্নাহর কিছু সালাফ এবং অধিকাংশ খালাফ 'তাবীলে বায়ীদ' ও বিস্তারিত তাবীল করতেন।

পরবর্তীদের তাবীলের কারণ

এর কারণ বিবরণে মোল্লা আলী কারী রাহ. (মৃ. ১০১৪ হি.) বলেন,

وَإِنَّمَا دَعَتِ الضَّرُورَةُ فِي أَزْمِنَتِهِمْ لِذَلِكَ، لِكَثْرَةِ الْمُجَسِّمَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَغَيْرِهَا مِنْ فِرَقِ الضَّلَالَةِ، وَاسْتِيلَائِهِمْ عَلَى عُقُولِ الْعَامَّةِ، فَقَصَدُوا بِذَلِكَ رَدْعَهُمْ وَبُطْلَانَ قَوْلِهِمْ، وَمِنْ ثَمَّ اعْتَذَرَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَقَالُوا: لَوْ كُنَّا عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ مِنْ صَفَاءِ الْعَقَائِدِ وَعَدَمِ الْمُبْطِلِينَ فِي زَمَنِهِمْ: لَمْ نَخُضْ فِي تَأْوِيلِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

'তাঁদের যুগে দেহবাদী, জাহমিয়া ও অন্য ভ্রান্ত দলগুলোর আধিক্য এবং সাধারণ মানুষের বুঝ তাদের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ফলে তাবীলের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ জন্য তাঁরা তাবীলের দ্বারা সেসব বাতিল ফেরকার প্রতিরোধ ও তাদের মতবাদ খণ্ডন করেন। এ কারণেই তাদের অনেকে ওজর পেশ করে বলেছেন, আমাদের সময় যদি সালাফের যুগের মতো আকীদার পরিশুদ্ধি এবং ভ্রান্ত দলগুলোর উপস্থিতি না

---

৩৮৮. দ্র. আ'লামুল হাদীস, খাত্তাবী, ২/১৩৬৭, ৩/১৯২২; আল-আসমা ওয়াস সিফাত, বায়হাকী, ২/৪০২

৩৮৯. ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার, ৬/৪০, দাফউ শুবাহিত তাশবীহ।

৩৯০. মিরকাতুল মাফাতীহ, ৩/৯২৪

থাকত, তাহলে আমরা এগুলোর তাবীলে নিবিষ্ট হতাম না।’[৩৯১]

মুহাক্কিক ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. (মৃ. ৮৬১ হি.) বলেন,

وقد تؤوَّل اليد والإصبع.. لما ذكرنا من صرف فهم العامة عن الجسمية، وهو ممكن أن يُراد، ولا يُجْزَم بإرادته.

‘কখনো হাত, আঙুল ইত্যাদি শব্দগুলোর তাবীল করা হয় সাধারণ মানুষকে দেহবাদী আকীদা থেকে বাঁচানোর জন্য। আর এই তাবীল সম্ভাব্য অর্থ হিসেবে গ্রহণ করা হবে, নিশ্চিত অর্থ মনে করা যাবে না।’[৩৯২]

সুতরাং ভ্রান্ত আকীদা থেকে সাধারণ মানুষকে বাঁচানো ছিল তাবীলের মূল কারণ। আর এই তাবীলের ক্ষেত্রে শর্ত হলো, সম্ভাব্য একটি অর্থ মনে করতে হবে।

হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রাহ. (মৃ. ১৩৬২ হি.) ‘তামহীদুল ফারশ ফী তাহদীদিল আরশ’ নামক রিসালায় সবিস্তারে বড় সুন্দর করে বলেন, ‘খালাফ তথা পরবর্তীদের পন্থা হলো, এতে উপযুক্ত তাবীল গ্রহণ করা হবে, যাতে ভ্রান্ত ফেরকা সাদৃশ্যবাদী ও দেহবাদীরা সাধারণ লোকদেরকে ভ্রান্তিতে নিপতিত করতে না পারে এই বলে যে, “দেখো, আল্লাহ তাআলা আরশের ওপর সমাসীন। তাহলে বোঝা গেল, আল্লাহ আরশে উপবিষ্ট, যেভাবে আমরা সিংহাসনে বসে থাকি। কাজেই তিনিও আমাদের মতো দেহধারী।” নাউযুবিল্লাহ!

সালাফের পন্থামতে এই বিভ্রান্তির অপনোদন হলো, ‘আল্লাহর জন্য ইস্তিওয়া প্রমাণিত। তবে এটা অপরিহার্য নয় যে, তার জন্য দেহ প্রয়োজন হবে; বরং এর হাকীকত ও বাস্তবতা আমাদের জানা নেই।’ সালাফের এই বক্তব্য সঠিক ও নিরাপদ হওয়া সত্ত্বেও জনসাধারণকে এটা বোঝানো কঠিন।

এভাবে তারা এই সংশয়ে নিপতিত করতে পারে যে, ‘আল্লাহর হাত-পা রয়েছে। কেননা, কুরআন-সুন্নাহয় এগুলোর কথা এসেছে। আর এটা স্পষ্ট যে, হাত-পা হলো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। তাহলে বোঝা গেল, আল্লাহর দৈহিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আছে।’

সালাফের পন্থামতে এটিরও সঠিক উত্তর হলো, ‘হাত-পা তো প্রমাণিত, তবে তা আমাদের মতো অঙ্গ নয়।’ কিন্তু সালাফের এই বক্তব্য জনসাধারণকে বোঝানো কঠিন; বরং হাত-পা থেকে তাদের বুঝ চলে যায় দেহ ও সাদৃশ্যের দিকে।

সুতরাং তাদেরকে দেহবাদ ও সাদৃশ্যবাদের ভ্রান্তির কবল থেকে রক্ষা করা উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব। তাই পরবর্তী আলেমগণ এই পন্থা অবলম্বন করলেন যে, এগুলোর

---

৩৯১. মিরকাতুল মাফাতীহ, ৩/৯২৪

৩৯২. আল-মুসায়ারাহ, পৃষ্ঠা ৪৭-৪৮

এমনভাবে তাবীল করা হবে, যেন কুরআন-সুন্নাহ পরিত্যক্ত না হয় এবং দেহবাদ ও সাদৃশ্যবাদেও লিপ্ত না হয়। উদাহরণস্বরূপ, তাঁরা হাতকে কুদরতের অর্থে নিয়েছেন এবং পা রাখাকে পরাস্ত করার অর্থে বলেছেন।

আর সালাফগণের এই তাবীলের প্রয়োজন ছিল না। কেননা, তাঁদের বিশেষশ্রেণির লোকেরা তো এই হাদীসের ওপর আমল করতেন যে, "তোমরা আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করো; তবে আল্লাহকে নিয়ে চিন্তা-ভাবনা কোরো না।" ফলে তাঁরা এতে নিমগ্ন হতেন না এবং মনে কোনো ওয়াসওয়াসা এলে, তা স্থান দিতেন না।

আর তাঁদের জনসাধারণ নিরাপদ থাকার কারণ হলো, ওই যুগে বিদআতপন্থী ভ্রান্ত দলগুলো না থাকায় এ ধরনের সন্দেহ-সংশয় তাদের কর্ণপাত হতো না। তারা এসব বিষয়াদির ওপর সংক্ষিপ্তভাবে ঈমান এনে ক্ষান্ত হতেন, অনুসন্ধানের বিভ্রান্তিতে পড়তেন না। তবে ব্যতিক্রম কেউ এমন করলে খেলাফতে রাশেদা তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিত, যার ফলে ফিতনা ছড়াত না। যেমন : ছাবীগ (صَبِيغٌ) নামে এক ব্যক্তি মদীনায় আগমন করে 'মুতাশাবিহ' নিয়ে আলোচনায় লিপ্ত হয়েছিল। এটা দেখে হযরত উমর রাযি. তাকে কঠোর শাস্তি দিয়েছিলেন।[৩৯৩] পরে সে নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করলে হযরত আবু মুসা আশআরী রাযি.-কে এ মর্মে হুকুম পাঠানো হলো যে, লোকজন যেন তার সাথে ওঠাবসা না করে।

মোদ্দাকথা, সেই যুগের জনসাধারণ এভাবে বিভ্রান্তি থেকে নিরাপদ ছিল। যেভাবে এই যুগের কতক নিরক্ষর সাধারণ লোক আছে, যাদের কাছে বিদআতপন্থীদের ভ্রান্ত কথাবার্তা পৌঁছেনি এবং যারা নিজেদেরকে জ্ঞানী মনে করে না। তারা যদি এসব বিষয় নিয়ে নিবিষ্ট না হয় এবং সরলতার নীতির ওপর অবিচল থাকে, তাহলে এসব তাবীল তাদেরও প্রয়োজন নেই।

হ্যাঁ, এক শ্রেণির লোক আছে, যারা মুহাক্কিক না হলেও আরবী জানে অথবা যারা একেবারে সাধারণ নয়; বরং বই-পুস্তক অধ্যয়ন করতে পারে, তাদের সংশয় ও সন্দেহ দূরীভূত করার জন্য এবং তাদের দ্বীনের রক্ষাকবচ হিসেবে পরবর্তী আলেমগণ এমন তাবীলের পন্থা অবলম্বন করেছেন।'[৩৯৪]

---

٣٩٣. عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: صَبِيغٌ، قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَجَعَلَ يَسْأَلُ عَنْ مُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُمَرُ ﷺ، فَقَالَ لَه: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا عَبْدُ اللهِ صَبِيغٌ، فَأَخَذَ عُمَرُ عُرْجُونًا مِنَ الْعَرَاجِينِ، فَضَرَبَهُ وَقَالَ: أَنَا عَبْدُ اللهِ عُمَرُ، فَجَعَلَ لَهُ ضَرْبًا حَتَّى دَمِيَ رَأْسُهُ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حَسْبُكَ، قَدْ ذَهَبَ الَّذِي كُنْتُ أَجِدُ فِي رَأْسِي. رواه الدارمي (١٥١)، رجاله ثقات غير انه منقطع؛ لأن سليمان لم يدرك عمر. ورواه الآجري في "الشريعة" ٢٠٦٤، وابن بطة في "الإبانة" ٣٣٠ مطولا بإسناد صحيح.

قال الخلال في «السنة» ١/٢٢٣: وَلَوْ شَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﷺ أَنْ يُنَاظِرَ صَبِيغًا، وَيَجْمَعَ لَهُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى يُنَاظِرُوهُ وَيُحَاجُوه: لَفَعَلَ، وَلَكِنَّهُ قَمَعَ جَهْلَهُ، وَأَوْجَعَ ضَرْبَهُ... لا يُكَلَّمُ وَلَا يُجَالَسُ، وَلَا يُشْفَى بِالْحُجَّةِ وَالنَّظَرِ.

৩৯৪. ইমদাদুল ফাতওয়া, ১২/১৩২-৩৪

ইমাম ইবনে আসাকির রাহ. (মৃ. ৫৭১ হি.) চমৎকারভাবে লেখেন,

فإذا وجدوا مَن يقول بالتجسيم أو التكييف من المجسِّمة والمشبِّهة، وآنسوا مَن يصفه بصفات المحدَثات مِن القائلين بالحدود والجهة: فحينئذ يسلكون طريق التأويل... فإذا أمِنوا من ذلك: رأوا أن السكوت أسلم وترك الخوض في التأويل إلا عند الحاجة أحزم.. .وما مثال المتأوِّل بالدليل الواضح إلا مثال الرجل السابح؛ فإنه لا يحتاج إلى السباحة ما دام في البر، فإن اتفق له في بعض الأحايين ركوبُ البحر، وشاهد منه تلاطم أمواجه، وعصفتْ به الريح حتى انكسر الفلك..: فحينئذ يسبح بجهده طلبا للنجاة، ولا يلحقه فيها تقصيرٌ حبا للحياة .فكذلك الموحِّد ما دام سالكًا محجَّة التنزيه آمِنًا في عَقْده من ركوب لجَّة التشبيه: فهو غير محتاج إلى الخوض في التأويل؛ لسلامة عقيدته من الشُّبَه والأباطيل، فأما إذا تكدَّر صفاء عقده بكدورة التكييف والتمثيل: فلا بد من تصفية قلبه من الكدر بمصفاة التأويل لتسليم عقيدته من التشبيه والتعطيل.

'তাঁরা (ইমামগণ) যখন দেহবাদের প্রবক্তাদের বা দেহবাদী ও সাদৃশ্যবাদীদের (আল্লাহর) ধরন-স্বরূপ সম্পর্কে বলতে দেখলেন এবং দিক ও সীমা ইত্যাদির প্রবক্তাদের আল্লাহকে সৃষ্টির গুণে গুণান্বিত করতে দেখলেন, তখন তাঁরা তাবীলের পথে হাঁটলেন। আর এটা থেকে নিরাপদ মনে হলে চুপ থাকতেন এবং তাবীল তরক করতেন। তবে প্রয়োজন দেখা দিলে অবশ্যই করতেন।

তাবীলকারীর উপমা হলো সাঁতার কাটা ব্যক্তির মতো। কেননা, যতক্ষণ সে স্থলে থাকে, সাঁতার কাটার প্রয়োজন পড়ে না। তবে কোনো সময় যদি তার সাগর পথে ভ্রমণের প্রয়োজন হয় এবং সাগরের তরঙ্গমালার ধাক্কা ও ঝড়ো হাওয়ার কারণে তরি উল্টে যায়, তখন জীবন বাঁচানোর জন্য সাধ্যানুযায়ী সাঁতার কাটতে হয়।

অনুরূপ তাওহীদবাদী যতক্ষণ পর্যন্ত দেহবাদ ও সাদৃশ্যবাদের অতল সাগরে নিমজ্জিত হওয়া থেকে নিরাপদ থেকে তানযীহের সরল পথে পরিচালিত হবে, তাঁর জন্য তাবীল অবলম্বন করার প্রয়োজন নেই। কেননা, তার আকীদা সংশয় ও বাতিল থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

পক্ষান্তরে তার নিষ্কলুষ আকীদা যখন ধরন-স্বরূপ ও সাদৃশ্যের কদর্যে কলুষিত হবে, তখন তাবীলের শোধনযন্ত্রে তার অন্তরকে কদর্যতা থেকে পরিষ্কার করে স্বচ্ছ ও নির্মল আকীদায় সজ্জিত করা অপরিহার্য। যেন তার আকীদা সাদৃশ্য ও অস্বীকার থেকে নিরাপদ থাকে।'[৩৯৫]

বলাবাহুল্য, অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো তাবীলের ক্ষেত্রেও কেউ কেউ বাড়াবাড়ির শিকার হয়েছেন এবং অতিরঞ্জন করেছেন, যা কখনো গ্রহণযোগ্য নয়। তাই বলে প্রয়োজনীয় তাবীলকে অস্বীকার করা যাবে না।

---

৩৯৫. তাবয়ীনু কাযিবিল মুফতারী, পৃষ্ঠা ৬৭৬-৬৭৭

তাবীলের শর্তাবলি

তাবীলের ক্ষেত্রে তিন শর্ত :

১. তাবীলটিকে সম্ভাব্য একটি অর্থ মনে করতে হবে।

২. তাবীলটি আল্লাহ তাআলার সত্তা ও তাঁর সিফাতের শান উপযোগী হতে হবে।

৩. আরবী ভাষায় শব্দটির এমন তাবীলের ব্যবহার থাকতে হবে।

ইমাম আবুল বারাকাত নাসাফী রাহ. (মৃ. ৭১০ হি.) বলেন,

ومذهب الخلف أن نؤولها بما يليق بذات الله تعالى وصفاته، ولا نقطع بأنه مراد الله تعالى، لعدم دليل يوجب القطع على المراد.

'খালাফ তথা পরবর্তীদের মাযহাব হচ্ছে, আমরা এগুলোকে আল্লাহ তাআলার সত্তা ও তাঁর সিফাতের শান উপযোগী অর্থে তাবীল করব। তবে আমরা তাবীলটিকে সুনিশ্চিত আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য মনে করব না। কেননা, সুনিশ্চিত উদ্দেশ্য বলার কোনো দলীল নেই।'[৩৯৬]

সুতরাং তাঁর সত্তা ও সিফাতের শান অনুপযোগী কোনো তাবীল করা যাবে না। আর তাবীলটিকে সুনিশ্চিত মনে করা যাবে না, যা ইবনুল হুমাম রাহ.-ও বলেছেন।

প্রসিদ্ধ কিতাব 'শারহুল আকায়েদে' রয়েছে,

يُؤَوَّل بِتَأْوِيْلات صَحِيْحَة عَلَى مَا اخْتَاره الْمُتَأَخِّرُوْن.

'পরবর্তীদের মাযহাবমতে এগুলোর সহীহ তাবীল (তথা আরবী ভাষায় এর ব্যবহার রয়েছে এমন তাবীল) করা হবে।'

তাবীল সালাফ থেকেও প্রমাণিত

আমাদের কিছু ভাই আছেন, যারা সব তাবীলকে অস্বীকার করেন; বরং তাবীলের কারণে আশআরী-মাতুরীদীদেরকে সিফাতের ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ থেকেই খারেজ করে দেন। অথচ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি.-সহ অনেক সালাফ থেকে সিফাতের ক্ষেত্রে তাবীল প্রমাণিত। তন্মধ্যে কয়েকটি তুলে ধরছি :

১. আল্লাহ তাআলা সূরা কলমের ৪২ নং আয়াতে ইরশাদ করেন,

يَوۡمَ يُكۡشَفُ عَن سَاقٖ وَيُدۡعَوۡنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسۡتَطِيعُونَ

'যেদিন 'সাক' খুলে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে সিজদার জন্য আহ্বান করা হবে, তখন তারা (সিজদা) করতে সক্ষম হবে না।'

---

৩৯৬. আল-ই'তিমাদ ফীল ই'তিকাদ, পৃষ্ঠা ১২২

সহীহ বুখারীতে এটা যে আল্লাহ তাআলার 'সাক', সেটা উল্লেখ হয়েছে,

يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ.

'আমাদের রব তাঁর 'সাক' খুলে দেবেন।' আর 'সাক' অর্থ হলো পায়ের গোছা।

অথচ ইবনে আব্বাস রাযি. এর তাবীল করেছেন,

هَذَا يَوْمُ كَرْبٍ وَشِدَّةٍ.

'এটা কষ্ট ও ভয়াবহতার দিন।'

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

يُرِيدُ: الْقِيَامَةَ وَالسَّاعَةَ لِشِدَّتِهَا.

'এর দ্বারা কিয়ামত ও সেই সময়ের ভয়াবহতা উদ্দেশ্য।'

হাফেজ ইবনে হাজার রাহ. বলেন, 'বায়হাকী রাহ. ইবনে আব্বাসের (প্রথম) বর্ণনাটি দুটি সনদে উল্লেখ করেছেন, উভয় সনদের প্রতিটি হাসান। আর (দ্বিতীয়) বর্ণনাটি সহীহ।'[৩৯৭]

২. বিশিষ্ট তাবেয়ী সাঈদ ইবনে জুবায়ের রাহ. বলেন,

قَالَ ابْنُ جُبَيْرٍ: {كُرْسِيُّهُ}: عِلْمُهُ.

'তাঁর (আল্লাহর) কুরসীর অর্থ হলো, তাঁর ইলম।'

ইমাম বুখারী রাহ. উক্ত তাবীল 'সহীহ বুখারী'তে এনেছেন। এর ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজার রাহ. লেখেন, 'সুফিয়ান সাওরী রাহ. এটি তাঁর 'তাফসীর' গ্রন্থে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।'[৩৯৮] আর ইমাম তাবারী রাহ. (মৃ. ৩১০ হি.) নিজ সনদে ইবনে আব্বাস রাযি. থেকেও উক্ত তাবীল বর্ণনা করেছেন। ইমাম কুরতুবী রাহ. বলেন, এটিকে তাবারী রাহ. প্রাধান্য দিয়েছেন।'[৩৯৯]

৩. কুরআনে 'রূহ' (আত্মা)-কে আল্লাহর দিকে সম্বন্ধ করে 'রূহুল্লাহ' বলা হয়েছে। ইমাম আহমদ রাহ. (মৃ. ২৪১ হি.) এর তাবীল করে বলেন,

تفسير روح الله إنما معناها: أنها روح خلقها الله تعالى، كما يقال: عبد الله وسماء الله وأرض الله.

''রূহুল্লাহ' বা আল্লাহর রূহের ব্যাখ্যা হলো, আল্লাহর সৃষ্ট রূহ। যেমন বলা হয়,

---

৩৯৭. দেখুন, মুসতাদরাকে হাকিম, ৩৮৪৫, হাকিম বলেন, (প্রথম) বর্ণনাটির সনদ সহীহ; আল-আসমা ওয়াস সিফাত, বায়হাকী, ২/১৮৩-১৮৫; ফাতহুল বারী, ১৩/৪২৮

৩৯৮. ফাতহুল বারী, ৮/১৯৯

৩৯৯. তাফসীরে তাবারী, ৫/৩৯৭; তাফসীরে কুরতুবী, ৩/২৭৬

আল্লাহর বান্দা, আল্লাহর আসমান ও আল্লাহর জমিন।'[৪০০]

অথচ সালাফী বন্ধুরা এখানে বলে না, 'আল্লাহরও রূহ রয়েছে, তবে তা আমাদের রূহের মতো নয়'; যেমনটা বলে থাকে যে, 'আল্লাহরও হাত বা সূরত-আকার রয়েছে, তবে তা আমাদের হাত বা সূরত-আকারের মতো নয়।'

এ ছাড়া ইমাম বায়হাকী রাহ. নিজ সনদে বর্ণনা করেছেন, ইমাম আহমদ রাহ. এ আয়াত وَجَاءَ رَبُّكَ তথা 'আপনার প্রভু আগমন করবেন'-এর তাবীল করেছেন جَاءَ ثَوَابُهُ 'আল্লাহর সাওয়াব' দ্বারা। অতঃপর বায়হাকী রাহ. বলেন, এর সনদে সমস্যা নেই।[৪০১] এ বিষয়ে আরও কিছু তথ্য 'ইমাম আহমদ ও গুলাতুল হানাবিলার মাঝে পার্থক্যের কিছু উদাহরণ' শিরোনামে **'চার : তাবীল বিষয়ে বাড়াবাড়ি'** উপশিরোনামের অধীনে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. ইমাম মালেক রাহ. (মৃ. ১৭৯ হি.)-কে শেষ রাতে দুনিয়ার আসমানে আল্লাহ তাআলার অবতরণের হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে বলেন,

يَتَنَزَّلُ أَمْرُهُ.

'(এর অর্থ হচ্ছে,) তাঁর নির্দেশ অবতরণ করে বা নেমে আসে।'

ইমাম ইবনে আব্দিল বার রাহ.-ও (মৃ. ৪৬৩ হি.) তা সমর্থন করেছেন।[৪০২]

৫. ইমাম আবু হানীফার বিশিষ্ট তাবেয়ী উস্তাদ ও মুহাদ্দিসগণের শায়খ শায়খুল ইসলাম ইমাম আ'মাশ রাহ. (মৃ. ১৪৮ হি.) থেকে একটি তাবীল 'সুনানে তিরমিযী' গ্রন্থে (হাদীস নং ৩৬০৩-এর অধীনে) উল্লেখ হয়েছে,

وَيُرْوَى عَنِ الأَعْمَشِ فِي تَفْسِيرِ هَذَا الحَدِيثِ: تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا يَعْنِي بِالمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ، وَهَكَذَا فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ هَذَا الحَدِيثَ. قَالُوا: إِنَّمَا مَعْنَاهُ يَقُولُ: إِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ العَبْدُ بِطَاعَتِي وَبِمَا أَمَرْتُ: تُسَارِعُ إِلَيْهِ مَغْفِرَتِي وَرَحْمَتِي.

'"যে এক বিঘত আমার নিকটবর্তী হয়, আমি এক হাত তার নিকটবর্তী হই", এই হাদীসটির ভাষ্যে আ'মাশ রাহ. থেকে বর্ণিত আছে যে, "এর মর্ম হলো রহমত ও মাগফিরাতের সাথে নিকটবর্তী হই।" কতক আহলে ইলম হাদীসটির অনুরূপ ব্যাখ্যাই করেছেন। তাঁরা বলেন, "এর মর্ম হলো বান্দা যখন আমার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং আমার নির্দেশ পালন করে আমার নিকটবর্তী হয়, তখন তার প্রতি আমার মাগফিরাত ও রহমত অতি দ্রুত অগ্রসর হয়।"'

---

৪০০. আর-রাদ্দু আলাল জাহমিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ১২৬; আল-উদ্দাহ ফী উসূলিল ফিকহ, আবু ইয়ালা, ৩/৭১৩

৪০১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১০/৩৬১; আল ফিসাল ফিল মিলালি ওয়াল আহওয়া ওয়ান নিহাল, ২/১৩২; আর-রাদ্দুল ইসলামীল মুমতায আলা ফায়সাল বিন কায্যায, পৃষ্ঠা ২৪৭-২৫২; সূরা ফাজর, (৮৯) : ২২

৪০২. আত-তামহীদ, ৭/১৪৩; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ৮/১০৫

৬. 'সহীহ্ বুখারী' গ্রন্থের কিতাবুত তাফসীরে ইমাম বুখারী রাহ. (মৃ. ২৫৬ হি.) সূরা কাসাসের ৮৮ নং আয়াতের তাফসীরে লেখেন,

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ: إِلَّا مُلْكَهُ.

'তাঁর চেহারা তথা তাঁর রাজত্ব ছাড়া সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে।'

এখানে তিনি 'আল্লাহর চেহারা'র তাবীল করেছেন 'আল্লাহর রাজত্ব' দ্বারা।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের সালাফী বন্ধুদের 'তাওহীদ পাবলিকেশন্স' থেকে প্রকাশিত সহীহ্ বুখারীর অনুবাদের টীকায় তারা লিখেছে, **'ইমাম বুখারী যে তাফসীর করেছেন, সেটি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর আকীদার অনুপাতে হয়নি।'**[৪০৩]

অর্থাৎ তাবীল করার কারণে ইমাম বুখারীর মতো আহলুস সুন্নাহর মহান ইমামকেও আহলুস সুন্নাহর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হচ্ছে!

এভাবে ইমাম বুখারী রাহ. আল্লাহ্ তাআলা যে হাসেন, এর তাবীল করে বলেন,

معنى الضحك: الرحمة.

'হাসার অর্থ হলো, দয়া ও অনুগ্রহ।'[৪০৪]

৭. হাদীসের ইমাম ইবনে খুযায়মা রাহ. (মৃ. ৩১১ হি.)-এর জীবনীতে ইমাম যাহাবী রাহ. লেখেন,

وَكِتَابُهُ فِي (التَّوحِيدِ) مُجَلَّدٌ كَبِيرٌ، وَقَدْ تَأَوَّلَ فِي ذَلِكَ حَدِيْثَ الصُّورَةِ، فَلْيَعْذُر مَنْ تَأَوَّلَ بَعْضَ الصِّفَاتِ.

'তাঁর 'আত-তাওহীদ' কিতাবটি বড় ধরনের, এতে তিনি (আল্লাহর) সূরতের হাদীসটির তাবীল করেছেন। আর কেউ কিছু সিফাতের তাবীল করলে, তার ওজর মেনে নেওয়া উচিত।'[৪০৫]

প্রিয় পাঠক! তাবীলের কারণে যদি আহলুস সুন্নাহ থেকে খারেজ হতে হয়, তাহলে সাহাবী-তাবেয়ীসহ অসংখ্য ইমাম গোমরাহ সাব্যস্ত হবেন। তাই আশরাফ আলী থানভী রাহ. তাদের চারটি ভুলের তৃতীয় নম্বর ভুল চিহ্নিত করে বলেন,

تیسری غلطی یہ کہ مسلک تاویل کو علی الاطلاق باطل کہہ کر ہزاروں اہل حق کی تضلیل کرتے ہیں۔

'যেকোনো তাবীলকে বাতিল বলা অসংখ্য হকপন্থীকে গোমরাহ সাব্যস্ত করে।'[৪০৬]

---

৪০৩. দ্র. সহীহ্ বুখারী, ৪/৫০৩, টীকা নং ১৫৪, জানুয়ারি ২০১১ ঈসায়ী

৪০৪. দ্র. আ'লামুল হাদীস, খাত্তাবী, ২/১৩৬৭, ৩/১৯২২; আল-আসমা ওয়াস সিফাত, বায়হাকী, ২/৪০২

৪০৫. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৪/৩৭৪

৪০৬. ইমদাদুল ফাতাওয়া, ১২/২৫১

আশআরীগণের তাবীল ছেড়ে সালাফী আকীদা গ্রহণ নিয়ে বিভ্রান্তি

সালাফী বন্ধুরা দাবি করে থাকেন, ইমাম আশআরী রাহ. শেষ জীবনে সালাফী আকীদা গ্রহণ করেছেন। এর স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে তারা ইমাম ইবনে কাসীর রাহ. (মৃ. ৭৭৪ হি.)-এর নিম্নোক্ত বক্তব্য উল্লেখ করেন, 'ইমাম আশআরীর ব্যাপারে তিনটি অবস্থা জানা যায়।... তৃতীয় অবস্থা হলো সালাফের পদ্ধতি, যা তাঁর শেষ কিতাব 'আল-ইবানাহ' গ্রন্থে অবলম্বন করেছেন।'[৪০৭]

এটি উল্লেখ করে সালাফী বন্ধুরা বলতে চান, তিনি শেষ জীবনে আমাদের 'সালাফী আকীদা' গ্রহণ করেছেন। এভাবে ইমামুল হারামাইন জুয়াইনী, গাযালী ও ফখরুদ্দীন রাযী রাহ. প্রমুখ আশআরীও শেষ জীবনে একই কাজ করেছেন।

উত্তর :

তাদের এ দাবির উত্তর হলো, একটা হচ্ছে 'সালাফের আকীদা', আরেকটা হলো বর্তমান 'সালাফী আকীদা'। ইতিপূর্বে পার্থক্যসহ সবিস্তারে আলোচনা করে দেখানো হয়েছে যে, 'সালাফের আকীদা' ও বর্তমান 'সালাফী আকীদা' এক নয়। আর 'তাফবীযের' আলোচনায় অনেক ইমামের বক্তব্যে উল্লেখ হয়েছে যে, সালাফের মাযহাব হলো সিফাতের অর্থ তাফবীয করা।

এখানে ইবনে কাসীর রাহ. 'সালাফের পদ্ধতি' বলে সিফাতের ক্ষেত্রে (যে আহলুস সুন্নাহর 'তাফবীয' ও 'তাবীল'-এর দুটি পদ্ধতি রয়েছে, সেখান থেকে) তাবীলের পদ্ধতি ছেড়ে শুধু তাফবীযের পদ্ধতি গ্রহণের কথা বলেছেন, যা তাঁর কথা থেকেই স্পষ্ট বুঝে আসে। কেননা, ইবনে কাসীর রাহ. এরপর বলেছেন,

والحال الثالثة: إثبات ذلك كله من غير تكييف، ولا تشبيه، جريا على منوال السلف، وهي طريقته في "الإبانة" التي صنفها آخرا، وشرحه القاضي الباقلاني، ونقلها أبو القاسم ابن عساكر، وهي التي مال إليها الباقلاني، وإمام الحرمين، وغيرهما من أئمة الأصحاب المتقدمين، في أواخر أقوالهم، والله أعلم.

'তাঁর (আশআরীর) তৃতীয় অবস্থা হলো সালাফের পদ্ধতি গ্রহণ করা, যা তাঁর শেষ কিতাব 'আল-ইবানাহ'তে অবলম্বন করেছেন এবং কাযী বাকিল্লানী এর ব্যাখ্যা করেছেন ও ইবনে আসাকির তা নকল করেছেন। আর বাকিল্লানী ও **ইমামুল হারামাইনসহ অন্য পূর্ববর্তী ইমামগণ সর্বশেষ এই পদ্ধতি পছন্দ করেছেন।**'[৪০৮]

অর্থাৎ ইমাম আশআরী, বাকিল্লানী, ইমামুল হারামাইনসহ পূর্ববর্তী ইমামগণ সর্বশেষ সালাফের পদ্ধতি তথা তাবীল না করে তাফবীয করা পছন্দ করেছেন।

---

৪০৭. তবাকাতুশ শাফিয়্যীন, ১/২১০-সূত্রে আল-আশাঈরা ফী মীযানি আহলিস সুন্নাহ, পৃষ্ঠা ৭১৫-১৬
৪০৮. তবাকাতুশ শাফিয়্যীন, পৃষ্ঠা ২১০, মাকতাবাতুছ ছাকাফাহ

যেমন : ইমাম যাহাবী রাহ. (মৃ. ৭৭৪ হি.) ইমাম আশআরীর জীবনীতে লেখেন,

رَأَيْتُ لأَبِي الحَسَن أَرْبَعَة تَوَالِيف فِي الأُصُوْل يذكرُ فِيْهَا قوَاعدَ مَذْهَبِ السَّلَف فِي الصِّفَات، وَقَالَ فِيْهَا: تُمَرُّ كَمَا جَاءت. ثُمَّ قَالَ: وَبِذَلِكَ أَقُول، وَبِهِ أَدين، وَلاَ تُؤَوَّل.

'আমি আশআরীর আকীদা বিষয়ে চারটি গ্রন্থ দেখেছি, যেখানে তিনি সিফাতের ক্ষেত্রে সালাফের মাযহাবের মূলনীতি উল্লেখ করেছেন এবং এতে তিনি (আশআরী) বলেছেন, "ইমরার করা হবে যেভাবে এগুলো এসেছে।" অতঃপর বলেন, "এটাই আমি বলি ও গ্রহণ করি এবং এগুলো তাবীল করা হবে না।"'[৪০৯]

অর্থাৎ আশআরী রাহ. বলেন, আমি তাফবীয গ্রহণ করি, তাবীলের পক্ষে নই।

প্রখ্যাত মুফাসসির মাহমুদ আলূসী হানাফী রাহ. (মৃ. ১২৭০ হি.) লেখেন,

وكلام إمام الحرمين في «الإرشاد» يميل إلى طريقة التأويل، وكلامه في «الرسالة النظامية» مصرح باختياره طريقة التفويض... وقد اختاره أيضا الإمام أبو الحسن الأشعري في «مقالات الإسلاميين»، و»الإبانة».

'ইমামুল হারামাইন রাহ. 'আল-ইরশাদ' কিতাবে তাবীলের পদ্ধতি পছন্দ করেছেন। তবে 'আন-নিযামিয়্যাহ রিসালায়' সুস্পষ্টভাবে তাফবীয পছন্দ করার কথা বলেছেন। আর এটি ইমাম আশআরী রাহ.-ও 'মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন' ও 'আল-ইবানাহ' গ্রন্থদ্বয়ে পছন্দ করেছেন।'[৪১০]

ইবনে আবী শরীফ মাকদেসী রাহ.-ও (মৃ. ৯০৬ হি.) ইমামুল হারামাইন সম্পর্কে একই কথা বলেছেন।'[৪১১]

ইমামুল হারামাইন রাহ. (মৃ. ৪৭৮ হি.) 'আন-নিযামিয়্যাহ'তে কী বলেছেন দেখুন,

وَذَهَبَ أَئِمَّةُ السَّلَفِ إِلَى الانْكِفَافِ عَنِ التَّأْوِيلِ، وَإِجْرَاءِ الظَّوَاهِرِ عَلَى مَوَارِدِهَا، وَتَفْوِيضِ مَعَانِيهَا إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَالَّذِي نَرْتَضِيْه رَأْياً، وَنَدِينُ اللهَ بِهِ عَقداً اتِّبَاعُ سلفِ الأُمَّة.

'সালাফের ইমামগণের মাযহাব হলো, এগুলোর তাবীল না করা ও বাহ্যিকভাবে রেখে দেওয়া এবং এগুলোর অর্থ আল্লাহ তাআলার দিকে তাফবীয করা। আর আমি যেটাকে পছন্দ করি এবং যে পদ্ধতিতে আল্লাহর ব্যাপারে আকীদা রাখি, তা হলো সালাফের অনুসরণ করা।'[৪১২] অর্থাৎ সিফাতের অর্থ তাফবীয করা।

কাযী শাওকানী রাহ. (মৃ. ১২৫০ হি.) এ নিয়ে আলোচনা করার পর বলেন,

---

৪০৯. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৫/৮৬
৪১০. রুহুল মাআনী, ৮/৪৭৩
৪১১. দেখুন, আল-মুসামারা, পৃষ্ঠা ৪৯
৪১২. আল-আকীদাতুন নিযামিয়্যাহ, জুয়াইনী, পৃষ্ঠা ৩২; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, যাহাবী, ১৮/৪৭৩

وَهَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةُ أعني: الجويني، والغزالي، الرازي. هُمُ الَّذِينَ وَسَّعُوا دَائِرَةَ التَّأْوِيلِ، وَطَوَّلُوا ذُيُولَهُ، وَقَدْ رَجَعُوا آخِرًا إِلَى مَذْهَبِ السَّلَفِ كَمَا عَرَفْتَ.

'এই তিনজন তথা (ইমামুল হারামাইন) জুয়াইনী, গাযালী ও (ফখরুদ্দীন) রাযী রাহ. প্রমুখ তাবীলের পরিধি বিস্তৃত করেছেন। তবে সর্বশেষ তাঁরা সালাফের মাযহাবে ফিরে গেছেন।'[৪১৩]

সালাফী শায়খ আমীন শানকীতী রাহ. (মৃ. ১৩৯৩ হি.) উপরিউক্ত তিন ইমামের সাথে ইমাম বাকিল্লানী রাহ.-কেও যোগ করে একই কথা বলেছেন।[৪১৪]

বলাবাহুল্য, **তাঁরা যে তাবীল থেকে ফিরেছেন, সেটা হলো 'তাবীলে বায়ীদ'। কেননা, 'নাকসে মাহায'-এর তাবীল অপরিহার্য এবং 'তাবীলে কারীব' অনস্বীকার্য। কাজেই উক্ত দুই প্রকারের তাবীল থেকে ফেরার অবকাশ নেই।** আর এতে সালাফী বন্ধুদের উচ্ছ্বসিত হওয়ার কিছু নেই। কারণ, তারা তো কোনো প্রকার তাবীলই মানেন না; বরং যেকোনো তাবীলকারীকে গোমরাহ বলেন।

উত্তরের সারকথা, আহলুস সুন্নাহর ইমামগণ সিফাতের ক্ষেত্রে 'তাফবীয' ও 'তাবীল' এই দুই পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন, তবে অনেকে প্রথমে তাফবীযের চেয়ে তাবীল বেশি পছন্দ করেছিলেন। কিন্তু ইমাম আশআরী রাহ.-সহ উপরিউক্ত ইমামগণ শেষে তাবীল ছেড়ে শুধু তাফবীয পছন্দ করেছেন, যা ছিল সালাফের পদ্ধতি। এটা কখনো বর্তমান 'সালাফী পদ্ধতি' বা 'সালাফী আকীদা' গ্রহণ নয়; বরং বাস্তবতা হলো, প্রথমে নিজেদের পদ্ধতিদ্বয়ের দ্বিতীয় পদ্ধতি (তাবীল) পছন্দ করেছিলেন, আর শেষে প্রথম পদ্ধতি (তাফবীয) পছন্দ করেছেন।

তবে তাবীল থেকে তাঁদের ফেরার বিষয়টি সকল আকীদা গবেষক মানেন না। তাই বিষয়টি বিস্তৃত গবেষণা ও পর্যালোচনার দাবি রাখে।

'ইস্তিওয়া আলাল আরশ' তথা 'আল্লাহ আরশের ওপর' বা 'আল্লাহ আসমানে আছেন' সম্পর্কে আলোচনা

তৃতীয় প্রকার সিফাতের সাথে সংশ্লিষ্ট বড় একটি বিষয় হলো, 'ইস্তিওয়া আলাল আরশ' তথা 'রহমান (আল্লাহ) আরশের ওপর ইস্তিওয়া করেছেন' বা 'আল্লাহ আসমানে আছেন'। তাই এ সম্পর্কে কিছু আলোচনা।

'আল্লাহ আরশের ওপর' বা 'আল্লাহ আসমানে আছেন' কথাটি অকাট্যভাবে সত্য এবং অনেক আয়াত দ্বারা তা প্রমাণিত, যা অস্বীকার করলে ঈমান থাকবে না। এ

৪১৩. ইরশাদুল ফুহুল, ২/৩৩-৩৪
৪১৪. আদওয়াউল বয়ান, ৭/২৯৭

কারণেই আহলুস সুন্নাহর কেউ তা অস্বীকার করেনি; বরং 'আল্লাহ আরশের ওপর' বা 'আল্লাহ আসমানে আছেন' কথাটি আশআরী, মাতুরীদী ও আছারীসহ আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর সর্বসম্মত আকীদা।

তবে উক্ত 'সর্বসম্মত আকীদা'র ব্যাখ্যায় আহলুস সুন্নাহর ইমামগণ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন, কথাটির অর্থ কখনো আল্লাহর জন্য কোনো স্থান/অবস্থান বা দিক কিংবা তাঁর অবস্থানে পরিবর্তন ও স্থানান্তর ইত্যাদি সাব্যস্ত করা নয়। অথবা কথাটির উদ্দেশ্য এটাও নয় যে, 'আরশ' বা 'আসমান' আল্লাহর থাকার স্থান কিংবা এতে তিনি অবস্থান গ্রহণ করেছেন, আর তিনি ওপরের দিকে রয়েছেন।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম খাত্তাবী রাহ. (মৃ. ৩৮৮ হি.) বলেন,

وَلَيْسَ مَعْنَى قَوْلِ الْمُسْلِمِينَ:)إِنَّ اللهَ عَلَى الْعَرْشِ(هُوَ أَنَّه تَعَالَى مُمَاسٌّ لَهُ، أَوْ مُتَمَكِّنٌ فِيهِ، أَوْ مُتَحَيِّزٌ فِي جِهَةٍ مِنْ جِهَاتِه؛ لَكِنَّه بَائِنٌ مِنْ جَمِيعِ خَلْقِهِ.

'মুসলমানরা যে বলে "আল্লাহ আরশের ওপর", এই কথার অর্থ এটা নয় যে, তিনি আরশকে স্পর্শ করেছেন কিংবা আরশে স্থির হয়েছেন অথবা আরশের কোনো দিকে স্থান গ্রহণ করেছেন; বরং তিনি তাঁর সকল সৃষ্টি থেকে পৃথক।'[৪১৫]

হাদীসের আরেক বিখ্যাত ইমাম বায়হাকী রাহ. (মৃ. ৪৫৮ হি.) বলেন,

وَفِي الْجُمْلَةِ: يَجِبُ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اسْتِوَاءَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لَيْسَ بِاسْتِوَاءِ اعْتِدَالٍ عَنِ اعْوِجَاجٍ، وَلَا اسْتِقْرَارٍ فِي مَكَانٍ، وَلَا مُمَاسَّةٍ لِشَيْءٍ مِنْ خَلْقِهِ، لَكِنَّهُ مُسْتَوٍ عَلَى عَرْشِهِ، كَمَا أَخْبَرَ بِلَا كَيْفَ بِلَا أَيْنَ.

'মোটকথা, এটা জেনে রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহ তাআলার ইস্তিওয়া কোনোরূপ কাত-চিত বা কুঁজো থেকে সোজা হওয়া নয়। কিংবা কোনো স্থানে অবস্থান বা আরোহণ/ওঠা নয় এবং তাঁর সৃষ্ট কোনো বস্তুর সাথে স্পর্শ করাও নয়; বরং তিনি তাঁর আরশের ওপর ইস্তিওয়া করেছেন, যেমনটা বর্ণিত হয়েছে। এতে 'কোথায়' ও 'কীভাবে' বলতে কিছু নেই।'[৪১৬]

তাই ইমাম ইবনে কাসীর রাহ. (মৃ. ৭৭৪ হি.) আরশের ওপর ইস্তিওয়া সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,

وَالظَّاهِرُ الْمُتَبَادِرُ إِلَى أَذْهَانِ الْمُشَبِّهِيْنَ مَنْفِيٌّ عَنِ اللهِ.

'এ থেকে বাহ্যিক যে অর্থ সাদৃশ্যবাদীদের মাথায় আসে, তা থেকে আল্লাহ তাআলা মুক্ত।'[৪১৭] অর্থাৎ স্থান ও দিকসহ যত কিছু মাথায় আসে, তা থেকে তিনি পবিত্র।

---

৪১৫. আ'লামুল হাদীস, খাত্তাবী, ২/১৪৭৪; ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার, ১৩/৪১৩
৪১৬. আল-ই'তিকাদ, বায়হাকী, পৃষ্ঠা ১১৬
৪১৭. তাফসীরে ইবনে কাসীর, ৩/৪২৬

ইমাম আযম আবু হানীফা রাহ. (মৃ. ১৫০ হি.) বলেন,

نُقِرُّ بأن الله سبحانه تعالى على العرش استوى، من غير أن يكون له حاجةٌ واستقرارٌ [৪১৮] عليه، وهو حافظ العرش وغيرِ العرش من غير احتياج، فلو كان محتاجا: لَمَا قَدَر على إيجاد العالَم، والحفظ وتدبيره كالمخلوقين، ولو صار محتاجا إلى الجلوس والقرار: فقَبْلَ خلْقِ العرش أين كان الله تعالى؟ تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرا.

‘আমরা স্বীকার করি, “আল্লাহ তাআলা আরশের ওপর ইস্তিওয়া করেছেন।” কিন্তু তিনি আরশের প্রতি মুখাপেক্ষী নন এবং **আরশের ওপর অবস্থান গ্রহণকারী নন;** বরং তিনি কোনো প্রয়োজন ছাড়াই আরশ ও অন্য সবকিছুর রক্ষাকর্তা। সৃষ্টির মতো তিনি যদি (আরশ বা অন্য কিছুর প্রতি) মুখাপেক্ষী হতেন, তাহলে মহাবিশ্ব সৃষ্টি, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করতে সক্ষম হতেন না। আর তিনি যদি (আরশে) বসা কিংবা অবস্থানের প্রতি মুখাপেক্ষী হতেন, তাহলে **আরশ সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তাআলা কোথায় ছিলেন?** আল্লাহ এসব থেকে মহাপবিত্র।’[৪১৯]

এখানে ইমাম আবু হানীফা রাহ. আল্লাহর আরশে অবস্থানকে এবং কোনো স্থানে থাকাকে স্পষ্টভাবে খণ্ডন করেছেন। আবু হানীফা রাহ. আরও বলেন,

ولقاءُ الله تعالى لأهلِ الجنَّةِ حقٌّ، بلا كيفيَّةٍ ولا تشبيهٍ ولا جِهَةٍ.

‘জান্নাতবাসীর জন্য আল্লাহ তাআলার দর্শন সত্য, তবে কোনো ধরন, সাদৃশ্য ও **দিক ব্যতীত।**’[৪২০] এখানে তিনি আল্লাহ তাআলাকে দিক থেকে মুক্ত বলেছেন।

একই কথা ইমাম আবু মানসুর মাতুরীদী রাহ.-ও বলেছেন। তিনি লেখেন,

كَانَ وَلَا مَكَان، وَلَيْسَ فِي الْإِضَافَة إِلَى أَنه {عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} تثبيتُ مَكَان.

‘তিনি (আল্লাহ তাআলা) তখন ছিলেন, যখন কোনো ‘স্থান’ ছিল না। আর (কুরআনে যে) “তিনি আরশের ওপর ইস্তিওয়া করেছেন” বলে সম্বন্ধ করা হয়েছে, এর উদ্দেশ্য কোনো ‘স্থান’ প্রমাণিত করা নয়।’[৪২১] অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার ‘আরশ’ নামক স্থানের ওপর অবস্থানগ্রহণ প্রমাণিত করা উদ্দেশ্য নয়।

আরও স্পষ্ট করে শাহ ওলীউল্লাহ দেহলবী রাহ. (মৃ. ১১৭৬ হি.) বলেন,

وَهُوَ فَوْقَ الْعَرْشِ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ، وَلَكِنْ لَا بِمَعْنَى التَّحَيُّزِ وَلَا الْجِهَةِ.

---

৪১৮. দারু ইবনে হাযম থেকে প্রকাশিত কিতাবে واستقر রয়েছে। এটা ভুল, যা পরের বাক্য থেকেও পরিষ্কার হয়।

৪১৯. কিতাবুল ওসিয়্যাহ, আকীদা নং ৭-সূত্রে মাজমুউ কুতুব ওয়া রাসায়িল ওয়া ওসায়াল ইমামিল আযম, পৃষ্ঠা ৪৫৭

৪২০. কিতাবুল ওসিয়্যাহ, আকীদা নং ২৪-সূত্রে মাজমুউ কুতুব ওয়া রাসায়িল ওয়া ওসায়াল ইমামিল আযম, পৃষ্ঠা ৪৬২

৪২১. কিতাবুত তাওহীদ, পৃষ্ঠা ১০৫; সূরা ত্বহা, (২০) : ৫

'তিনি আরশের ওপর (ইস্তিওয়া) করেছেন, যেভাবে স্বয়ং (কুরআনে) বিবরণ দিয়েছেন। কিন্তু তা স্থানগ্রহণ ও (ওপরের) দিকে থাকার অর্থে নয়।'[৪২২]

সুতরাং সালাফী বন্ধুদের ইমাম তাহাবীর وَفَوْقَهُ (তিনি আরশের ওপর) শব্দ থেকে আল্লাহ তাআলা স্থানগতভাবে আরশের ওপর থাকার প্রমাণগ্রহণ যে ভুল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এ বিষয়ে অত্যন্ত চমৎকার করে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত ফকীহ ইমাম ইবনে নুজাইম মিসরী রাহ. (মৃ. ৯৭০ হি.) বলেন,

وَيَكْفُرُ... بِإِثْبَاتِ الْمَكَانِ للهِ تَعَالَى، فَإِنْ قَالَ: اللهُ فِي السَّمَاءِ، فَإِنْ قَصَدَ حِكَايَةَ مَا جَاءَ فِي ظَاهِرِ الْأَخْبَارِ: لَا يَكْفُرُ، وَإِنْ أَرَادَ الْمَكَانَ: كَفَرَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ: كَفَرَ عِنْدَ الْأَكْثَرِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى.

'আল্লাহর জন্য 'স্থান' সাব্যস্ত করার দ্বারা কাফের হয়ে যাবে। অবশ্য কেউ যদি বলে, "আল্লাহ আসমানে আছেন", আর এ কথা দ্বারা সে কুরআন-হাদীসের বাহ্যিক বর্ণনাকে উদ্ধৃত করতে চায়, তাহলে সে কাফের হবে না।

তবে যদি সে 'স্থান' উদ্দেশ্য নেয় (অর্থাৎ এ কথা দ্বারা সে "আল্লাহ তাআলা আসমানের ওপরে 'স্থানে' আছেন" উদ্দেশ্য নেয়), তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। এমনকি তার যদি কোনোরূপ নিয়তই না থাকে, তাহলেও অধিকাংশের মতে সে কাফের হয়ে যাবে। এটাই সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত এবং এর ওপরই ফতোয়া।'[৪২৩]

ইমাম আহমদ রাহ. (মৃ. ২৪১ হি.)-এর আকীদার বিবরণে এসেছে,

وكان يقول: إن الله عز وجل مستو على العرش المجيد... وكان يقول في معنى الاستواء: هو العلو والارتفاع، ولم يزل الله تعالى عاليا رفيعا قبل أن يخلق عرشه، فهو فوق كل شيء والعالي على كل شيء، وإنما خص الله العرش لمعنى فيه مخالف لسائر الأشياء، والعرش أفضل الأشياء وأرفعها، فامتدح الله نفسه بأنه على العرش استوى أي عليه علا. ولا يجوز أن يقال: استوى بمماسة ولا بملاقاة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والله تعالى لم يلحقه تغير ولا تبدل، ولا تلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش.

'তিনি বলতেন, নিশ্চয় আল্লাহ আরশের ওপর ইস্তিওয়া করেছেন।... তিনি আরও বলতেন, ইস্তিওয়ার অর্থ হলো সমুন্নত হওয়া ও সুউচ্চ হওয়া। আর আল্লাহ তাআলা আরশ সৃষ্টির পূর্ব থেকেই সুউচ্চ ও সমুন্নত, তিনি সবকিছুর ঊর্ধ্বে এবং সমস্ত কিছুর ওপরে। তিনি আরশকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো, আরশের মধ্যে কিছু

---

৪২২. আল-আকীদাতুল হাসানাহ, পৃষ্ঠা ২৫
৪২৩. আল-বাহরুর রায়েক, ৫/২০২-২০৩; ফাতাওয়া আলমগীরী, ২/২৭২

বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা অন্যান্য জিনিসে নেই। তা হলো, আরশ সর্বোত্তম ও সর্বোচ্চ জিনিস। এ কারণে মহান আল্লাহ্ নিজের প্রশংসা করে এ কথা বলেছেন, "তিনি আরশের ওপর ইস্তিওয়া করেছেন" অর্থাৎ তিনি আরশের ওপর সমুন্নত হয়েছেন।

আর এ কথা বলা বৈধ নয় যে, তিনি (আরশে) স্পর্শ করা ও লেগে থাকার দ্বারা ইস্তিওয়া করেছেন। আল্লাহ্ এ সবকিছু থেকে অনেক ঊর্ধ্বে।

আল্লাহর সঙ্গে কোনো ধরনের রূপান্তর ও পরিবর্তন সম্পৃক্ত হয়নি। আরশ সৃষ্টির পূর্বে এবং আরশ সৃষ্টির পরে সীমা-পরিধি তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়নি।'[৪২৪]

ইমাম ইবনে হামদান হাম্বলী (মৃ. ৬৯৫ হি.) তাঁর আকীদা নকল করেছেন যে,

والله فوق ذلك لا مكان ولا حد؛ لأنه كان ولا مكان، ثم خلق المكان، وهو كما كان قبل خلق المكان.

'(ইমাম আহমদের আকীদা হচ্ছে,) মহান আল্লাহ্ আরশের ঊর্ধ্বে। তাঁর কোনো স্থান নেই এবং কোনো সীমা নেই। কেননা, তিনি ছিলেন, যখন কোনো স্থান ছিল না। এরপর তিনি স্থান সৃষ্টি করেছেন, আর তিনি এভাবেই আছেন, যেভাবে স্থান সৃষ্টি করার পূর্বে ছিলেন।'[৪২৫]

মুফাসসির, মুহাদ্দিস ও ফকীহ্ ইমাম ইবনে জারীর তাবারী (মৃ. ৩১০ হি.) বলেন,

عَلَا عَلَيْهَا عُلُوَّ مُلْكٍ وَسُلْطَانٍ لَا عُلُوَّ انْتِقَالٍ وَزَوَالٍ.

'তিনি আসমানের ওপর সমুন্নত, যা কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার দিক থেকে সমুন্নত হওয়া; **স্থান পরিবর্তন ও অবস্থার বদল হওয়ার মাধ্যমে সমুন্নত হওয়া নয়।**'[৪২৬]

যদি আল্লাহ্ তাআলা আসমানের ওপরে স্থানে আছেন বা আরশ নামক স্থানে আছেন মনে করা হয়, তাহলে তো স্থান পরিবর্তন হওয়ার মাধ্যমে 'তিনি সমুন্নত' এমন মানতে হবে। কেননা, আসমান বা আরশ নামক স্থান সৃষ্টির পূর্বে যেহেতু সংশ্লিষ্ট স্থান ছিল না, তাই এ স্থানে তিনি সমুন্নত ছিলেন না। অথচ তিনি আরশ সৃষ্টির পূর্ব থেকেই সমুন্নত, যেমনটা ইমাম আহমদ রাহ. সুস্পষ্টভাবে বলেছেন। সামনে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হচ্ছে।

তিনি স্থান-দিক, পরিবর্তন-স্থানান্তর এবং তাঁর মাঝে কোনো গুণের সংযোজন হওয়া থেকে পবিত্র হওয়ার দলীল

আল্লাহ্ তাআলা মানুষ ও সৃষ্টির মতো স্থান-কাল-দিক এ-জাতীয় বস্তুর গণ্ডিতে

---

৪২৪. দ্র. ই'তিকাদুল ইমামিল মুনাব্বাল আহমদ ইবনে হাম্বল, পৃষ্ঠা ৩৮

৪২৫. নিহায়াতুল মুবতাদিয়ীন, পৃষ্ঠা ৩১

৪২৬. তাফসীরে তাবারী, ১/৪৩০, সূরা বাকারার ২৯ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

অবস্থানকারী ও আবদ্ধ নন। কেননা,

প্রথমত : স্থান-কাল-দিকজাতীয় বস্তুর গণ্ডিতে অবস্থানকারী ও আবদ্ধ হওয়া সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য এবং সৃষ্টবস্তুর জন্য অপরিহার্য, যা থেকে আল্লাহ তাআলা চিরপবিত্র।

দ্বিতীয়ত : আল্লাহ তাআলা সকল কিছু সৃষ্টির আগেও স্থান-কাল-দিকের ঊর্ধ্বে ছিলেন, এখনো তেমনই আছেন এবং থাকবেন। কারণ, আল্লাহ হলেন স্রষ্টা আর স্থান-কাল-দিক হলো তাঁর সৃষ্টি। তো স্রষ্টা কীভাবে সৃষ্টের মুখাপেক্ষী হবেন?

তাহলে কি তিনি কোনো মুখাপেক্ষিতা ছাড়াই স্থান ও দিক সৃষ্টির পর কোনো স্থানে অবস্থান করছেন এবং কোনো দিকে রয়েছেন?!

না, কখনোই না। কেননা, তিনি সৃষ্টির কোনো কিছুর সাথে যুক্ত ও সংশ্লিষ্ট হওয়া কিংবা সৃষ্টির পর তাঁর ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন আসা বা তিনি স্থানান্তর হওয়া এবং তাঁর মাঝে কোনো গুণের সংযোজন ও যুক্ত হওয়া—এসব থেকে তিনি পবিত্র। এ কারণেই তিনি না বিশ্বজগতের ভেতরে, না বাইরে; না বিশ্বজগতের সাথে যুক্ত, না পৃথক।

তাই একজন মুমিনের বিশ্বাস রাখতে হবে, যখন কিছুই ছিল না, আসমান-জমিন ছিল না, আরশ-ফরশ ছিল না, দিন-রাত ছিল না, ওপর-নিচ ও ডান-বাম ছিল না, স্থান-কাল-দিক বলতে কিছুই ছিল না, বিশ্বজগতের ভেতরে-বাইরে বলার মতো কিছুই ছিল না, কোনো দেহ-শরীর ও আকার-আকৃতিও ছিল না, তখনো তিনি ছিলেন। আবার স্থান-কাল-দিক ও বিশ্বজগৎসহ সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেলেও তিনি থাকবেন।

তো সবকিছু সৃষ্টির আগে যেভাবে তিনি আরশ ও ওপর বা স্থান-কাল-দিক ও বিশ্বজগতের ভেতরে-বাইরে ছাড়া ছিলেন এবং এগুলো ধ্বংস হওয়ার পরও এগুলো ছাড়াই যেভাবে থাকবেন, ঠিক একইভাবে এ দুইয়ের মধ্যবর্তী সময় তথা বর্তমানেও তিনি আরশ ও ওপর বা স্থান-কাল-দিক ও বিশ্বজগতের ভেতরে-বাইরে ছাড়াই আছেন।

সুতরাং তাঁর অস্তিত্ব কোনো স্থান-কাল-দিক অথবা ওপরের দিক ও আরশের প্রতি মুখাপেক্ষী বা বিশেষিত নয়। তাঁর অস্তিত্ব এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, এগুলো সৃষ্টির পর তাঁর মাঝে কোনো পরিবর্তন বা কোনো গুণের সংযোজন হয়নি।

ইমামগণ বিষয়টাকে সংক্ষিপ্ত ভাষায় এভাবে ব্যক্ত করেছেন, 'তিনি আগে যেমন ও যেভাবে ছিলেন, এখনো তেমন ও সেভাবে আছেন।'

তৃতীয়ত : সবার নিকট তিনি অন্য কোনো সত্তার সাথে একীভূত (ইত্তিহাদ) হওয়া অথবা অন্য কারও ভেতরে প্রবিষ্ট হওয়া বা কোনো কিছুর ওপরে অবস্থান করা

(হুলূল) কুফরী আকীদা। আর আল্লাহকে কোনো স্থানে অবস্থানকারী মনে করা হুলূলের আকীদারই একটি অংশ।

কেননা, 'হুলূল' মানে হলো কোনো বস্তু নিজের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রেখে অন্য বস্তুতে অবস্থান করা; চাই তা সেই বস্তুর ভেতরে অবস্থান করুক কিংবা বস্তুর ওপরে-পিঠে অবস্থান করুক, চাই তা সর্বত্র (সব জায়গায় সত্তাগতভাবে) বিরাজমান বা জগৎ জুড়ে হোক কিংবা নির্দিষ্ট স্থান বা আরশ হোক—সর্বাবস্থায় তাকে 'হুলূল' বলা হয়।

সুতরাং আল্লাহ তাআলাকে কোনো বস্তুর ভেতরে প্রবিষ্ট ও সর্বত্র বিরাজমান মনে করা যেমন ভ্রান্ত আকীদা, তেমনই তাঁকে কোনো বস্তুর ওপরে-পিঠে ও আরশে অবস্থানকারী মনে করাও ভ্রান্ত আকীদা।

বিষয়টি কুরআন-হাদীসের ভাষ্য এবং ইজমা' দ্বারা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। তাই কুরআন-হাদীস থেকে কিছু প্রমাণ পেশ করে এবং সালাফ ও ইমামগণের ইজমা' ও তাঁদের বিভিন্ন উক্তির আলোকে বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট দলীলসমৃদ্ধ করার চেষ্টা করব। ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

'নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বজগতের সকল কিছু থেকে অমুখাপেক্ষী।'[৪২৭]

অর্থাৎ তিনি স্থান-কাল-দিক ও আকাশ-আরশসহ সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী।

বুখারীর হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

كَانَ اللهُ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ...

'(সবকিছু সৃষ্টির আগে একমাত্র) আল্লাহ তাআলা ছিলেন, তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আর তাঁর আরশ হলো পানির ওপর।'[৪২৮]

অর্থাৎ যখন কিছুই ছিল না, আকাশ-আরশ, ওপর বা স্থান-কাল-দিক, বিশ্বজগতের ভেতরে-বাইরে বলতে কিছুই ছিল না, তখনো তিনি ছিলেন।

সূরা হাদীদের ৩ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ

'তিনিই সবার আগে, তিনিই সবার শেষে এবং তিনিই সবচেয়ে জাহের, তিনিই সবচেয়ে বাতেন। তিনি সবকিছু পরিপূর্ণভাবে জানেন।'

এ আয়াতে চারটি গুণ বর্ণিত হয়েছে :

---

৪২৭. সূরা আনকাবূত (২৯) : ৬
৪২৮. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩১৯১

১. তিনিই 'আওয়াল' তথা সবার ও সবকিছুর আগে অর্থাৎ যখন কিছুই ছিল না, তখনো তিনি ছিলেন।

২. তিনিই 'আখির' তথা সবার ও সবকিছুর শেষে অর্থাৎ সবকিছু শেষ হয়ে গেলেও তিনি থাকবেন।

৩. তিনিই 'যাহির' তথা সবকিছুর ঊর্ধ্বে; তাঁর ঊর্ধ্বে আর কিছু নেই।

৪. এবং তিনিই 'বাতিন' তথা সবকিছুর সবচেয়ে নিকটবর্তী ও সবচেয়ে অন্তস্তলে; তাঁর অন্তরালে কিছু নেই, তাঁর চেয়ে নিকটবর্তী কিছু নেই।

সূরা হাদীদের এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিস ও মুফাসসির ইমাম তাবারী রাহ. (মৃ. ৩১০ হি.) লেখেন,

{هُوَ الْأَوَّلُ} قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ بِغَيْرِ حَدٍّ {وَالْآخِرُ} يَقُولُ: وَالْآخِرُ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ بِغَيْرِ نِهَايَةٍ، وَإِنَّمَا قِيلَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، لِأَنَّهُ كَانَ وَلَا شَيْءَ مَوْجُودٌ سِوَاهُ، وَهُوَ كَائِنٌ بَعْدَ فَنَاءِ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا، كَمَا قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ} .وَقَوْلُهُ: {وَالظَّاهِرُ} يَقُولُ: وَهُوَ الظَّاهِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ دُونَهُ، وَهُوَ الْعَالِي فَوْقَ كُلِّ شَيْءٍ، فَلَا شَيْءَ أَعْلَى مِنْهُ {وَالْبَاطِنُ} يَقُولُ: وَهُوَ الْبَاطِنُ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ، فَلَا شَيْءَ أَقْرَبُ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُ، كَمَا قَالَ: {وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ}، وَبِنَحْوِ الَّذِي قُلْنَا فِي ذَلِكَ جَاءَ الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَقَالَ بِهِ أَهْلُ التَّأْوِيلِ.

'তিনিই 'আওয়াল' তথা সবকিছুর আগে সর্বদা বিদ্যমান অসীম সত্তা। আর তিনিই 'আখির' তথা সবকিছুর পরে বিদ্যমান অনন্ত সত্তা। এর কারণ হলো, যখন কিছুই ছিল না তখনো তিনি ছিলেন এবং সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরেও তিনি থাকবেন। যেমনটা তিনি অন্য আয়াতে বলেছেন, "সবকিছু ধ্বংস হবে, তাঁর সত্তা ছাড়া।"[৪২৯]

তিনিই 'যাহির' তথা সকল বস্তুর ঊর্ধ্বে, তাঁর চেয়ে ঊর্ধ্বে আর কিছু নেই। আর তিনিই 'বাতিন' তথা তিনি সবকিছুর অন্তস্তলে, ফলে কোনো বস্তুর অতি নিকটবর্তী তাঁর চেয়ে আর কেউ নেই। যেমনটা আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে নিজেই বলেছেন, "আমি তার গলদেশের শিরা অপেক্ষাও বেশি নিকটবর্তী।"'[৪৩০]

এরপর ইমাম তাবারী রাহ. বলেন, 'আয়াতের ব্যাখ্যায় আমরা যা বললাম তার অনুরূপ কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে এবং মুফাসসিরগণও অনুরূপ তাফসীর করেছেন।'[৪৩১]

তাবারী রাহ. যে হাদীসটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, তা মূলত একটি দীর্ঘ দুআর অংশ।

---

৪২৯. সূরা কাসাস, (২৮) : ৮৮

৪৩০. সূরা কাফ, (৫০) : ১৬

৪৩১. তাফসীরে তাবারী, ২৩/১৬৮; আরও দেখুন, তারীখে তাবারী, ১/৩০

যার শব্দমালা এই,

اللهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ.

‘হে আল্লাহ! আপনিই সবার ও সবকিছুর প্রথম, তাই আপনার পূর্বে কিছু নেই। আপনিই সবার ও সবকিছুর অন্ত, তাই আপনার পরে কিছু নেই। আপনিই সবচেয়ে যাহির, তাই আপনার ঊর্ধ্বে কিছু নেই। আপনি সবচেয়ে বাতিন, তাই আপনার অন্তরালে কিছু নেই।’[৪৩২]

সুতরাং ইমাম তাবারীর ব্যাখ্যাটি সহীহ্ হাদীসের শব্দ দ্বারা সমর্থিত।

উপরিউক্ত দুআর ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত ইমাম বায়হাকী রাহ. (মৃ. ৪৫৮ হি.) লেখেন,

وَالَّذِي رُوِيَ فِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِلَى نَفْيِ الْمَكَانِ عَنِ اللهِ تَعَالَى، وَأَنَّ الْعَبْدَ أَيْنَمَا كَانَ فَهُوَ فِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ مِنَ اللهِ تَعَالَى سَوَاءٌ، وَأَنَّهُ الظَّاهِرُ، فَيَصِحُّ إِدْرَاكُهُ بِالْأَدِلَّةِ؛ الْبَاطِنُ، فَلَا يَصِحُّ إِدْرَاكُهُ بِالْكَوْنِ فِي مَكَانٍ. وَاسْتَدَلَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي نَفْيِ الْمَكَانِ عَنْهُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «أَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ». وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فَوْقَهُ شَيْءٌ وَلَا دُونَهُ شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ فِي مَكَانٍ.

‘উপরিউক্ত দুআর হাদীসের শেষাংশে যা বর্ণিত হয়েছে, তাতে আল্লাহ তাআলার মহান সত্তা থেকে স্থান নাকচ করার প্রতি ইশারা রয়েছে। এবং বান্দা যেখানেই থাক, সেখানেই সেই দূরত্ব ও নৈকট্যের বিচারে আল্লাহ তাআলার কাছে সমান।

আর আল্লাহ সবচেয়ে যাহির হওয়ার কারণে তাঁকে দলীল-প্রমাণ দ্বারা সহজেই অনুধাবন করা যায় এবং সবকিছু থেকে সবচেয়ে বাতিন ও গুপ্ত হওয়ার কারণে তিনি কোনো স্থানে থাকার ধারণা সঠিক নয়।

আমাদের মাশায়েখের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ তাআলা কোনো স্থানে না থাকার পক্ষে প্রমাণ হিসেবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরিউক্ত দুআর বাণীটি পেশ করেছেন।

আর যেহেতু আল্লাহ তাআলার ওপরেও কিছু নেই এবং তাঁর নিচেও কিছু নেই, তো তিনি কোনো স্থানে নন বা তাঁর কোনো স্থান নেই।’[৪৩৩]

এভাবে মুহাদ্দিস আবু বকর ইবনুল আরবী মালেকী রাহ.-ও (মৃ. ৫৪৪ হি.) উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণ গ্রহণ করে আল্লাহ তাআলা ওপরে-নিচে কোনো দিকে না

---

৪৩২. মুসলিম, হাদীস নং ২৭১৩
৪৩৩. আল-আসমা ওয়াস সিফাত, বায়হাকী, ২/২৮৯

থাকার কথা বলেছেন।[৪৩৪]

দুআটির ব্যাখ্যায় নাহ্ ও আরবী ভাষার ইমাম যুজাজ (মৃ. ৩১১ হি.) লেখেন,

والله تعالى عالٍ على كل شيء، وليس المراد بالعلو: ارتفاع المحل؛ لأن الله تعالى يجل عن المحل والمكان، وإنما العلو علو الشأن وارتفاع السلطان.

'আল্লাহ্ তাআলা সবকিছুর সুউচ্চে, তবে 'সুউচ্চ' থেকে স্থানগত উচ্চতা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, তিনি স্থান ও জায়গা থেকে বহু ঊর্ধ্বে। 'সুউচ্চ' থেকে উদ্দেশ্য হলো, তিনি সুউচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং তাঁর ক্ষমতা সর্বোচ্চ।'[৪৩৫]

লক্ষ করুন, যখন আরশ-আসমান বলতে কিছুই ছিল না এবং 'ওপর' বা স্থান-কাল-দিকসহ কিছুই ছিল না, তখনো তিনি ছিলেন। আবার যখন এগুলো কিছুই থাকবে না, তখনো তিনি থাকবেন। সবকিছুর ঊর্ধ্বে থাকা স্বত্ত্বেও তিনি সবকিছুর অতি নিকটবর্তী। তো যখন তাঁর আগেও কিছু নেই, তাঁর পরেও কিছু নেই, তাঁর ওপরেও কিছু নেই এবং তাঁর নিচে ও অন্তরালেও কিছু নেই, তখন তিনি যে আরশ ও ওপর বা স্থান-কাল-দিক ও বিশ্বজগতের ভেতরে-বাইরে থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত ও পবিত্র এবং এগুলো সৃষ্টির পর তাঁর মাঝে কোনো পরিবর্তন বা নতুন কোনো গুণের সংযোজন হয়নি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রখ্যাত মুফাসসির ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী রাহ. (মৃ. ৬০৬ হি.) শুরুতে উল্লেখিত সূরা আনকাবূতের ৬ নং আয়াত, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ বিশ্বজগতের সকল কিছু থেকে অমুখাপেক্ষী'-এর তাফসীরে লেখেন,

تدل الآية على أنه ليس في مكان، وليس على العرش على الخصوص؛ فإنه من العالم والله غني عنه، والمستغني عن المكان لا يمكن دخوله في مكان.

'এ আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ তাআলা কোনো স্থানে নন এবং বিশেষভাবে আরশের ওপরও নন। কেননা, স্থান ও আরশ বিশ্বজগতের অন্তর্ভুক্ত। অথচ আল্লাহ্ তাআলা বিশ্বজগৎ থেকে অমুখাপেক্ষী। সুতরাং যিনি স্থান থেকে অমুখাপেক্ষী, তিনি কোনো স্থানে থাকতে পারেন না।'[৪৩৬]

এভাবে কিছু পূর্বে উল্লেখিত সূরা কাসাসের ৮৮ নং আয়াত, 'সবকিছু ধ্বংস হবে, তাঁর সত্তা ছাড়া' উল্লেখ করে ইমাম রাযী রাহ. বলেন,

ظاهر هذه الآية يقتضي فناء العرش وفناء جميع الأحياز والجهات، وحينئذ يبقى الحق سبحانه

---

৪৩৪. দ্র. আরিযাতুল আহওয়াযী, ১২/১৮৪

৪৩৫. তাফসীরু আসমায়িল্লাহিল হুসনা, পৃষ্ঠা ৬০, আরও দেখুন, পৃষ্ঠা ৪৮

৪৩৬. আত-তাফসীরুল কাবীর, ২৫/২৯

وتعالى منزها عن الحيز والجهة، وإذا ثبت ذلك: امتنع كونه الآن في جهة وحيز؛ وإلا لزم وقوع التغير في الذات.

'এ আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, আরশসহ্ সকল স্থান ও দিক ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু মহান আল্লাহ্ তাআলা তখনো বাকি থাকবেন, যিনি স্থান ও দিক হতে চিরপবিত্র। সুতরাং এটা (তিনি স্থান ও দিকসহ্ সবকিছু ধ্বংসের পরও বাকি থাকবেন) যেহেতু সাব্যস্ত হলো, কাজেই এখনো তিনি কোনো দিক ও স্থানে থাকা অসম্ভব। অন্যথায় তাঁর সত্তার মাঝে পরিবর্তন ঘটা জরুরি হয়ে পড়ে।'

এ ছাড়া তিনি 'সূরা ইখলাস' থেকেও এসব বিষয় প্রমাণ করেছেন।[৪৩৭]

আরেকটি দলীল হলো, 'স্থান' বা 'দিক'-এর গণ্ডিতে অবস্থান করা আল্লাহ্ তাআলার **مُحِيطٌ** অর্থাৎ সবকিছুকে পরিবেষ্টন করার গুণের পরিপন্থী। কারণ, সবকিছুকে যিনি পরিবেষ্টন করে রেখেছেন, তিনি কখনো কোনো স্থান ও দিকের গণ্ডিতে অবস্থানকারী হতে পারেন না। তাই আল্লামা ইবনে হাযম যাহেরী রাহ. (মৃ. ৪৫৬ হি.) বলেন,

فَأَما الْقَوْل الثَّالِث فِي الْمَكَان: فَهُوَ أَن الله تَعَالَى لَا فِي مَكَان وَلَا فِي زمَان أصلا، وَهُوَ قَول الْجُمْهُور من أهل السّنة، وَبِه نقُول، وَهُوَ الَّذِي لَا يجوز غَيره لبُطْلَان كل مَا عداهُ، وَلقَوْله تَعَالَى: {أَلَآ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَيۡءٖ مُّحِيطُۢ} فَهَذَا يُوجب ضَرُورَة أَنه تَعَالَى لَا فِي مَكَان، إِذْ لَو كَانَ فِي الْمَكَان: لَكَانَ الْمَكَان محيطاً بِهِ من جِهَة مَا أَو من جِهَات، وَهَذَا مُنْتَفٍ عَن الْبَارِي تَعَالَى بِنَصّ الْآيَة الْمَذْكُورَة... وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ فِي مَكَان إِلَّا مَا كَانَ جسماً أَو عرضا فِي جسم، هَذَا الَّذِي لَا يجوز سواهُ وَلَا يتشكل فِي الْعقل وَالوهم غَيره الْبَتَّةَ، وَإِذا انْتَفَى أَن يكون الله عز وَجل جسما أَو عرضا: فقد انْتَفَى أَن يكون فِي مَكَان أصلا.

'স্থান বিষয়ে তৃতীয় কথা হলো, আল্লাহ্ তাআলা না কোনো স্থানে আছেন, আর না তিনি কোনো সময়ে আবদ্ধ। এটাই অধিকাংশ আহলুস সুন্নাহর মত এবং আমরাও এটাই বলি। আর এ মত ছাড়া অন্য কিছু বৈধ নয়। কারণ, এর বিপরীত হওয়া বাতিল। তা ছাড়া এর বিপরীত না হওয়ার কারণ হচ্ছে, আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন, "জেনে রেখো, তিনি অবশ্যই সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে আছেন।"

এ আয়াত স্পষ্টভাবে আল্লাহ্ তাআলা যে কোনো স্থানে নেই, তা আবশ্যক করে। কেননা, তিনি যদি স্থানে থাকেন, তাহলে স্থানটি এক বা অনেক দিক থেকে তাঁকে বেষ্টন করে ফেলবে। আর এটা আল্লাহ্ তাআলার ক্ষেত্রে হতে পারবে না, যা উল্লেখিত আয়াত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে।'

তিনি আরও বলেন, 'বস্তুত দেহ ও দেহসংশ্লিষ্ট বস্তুই কোনো স্থানে থাকে। অথচ

---

৪৩৭. দেখুন, তাসীসুত তাকদীস, পৃষ্ঠা ৭০ ও ৫৯-৬১, দারু নূরিস সাবাহ

আল্লাহ্ তাআলা দেহ ও দেহসংশ্লিষ্ট বস্তু থেকে মুক্ত। কাজেই তিনি কোনো স্থানে হওয়া থেকেও সম্পূর্ণ মুক্ত।'[৪৩৮]

সূরা বাকারায় আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ

'(হে নবী!) আমার বান্দারা যদি আপনাকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তাহলে (বলুন,) আমি তো (তাদের) কাছেই আছি।'[৪৩৯]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম মাতুরীদী রাহ. (মৃ. ৩৩৩ হি.) তাঁর তাফসীরে বলেন,

لا قرب المكان والذات كقرب بعضهم من بعض في المكان؛ لأنه كان ولا مكان، ويكون على ما كان... والله تعالى يتعالى عن المكان، كان ولا مكان، فهو على ما كان.

'"আমি তো (তাদের) কাছেই আছি"-এর অর্থ এটা নয় যে, মানুষ যেভাবে একে অপরের কাছাকাছি স্থানে হয়, আল্লাহ্ও সে রকম (মানুষের) কাছাকাছি স্থানে হয়। কেননা, তিনি ছিলেন, যখন কোনো স্থান ছিল না। আর আগে যেমন তিনি (স্থানবিহীন) ছিলেন, এখনো তেমন আছেন এবং ভবিষ্যতেও তেমন থাকবেন।'

তিনি আরও বলেন, 'আল্লাহ্ তাআলা 'স্থান' থেকে বহু ঊর্ধ্বে। তিনি স্থান ছাড়াই ছিলেন। সুতরাং তিনি আগের মতোই (স্থানবিহীন) আছেন।'[৪৪০]

একই কথা মুহাদ্দিস ইবনুল আছীর (মৃ. ৬০৬ হি.), প্রসিদ্ধ আরবী ভাষাবিদ ইবনে মানযুর (মৃ. ৭১১ হি.) ও রাগিব আসফাহানী (মৃ. ৫০২ হি.) রাহ.-ও বলেছেন।[৪৪১]

ইমাম আযম আবু হানীফা রাহ.-ও বলেন,

وليس قُرب الله تعالى ولا بُعده من طريق طُوْل المسافة وقِصَرها، ولكن على معنى الكَرامة والهَوان. والمطيعُ قريب منه بلا كيف، والعاصي بعيد منه بلا كيف.

'আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্য ও দূরত্ব (বস্তুগত) দূরে বা কাছে থাকার বিচারে নয়; বরং তা সম্মান ও অপমানের বিচারে। অনুগত বান্দা কোনো ধরন ব্যতীত আল্লাহর নিকটবর্তী এবং অবাধ্য ব্যক্তি কোনো ধরন ব্যতিরেকে আল্লাহ্ থেকে দূরবর্তী।'[৪৪২]

উল্লেখ্য, কিছু ভাই বলে থাকেন, ইমাম আবু হানীফার আকীদা ও মাতুরীদী আকীদা

---

৪৩৮. আল-ফিসাল ফিল মিলাল ওয়ান নিহাল, ২/৯৮; সূরা হা-মীম সাজদাহ, (৪১) : ৫৪

৪৩৯. সূরা বাকারা, (২) : ১৮৬

৪৪০. তাফসীরে মাতুরীদী, ২/৪৮ ও ২/১০৪

৪৪১. আন-নিহায়াহ ফী গারীবিল হাদীস, ৪/৩২; লিসানুল আরব, ২/৬৬৪; মুফরাদাতু গারীবিল কুরআন, পৃষ্ঠা ৬৬৪

৪৪২. আল-ফিকহুল আকবার, বি-রিওয়াতি হাম্মাদ, আকীদা নং ৫২-সূত্রে মাজমূউ কুতুব ওয়া রাসায়িল ওয়া ওসায়াল ইমামিল আযম, পৃষ্ঠা ২৮০, মাকতাবাতুল গানিম

এক নয়। এগুলো দেখে আশা করি এ ভাইদের ভুল ভাঙবে।

সহীহ্ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ.

'নিশ্চয় তোমাদের কেউ যখন নামাজে দাঁড়ায়, তখন সে তার রবের সাথে একান্তে কথা বলে। অথবা নিশ্চয় তার ও কিবলার মাঝে তার প্রতিপালক রয়েছেন। কাজেই তোমাদের কেউ যেন কিবলার দিকে থুতু না ফেলে; বরং সে যেন তা তার বামে অথবা পায়ের নিচে ফেলে।'[৪৪৩]

হাদীসে উল্লেখিত 'তার ও কিবলার মাঝে তার প্রতিপালক রয়েছেন'-এর ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. (মৃ. ৮৫২ হি.) লেখেন,

وَفِيهِ الرَّدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ عَلَى الْعَرْشِ بِذَاتِهِ.

'হাদীসটির মাঝে ওই ব্যক্তির খণ্ডন নিহিত রয়েছে, যে আল্লাহ তাআলাকে সত্তাগতভাবে আরশে আছেন বিশ্বাস করে।'[৪৪৪]

গুলাতুল হানাবিলার ইবনুয যাগুনী তার এক কাব্যে বলেন, 'আল্লাহ তাআলা সত্তাগতভাবে আরশে।' ইমাম যাহাবী রাহ. (মৃ. ৭৪৮ হি.) এর খণ্ডনে বলেন,

قد ذكرنا أن لفظة (بِذَاته) لاَ حَاجَةَ إِلَيْهَا، وَهِيَ تَشْغَبُ النُّفُوْسَ، وَتركُهَا أَوْلَى – وَاللهُ أَعْلَمُ –.

'আমরা উল্লেখ করেছি যে, 'সত্তাগতভাবে' শব্দটির কোনো প্রয়োজন নেই। এ শব্দটি ভ্রান্ত আকীদার দিকে নিয়ে যায়। এটি তরক করা চাই।'

এভাবে ইয়াহয়া বিন আম্মার 'সত্তাগতভাবে' শব্দটি বললে যাহাবী রাহ. বলেন,

قلت: قولك «بذاته» هذا من كيسك.

'এই 'সত্তাগতভাবে' শব্দটি তোমার আকল থেকে বের করেছ!'[৪৪৫]

নুআইম বিন হাম্মাদ বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা সত্তাগতভাবে অবতরণ করেন।' ইমাম ইবনে আব্দিল বার রাহ. (মৃ. ৪৬৩ হি.) এর রদ করে বলেন,

لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ عِنْدَ أَهْلِ الْفَهْمِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ؛ لِأَنَّ هَذَا كَيْفِيَّةٌ، وَهُمْ يَفْزَعُونَ مِنْهَا.

'আহলুস সুন্নাহর নিকট 'সত্তাগতভাবে' শব্দটি অগ্রহণযোগ্য। কেননা, শব্দটি

---

৪৪৩. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪০৫
৪৪৪. ফাতহুল বারী, ১/৫০৮
৪৪৫. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ১৯/৬০৬-৬০৭; আল-উলূ, যাহাবী, পৃষ্ঠা ২৪৫

(আল্লাহর জন্য) ধরন সাব্যস্ত করে। আর এই ধরনকে তাঁরা ভয় করতেন।'[৪৪৬]

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

'পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই। অতএব তোমরা যে দিকেই মুখ ফেরাবে, সেখানেই আল্লাহ। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বব্যাপী ও সর্বজ্ঞ।'[৪৪৭]

আয়াতটির ব্যাখ্যায় ভাষাবিদ আবু হাইয়ান আন্দালুসী রাহ. (মৃ. ৭৪৫ হি.) বলেন,

وفي قوله: {فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ} رَدٌّ عَلَى مَنْ يقُولُ: إِنَّهُ فِي حَيِّزٍ وَجِهَةٍ، لِأَنَّهُ لَمَّا خُيِّرَ فِي اسْتِقْبَالِ جَمِيعِ الْجِهَاتِ: دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِي جِهَةٍ وَلَا حَيِّزٍ، وَلَوْ كَانَ فِي حَيِّزٍ: لَكَانَ اسْتِقْبَالُهُ وَالتَّوَجُّهُ إِلَيْهِ أَحَقَّ مِنْ جَمِيعِ الْأَمَاكِنِ. فَحَيْثُ لَمْ يُخَصِّصْ مَكَانًا: عَلِمْنَا أَنَّهُ لَا فِي جِهَةٍ وَلَا حَيِّزٍ...

'এ আয়াত "তোমরা যে দিকেই মুখ ফেরাবে, সেখানেই আছেন আল্লাহ" ওই ব্যক্তিদের (আকীদাকে) খণ্ডন করে, যারা আল্লাহ তাআলা কোনো স্থানে ও দিকে আছেন বলে। কেননা, সকল দিকে মুখ ফেরানোর যখন ইখতিয়ার দেওয়া হয়েছে, তাহলে তিনি কোনো দিক ও স্থানে না থাকা প্রমাণিত হলো।

আর তিনি যদি কোনো স্থানে থাকতেন, তাহলে সেদিকে মুখ ফেরানো অন্যান্য স্থানের ওপর প্রাধান্য পেত। কিন্তু তিনি যেহেতু কোনো স্থানকে নির্দিষ্ট করেননি, কাজেই আমরা জানতে পারলাম, তিনি কোনো দিক ও স্থানে নেই।'[৪৪৮]

এর ব্যাখ্যায় শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রাহ. (মৃ. ১৩৩৯ হি.) লিখেছেন,

یہ بھی یہود و نصاریٰ کا جھگڑا تھا کہ ہر کوئی اپنے قبلہ کو بہتر بتاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ مخصوص کسی طرف نہیں بلکہ تمام مکان اور جہت سے منزہ۔ البتہ اس کے حکم سے جس طرف منہ کروگے وہ متوجہ ہے۔ تمہاری عبادت قبول کرے گا۔

'এটাও ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের বিতর্কের বিষয় ছিল যে, প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজেদের কিবলাকে শ্রেষ্ঠ বলত। আল্লাহ তাআলা বলে দিলেন, **"তিনি বিশেষ কোনো দিকে নন; বরং তিনি সকল স্থান ও দিক থেকে পবিত্র।"**

অবশ্য তাঁর হুকুমে তোমরা যেদিকেই মুখ করবে, তাঁর রহমতের দৃষ্টি সেদিকেই পাবে, তিনি তোমাদের ইবাদত কবুল করবেন।'[৪৪৯]

হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রাহ. (মৃ. ১৩৬২ হি.) বলেন, 'আল্লাহ

---

৪৪৬. আত-তামহীদ, ৭/১৪৪
৪৪৭. সূরা বাকারা, (২) : ১১৫
৪৪৮. তাফসীরুল বাহরিল মুহীত, ১/৫৭৮
৪৪৯. দ্র. তাফসীরে উসমানী, পৃষ্ঠা ২২, আরও দেখুন, পৃষ্ঠা ৪৮৯, সূরা নামলের ৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা

তাআলা ‘দিক’ থেকে মুক্ত হওয়াটা নকলী ও আকলী উভয় দলীল দ্বারা প্রমাণিত। নকলী দলীল হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞ

“তাঁর মতো বা সদৃশ কিছু নেই।”[৪৫০]

আর আকলী দলীল হলো, ‘দিক’ সৃষ্ট বস্তু ও নশ্বর। যেহেতু নশ্বর বস্তুর সাথে নশ্বর বস্তু সম্পৃক্ত হয়, কাজেই আল্লাহ তাআলা নশ্বর বস্তুর সাথে গুণান্বিত হওয়া থেকে পবিত্র।

আর আল্লাহর ইস্তিওয়া বা উলূর (সমুন্নত হওয়ার) গুণ ‘দিক’কে আবশ্যক করে না। যদি ‘দিক’ সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে ইস্তিওয়া ও উলূর প্রকৃতি উদ্‌ঘাটন হয়ে যাবে। অথচ সালাফ এর প্রকৃতি না জানার কথা স্পষ্ট করে বলেছেন।’

অতঃপর বলেন,

پس حاصل یہ ہوا کہ استواء وعلو میں دو حیثیت ہیں: ایک مع الحکم بالجہۃ، ایک مع عدم الحکم بالجہۃ؛ بل مع الحکم بعدم الجہۃ، اول مذہب ہے مجسمہ کا، دوسرا مذہب ہے اہل سنت کا جن میں محدثین وصوفیہ سب داخل ہیں۔

‘সারকথা হলো, ইস্তিওয়া ও উলূর ব্যাপারে দুটি দৃষ্টিকোণ রয়েছে : ১. ‘দিক’ সাব্যস্ত করা, ২. ‘দিক’ সাব্যস্ত না করা; বরং ‘দিক’ নাকচ করা। প্রথম মাযহাব দেহবাদীদের; আর দ্বিতীয় মাযহাব আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর, যাদের মধ্যে মুহাদ্দিস ও সূফীগণসহ সবাই অন্তর্ভুক্ত।’[৪৫১]

ইমামুল হারামাইন জুয়াইনী ‘রাহ. (মৃ. ৪৭৮ হি.) বলেন, এটা সমস্ত আহলে হকের মাযহাব এবং সকলের সর্বসম্মত বিষয়। তিনি লেখেন,

مذهب أهل الحق قاطبة أن الله سبحانه وتعالى يتعالى عن التحيز والتخصص بالجهات. وذهبت الكرامية وبعض الحشوية إلى أن الباري – تعالى عن قولهم – متحيز مختص بجهة فوق، تعالى الله عن قولهم.

‘সমস্ত আহলে হকের মাযহাব হলো, আল্লাহ তাআলা স্থান ও দিকসমূহের সাথে বিশেষিত হওয়া থেকে চিরপবিত্র। কিন্তু কাররামিয়া ও কিছু হাশাবীর মতে আল্লাহ তাআলা ওপরের দিকে আছেন। আল্লাহ তাআলা তাদের এ সকল কথা থেকে চিরপবিত্র।’[৪৫২]

---

৪৫০. সূরা শূরা, (৪২) : ১১

৪৫১. ইমদাদুল ফাতাওয়া, ১২/১২৮-১২৯

৪৫২. আল-ইরশাদ ইলা কাওয়াতিয়িল আদিল্লাহ ফী উসূলিল ই'তিকাদ, পৃষ্ঠা ২১; একই কথা বলেছেন ইসমাঈল শায়বানী হানাফী রাহ. (মৃ. ৬২৯ হি.) ‘শারহুল আকীদাতুত তাহাবিয়্যা’তে, পৃষ্ঠা ৪৫; আরও দেখুন, গায়াতুল

এভাবে ইমাম আবদুল কাহের বাগদাদী রাহ. (মৃ. ৪২৯ হি.) বলেন,

وأجمعوا على أنه لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان.

'এ ব্যাপারে সকলে (আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ) একমত যে, কোনো স্থান তাঁকে (আল্লাহকে) বেষ্টন করতে পারে না এবং তাঁর ওপর কোনো সময়ও অতিবাহিত হয় না (অর্থাৎ তিনি স্থান ও কাল থেকে মুক্ত)।'[৪৫৩]

এমনকি শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী রাহ.-ও (মৃ. ১৪২০ হি.) বলেন,

إن الله منزه عن المكان باتفاق جميع علماء الإسلام. لماذا؟ لأن الله كان ولا شيء معه، وهذا معروف في الحديث الذي في صحيح البخاري عن عمران بن حصين: (كان الله ولا شيء معه)، ولا شك أن المكان هو شيء، أي: هو شيء وجد بعد أن لم يكن، وإذا قال الرسول: (كان الله ولا شيء معه) معناه: كان ولا مكان له؛ لأنه هو الغني عن العالمين، هذه الحقيقة متفق عليها.

'উলামায়ে ইসলামের ঐকমত্যে আল্লাহ্ তাআলা স্থান থেকে পবিত্র। কেননা, সহীহ বুখারীর হাদীসে এসেছে, "(সবকিছু সৃষ্টির আগে একমাত্র) আল্লাহ্ তাআলা ছিলেন, তাঁর সাথে আর কিছুই ছিল না।" আর নিঃসন্দেহে স্থান একটা 'কিছু', যা অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বশীল হয়েছে।

এখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেহেতু বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা ছিলেন, তাঁর সাথে আর কিছুই ছিল না", তাহলে এর অর্থ হলো, তিনি ছিলেন, যখন তাঁর কোনো স্থান ছিল না। কারণ, তিনি বিশ্বজগতের সকল কিছু থেকে অমুখাপেক্ষী। এটা সর্বসম্মত একটি বাস্তবতা।'[৪৫৪]

বলাবাহুল্য, এ আলোচনার শুরুতে আমরা আল্লাহ তাআলা স্থান-কাল-দিকের গণ্ডি থেকে পবিত্র হওয়ার ওপর সূরা আনকাবূতের যে আয়াত ও সহীহ বুখারীর যে হাদীস দ্বারা দলীল দিয়েছি, সেই একই আয়াতের ভাষ্য ও হাদীস দ্বারা দলীল দিয়ে শায়খ আলবানীও একই বক্তব্য প্রমাণ করেছেন।

আল্লাহ তাআলা স্থান থেকে পবিত্র কেন?

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা স্থান থেকে পবিত্র কেন?

এর উত্তর হিসেবে যদিও ওপরে কিছু কথা এসেছে, তবে সুনির্দিষ্টভাবে এর উত্তর উল্লেখ করছি। আবুছ ছানা লামিশী রাহ. (মৃ. ৫২২ হি.) বলেন,

ولأن في القول بالمكان قولا بقدم المكان، أو بحدوث الباري تعالى، لأنه لو كان لم يزل في المكان:

মারাম ফী ইলমিল কালাম, সাইফুদ্দীন আমেদী, পৃষ্ঠা ১৯৪

৪৫৩. আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক, পৃষ্ঠা ২৮৭

৪৫৪. দুরূসুন লিশ-শায়খ আল-আলবানী, ৩/৩, আল-মাকাতাবাতুশ শামেলা

لكان المكان قديما أزليا. ولو كان ولا مكان، ثم خلق المكان وتمكن فيه: لتغير عن حاله ولحدثت فيه صفة التمكن بعد أن لم تكن، وقبول الحوادث من أمارات الحدث، وهو على الله محال.

'(আল্লাহ তাআলা) স্থানে আছেন বললে হয়তো আল্লাহ তাআলার মতো স্থানকেও অনাদি বলতে হবে, অথবা (সৃষ্ট স্থানের মতো) তাঁকেও সৃষ্ট বলতে হবে। কেননা, তিনি যদি শুরু থেকে স্থানে অবস্থান করেন, তাহলে তো সেই স্থানকেও তাঁর মতো অনাদি মানতে হবে।

আর যদি এমন হয় যে, (সকল কিছু সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র) তিনিই ছিলেন এবং কোনো স্থান ছিল না। তারপর তিনি স্থান সৃষ্টি করলেন এবং তাতে অবস্থান করেন, তাহলে তো তিনি তাঁর পূর্বের অবস্থা থেকে পরিবর্তিত হয়ে গেলেন এবং নতুনভাবে (স্থানে) অবস্থানের একটি গুণ তাঁর মাঝে সৃষ্টি হলো, যা ইতিপূর্বে তাঁর ছিল না। তো সৃষ্ট জিনিস গ্রহণ করা সৃষ্টির লক্ষণ, আর তা আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে অসম্ভব।'[৪৫৫]

ইমাম আবুল মুঈন নাসাফী রাহ. (মৃ. ৫০৮ হি.) বলেন,

ولأن الله كان قبل أن يخلق العرش، فلا يجوز أن يقال: انتقل إلى العرش، لأن الانتقال من صفات المخلوقين وأمارات المحدثين، والله تعالى منزه عن ذلك. ولأن من قال بالاستقرار على العرش فلا يخلو إما أن يقول: بأنه مثل العرش والعرش أكبر منه، أو هو أكبر من العرش، وأيما كان فقائله كافر، لأنه جعله محدودا.

'আল্লাহ তাআলা আরশ সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন। সুতরাং তিনি (আরশ সৃষ্টির পর) আরশে স্থানান্তরিত হয়েছেন, এটা বলা জায়েয নেই। কেননা, স্থানান্তর হলো সৃষ্টির গুণ ও বৈশিষ্ট্য, যা থেকে তিনি চিরপবিত্র।

আর যে বলবে, তিনি আরশে অবস্থান করেন বা উঠেছেন, (এতে তিন অবস্থার কোনো একটি আবশ্যক হবে,) হয় তিনি আরশের সমান হবেন বা আরশ তাঁর থেকে বড় হবে কিংবা তিনি আরশ থেকে বড় হবেন। এ তিনটির যেকোনো একটি বললেই কাফের হয়ে যাবে। কেননা, (এ কথা বলে) সে আল্লাহকে একটা সীমায় আবদ্ধ করে ফেলছে।'[৪৫৬]

ইমাম বুখারী (মৃ. ২৫৬ হি.) রাহ.-এর 'সহীহুল বুখারীর' একটি অধ্যায়ের ব্যাখ্যায় ইবনে বাত্তাল মালেকী (মৃ. ৪৪৯ হি.) রাহ. লেখেন,

غَرضُ الْبُخَارِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ الرَّدُّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ الْمُجَسِّمَةِ فِي تَعَلُّقِهَا بِهَذِهِ الظَّوَاهِرِ، وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ اللهَ لَيْسَ بِجِسْمٍ، فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى مَكَانٍ يَسْتَقِرُّ فِيهِ فَقَدْ كَانَ وَلَا مَكَانَ، وَإِنَّمَا أَضَافَ الْمَعَارِجَ إِلَيْهِ

---

৪৫৫. আত-তামহীদ, পৃষ্ঠা ৯২
৪৫৬. বাহরুল কালাম, পৃষ্ঠা ৫১-৫২

إِضَافَةَ تَشْرِيفٍ، وَمَعْنَى الِارْتِفَاعِ إِلَيْهِ: اعْتِلَاؤُهُ، مَعَ تَنْزِيهِهِ عَنِ الْمَكَانِ.

'এ অধ্যায় রচনা দ্বারা বুখারীর উদ্দেশ্য হচ্ছে, দেহবাদী জাহমীদের খণ্ডন করা। এটা স্বীকৃত যে, আল্লাহ তাআলা দেহধারী নন। সুতরাং তিনি অবস্থানের জন্য কোনো স্থানের প্রয়োজন নেই। তিনি তখনো ছিলেন, যখন কোনো স্থান ছিল না।

তাঁর দিকে (বিভিন্ন কিছু) ওঠা বা আরোহণ করার ইযাফত বা সম্বোধনটা মূলত মর্যাদা বোঝানোর জন্য হয়ে থাকে। আর তাঁর দিকে ঊর্ধ্বগমন করার অর্থ হচ্ছে, সমুন্নত হওয়া। তবে তিনি স্থান থেকে পবিত্র।'

তিনি আরও বলেন,

لَا تَعَلُّقَ لِلْمُجَسِّمَةِ فِي إِثْبَاتِ الْمَكَانِ، لِمَا ثَبَتَ مِنَ اسْتِحَالَةِ أَنْ يَكُونَ سُبْحَانَهُ جِسْمًا، أَوْ حَالًّا فِي مَكَانٍ.

'দেহবাদীরা এখান থেকে (আল্লাহ তাআলার জন্য) স্থান সাব্যস্ত করতে পারবে না। কেননা, তিনি দেহধারী হওয়া কিংবা কোনো স্থানে প্রবিষ্ট হওয়া অসম্ভব।'[৪৫৭]

তিনি বিশ্বজগতের ভেতরে-বাইরে থেকেও পবিত্র

আল্লাহ তাআলা স্থান থেকে যেভাবে পবিত্র, তেমনইভাবে বিশ্বজগতের ভেতরে-বাইরে থেকেও পবিত্র। ইমাম গাযালী শাফেয়ী রাহ. (মৃ. ৫০৫ হি.) বলেন,

وهو أن الله تعالى مقدس عن المكان، ومنزه عن الأقطار والجهات، وأنه ليس داخل العالم ولا خارجه، ولا هو متصل بالعالم ولا هو منفصل عنه.

'আল্লাহ তাআলা স্থান থেকে চিরপবিত্র এবং বিভিন্ন দিক ও প্রান্ত থেকেও পবিত্র। তিনি না বিশ্বের ভেতরে আছেন, না বাইরে; না বিশ্বের সাথে যুক্ত আছেন, না পৃথক।'[৪৫৮]

এর কারণ হলো, ভেতর-বাহির স্থানবিশিষ্ট সত্তার জন্য অপরিহার্য, যা থেকে তিনি পবিত্র। ইমাম ইবনুল জাওযী হাম্বলী রাহ. (মৃ. ৫৯৭ হি.) বলেন,

وكذا ينبغي أن يقال: ليس بداخل في العالم وليس بخارج منه، لأن الدخول والخروج من لوازم المتحيزات.

'অনুরূপ এটাও বলা উচিত যে, আল্লাহ তাআলা না বিশ্বের ভেতরে আছেন, আর না বাইরে। কেননা, ভেতর-বাহির স্থানবিশিষ্ট সত্তার জন্য অপরিহার্য।'[৪৫৯]

---

৪৫৭. ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার, ১৩/৪১৬ ও ১৩/৪৩৩; উমদাতুল কারী, আইনী, ২৫/১১৭
৪৫৮. ইয়াইয়াউ উলূমিদ্দীন, ৪/৪৩৪
৪৫৯. দাফউ শুবাহিত তাশবীহ, পৃষ্ঠা ২২/১৩০

আল্লাহ তাআলাই একমাত্র সত্তা, যাঁর কোনো শুরু-শেষ নেই। কিন্তু স্থান ও এ বিশ্বজগৎ এবং এর ভেতর-বাহিরসহ সকল সৃষ্টির একটা শুরু-শেষ আছে। তাহলে এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তাআলা কোথায় ছিলেন? তিনি বিশ্বজগতের ভেতরে ছিলেন, না বাইরে ছিলেন?

বস্তুত, সে সময় আল্লাহ তাআলা যেভাবে কোনো স্থানেই ছিলেন না, তেমনই বিশ্বজগতের ভেতরেও ছিলেন না, বাইরেও ছিলেন না; থাকার প্রশ্নই আসে না। কারণ, তখন স্থান ও বিশ্বজগৎ বলতে কিছুই ছিল না, তো সেখানে বিশ্বজগতের ভেতরে-বাইরে হওয়ার প্রশ্নই আসে না। আর তখন যেভাবে স্থান থেকে পবিত্র ছিলেন তিনি, এখনো সেভাবে বিশ্বজগতের ভেতরে-বাইরে থেকে পবিত্র তিনি।

তা ছাড়া ভেতর-বাহির ও অন্ধ-চক্ষুষ্মান এসব গুণ ও বিশেষণ কেবল ওই বস্তু ও ব্যক্তির ক্ষেত্রেই বিবেচিত হয়, যাকে এসব গুণ ও বিশেষণে বিশেষিত করা যায়। অন্যথায় এসব গুণ ও বিশেষণ প্রয়োগ ও ব্যবহার কোনোটাই সঠিক নয়।

উদাহরণস্বরূপ কেউ যদি বলে, আপনার ঘরের সামনের গাছটি অন্ধ না চক্ষুষ্মান? তার এ প্রশ্নটাই অর্থহীন ও অবান্তর। কারণ, দেখতে পারা না পারার কোনো গুণ ও বিশেষণে গাছকে বিশেষিত করা যায় না। কাজেই গাছের ক্ষেত্রে এগুলোর প্রয়োগ ও ব্যবহার কোনোটাই সঠিক নয়।

এভাবে 'ছাত্ররা ক্লাসের ভেতরে না বাইরে?' এমন প্রশ্ন করা যায়। কিন্তু গাছের ক্ষেত্রে এমন প্রশ্ন অবান্তর। এ কারণেই কেউ যদি বলে, 'আল্লাহর স্রষ্টা কে?' আমরা বলি, প্রশ্নটাই অবান্তর। কেননা, যিনি সবকিছুর স্রষ্টা, তাঁর স্রষ্টা থাকতে পারে না। কাজেই এমন প্রশ্নই করা যায় না, যেভাবে গাছটি অন্ধ না চক্ষুষ্মান প্রশ্ন করা যায় না কিংবা ক্লাসের ভেতরে না বাইরে এমন প্রশ্ন করা যায় না।

একইভাবে 'আল্লাহ তাআলা বিশ্বজগতের ভেতরে না বাইরে?' এমন প্রশ্ন করা যায় না; বরং তিনি এ থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম কারাফী রাহ. (মৃ. ৬৮৪ হি.) লেখেন,

كما جاز أن يُبصرنا وهو ليس في جهة، وبغير جارحة، نراه نحن وهو ليس في جهة، ونقطع بوجوده، وليس هو داخل العالم، ولا خارج العالم، ولا جسم له.

'যেভাবে তিনি আমাদেরকে দেখেন, অথচ তিনি কোনো দিকে নন এবং অঙ্গধারী নন, আমরাও (জান্নাতবাসীরা) তাঁকে দেখব, অথচ তিনি কোনো দিকে থাকবেন না। আমরা তাঁর অস্তিত্ব অকাট্যভাবে বিশ্বাস করি, অথচ তিনি বিশ্বজগতের ভেতরে

নন এবং বিশ্বের বাইরেও নন। আর তিনি দেহধারী নন।'[৪৬০]

কামালুদ্দীন বায়াযী হানাফী রাহ. (মৃ. ১০৯৮ হি.) বলেন,

بأن لا يكون الباري تعالى داخل العالم، لامتناع أن يكون الخالق داخلا في الأشياء المخلوقة، ولا خارجا عنه بأن يكون في جهة منه، لوجوده تعالى قبل المخلوقات وتحقق الأمكنة والجهات .

'আল্লাহ তাআলা বিশ্বজগতের ভেতরে নন। কারণ, স্রষ্টা খোদ তাঁরই সৃষ্ট বস্তুর মাঝে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন না। এভাবে তিনি বিশ্বের বাইরেও নন। কেননা, সে ক্ষেত্রে তাঁর একটি দিকে থাকা সাব্যস্ত হয়। অথচ তিনি তো সকল সৃষ্টির পূর্বে, এমনকি বিভিন্ন স্থান ও দিক অস্তিত্বে আসার পূর্বেও বিদ্যমান ছিলেন।'[৪৬১]

তিনি ওপরের দিকসহ সকল দিক থেকেও পবিত্র

আল্লাহ তাআলা স্থান ও বিশ্বজগতের ভেতরে-বাইরে থেকে যেভাবে পবিত্র, তেমনইভাবে ওপরের দিকসহ সকল দিক থেকেও পবিত্র। কারণ, স্থান ও বিশ্বজগতের ভেতরে-বাইরে বলতে যখন কিছুই ছিল না, তখনো তিনি ছিলেন এবং ওপরের দিকসহ কোনো দিকই যখন ছিল না, তখনো তিনি ছিলেন। তখন যেভাবে তিনি ওপরের দিকসহ সকল দিকবিহীন ছিলেন, এখনো সেভাবে আছেন। একজন মুমিনকে এমন আকীদাই রাখতে হবে।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম নববী রাহ. (মৃ. ৬৭৬ হি.) বলেন,

اعْتِقَادنَا الْجَازِم أَنَّ اللهَ تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وَأَنَّهُ مُنَزَّهٌ عَنِ التَّجَسُّمِ، وَالِانْتِقَالِ، وَالتَّحَيُّزِ فِي جِهَةٍ، وَعَنْ سَائِرِ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِ.

'আমাদের সুদৃঢ় আকীদা হচ্ছে, কোনো কিছুই আল্লাহ তাআলার মতো নয়। তিনি দেহত্ব, স্থানান্তর, কোনো দিকে অবস্থান করা এবং সৃষ্টির সকল গুণ থেকে চিরপবিত্র।'[৪৬২]

ইমাম আহমদ রাহ. আল্লাহকে দিকমুক্ত মনে করতেন। ইবনুল জাওযী হাম্বলী রাহ. (মৃ. ৫৯৭ হি.) ও ইবনে জামাআহ রাহ. (মৃ. ৭২৭ হি.) উভয়ে বলেন,

وكان أحمد لا يقول بالجهة للباري .

'ইমাম আহমদ রাহ. মহান স্রষ্টার জন্য দিক আছে বলতেন না।'[৪৬৩]

ইমাম নূরুদ্দীন সাবূনী মাতুরীদী হানাফী রাহ. (মৃ. ৫৮০ হি.) বলেন,

---

৪৬০. আল-আজয়িবাতুল ফাখিরাহ আনিল আসয়িলাতিল ফাজিরাহ, কারাফী, পৃষ্ঠা ২৭২

৪৬১. ইশারাতুল মারাম, পৃষ্ঠা ৩৮৫; আরও দেখুন, তাবসিরাতুল আদিল্লাহ, আবুল মুঈন নাসাফী, ১/১৭৭

৪৬২. আল-মিনহাজ শারহু মুসলিম, ৩/১৯

৪৬৩. দ্র. দাফউ শুবাহিত তাশবীহ, পৃষ্ঠা ১৩৫, তাহকীক : সাক্কাফ; ইযাহুদ দলীল, পৃষ্ঠা ১০৮

إن صانع العالم يستحيل أن يكون جسما أو ذا صورة أو فى جهة أو مكان. وزعمت اليهود غلاة الروافض والمشبهة والكرامية أنه جسم. وهشام بن الحكم يصفه بالصورة. وقالت المشبهة والكرامية: إنه متمكن على العرش. وقال بعضهم: إنه على العرش لا بمعنى التمكن، ولكن يثبتون جهة فوق. وقالت النجارية: إنه بكل مكان بالذات. وكل ذلك فاسد؛ لأن فيه أمارات الحدث.

'জগতের স্রষ্টা (আল্লাহ) দেহ বা আকার-আকৃতিবিশিষ্ট হওয়া অথবা কোনো দিকে বা স্থানে থাকা অসম্ভব।

ইহুদী, কট্টর শিয়া-রাফেযী, মুশাব্বিহা (সাদৃশ্যবাদী) ও কাররামিয়াদের আকীদা হলো, তিনি দেহবিশিষ্ট। হিশাম ইবনে হাকামের মতে তিনি আকার-আকৃতিবিশিষ্ট। মুশাব্বিহা (সাদৃশ্যবাদী) ও কাররামিয়াদের মতবাদ হলো, তিনি আরশের ওপর অবস্থানকারী। তাদের কেউ কেউ বলে, তিনি আরশের ওপর অবস্থানগ্রহণ ব্যতীত আরশের ওপর আছেন। নাজ্জারিয়া ফেরকার বিশ্বাস হলো, তিনি সর্বত্র বিরাজমান। এদের সকলের মতবাদই ভ্রান্ত। কারণ, এগুলো সবই সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য।'[৪৬৪]

ইমাম ইবনে ফূরাক রাহ. (মৃ. ৪০৬ হি.) বলেছেন,

اعْلَم أَن الثَّلْجِي... كَانَ يذهب مَذْهَب النجار فِي الْقَوْل: بِأَن الله فِي كل مَكَان، وَهُوَ مَذْهَب الْمُعْتَزلَة. وَهَذَا التَّأْوِيل عندنَا مُنكر من أجل أَنه لَا يجوز أَن يُقَال: إِن الله تَعَالَى فِي مَكَان، أَو فِي كل مَكَان.

'জেনে রেখো, সালজী মূলত নাজ্জারের বিশ্বাস লালন করত। নাজ্জারিয়া ফেরকার বিশ্বাস ছিল, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান। এটি মুতাযিলাদেরও মতবাদ। আমাদের নিকট এই বক্তব্য নিন্দনীয়। কেননা, এটা বলা বৈধ নয় যে, আল্লাহ তাআলা সব জায়গায় অথবা কোনো একটি জায়গায় রয়েছেন।'[৪৬৫]

ইমাম আবুল মুঈন নাসাফী মাতুরীদী হানাফী রাহ. (মৃ. ৫০৮ হি.) বলেন,

ظهر بطلان القول: بأنه تعالى في مكان دون مكان أو في جهة من الجهات، وظهر أيضا بطلان قول من قال: إنه تعالى بكل مكان بذاته.

'আল্লাহ তাআলা কোনো স্থানে অথবা কোনো দিকে থাকার বক্তব্য বাতিল। এবং সত্তাগতভাবে সর্বত্র বিরাজমান থাকার কথাও বাতিল।'[৪৬৬]

সা'দুদ্দীন তাফতাযানী রাহ. (মৃ. ৭৯২ হি.) বলেন,

وإذا لم يكن في مكان: لم يكن في جهة، لا في علو، ولا في سفل، ولا في غيرهما.

---

৪৬৪. আল-বিদায়া মিনাল কিফায়া ফীল হিদায়া ফি উসূলিদ্দীন, পৃষ্ঠা ৪৪

৪৬৫. মুশকিলুল হাদীস, আলামুল কুতুব, বৈরুত, পৃষ্ঠা ১৭০-১৭১

৪৬৬. তাবসিরাতুল আদিল্লাহ ফি উসূলিদ্দীন আলা তরীকাতিল ইমাম আবু মানসুর মাতুরীদী, ১/১৭৩

'আল্লাহ তাআলা যেহেতু স্থান থেকে মুক্ত, কাজেই তিনি দিক থেকেও মুক্ত। তিনি ওপরেও নন, নিচেও নন, অন্য কোনো দিকেও নন।'[৪৬৭]

সুতরাং যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে কোনো স্থান বা দিকের সাথে সম্পৃক্ত করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে। ইমাম গাযালী রাহ. (মৃ. ৫০৫ হি.) লেখেন,

غلط من قال: إنه في كل مكان. وكل من نسبه إلى مكان أو جهة: فقد زلّ فضلّ، ورجع غاية نظره إلى التصرف في محسوسات البهائم ولم يجاوز الأجسام وعلائقها.

'তিনি সব জায়গায় আছেন বলা ভুল। মূলত যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলাকে কোনো স্থান বা দিকের সাথে সম্পৃক্ত করেছে, তার পদস্খলন হয়েছে এবং সে পথভ্রষ্ট হয়েছে। সে তার সমস্ত চিন্তা-ভাবনাকে জীব-জন্তুর ইন্দ্রিয় ক্ষমতার মধ্যেই কেন্দ্রীভূত করে রেখেছে। তার চিন্তা-শক্তি দেহ ও দেহসংশ্লিষ্ট বিষয়ের গণ্ডি থেকেও মুক্ত হয়নি।'[৪৬৮]

ইমাম আবু ইসহাক শীরাযী শাফেয়ী রাহ. (মৃ. ৪৭৬ হি.) বলেন,

فلو كان في جهة فوق: لما وُصِف العبد بالقرب منه إذا سجد.

'তিনি (আল্লাহ) যদি ওপরের দিকে থাকতেন, তাহলে সিজদাকারী বান্দাকে তাঁর নিকটবর্তী বলা হতো না।'[৪৬৯]

সালাফী বন্ধুরা বলে থাকেন, আল্লাহ্ আরশের ওপর আছেন। আর আরশ যেহেতু সবকিছুর ওপরে, তাই আল্লাহর জন্য তারা علو 'স্থানগত উচ্চতা' প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। অথচ সিজদার বিষয়টি নিয়ে তারা যদি একটু চিন্তা করতেন, তাহলে তারা এমন কথা বলতে অবশ্যই ইতস্তত করতেন। কেননা, আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

'আর আপনি সিজদা করুন এবং নিকটবর্তী হোন।'[৪৭০]

আর সিজদায় গিয়ে মুমিন নামাজী বলে,

سبحان ربي الأعلى

'পবিত্র আমার রব, যিনি সুউচ্চে অধিষ্ঠিত।'

সিজদা করার সময় যেখানে নামাজী কয়েক হাত নিচে নেমে আসে, তখন আল্লাহর স্থানগত নিকটবর্তী হয় কী করে? বরং তখন তো আল্লাহ্ ও সিজদাকারীর মাঝে দূরত্ব

---

৪৬৭. শারহুল আকাইদিন নাসাফিয়্যা, পৃষ্ঠা ১৩২

৪৬৮. আল-আরবায়ীন ফী উসূলিদ্দীন, পৃষ্ঠা ২৫৭, দারুল কলম

৪৬৯. আল-ইশারাহ ইলা মাযহাবি আহলিল হাক, পৃষ্ঠা ২৩৮, দারুল কিতাবিল আরবী

৪৭০. সূরা আলাক, (৯৬) : ১৯

আরও বৃদ্ধি পাওয়ার কথা।

এর দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যায়, আল্লাহ তাআলার উচ্চতা 'মর্যাদাগত উচ্চতা', 'স্থানগত উচ্চতা' নয়। আর আমরা সিজদা করে তাঁর মর্যাদাগত নৈকট্য লাভ করি, স্থানগত নয়।

প্রসিদ্ধ হাদীস-ব্যাখ্যাকার হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী আশআরী শাফেয়ী রাহ. (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেন,

قوله: (يَنْزِلُ رَبُّنَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا) اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ أَثْبَتَ الْجِهَةَ، وَقَالَ: هِيَ جِهَةُ الْعُلُوِّ، وَأنكر ذَلِك الْجُمْهُور، لِأَنَّ الْقَوْلَ بِذَلِكَ يُفْضِي إِلَى التَّحَيُّزِ، تَعَالَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ.

'"আল্লাহ তাআলা প্রথম আকাশে অবতরণ করেন" এই হাদীস দ্বারা আল্লাহর জন্য দিক সাব্যস্তকারীরা দলীল পেশ করে বলে, সেটি ওপরের দিক (অর্থাৎ আল্লাহ ওপরের দিকে রয়েছেন)। অথচ অধিকাংশ ইমাম এটা অস্বীকার করেছেন। কেননা, এই কথাটা আল্লাহকে স্থানে অবস্থান করার দিকে নিয়ে যায়, যা থেকে আল্লাহ চিরপবিত্র।'[৪৭১]

একই কথা আল্লামা আইনী মাতুরীদী হানাফী রাহ.-ও (মৃ. ৮৫৫ হি.) বলেছেন,

وأنكر ذلك جمهور العلماء؛ لأن القول بالجهة يؤدي إلى تحيز وإحاطة، وقد تعالى الله عن ذلك.

'অধিকাংশ আলেম এটা অস্বীকার করেছেন। কেননা, এই কথাটা আল্লাহকে স্থানে অবস্থান ও পরিবেষ্টন করার দিকে নিয়ে যায়, যা থেকে আল্লাহ চিরপবিত্র।'[৪৭২]

তবে আল্লামা মুহাম্মাদ বিন আহমদ মালেকী রাহ. (মৃ. ১০৭২ হি.) আল্লাহ তাআলার জন্য কোনো দিক না থাকার বিষয়ে আহলে হকের ইজমা' নকল করেছেন।[৪৭৩]

ইমাম আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রাহ. (মৃ. ১৩৫২ হি.) বলেন,

قال ابن تيمية: من أنكر الجهة في حق الله تعالى فقد أنكر وجودَهُ .قلتُ (القائل الكشميري): ويا

---

৪৭১. ফাতহুল বারী, ৩/৩০

শায়খ বিন বায এর খণ্ডনে 'ফাতহুল বারী'র টীকায় লেখেন,

مراده بالجمهور أهل الكلام! وأما أهل السنة وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان فإنهم يثبتون لله جهة، وهي جهة العلو.

অর্থাৎ "অধিকাংশ থেকে কালামপন্থীরা উদ্দেশ্য, অন্যথায় আহলুস সুন্নাহ তথা সাহাবা ও তাঁদের উত্তম অনুসারীরা আল্লাহর জন্য ওপরের দিক সাব্যস্ত করেন।"

অথচ সাহাবা তো দূরের কথা; বরং মুষ্টিমেয় গুলাতুল হানাবিলা ও ইবনে কুতায়বার মতো দু-একজন ছাড়া আর কারও থেকে সুস্পষ্টভাবে আল্লাহর জন্য ওপরের দিক সাব্যস্তকারী দেখানো যাবে না।

৪৭২. উমদাতুল কারী, ৭/১৯৯

৪৭৩. দ্র. আদ-দুররুছ ছামীন, ১/৪৫-৪৬, দারুল হাদীস কাহেরা; এ বিষয়ে সবিস্তারে জানতে দেখুন, গায়াতুল বয়ান ফী তানযীহিল্লাহি আনিল জিহাতি ওয়াল মাকান, শায়খ খলীল আযহারী

للعجبَ ويا للأسف، كيف سوَّى أمرَ الممكن والواجب؟ أمَا كان له أن يَنْظُرَ أنَّ من أَخْرَجَ العالَمَ كلَّه من كتم العدم إلى بقعة الوجود كيف تكون علاقته معه كعلاقة سائر المخلوقات؟ فإنَّ اللهَ تعالى كان ولم يكن معه شيءٌ، فهو خالقٌ للجهات. والغُلُو في هذا الباب يُشْبِهُ القولَ بالتجسيم، والعياذ بالله أن نتعدَّى حدودَ الشرع.

'ইবনে তাইমিয়া রাহ. বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য দিক অস্বীকার করল, সে আল্লাহর অস্তিত্বকেই অস্বীকার করল।

আমি (কাশ্মীরী) বলি, কী আশ্চর্য, তিনি কীভাবে সৃষ্টি ও স্রষ্টার বিষয়টি একাকার করে ফেললেন!?

উনার এটা ভাবা উচিত ছিল যে, যিনি সমস্ত বিশ্বকে অস্তিত্বহীন ও শূন্য থেকে অস্তিত্বে এনেছেন, তিনি কীভাবে অন্যান্য সৃষ্টির পরস্পর সম্পর্কের মতো নিজেও সেভাবে সম্পর্কিত হবেন!? নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তখন ছিলেন, যখন তাঁর সাথে কিছুই ছিল না। অতঃপর তিনি সকল দিকের সৃষ্টিকারী। (সুতরাং তিনি দিক সৃষ্টির আগে যেভাবে দিকবিহীন ছিলেন, এখনো দিকবিহীন আছেন।)

এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি মূলত দেহবাদের বক্তব্যের সাদৃশ্য হয়ে থাকে। আমরা শরীয়তের সীমালঙ্ঘন করা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় কামনা করছি।'[৪৭৪]

এ জন্যই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর আকীদা হলো, আল্লাহ তাআলা সকল কিছু সৃষ্টির পূর্বে যেমন ছিলেন, এখনো তেমনই আছেন এবং সর্বদা এভাবে থাকবেন।

তিনি পরিবর্তন-স্থানান্তর এবং তাঁর মাঝে কোনো গুণের সংযোজন হওয়া থেকে পবিত্র

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর সর্বসম্মত আকীদা হলো, আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণাবলিতে কোনো ধরনের পরিবর্তন, রূপান্তর ও স্থানান্তর নেই। এমনকি সবকিছু সৃষ্টির পরও তাঁর মাঝে কোনো পরিবর্তন বা কোনো গুণের সংযোজন হয়নি।

প্রখ্যাত মুফাসসির ইমাম ইবনে জারীর তাবারী রাহ. (মৃ. ৩১০ হি.) বলেন,

(القيُّومُ): وَوَجَّهُوهُ إِلَى الْقِيَامِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا زَوَال مَعَهُ وَلَا انْتِقَالَ، وَأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّمَا نَفَى عَنْ نَفْسِهِ بِوَصْفِهَا بِذَلِكَ: التغيُّرَ وَالتَّنَقُّلَ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ وَحُدُوث التَّبَدُّلِ الَّذِي يَحْدُثُ فِي الْآدَمِيِّينَ وَسَائِرِ خَلْقِهِ غَيْرِهِمْ.

'আল্লাহর একটি গুণবাচক নাম হচ্ছে 'আল-কাইয়ূম'। তারা এর ব্যাখ্যা করেছে, যিনি সর্বদাই সুপ্রতিষ্ঠিত, যাঁর অস্তিত্বের কোনো ধ্বংস নেই এবং নেই কোনো

---

৪৭৪. ফয়যুল বারী, ৬/৫৬৩

স্থানান্তর। মূলত আল্লাহ্ তাআলা উক্ত গুণে গুণান্বিত হওয়ার ফলে পরিবর্তন ও এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর এবং মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টির মাঝে যেসব পরিবর্তন সংঘটিত হয়, সেসব বিষয়কে নিজ সত্তা থেকে নাকচ করেছেন।'[৪৭৫]

ইমাম আহমদ রাহ. (মৃ. ২৪১ হি.)-এর আকীদার বিবরণে এসেছে,

والله تعالى لم يلحقه تغير ولا تبدل، ولا تلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش.

'আল্লাহর সঙ্গে কোনো ধরনের রূপান্তর ও পরিবর্তন সম্পৃক্ত হয়নি। আরশ সৃষ্টির পূর্বে এবং আরশ সৃষ্টির পরে সীমা-পরিধি তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়নি।'[৪৭৬]

ইমাম তাহাবী রাহ. (মৃ. ৩২১ হি.) বলেন,

مَا زَالَ بِصِفَاتِهِ قَدِيمًا قَبْلَ خَلْقِهِ، وَلَمْ يَزْدَدْ بِكَوْنِهِمْ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُمْ مِنْ صِفَتِهِ.

'তিনি মাখলূক সৃষ্টি করার আগ থেকেই তাঁর যাবতীয় অনাদি গুণসহ বিদ্যমান (অর্থাৎ তিনি সর্বদা তাঁর সকল গুণের অধিকারী)। মাখলূক সৃষ্টির পর তাঁর মাঝে নতুন কোনো গুণের সংযোজন ঘটেনি, যা মাখলূকের (অস্তিত্বের) আগে ছিল না।'

ইমাম আবুল মুযাফফার ইসফারায়িনী রাহ. (মৃ. ৪৭১ হি.) বলেন,

وأن تَعلم أن كل ما دل على حدوث شيءٍ من الحد، والنهاية، والمكان، والجهة، والسكون، والحركة، فهو مستحيل عليه سبحانه وتعالى، لأن ما لا يكون محدَثاً لا يجوز عليه ما هو دليل على الحدوث .

'জেনে রেখো, সীমা, প্রান্ত, স্থান, দিক, স্থিরতা ও নড়নের মতো নশ্বরতা বোঝায়—এমন সবকিছু আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে অসম্ভব। কেননা, যিনি অবিনশ্বর, তাঁর ক্ষেত্রে নশ্বরতা বোঝায় এমন কিছু প্রয়োগ হতে পারে না।'[৪৭৭]

ইমাম ইবনুল জাওযী হাম্বলী রাহ. (মৃ. ৫৯৭ হি.) বলেন,

الواجب علينا أن نعتقد أن ذات الله تعالى لا تتبعض، ولا يحويها مكان، ولا توصف بالتغيّر ولا بالانتقال .

'আমাদের জন্য এই আকীদা রাখা ওয়াজিব যে, আল্লাহ্ তাআলার সত্তা বিভাজ্য নয়, আর তাঁকে কোনো স্থান বেষ্টন করে না এবং তাঁকে পরিবর্তন ও স্থানান্তরের গুণে গুণান্বিত করা যাবে না।'[৪৭৮]

---

৪৭৫. তাফসীরে তাবারী, ৫/১৭৮, সূরা আলে ইমরানের ২ নং আয়াতের তাফসীর
৪৭৬. ই'তিকাদুল ইমামিল মুনাব্বাল : আহমদ ইবনে হাম্বল, পৃষ্ঠা ৩৮
৪৭৭. আত-তাবসীর ফীদ দ্বীন, পৃষ্ঠা ১৬১
৪৭৮. দাফউ শুবাহিত তাশবীহ, পৃষ্ঠা ৪২/১৭০

ইমাম ইবনে আব্দিল বার মালেকী রাহ. (মৃ. ৪৬৩ হি.) বলেন,

فلما ثبتَ أنه تعالى ليس بِجِسْمٍ ولا جوهر: لم يجب أن يكون مجيئه حركةً ولا نقلةً.

'যেহেতু এ কথা প্রমাণিত যে, আল্লাহ তাআলা দেহধারী নন এবং মৌলিক পদার্থ বা বস্তু নন, তাই তাঁর আসা/আগমন কখনো নড়ন-চলন হতে পারে না এবং স্থানান্তরও হতে পারে না।'[৪৭৯]

হাফেজ ইবনে হাজার রাহ. (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেন,

فَمُعْتَقَدُ سَلَفِ الْأَئِمَّةِ وَعُلَمَاءِ السُّنَّةِ مِنَ الْخَلَفِ: أَنَّ اللهَ مُنَزَّهٌ عَنِ الْحَرَكَةِ وَالتَّحَوُّلِ وَالْحُلُولِ.

'সালাফ ইমাম ও পরবর্তী হাদীসবিশেষজ্ঞ বা আহলুস সুন্নাহ আলেমদের আকীদা হলো, আল্লাহ তাআলা নড়ন-চলন থেকে, পরিবর্তিত-রূপান্তরিত হওয়া থেকে এবং 'হুলূল' বা প্রবিষ্ট হওয়া থেকে চিরপবিত্র।'[৪৮০]

ইমাম শাহ ওলীউল্লাহ দেহলবী রাহ. (মৃ. ১১৭৬ হি.) বলেন,

ليس بجوهر ولا عرض، ولا جسم، ولا في حيز، ولا جهة، ولا يشار إليه بهنا وهناك، ولا يصح عليه الحركة والانتقال والتبديل في ذاته ولا في صفاته.

'তিনি মৌলপদার্থ নন, পরনির্ভর কোনো বস্তু নন এবং দেহধারীও নন। তিনি কোনো স্থানেও নন এবং কোনো দিকেও নন। তিনি এমন সত্তা নন, যাঁর প্রতি এখানে বা ওখানে আছেন বলে ইশারা করা যায় (যেমন : আকাশে বা আরশে)। আর তাঁর সত্তা ও গুণাবলিতে নড়াচড়া, স্থানান্তর ও পরিবর্তন অসম্ভব।'[৪৮১]

সুতরাং আল্লাহ তাআলা এসব থেকে মুক্ত ও চিরপবিত্র।

ইস্তিওয়া বিষয়ে ইমামগণের পদ্ধতি

এখন জানার বিষয় হলো, 'আল্লাহ আরশের ওপর ইস্তিওয়া করেছেন' কথাটির ব্যাপারে ইমামগণের পদ্ধতি কী ছিল?

উত্তর :

যেহেতু কথাটি 'মুতাশাবিহ'র অন্তর্ভুক্ত, তাই 'মুতাশাবিহ'র এ বিষয়ে ইমামগণের দুটি পদ্ধতি পাওয়া যায় : তাফবীয ও তাবীল।

মুফাসসির ইবনে আদিল হাম্বলী রাহ. (মৃ. ৭৭৫ হি.) বলেন,

---

৪৭৯. আত-তামহীদ, ৭/২৩৪
৪৮০. ফাতহুল বারী, ৭/১২৪
৪৮১. আল-আকীদাতুল হাসানাহ, ২৬-৩২

إنَّ قولهُ تعالى: {ثُمَّ استوى عَلَى العرش} من المُتشابِهَاتِ، وللعلماء هاهُنَا مذهبان. الأول: أن يُقْطَعَ بكونه تعالى مُتَعَالِياً عن المكان والجهة، ولا نخوض في تأويل الآية على التَّفْصِيل، بل نُفَوِّض عِلْمَهَا إلى الله تعالى ونقُولُ: الاستواءُ على العَرْشِ صفةٌ لله تعالى بلا كيف يَجِبُ على الرَّجُلِ الإيمان به، ونَكِلُ العلم فيه إلى الله عزَّ وجلَّ... والمَذْهَبُ الثَّانِي: أن نَخُوضَ في تأويلِهِ على التَّفْصيلِ.

'ইস্তিওয়ার আয়াতটি 'মুতাশাবিহ'র অন্তর্ভুক্ত। এ ক্ষেত্রে আলেমগণের দুই মাযহাব : ১. অকাট্যভাবে বিশ্বাস করা আল্লাহ্ তাআলা স্থান ও দিক থেকে পবিত্র এবং আমরা আয়াতটির বিস্তারিত ব্যাখ্যায় নিবিষ্ট হব না; বরং তার ইলম আল্লাহ তাআলার নিকট তাফবীয বা সোপর্দ করে বলব, 'আরশের ওপর ইস্তিওয়া' হচ্ছে আল্লাহ্ তাআলার ধরনহীন একটি সিফাত। মানুষের ওপর ওয়াজিব হচ্ছে এর ওপর ঈমান আনা এবং এই বিষয়ের জ্ঞানকে আল্লাহ্ তাআলার কাছে ন্যস্ত করা। ২. আয়াতটির বিস্তারিত ব্যাখ্যায় নিবিষ্ট হওয়া।'[৪৮২]

ইমাম বায়হাকী রাহ. (মৃ. ৪৫৮ হি.) বলেন,

فَأَمَّا الِاسْتِوَاءُ: فَالْمُتَقَدِّمُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا كَانُوا لَا يُفَسِّرُونَهُ وَلَا يَتَكَلَّمُونَ فِيهِ كَنَحْوِ مَذْهَبِهِمْ فِي أَمْثَالِ ذَلِكَ.

'আমাদের পূর্ববর্তী ইমামগণ ইস্তিওয়ার ব্যাখ্যা করতেন না, এ নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতেন না। এ ধরনের বিষয়গুলোতে এটাই তাঁদের কর্মপদ্ধতি ছিল।'[৪৮৩]

শায়খ যাহেদ কাউসারী রাহ. (মৃ. ১৩৭১ হি.) বলেন,

ومن أنكر أن الرحمن على العرش استوى: فقد أنكر آية من الذكر الحكيم فيكفر، لكن الاستواء الثابت له جل جلاله استواء يليق بجلاله على مراد الله ومراد رسوله من غير خوض في المعنى كما هو مسلك السلف. ومسلك الخلف الحمل على الملك ونحوه على مقتضى اللغة، وليس في ذلك إنكار الآية فحاشاهم من ذلك، وأما حمله على الجلوس والاستقرار: فهو الزيغ المبين.

'যদি কেউ "আল্লাহ্ আরশের ওপর ইস্তিওয়া করেছেন" কথাটিকে অস্বীকার করে, তাহলে সে কুরআনের আয়াতকে অস্বীকার করল, ফলে সে কাফের হয়ে যাবে। সালাফের মাযহাব হলো, অর্থে নিবিষ্ট হওয়া ছাড়া (বিশ্বাস করা যে,) আল্লাহ্ তাআলার জন্য এমন ইস্তিওয়া প্রমাণিত, যা তাঁর শান উপযোগী এবং যা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্য। কিন্তু খালাফ তথা পরবর্তীদের মাযহাব হচ্ছে, রাজত্ব বা আরবী ভাষায় সমর্থিত কোনো অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া। কিন্তু এই অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়া দ্বারা আয়াতকে অস্বীকার করা হয় না। তবে 'ইস্তিওয়া' শব্দটিকে বসা, অবস্থান ও

৪৮২. আল-লুবাব ফী উলূমিল কিতাব, ৯/১৫০
৪৮৩. আল-আসমা ওয়াস সিফাত, বায়হাকী, ২/৩০৩-৩০৪

ওঠার অর্থে নেওয়া স্পষ্ট গোমরাহী।’[৪৮৪]

ইস্তিওয়ার তাবীল

জেনে রাখা দরকার, আহলুস সুন্নাহর যারা ইস্তিওয়ার তাবীল বা অর্থ করেন, তারা এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন যে, ‘ইস্তিওয়া’ কি আল্লাহর সত্তাগত গুণ, না কর্মগত গুণ?

যারা ‘ইস্তিওয়া’কে আল্লাহর সত্তাগত গুণ বলেছেন, তারা এর অর্থ করেছেন, عَلَا তথা ‘তিনি আরশের ওপর সমুন্নত ও সুউচ্চ’।

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার ইবনে বাত্তাল মালেকী রাহ. (মৃ. ৪৪৯ হি.) বলেন, ‘এ অর্থটি সঠিক এবং আহলুস সুন্নাহ ও আহলে হকের মাযহাব।’ হাফেজ ইবনে হাজার শাফেয়ী রাহ. ও আল্লামা আইনী হানাফী রাহ. তা সমর্থন করেছেন।[৪৮৫]

তবে এখানে ‘সমুন্নত ও সুউচ্চ’ থেকে উদ্দেশ্য হলো, মর্যাদার দিক থেকে তিনি সমুন্নত ও সর্বোচ্চ, স্থানগত দিক থেকে নয়।

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. (মৃ. ৮৫২ হি.) বলেন,

وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ جِهَتَيِ الْعُلُوِّ وَالسُّفْلِ مُحَالٌ عَلَى اللهِ: أَنْ لَا يُوصَفَ بِالْعُلُوِّ، لِأَنَّ وَصْفَهُ بِالْعُلُوِّ مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى، وَالْمُسْتَحِيلُ كَوْنُ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ الْحِسِّ .

‘ওপর ও নিচ—এ দুটি দিক আল্লাহ্ তাআলার জন্য অসম্ভব হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, তাঁকে সমুন্নত ও সুউচ্চ গুণে গুণান্বিত করা যাবে না। কেননা, তাঁর সমুন্নত হওয়াটা হলো অর্থগত দিক থেকে, দৃশ্যমান বা পঞ্চেন্দ্রিয় অনুভবে তিনি সমুন্নত ও সুউচ্চ হওয়া অসম্ভব।’[৪৮৬]

আর যারা ‘ইস্তিওয়া’কে আল্লাহর কর্মগত গুণ বলেছেন, তারা এর বিভিন্ন তাবীল ও অর্থ করেছেন।

ইমাম আশআরী রাহ. (মৃ. ৩২৪ হি.)-এর মতে এর তাবীল ও অর্থ হচ্ছে,

أَنَّ اللهَ تَعَالَى فَعَلَ فِي الْعَرْشِ فِعْلًا سَمَّاهُ اسْتِوَاءً، كَمَا فَعَلَ فِي غَيْرِهِ فِعْلًا سَمَّاهُ رِزْقًا أَوْ نِعْمَةً أَوْ غَيْرَهُمَا مِنْ أَفْعَالِهِ.

‘আল্লাহ্ তাআলা আরশে একটি কর্ম সম্পাদন করেছেন, যাকে তিনি নাম দিয়েছেন ‘ইস্তিওয়া’, যেমন তিনি অন্য বিষয়ে কোনো কর্ম সম্পাদন করে তার নাম দেন

---

৪৮৪. আল-আসমা ওয়াস সিফাত, বায়হাকী, পৃষ্ঠা ২৪১, তা’লীক : কাউসারী

৪৮৫. দ্র. শারহুল বুখারী, ইবনে বাত্তাল, ১০/৪৪৮, ৪৪৯-৫০; ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার, ১৩/৪০৬; উমদাতুল কারী, আইনী ২৫/১১১;

৪৮৬. ফাতহুল বারী, ৬/১৩৬

রিযিক, নিয়ামত প্রভৃতি।'[৪৮৭]

আবার কারও কারও মতে ইস্তিওয়ার সম্ভাব্য তাবীল হলো, اسْتَوْلَى তথা 'তিনি ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তার করলেন'।

উল্লেখ্য, কারও কারও মতে এই তাবীল সঠিক নয়। আবার কেউ কেউ বলেছেন, এটি মুতাযিলাদের তাবীল। তবে এর উত্তরে বলা হয়েছে, মুতাযিলারা তাবীল করে অকাট্য ও সুনিশ্চিত মনে করে। কিন্তু আহলুস সুন্নাহর যারা এই তাবীল করে, তারা এটিকে সুনিশ্চিত মনে করে না; বরং সম্ভাব্য মনে করে। কাজেই উভয়ের তাবীল এক পর্যায়ের নয়।

আর কেউ ইস্তিওয়ার তাবীল ও অর্থ বলেছেন,

فَمَعْنَى اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ: أَتَمَّ الْخَلْقَ، وَخَصَّ لَفْظَ الْعَرْشِ لِكَوْنِهِ أَعْظَمَ الْأَشْيَاءِ.

অর্থাৎ 'আল্লাহ সৃষ্টিজগতের পরিপূর্ণতা দান করেছেন। আর এর সাথে আরশ শব্দটি বলার কারণ হলো, এটি সবচেয়ে বড় সৃষ্টি।'[৪৮৮]

এক হিন্দু পণ্ডিত একবার বিতর্কের সময় 'ইস্তিওয়া' থেকে দাবি করে বসে যে, আল্লাহ তাআলা আরশে অবস্থিত, তিনি দেহধারী, নশ্বর এবং একাধিক সত্তা।

হযরত মাওলানা কাসেম নানুতুবী রাহ. (মৃ. ১২৯৭ হি.) উত্তরে তাকে বললেন, 'ইস্তিওয়ার অর্থ অবস্থান করা নয়; বরং এখানে প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে, আরশ (-এর মতো সবচেয়ে বড় সৃষ্টিও) আল্লাহ তাআলার নিয়ন্ত্রণে এবং এর ওপরও আল্লাহর কর্তৃত্ব চলে। কাজেই 'ইস্তিওয়া'র অর্থ আল্লাহ তাআলা আরশে অবস্থিত নয়; বরং আরশ তাঁর কর্তৃত্বাধীন। সুতরাং আল্লাহ তাআলা সীমা ও শরীর থেকে পবিত্র এবং তাঁর সত্তা দেহ, সকল দিক ও সীমার ঊর্ধ্বে।'[৪৮৯]

'ইস্তিকাররা' শব্দ দ্বারা 'ইস্তিওয়া'র তাবীল বা অর্থ করা

ইস্তিকাররা (اسْتَقَرَّ)/ইস্তিকরার শব্দের অর্থ হচ্ছে অবস্থান করা, ওঠা।

শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ উসাইমীন লেখেন,

واستوى على العرش في جميع مواقعها في اللغة العربية لا تقتضي إلا العلو والاستقرار.

"'তিনি আরশের ওপর ইস্তিওয়া করেছেন'-(এর অর্থ) আরবী অভিধান অনুযায়ী

---

৪৮৭. আল-আসমা ওয়াস সিফাত, বায়হাকী, ২/৩০৭

৪৮৮. দ্র. শারহুল বুখারী, ইবনে বাত্তাল, ১০/৪৪৯; ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার, ১৩/৪০৬; উমদাতুল কারী, আইনী ২৫/১১১; আরও দেখুন, তাফসীরে মাতুরীদী, ৭/২৬৭-৬৮

৪৮৯. মুনকিরীনে ইসলাম কো দানদান শেকন জাওয়াবাত, ১/৪৭, ফায়সাল পাবলিকেশন, দেওবন্দ

উচ্চতা ও **অবস্থান ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না।**"[৪৯০]

আর ইবনে তাইমিয়া রাহ. উসমান বিন সাঈদ দারেমী থেকে নকল করে বলেন,

وَلَوْ قَدْ شَاءَ: لَاسْتَقَرَّ عَلَى ظَهْرِ بَعُوضَةٍ ...فَكَيْفَ عَلَى عَرْشٍ عَظِيمٍ أَكْبَرَ مِنَ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرَضِينَ السَّبْعِ؟

'তিনি (আল্লাহ) চাইলে মশার পিঠের ওপর **অবস্থান করতে/উঠতে** পারেন, সেখানে সাত আসমান ও সাত জমিনের চেয়ে এত বড় আরশে আযীমের ওপর (অবস্থান করতে/উঠতে) পারবেন না?'[৪৯১]

অথচ 'অবস্থান করা/ওঠা' সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। তাই আহলুস সুন্নাহ উক্ত শব্দ দ্বারা 'ইস্তিওয়া'র তাবীল করে না; বরং দেহবাদী ও কাররামিয়ার মতো ভ্রান্ত ফেরকা এই তাবীল করে। ইমাম আযম আবু হানীফা রাহ. (মৃ. ১৫০ হি.) বলেন,

نُقِرُّ بأن الله سبحانه تعالى على العرش استوى، من غير أن يكون له حاجةٌ واستقرارٌ عليه.[৪৯২]

'আল্লাহ তাআলা আরশের ওপর ইস্তিওয়া করাটা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু তিনি আরশের প্রতি মুখাপেক্ষী নন এবং **আরশের ওপর অবস্থানকারী নন।**'[৪৯৩]

এরপরও দাবি করা হয়, ইমাম আবু হানীফার আকীদা সালাফী বন্ধুদের মতো!

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম বাগাভী রাহ. (মৃ. ৫১৬ হি.) বলেন,

{ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} قَالَ الْكَلْبِيُّ وَمُقَاتِلٌ: اسْتَقَرَّ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: صَعِدَ. وَأَوَّلَتِ الْمُعْتَزِلَةُ الِاسْتِوَاءَ بِالِاسْتِيلَاءِ وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ فَيَقُولُونَ: الِاسْتِوَاءُ عَلَى الْعَرْشِ صِفَةٌ لله تَعَالَى بِلَا كَيْفٍ، يَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ الْإِيمَانُ بِهِ، وَيَكِلُ الْعِلْمَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

'কালবী ও মুকাতিল বলেছে, 'ইস্তিওয়া' মানে 'ইস্তিকাররা'। আবু উবাইদা বলেছে, 'ছায়িদা' তথা আরোহণ করা। আর মুতাযিলা তাবীল করেছে 'ইস্তাওলা' দ্বারা তথা প্রভাব বিস্তার করা। তবে আহলুস সুন্নাহর মতে 'ইস্তিওয়া' আল্লাহ তাআলার ধরনহীন সিফাত। মানুষের ওপর ওয়াজিব হচ্ছে এর প্রতি ঈমান রাখা এবং এই বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ তাআলার কাছে ন্যস্ত করা।'[৪৯৪]

এখানে 'ইস্তিকাররা'-সহ বাকি সব তাবীলকে আহলুস সুন্নাহর বিপরীত দেখানো

---

৪৯০. শারহুল আকীদাতিস সাফফারীনিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ২২৮; আরও দেখুন, ইবনুল কায়্যিমের 'ইজতিমাউল জুয়ূশিল ইসলামিয়্যাহ', ২/১৪৫

৪৯১. বয়ানু তালবীসিল জাহমিয়্যাহ, ৩/২৪৩

৪৯২. দারু ইবনে হাযম থেকে প্রকাশিত কিতাবে واستقر রয়েছে। এটা ভুল, যা পরের বাক্য থেকেও পরিষ্কার হয়।

৪৯৩. কিতাবুল ওসিয়্যাহ, আকীদা নং ৭-সূত্রে মাজমুউ কুতুব ওয়া রাসায়িল ওয়া ওসায়াল ইমামিল আযম, পৃষ্ঠা ৪৫৭

৪৯৪. মাআলিমুত তানযীল বা তাফসীরে বাগাভী, ৩/২৩৫

হয়েছে। যদি আশআরীরা 'ইস্তাওলা' শব্দ দ্বারা তাবীলের কারণে সমালোচিত হন, তাহলে সালাফীরা 'ইস্তিকাররা' শব্দ দ্বারা তাবীল করার পরও সমালোচনার পাত্র হবেন না কেন? কেননা, দুটোই তো আহলুস সুন্নাহর বিপরীত তাবীল।

ইমাম যাহাবী রাহ. (মৃ. ৭৪৮ হি.) বাগাভী থেকে এটি নকল করার পর বলেন,

قلت: لَا يُعجبنِي قَوْله: «استقر».

'তার 'ইস্তিকাররা' শব্দ (দ্বারা তাবীল করাটা) আমার কাছে পছন্দ নয়।' তিনি অন্যত্র আবু আহমদ কারজী 'ইস্তিকাররা' শব্দ বলার কারণে লেখেন,

قلت: ليته حذف «استواء استقرار».

'হায়! তিনি যদি 'ইস্তিকরার' শব্দটি না বলতেন।'

শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী রাহ.-ও (মৃ. ১৪২০ হি.) 'মুখতাছারুল উলূ'র শুরুতে 'ইস্তিকাররা' শব্দ দ্বারা তাবীল করার বিরোধিতা করেছেন।[৪৯৫]

'মাওসূআতুল আলবানী ফীল আকীদা' গ্রন্থে রয়েছে, শায়খ আলবানী বলেন,

لا يجوز أن يوصف الله بأنه مستقر؛ لأن الاستقرار أولا: صفة بشرية، ثانيا: لم يوصف بها ربنا عز وجل حتى نقول: استقرار يليق بجلاله وكماله، كما نقول في الاستواء.

''ইস্তিকরার' শব্দ দ্বারা আল্লাহকে গুণান্বিত করা বৈধ নয়। কেননা প্রথমত, 'ইস্তিকরার' তথা অবস্থান করা মানবীয় গুণ। দ্বিতীয়ত, উক্ত শব্দে আল্লাহকে গুণান্বিত করা হয়নি, ফলে তাঁর 'ইস্তিকরার' তাঁর শান উপযোগী—এমনও বলা যাবে না, যেভাবে আমরা 'ইস্তিওয়া'র ক্ষেত্রে বলি।'

ইমাম ইবনুল আরবী মালেকী রাহ. (মৃ. ৫৪৩ হি.) বলেন,

وللاستواء في كلامِ العَرَبِ خمسة عشر وجهًا ما بين حقيقةٍ ومجازٍ، منها ما يجوزُ على الله فيكون معنى الآية، ومنها ما لا يجوز بحالٍ، وهو إذا كان الاستواء بمعنى التمكين والاستقرار والاتِّصال والمُجَاوَرَةِ، فإنَّ شيئًا من ذلك لا يجوزُ على الباري تعالى.

'আরবদের কথায় হাকীকত ও রূপক মিলিয়ে ইস্তিওয়া শব্দটির ১৫টি অর্থ রয়েছে। কিছু অর্থ আল্লাহর ক্ষেত্রে বৈধ, তখন সে অর্থ অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে। আর কিছু অর্থ কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়। যেমন : ইস্তিওয়ার অর্থ যদি করা হয় স্থির হওয়া, অবস্থান করা, যুক্ত ও সংস্পর্শ; তাহলে এগুলোর কোনো অর্থই আল্লাহর ক্ষেত্রে বৈধ নয়।'[৪৯৬]

---

৪৯৫. দ্র. আল-উলূ, যাহাবী, পৃষ্ঠা ২৬২, ২৩৯; মুখতাছারুল উলূ, তাহকীক : আলবানী, পৃষ্ঠা ১৬, ২৮০, ২৫৯

৪৯৬. আল-মাসালিক ফী শারহি মুয়াত্তা মালিক, ৩/৪৫২; আরিযাতুল আহওয়াযী, ২/২৩৫, নুযূলের হাদীস

ইবনে বাত্তাল রাহ. (মৃ. ৪৪৯ হি.) বলেন,

وَقَالَتِ الْجِسْمِيَّةُ: مَعْنَاهُ الِاسْتِقْرَارُ... وَأَمَّا قَوْلُ الْمُجَسِّمَةِ فَفَاسِدٌ، لِأَنَّ الِاسْتِقْرَارَ مِنْ صِفَاتِ الْأَجْسَامِ، وَيَلْزَمُ مِنْهُ الْحُلُولُ وَالتَّنَاهِي، وَهُوَ مُحَالٌ فِي حَقِّ اللهِ تَعَالَى، وَلَائِقٌ بِالْمَخْلُوقَاتِ.

'দেহবাদীরা বলে, ইস্তিওয়ার অর্থ হলো অবস্থান করা।... তাদের এ কথা বাতিল। কেননা অবস্থান করা, এটা দেহের গুণাগুণ। আর এতে হুলূল তথা সৃষ্টির মাঝে প্রবিষ্ট হওয়া ও সীমা-পরিসীমা সাব্যস্ত হয়। অথচ আল্লাহর তা অসম্ভব; বরং তা মাখলূকের জন্য প্রযোজ্য।'

হাফেজ ইবনে হাজার শাফেয়ী রাহ. এটি নকল করে সমর্থন করেছেন। আর আল্লামা আইনী হানাফী রাহ. ও কাসতাল্লানী রাহ.-ও একই কথা লিখেছেন।[৪৯৭]

প্রখ্যাত হানাফী ফকীহ ইবনে আবেদীন শামী রাহ. (মৃ. ১২৫২ হি.) বলেন,

(قَوْلُهُ: كَالْكَرَّامِيَّةِ) فِرْقَةٌ مِنْ الْمُشَبِّهَةِ نُسِبَتْ إلَى عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بْنِ كَرَّامٍ، وَهُوَ الَّذِي نَصَّ عَلَى أَنَّ مَعْبُودَهُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتِقْرَارٌ، وَأَطْلَقَ اسْمَ الْجَوْهَرِ عَلَيْهِ، تَعَالَى اللهُ عَمَّا يَقُولُ الْمُبْطِلُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا.

'সাদৃশ্যবাদী কাররামিয়া ফেরকার প্রধান বলেছে, "তার মাবুদ আরশের ওপর অবস্থানকারী।" আল্লাহ তাআলা বাতিলপন্থীদের বক্তব্য থেকে পবিত্র।'[৪৯৮]

প্রশ্ন : আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রাহ. (মৃ. ৭৫১ হি.) বলেছেন,

قول ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} قَالَ: اسْتَقَرَّ.

'বায়হাকী রাহ. উল্লেখ করেছেন যে, ইবনে আব্বাস রাযি. ইস্তিওয়ার অর্থ করেছেন 'ইস্তিকাররা' শব্দ দ্বারা।'[৪৯৯]

উত্তর : জি, উল্লেখ করেছেন ঠিকই। তবে সাথে এর সনদ বা সূত্র যে অগ্রহণযোগ্য, তাও জানিয়ে দিয়েছেন, যা ইবনুল কায়্যিম রাহ. উল্লেখ করেননি। বায়হাকী রাহ. এর সনদ সম্পর্কে লেখেন,

وأبو صالح هذا، والكلبي ومحمد بن مروان كلهم متروك عند أهل العلم بالحديث، لا يحتجُون بشيء من رواياتهم لكثرة المناكير فيها، وظهور الكَذِب منهم في رواياتهم.

'এতে আবু সালেহ, কালবী ও মুহাম্মাদ বিন মারওয়ান নামে (তিনজন) পরিত্যক্ত

৪৯৭. দ্র. শারহুল বুখারী, ইবনে বাত্তাল ১০/৪৪৮; ফাতহুল বারী, ইবনে হাজার ১৩/৪০৬; উমদাতুল কারী, আইনী ২৫/১১১; ইরশাদুস সারী, কাসতাল্লানী ১০/৩৯১

৪৯৮. ফাতাওয়া শামী, ২/৩৫৪

৪৯৯. ইজতিমাউল জুয়ূশিল ইসলামিয়্যাহ, ২/২৪৯

ও অগ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারী রয়েছে।'[৫০০]

প্রখ্যাত মুফাসসির আল্লামা মাহমুদ আলূসী রাহ. (মৃ. ১২৭০ হি.) বলেন,

فمنهم من فسر العرش بالمعنى المشهور، وفسر الاستواء بالاستقرار. وروي ذلك عن الكلبي، ومقاتل، ورواه البيهقي في كتابه: الأسماء والصفات بروايات كثيرة عن جماعة من السلف، وضعفها كلها.

'বায়হাকী রাহ. সালাফের একদল থেকে ইস্তিওয়ার অর্থ 'ইস্তিকাররা' শব্দ দ্বারা করার বিষয়টি বর্ণনা করেছেন, তবে এর সকল সনদ যয়ীফ বলেছেন।'[৫০১]

'কাআদা' / 'জালাসা' শব্দ দ্বারা তাবীল বা অর্থ করা

কাআদা/জালাসা শব্দের অর্থ হচ্ছে বসা, উপবিষ্ট হওয়া।

ইমাম ইবনুল জাওযী হাম্বলী রাহ. (মৃ. ৫৯৭ হি.) বলেন,

ومن المعلوم: أن الاستواء إذا كان بمعنى الاستقرار والقعود لا بد فيه من المماسة. والمماسة إنما تقع بين جسمين أو جرمين والقائل بهذا شبه وجسم... فمن جعل الاستواء على العرش بمعنى الاستقرار والتمكن فقد ساوى بينه عزّ وجل وبين خلقه.

'জানা কথা, ইস্তিওয়া শব্দটির অর্থ যদি অবস্থান করা ও বসা দ্বারা করা হয়, তাহলে (দুটি জিনিসের মাঝে) সংস্পর্শ হতে হবে। আর সংস্পর্শ দেহ ও আয়তনবিশিষ্ট দুটি জিনিসের মাঝে হয়ে থাকে। সুতরাং যে (ইস্তিওয়া শব্দটির) উক্ত অর্থ করবে, সে আল্লাহ তাআলাকে উপমা দিল এবং তাঁকে দেহবিশিষ্ট সাব্যস্ত করল। কাজেই 'ইস্তিওয়া আলাল আরশ'-কে অবস্থান ও স্থির হওয়ার অর্থে নেওয়ার মানে হচ্ছে, আল্লাহ ও সৃষ্টির মাঝে সমমান সাব্যস্ত করা।'[৫০২]

হানাফী ফকীহ মাহমুদ বিন মাযাহ বুখারী রাহ. (মৃ. ৬১৬ হি.) বলেন,

روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال: يكره للرجل أن يقول في دعائه: اللهم إني أسألك بمقعد العز من عرشك.. لأنه وصف الله تعالى بما لا يليق به، وهو القعود والتمكن على العرش، وهو قول المجسمة.

সারাংশ : 'আল্লাহ তাআলাকে আরশের ওপর বসা ও স্থির হওয়া/অবস্থান করার কথা দেহবাদীরা বলে।'[৫০৩]

---

৫০০. দ্র. আল-আসমা ওয়াস সিফাত, বায়হাকী, ২/৩১১, ৩১২
৫০১. তাফসীরে রুহুল মাআনী, ৪/৩৭৪
৫০২. দাফউ শুবাহি মান তশাব্বাহা ওয়া তামাররাদা, তাকীউদ্দীন হিসনী, পৃষ্ঠা ৯-১০
৫০৩. আল-মুহীতুল বুরহানী, ৫/৩১২

আল্লামা আবদুল হাই লাখনাভী রাহ. (মৃ. ১৩০৪ হি.) বলেন,

لِأَنَّهُ وصف الله (تَعَالَى) بِمَا هُوَ بَاطِل، وَهُوَ الْقعُود على الْعَرْش، وَهُوَ قَول المجسمة.

'আল্লাহ তাআলাকে একটা বাতিল গুণে গুণান্বিত করা হচ্ছে আরশের ওপর উপবিষ্ট বলা। আর এটা দেহবাদীদের বক্তব্য।'[৫০৪]

মুহাদ্দিসুল আসর আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী রাহ. বলেন,

أمَّا الاستواءُ بمعنى جلوسه تعالى عليه، فهو باطلٌ لا يَذْهَبُ إليه إلَّا غبيٌّ، أو غويٌّ.

''ইস্তিওয়া'র অর্থ আল্লাহ তাআলার বসা/সমাসীন করাটা বাতিল। বসা/সমাসীন হওয়ার অর্থ কেবল বোকা আর বিভ্রান্ত ব্যক্তি করতে পারে।'[৫০৫]

প্রশ্ন : আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রাহ. (মৃ. ৭৫১ হি.) লিখেছেন,

وَفِي تَفْسِيرِ السُّدِّيِّ عَنْ أَبِي مَالِكٍ وَأَبِي صَالِحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} قَالَ: قَعَدَ.

'ইবনে আব্বাস রাযি. ইস্তিওয়ার অর্থ করেছেন 'কাআদা' শব্দ দ্বারা।'[৫০৬]

উত্তর : প্রথমত, ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে এ ধরনের অর্থ আর কেউ নকল করেছেন বলে জানা যায় না। দ্বিতীয়ত, এর সনদে আবু সালেহ নামক পরিত্যক্ত ও অগ্রহণযোগ্য বর্ণনাকারী রয়েছে।

প্রশ্ন : সূরা বনী ইসরাঈলের ৭৯ নং আয়াতটির 'মাকামে মাহমূদ'-এর তাফসীরে মুজাহিদ রাহ. বলেছেন,

يُجْلِسُهُ مَعَهُ عَلَى الْعَرْشِ.

'আল্লাহ তাআলা তাঁকে (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে) তাঁর সাথে আরশের ওপর বসাবেন।'

উত্তর :

প্রথমত, ইমাম যাহাবী রাহ. বলেন, 'এটি মুনকার বর্ণনা এবং এ বিষয়ে কোনো নস প্রমাণিত নয়, হাদীস হলো ওয়াহিন বা অগ্রহণযোগ্য।' আর শায়খ আলবানী রাহ. তো এ বর্ণনাটির খুবই জোরালোভাবে খণ্ডন করেছেন।[৫০৭]

---

৫০৪. আন-নাফিউল কাবীর, পৃষ্ঠা ৪৮২

৫০৫. ফয়যুল বারী, ৬/৫৬৩

৫০৬. ইজতিমাউল জুয়ূশিল ইসলামিয়্যাহ, ২/২৫১

৫০৭. দ্র. আল-উলূ, যাহাবী, পৃষ্ঠা ১৭০, ১৭১; মুখতাছারুল উলূ, তাহকীক : আলবানী, পৃষ্ঠা ১৩, ১৪, ২৩৪; সিলসিলাতুল আহাদীসিয যয়ীফা, ২/২৫৫-২৫৮

ইমাম যাহাবী রাহ. (মৃ. ৭৪৮ হি.) 'মীযানুল ই'তিদাল' গ্রন্থে বলেন,

ومن انكر ما جاء عن مجاهد في التفسير في قوله: عسى أن... قال: يجلسه معه على العرش.

'মুজাহিদ রাহ. থেকে বর্ণিত ব্যাখ্যাটি মুনকার বা অগ্রহণযোগ্য।'

এ ছাড়া তিনি ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে এ ধরনের একটি ব্যাখ্যাকে জাল আখ্যায়িত করেছেন।[৫০৮]

দ্বিতীয়ত, আয়াতটির প্রসিদ্ধ ও প্রণিধানযোগ্য ব্যাখ্যা হচ্ছে, 'শাফাআতে উযমা' তথা কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বড় শাফাআতের মর্যাদার অধিকারী হবেন, যা মুতাওয়াতির বা অসংখ্য হাদীসে এসেছে।

আর মুজাহিদ রাহ.-এর বর্ণনাটি প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যার বিপরীত হওয়ায় প্রত্যাখ্যাত।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম ইবনে আব্দিল বার রাহ. (মৃ. ৪৬৩ হি.) বলেন,

ومجاهدٌ وإن كان أحدَ المقدَّمين في العلم بتأويلِ القرآن، فإنَّ له قَوْلَيْنِ في تأويل آيتيْنِ، هما مَهْجوران عند العلماء مرغوبٌ عنهما.. والآخرُ: قولُه في قولِ الله عزَّ وجلَّ: {عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} .حدَّثنا ...عن ليثٍ، عن مجاهدٍ: {عَسَى...}، قال: يُوسِّعُ له على العرشِ فيجلسُه معه .وهذا قولٌ مخالفٌ للجماعة من الصحابةِ ومَن بعدَهم، فالذي عليه العلماءُ في تأويل هذه الآية أنَّ المقامَ المحمودَ: الشَّفاعةُ.

'মুজাহিদ রাহ.-এর দুইটি আয়াতের ব্যাখ্যা আলেমগণ বর্জন করেছেন। তন্মধ্যে একটি হলো, আল্লাহ তাঁর রাসূলকে আরশের ওপর পাশে বসানোর ব্যাখ্যা। (কারণ,) তাঁর এই ব্যাখ্যা সাহাবা ও তাঁদের পরবর্তী এক জামাআতের বিপরীত। আলেমগণের মতে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় 'মাকামে মাহমূদ' হলো 'শাফাআত'।'

তিনি আরও বলেন,

وهذا عِندهُم مُنكرٌ في تفسِيرِ هذه الآيةِ، والذي عليه جماعةُ العُلماءِ من الصَّحابةِ والتَّابِعِين ومن بَعدهُم من الخالِفِينَ: أنَّ المقامَ المحمودَ، هُو المُقامُ الذي يَشْفعُ فيه لأُمَّتِهِ .وقد رُوِي عن مُجاهِدٍ مِثْلُ ما عليه الجماعةُ من ذلك، فصارَ إجماعًا في تأوِيلِ الآيةِ من أهلِ العِلم بالكِتابِ والسُّنة .

'এ আয়াতের ব্যাখ্যা হিসেবে বসানোর ব্যাখ্যাটি আহলে ইলমের নিকট মুনকার বা অগ্রহণযোগ্য। সাহাবা, তাবেয়ী ও তাঁদের পরবর্তী আলেমগণের এক জামাআতের মতে 'মাকামে মাহমূদ' হলো 'শাফাআত'। আবার এই ব্যাখ্যাটি মুজাহিদ রাহ. থেকেও বর্ণিত আছে। কাজেই এই ব্যাখ্যাটি আহলে ইলমের সর্বসম্মত ব্যাখ্যায় পরিণত হলো।'[৫০৯]

---

৫০৮. দেখুন, মীযানুল ই'তিদাল, ৩/৪৩৯, ৪/১৭৪
৫০৯. আত-তামহীদ, ৭/১৫৭-৫৮, ১৯/৬৪

এমনকি ইমাম তাবারী রাহ. (মৃ. ৩১০ হি.) উক্ত অগ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যাটির পক্ষে বললেও ব্যাখ্যাটি উল্লেখ করার পর বলেছেন,

وَأَوْلَى الْقَوْلَيْنِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ مَا صَحَّ بِهِ الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... الشَّفَاعَةُ.

'এ বিষয়ে অধিকতর সঠিক বক্তব্য হলো, শাফাআতের ব্যাখ্যা।'[৫১০]

আর ইমাম ইবনে কাসীর রাহ. (মৃ. ৭৭৪ হি.) তো তাঁর তাফসীরে উক্ত অগ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যাটি উল্লেখই করেননি।

এ ছাড়া মুজাহিদ রাহ.-এর ব্যাখ্যাটিকে কেন্দ্র করে ৩১৭ হিজরীতে বাগদাদে বড় ফিতনা ও সংঘর্ষ হয়েছিল। ইমাম ইবনে কাসীর রাহ. ফিতনার ঘটনাটি উল্লেখ করার পর ইন্নালিল্লাহি... পড়ে বলেন, ''সহীহ বুখারী'তে রয়েছে, 'মাকামে মাহমূদের' অর্থ হলো বড় শাফাআতের মর্যাদা। তা হলো, বান্দাদের মধ্যে ফয়সালার ক্ষেত্রে শাফাআতের মর্যাদা। এটা এমন এক মর্যাদা, যার প্রতি সমস্ত সৃষ্টি আগ্রহান্বিত। এমনকি হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামও। এ ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল লোকই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈর্ষান্বিত।'[৫১১]

বিখ্যাত মুফাসসির ইমাম কুরতুবী (মৃ. ৬৭১ হি.) ব্যাখ্যাটি উল্লেখের পর বলেন,

قلت: وهذا قول مرغوب عنه، وإن صح الحديث.

'হাদীস সহীহ মেনে নিলেও তা বর্জিত।'[৫১২]

শায়খ আলবানী রাহ. ব্যাখ্যাটির খণ্ডনে জোরালোভাবে আলোচনার পর বলেন,

وخلاصة القول: إن قول مجاهد هذا – وإن صح عنه – لا يجوز أن يتخذ دينا وعقيدة، ما دام أنه ليس له شاهد من الكتاب والسنة.

'সারকথা হলো, মুজাহিদ রাহ.-এর ব্যাখ্যাটি সহীহ ধরে নিলেও তা আকীদা হিসেবে গ্রহণ করা যাবে না। কারণ, কুরআন-হাদীসে এর কোনো সমর্থন নেই।'[৫১৩]

সৌদি ফতোয়া বোর্ড ও সর্বোচ্চ উলামা পরিষদের সদস্য শায়খ সালেহ বিন ফাওযানকে 'ইস্তিওয়া'র তাবীল 'জালাসা' তথা 'বসা' অর্থ দিয়ে করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন,

---

৫১০. তাফসীরে তাবারী, ১৭/৫২৯

৫১১. আল-কামিল ফীত তারীখ, ইবনুল আছীর, ৬/৭৪৬, দারুল কিতাবিল আরবী; তারীখুল ইসলাম, যাহাবী, ৭/২২১-২২, দারুল গরবিল ইসলামী; আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসীর, ১১/১৮৪, দারু ইহয়াইত তুরাছ, ১১/৩০৩-৪, বাংলা ইসলামিক ফাউন্ডেশন; তারীখুল খুলাফা, সুয়ূতী, পৃষ্ঠা ২৭৮

৫১২. আত-তাযকিরাহ বি-আহওয়ালিল মাওতা ওয়া উমূরিল আখিরাহ, পৃষ্ঠা ৬০৫

৫১৩. মুখতাছারুল উলূ, তাহকীক : আলবানী, পৃষ্ঠা ১৯-২০

هذا باطل؛ لأنه لم يرد تفسيره بالجلوس.

'এটি বাতিল। কারণ, এর ব্যাখ্যা হিসেবে জুলূস বা 'বসা' বর্ণিত হয়নি।'[৫১৪]

অথচ দুঃখজনক বিষয় হলো, আল্লামা ইবনুল কায়্যিম রাহ. (মৃ. ৭৫১ হি.)-এর মতো মহান ব্যক্তি খারেজা বিন মুছআবের (মৃ. ১৬৮ হি.) মতো একজন যয়ীফ ও বিতর্কিত ব্যক্তি থেকে 'ইস্তিওয়ার' তাবীল 'বসা'র কথা সন্তুষ্টচিত্তে উল্লেখ করেছেন,

وهل يكون الاستواء إلّا الجلوس.

''ইস্তিওয়া' তো 'বসা' ছাড়া হতেই পারে না!'[৫১৫]

আরও দুঃখজনক বিষয় হলো, শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ্ উসাইমীন এটি ইবনুল কায়্যিম রাহ. থেকে নকল করে তার একাধিক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৫১৬]

আর তাদের উক্ত তাবীলের মূল সূত্র হলো, আব্দুল্লাহ বিন আহমদ (মৃ. ২৯০ হি.)-এর দিকে নিসবতকৃত বিতর্কিত 'আস-সুন্নাহ' গ্রন্থটি। গ্রন্থটিতে আব্দুল্লাহ্র সনদে খারেজা বিন মুছআব থেকে উক্ত তাবীল উল্লেখ হয়েছে।[৫১৭]

প্রিয় পাঠক, ইসলামী আকীদার প্রথম অধ্যায়ে উল্লিখিত 'ইমাম আহমদ ও গুলাতুল হানাবিলার মাঝে পার্থক্যের কিছু উদাহরণ' শিরোনামের লেখাটি এখন আবার একটু পড়লে অনেক কিছু পরিষ্কার হবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সীরাতে মুস্তাকীমের ওপর পরিচালিত করুন।

সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রশ্নোত্তর

১. প্রসঙ্গ : আসমানের দিকে ইশারা করে আল্লাহ তাআলার নাম বলা

প্রশ্ন : বয়ান ও আলোচনার সময় নিজের হাত দিয়ে আসমানের দিকে ইশারা করে আল্লাহ তাআলার নাম বলা যাবে কি না?

উত্তর : এভাবে ইশারা করে না বলা উচিত। তবে কুরআন-হাদীসে আল্লাহ্ তাআলার দিকে আসমানের সম্বন্ধ করে 'আল্লাহ আসমানে' বলা হয়েছে। যেমন : কুরআনে এসেছে,

ءَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ

৫১৪. শারহু লুমআতিল ই'তিকাদ, পৃষ্ঠা ৩০৫
৫১৫. আছ-ছাওয়াইকুল মুরসালাহ, ৪/১৩০৩
৫১৬. ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৮৪; মাজমূয়ে ফাতাওয়া ও রাসায়েলে উসাইমীন, ১/১৩৫
৫১৭. দেখুন, আস-সুন্নাহ, পৃষ্ঠা ১০৬

'তোমরা কি এ থেকে নির্ভয় হয়ে গেছ যে, যিনি আসমানে ...?'[৫১৮]

তিরমিযীর সহীহ হাদীসে রয়েছে,

ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّماءِ.

'তোমরা জমিনওয়ালাদের ওপর রহম করো। তাহলে আকাশে যিনি আছেন, তিনি তোমাদের ওপর রহম করবেন।'

উক্ত আয়াত ও এ-জাতীয় হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমামগণ বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা 'স্থান' ও 'দিক' থেকে পবিত্র হওয়া সত্ত্বেও যেহেতু অন্যান্য দিক থেকে 'ওপরের দিক' অধিকতর মর্যাদাবান, তাই 'আল্লাহ্ আসমানে' বলে 'ওপরের দিক'টাকে আল্লাহ্ তাআলার দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। এর দ্বারা ইশারা হলো, আল্লাহ্ তাআলার সত্তা ও তাঁর সিফাত সুউচ্চ ও সমুন্নত।

এর কারণ হলো, আরবীতে (السماء) শব্দটি 'আসমান/আকাশ' অর্থে প্রসিদ্ধ হলেও শব্দটি অধিক, অত্যন্ত ও সুউচ্চ বোঝানোর জন্যও ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়,

(يعني علو حاله ورفعته وشرفه./أي: هو رفيع الشأن عظيم المقدار فلان في السماء،)

অর্থাৎ 'অমুক আসমানে তথা তিনি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও অত্যন্ত সম্মানিত' বা 'তার অবস্থা, সম্মান ও মর্যাদা সুউচ্চ।'[৫১৯]

আমাদের বাংলা ভাষাতেও এমন ব্যবহার হয়। যেমন বলা হয়, 'আকাশচুম্বী মর্যাদা', 'আকাশচুম্বী দাম', 'আকাশচুম্বী সাফল্য' ইত্যাদি।

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার শামসুদ্দীন কিরমানী রাহ. (মৃ. ৭৮৬ হি.) লেখেন,

فإن قلت: (في السماء) ما المقصود منه؛ إذ الله تعالى منزه عن المكان والجهة؟

قلت: جهة العلو أشرف، فيضاف إليه إشارة إلى علو الذات والصفات، وليس ذلك باعتبار أنه محله أو جهته، تعالى الله عنه علوا كبيرا.

'তুমি যদি প্রশ্ন করো, আল্লাহ্ তাআলা 'স্থান' ও 'দিক' থেকে পবিত্র হওয়া সত্ত্বেও 'আল্লাহ্ আসমানে' বলার কী উদ্দেশ্য?

আমি উত্তরে বলব, যেহেতু 'ওপরের দিক' অধিকতর মর্যাদাবান, তাই 'ওপরের দিক'টাকে আল্লাহ্ তাআলার দিকে সম্বন্ধ করা হয়। এর দ্বারা ইশারা হলো, আল্লাহ্

---

৫১৮. সূরা মুলক, (৬৭) : ১৬

৫১৯. দেখুন, মুশকিলুল হাদীস, ইবনে ফূরাক, পৃষ্ঠা ১৫৯; আল-মুনতাকা, বাজী, ৬/২৭৪; আল-মাসালিক, ইবনুল আরবী, ৬/৫১৮; আল-মুফহিম, কুরতুবী, ২/১৪৪; তানবীরুল হাওয়ালিক, সুয়ূতী, ২/১৪০; ফাতহুল মুলহিম, শাব্বীর আহমদ উসমানী, ৪/৬৫

তাআলার সত্তা ও তাঁর সিফাত সুউচ্চ হওয়া। এ হিসেবে নয় যে, তা আল্লাহ তাআলার 'স্থান' বা 'দিক', যা থেকে তিনি বহু ঊর্ধ্বে।'[৫২০]

বুখারী শরীফের আরেক শাফেয়ী ব্যাখ্যাকার প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. (মৃ. ৮৫২ হি.) কিরমানী থেকে নকল করেন,

قَوْلُهُ:)فِي السَّمَاءِ(ظَاهِرُهُ غَيْرُ مُرَادٍ؛ إِذِ اللهُ مُنَزَّهٌ عَنِ الْحُلُولِ فِي الْمَكَانِ، لَكِنْ لَمَّا كَانَتْ جِهَةُ الْعُلُوِّ أَشْرَفَ مِنْ غَيْرِهَا: أَضَافَهَا إِلَيْهِ إِشَارَةً إِلَى عُلُوِّ الذَّاتِ وَالصِّفَاتِ.

''আল্লাহ আসমানে' বাক্য থেকে বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা 'স্থানে' প্রবিষ্ট হওয়া থেকে পবিত্র। তবে অন্যান্য দিক থেকে যেহেতু 'ওপরের দিক' অধিকতর মর্যাদাবান, তাই 'ওপরের দিক'টাকে আল্লাহ তাআলার দিকে নিসবত করে ইশারা করা হলো যে, তাঁর সত্তা ও সিফাত সমুন্নত হওয়া।'[৫২১]

বুখারীর অন্যতম হানাফী ব্যাখ্যাকার আল্লামা আইনী রাহ. (মৃ. ৮৫৫ হি.) বলেন,

قَوْله:)فِي السَّمَاء(وَجه هَذَا أَن جِهَة الْعُلُوّ لما كَانَت أشرف: أضيفت إِلَيْه، وَالْمَقْصُود علو الذَّات وَالصِّفَات، وَلَيْسَ ذَلِك باعْتِبَار أَنه مَحَله أَو جِهَته، تَعَالَى الله عَن ذَلِك علوا كَبِيرا... قَوْله:)من فَوق سبع سماوات(لما كَانَت جِهَة الْعُلُوّ أشرف من غَيرهَا: أضيفت إِلَيْه.

'অন্যান্য দিক থেকে 'ওপরের দিক' অধিক মর্যাদাবান, তাই সেই দিকটাকে আল্লাহ তাআলার দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। এ থেকে উদ্দেশ্য হলো, তাঁর সত্তা ও সিফাত সমুন্নত হওয়া। এ হিসেবে নয় যে, তা আল্লাহ তাআলার 'স্থান' বা 'দিক', যা থেকে তিনি বহু ঊর্ধ্বে।'[৫২২]

একই কথা বুখারী শরীফের আরেক ব্যাখ্যাকার আল্লামা শিহাবুদ্দীন কাসতাল্লানী রাহ.-ও (মৃ. ৯২৩ হি.) বলেছেন,

)وكانت تفخر على نساء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وكانت تقول: إن الله) عز وجل (أنكحني) به صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (في السماء) حيث قال تعالى: {زَوَّجْنَاكَهَا} [الأحزاب: ٣٧]، وذات الله تعالى منزّهة عن المكان والجهة، فالمراد بقولها: (في السماء): الإشارة إلى علو الذات والصفات، وليس ذلك باعتبار أن محله تعالى في السماء، تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرًا.

'আল্লাহ তাআলার সত্তা 'স্থান' ও 'দিক' থেকে পবিত্র। কাজেই 'আল্লাহ আসমানে' থেকে উদ্দেশ্য হলো, তাঁর সত্তা ও সিফাত সমুন্নত হওয়া। এ হিসেবে নয় যে, তা

---

৫২০. আল-কাওয়াকিবুদ দারারী শারহুল বুখারী, কিরমানী, ২৫/১৩১
৫২১. ফাতহুল বারী, ১৩/৪১২
৫২২. উমদাতুল কারী, ২৫/১১৪, ১১৫

আল্লাহ্ তাআলার 'স্থান', যা থেকে তিনি বহু ঊর্ধ্বে।'[৫২৩]

ইমামগণের বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, আল্লাহ তাআলাকে 'স্থান' ও 'দিক' থেকে পবিত্র বিশ্বাস করা সত্ত্বেও যেহেতু অন্যান্য দিক থেকে 'ওপরের দিক' অধিক মর্যাদাবান, তাই আসমানের দিকে ইশারা করে আল্লাহ্ তাআলার সাথে কথা বলার সুযোগ রয়েছে। বিশেষত সহীহ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে, 'বিদায় হজের ভাষণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "হে আল্লাহ, তুমি সাক্ষী থাকো"—এ কথা বলে আসমানের দিকে ইশারা করেছেন।' তবে শ্রোতারা 'আসমান'কে আল্লাহ্ তাআলার 'স্থান' মনে করার আশঙ্কা রয়েছে, তাই এমন না করা চাই। কেননা, আকীদার হেফাজত করা জরুরি।

'আসমান' শব্দের মতো 'ফাওক' শব্দটিও দুই অর্থে ব্যবহৃত

ইমাম গাযালী রাহ. (মৃ. ৫০৫ হি.) সূরা আনআমের ১৮ নং ও সূরা নাহলের ৫০ নং আয়াতে বর্ণিত আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বান্দাদের 'ফাওক' তথা ওপরে/ঊর্ধ্বে হওয়া বলতে কী বোঝানো হয়েছে, তার ব্যাখ্যায় বলেন,

إذا سمع لفظ)الفوق(في قوله تعالى: {وهو القاهر فوق عباده} [الأنعام: ١٨]، وفي قوله تعالى: {يخافون ربهم من فوقهم} [النحل: ٥٠]، فليعلم أن)الفوق(اسم مشترك يطلق لمعنيين .أحدهما: نسبة جسم إلى جسم؛ بأن يكون أحدهما أعلى والآخر أسفل؛ يعني: أن الأعلى من جانب رأس الأسفل .وقد يطلق لا لهذا المعنى، فيقال: الخليفة فوق السلطان، والسلطان فوق الوزير؛ وكما يقال: العلم فوق العمل، والصياغة فوق الدباغة .والأول: يستدعي جسما حتى ينسب إلى جسم، والثاني: لا يستدعيه .فليعتقد المؤمن قطعا: أن الأول غير مراد، وأنه على الله تعالى محال؛ فإنه من لوازم الأجسام، أو لوازم أعراض الأجسام.

''ফাওক' তথা 'ওপর/ঊর্ধ্বতা' শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে :

১. যা দেহের সাথে সম্পৃক্ত তথা একজন ওপরে থাকে, আরেকজন নিচে থাকে। যেমন : একজন নিচ তলায়, আরেকজন ওপর তলায়।

২. আবার কখনো 'ফাওক' শব্দটি অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়, প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রীর ওপরে/ঊর্ধ্বে (মর্যাদায়-কর্তৃত্বে)। আর প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীর ওপরে/ঊর্ধ্বে। যেমনইভাবে বলা হয়, ইলম আমলের ওপরে (অর্থাৎ ইলম আমলের চেয়েও উঁচু মর্যাদার), অলংকার বানানোর পেশা চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণ পেশার চেয়ে ওপরে।

---

৫২৩. ইরশাদুস সারী, কাসতাল্লানী, ১০/৩৯৩; আরও দেখুন, ফয়যুল কাদীর, মুনাবী, ১/৪৭৩; বাযলুল মাজহুদ, সাহারানপুরী, ১০/৫৭৫

এখানে প্রথমোক্ত অর্থটি দেহের সাথে সম্পৃক্ত, আর দ্বিতীয় অর্থটিতে তা নেই। কাজেই মুমিন ব্যক্তি অকাট্যভাবে এই আকীদা রাখবে যে, প্রথমোক্ত অর্থটি এসব আয়াতের উদ্দেশ্য নয়। কেননা, এই অর্থ দেহ বা দেহসংশ্লিষ্ট বিষয়কে অপরিহার্য করে, যা আল্লাহ তাআলার ক্ষেত্রে অসম্ভব।'[৫২৪]

২. প্রসঙ্গ : আল্লাহ কোথায়?

প্রশ্ন : হাদীসে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সাহাবীর দাসীকে জিজ্ঞাসা করেছেন, 'আয়নাল্লাহ' তথা 'আল্লাহ কোথায়?' দাসী মহিলাটি উত্তরে বলল, 'আল্লাহ আসমানে'। এ হাদীস থেকে প্রমাণ হয়, 'আল্লাহ তাআলা আসমানে' থাকেন। তিনি যদি আসমানে না থাকেন, তাহলে উক্ত দাসী এ উত্তর দিল কেন? আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা মেনে নিলেন কেন?

উত্তর :

প্রথমত : এটি 'হাদীসুল জারিয়াহ' নামে পরিচিত, এটি অনেক বড় হাদীস। মুসলিম শরীফে হাদিসটির শেষে এভাবে এসেছে, দাসীর মালিক সাহাবী তাকে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন,

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا أُعْتِقُهَا؟ قَالَ: «ائْتِنِي بِهَا» فَأَتَيْتُهُ بِهَا. فَقَالَ لَهَا: «أَيْنَ اللهُ؟» قَالَتْ: فِي السَّمَاءِ. قَالَ: «مَنْ أَنَا؟» قَالَتْ: أَنْتَ رسول الله. قال: «أَعْتِقْهَا؛ فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ».

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি কি তাকে আযাদ করে দেবো? তিনি বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি নিয়ে এলাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আল্লাহ কোথায়? সে বলল, আল্লাহ আসমানে আছেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কে? সে বলল, আপনি আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, তাকে আযাদ করে দাও। কারণ, সে মুমিন।'

সনদের দিক থেকে এ হাদীস সহীহ হলেও এর মতন ও পাঠ বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। বিশেষত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাসীকে কী প্রশ্ন করেছিলেন—এটি বিভিন্ন বর্ণনায় কয়েকভাবে এসেছে, যা ইমাম বায্যার, বায়হাকী ও হাফেজ ইবনে হাজার রাহ.-ও বলেছেন।[৫২৫]

সেখান থেকে একটি বর্ণনা আপনাদের সামনে পেশ করছি। ইমাম আবদুর রাযযাক সানআনী রাহ. (মৃ. ২১১ হি.) ও তাঁর থেকে ইমাম আহমদ রাহ. (মৃ. ২৪১ হি.) সহীহ সনদে বর্ণনা করেন,

---

৫২৪. ইলজামুল আওয়াম আন ইলমিল কালাম, পৃষ্ঠা ৫৬

৫২৫. মুসনাদে বায্যার, ১১/২৪১; মানাকিবুশ শাফেয়ী, বায়হাকী, ১/৩৯৭; আত-তালখীসুল হাবীর, ৩/৪৮০

فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ r: أَتَشْهَدِينَ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: أَتَشْهَدِينَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ r؟ قَالَتْ: نَعَمْ.

‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাসীকে জিজ্ঞাসা করলেন, **“তুমি কি এ সাক্ষী দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই?” সে বলল, “হ্যাঁ।”** এরপর জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি কি সাক্ষী দাও যে, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম?” সে বলল, “হ্যাঁ।”’[৫২৬]

ইবনে কাসীর রাহ. তাঁর ‘তাফসীরে’ (২/৩৩১) বলেন, ‘এর সনদ সহীহ।’

এ বর্ণনায় পেলাম যে, তাকে ‘আল্লাহ কোথায়?’ এটা জিজ্ঞাসা করেননি।

তা ছাড়া ইমাম আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে হিব্বান রাহ.-সহ অন্য একটি ঘটনার হাদীস বর্ণনা করেছেন। এতেও দাসীকে প্রশ্ন করার শব্দ হলো,

فَقَالَ لَهَا: مَنْ رَبُّكِ؟ قَالَتْ: اللهُ. قَالَ: مَنْ أَنَا؟ فَقَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: أَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ.

‘রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাসীকে জিজ্ঞাসা করলেন, **“তোমার রব কে?” সে বলল, “আল্লাহ।”**’[৫২৭]

এ হাদীসেও পেলাম যে, তাকে ‘আল্লাহ কোথায়?’ এটা জিজ্ঞাসা করেননি; বরং ‘তার রব কে?’ জিজ্ঞাসা করেছেন। এটি আবার কবরের প্রসিদ্ধ তিন প্রশ্নের প্রথমটির সাথে হুবহু মিল।

সুতরাং ‘আল্লাহ কোথায়?’—এটাই জিজ্ঞাসা করেছেন দৃঢ়ভাবে বলার সুযোগ নেই।

এখানে সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, এ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মূল উদ্দেশ্য ছিল, দাসীর ঈমান পরীক্ষা করা।

অথচ ইসলামে স্বীকৃত বিষয় হলো, ঈমানের পরীক্ষা হয় ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ’ বা কালেমার সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে, যা এখানে পাওয়া যায়নি। বুখারী-মুসলিমের প্রসিদ্ধ হাদীসে আছে, ‘ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি, তন্মধ্যে প্রথম হলো, কালেমার সাক্ষ্যদান।’ বুখারীর অন্য হাদীসে এসেছে, ‘নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআয বিন জাবাল রাযি.-কে ইয়ামান প্রেরণকালে বলেন, “প্রথমে কালেমার সাক্ষ্যদানের দাওয়াত দেবে।”’ বুখারী-মুসলিমের আরেক হাদীসে

---

৫২৬. মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, হাদীস নং ১৬৮১৪; মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৫৭৪৩, শায়খ শুয়াইব আরনাউত ও তার সঙ্গীগণ ‘মুসনাদে আহমদ’-এর টীকায় ১৩/২৮৬ বলেন,

قلنا: هذا هو اللفظ الصحيح للحديث إن شاء الله.

‘এই হাদীসের এটিই সহীহ শব্দ, ইনশাআল্লাহ।’

৫২৭. মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ১৭৯৪৫; আবু দাউদ, হাদীস নং ৩২৮৩; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ১৮৯, এর সনদ হাসান

রয়েছে, 'আমি লোকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি, তারা কালেমার সাক্ষ্য না দেওয়া পর্যন্ত।' এ ধরনের আরও হাদীস আছে।

অথচ এ বর্ণনাটি ছাড়া অন্য কোনো হাদীসে 'আল্লাহ আসমানে' থাকার সাক্ষ্যদানের কথা বলেননি। তাও আবার এটি সব বর্ণনায় নেই।

তা ছাড়া লক্ষাধিক সাহাবায়ে কেরামের মধ্য থেকে কারও থেকে জানা যায় না যে, 'আয়নাল্লাহ' বা 'আল্লাহ কোথায়?' বলে কারও ঈমান পরীক্ষা করেছেন কিংবা আকীদা শিক্ষা দিয়েছেন। অথচ সালাফী বন্ধুরা এটাকেই আকীদার অন্যতম প্রধান বিষয় বনিয়ে নিয়েছেন! মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী রাহ. বলেন, 'সৌদি সালাফীদের নিকট মূল আকীদা হলো, আল্লাহকে আরশের ওপর বসে আছেন মানতে হবে, তাহলে তুমি মুসলিম; অন্যথায় মুসলিম নও।'[৫২৮]

সারকথা, 'আল্লাহ কোথায়?' এমন শব্দ বলে দাসীকে জিজ্ঞাসা করাটা যেমন অকাট্য নয়, আবার ইসলামে ঈমানের পরীক্ষার এটা স্বীকৃত বিষয়ও নয়।

দ্বিতীয়ত : ইমামগণ এ হাদীসের ব্যাখ্যায় কী বলেছেন, তা দেখুন।

ইমাম খাত্তাবী রাহ. (মৃ. ৩৮৮ হি.) হাদীসটির ব্যাখ্যায় বলেছেন,

فَإِنَّ هَذَا السُّؤَال عَنْ أَمَارَةِ الْإِيمَان وَسِمَة أَهْله، وَلَيْسَ بِسُؤَالٍ عَنْ أَصْل الْإِيمَان وَحَقِيقَته. وَلَوْ أَنَّ كَافِرًا جَاءَنَا يُرِيد الِانْتِقَال مِنْ الْكُفْر إِلَى دِين الْإِسْلَام فَوَصَفَ مِنْ الْإِيمَان هَذَا الْقَدْر الَّذِي تَكَلَّمَتْ الْجَارِيَة: لَمْ يَصِرْ بِهِ مُسْلِمًا، حَتَّى يَشْهَد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُول الله، وَيَتَبَرَّأَ مِنْ دِينه الَّذِي كَانَ يَعْتَقِدهُ.

''আয়নাল্লাহ' বা 'আল্লাহ কোথায়?' বলে ঈমানের আলামত ও আহলে ঈমানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে, এটা আসল ঈমান ও হাকীকতে ঈমান সম্পর্কে প্রশ্ন নয়। যদি কোনো কাফের আমাদের কাছে এসে কুফর থেকে ইসলামে প্রবেশ করতে চায় আর ওই দাসীর মতো ঈমানের বিবরণ দেয়, তাহলে সে কখনো মুসলমান হবে না, যতক্ষণ না 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'র সাক্ষ্য দেবে এবং পূর্বের ধর্ম থেকে সম্পর্কহীন হবে।'[৫২৯]

ইবনুল জাওযী হাম্বলী রাহ.-ও (মৃ. ৩৮৮ হি.) একই কথা বলেছেন।[৫৩০]

মুহাদ্দিস ইমাম কুরতুবী মালেকী রাহ. (মৃ. ৬৫৬ হি.) বলেন,

أين الله؟ هذا السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم تنزل مع الجارية على قدر فهمها، إذ أراد أن

---

৫২৮. ইলমী খুতবাত, ১/১২৯-১৩০, সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত

৫২৯. মাআলিমুস সুনান, ১/২২২

৫৩০. মাআলিমুস সুনান, ১/২২২; কাশফুল মুশকিল, ৪/২৩৫

يظهر منها ما يدل على أنها ليست ممن يعبد الأصنام والحجارة التي في الأرض فأجابت بذلك... و(أين) ظرف يسأل به عن المكان... وهو لا يصح إطلاقه على الله تعالى بالحقيقة، إذ الله تعالى منزه عن المكان، كما هو منزه عن الزمان، بل هو خالق الزمان والمكان ولم يزل موجودا، ولا زمانَ ولا مكانَ، وهو الآن على ما عليه كان... فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعرّف منها: هل هي ممن يعتقد أن معبوده في بيت الأصنام، أم لا؟ فقال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء، فقنع منها بذلك، وحكم بإيمانها؛ إذ لم تتمكن من فهم غير ذلك.

'"আল্লাহ কোথায়?" প্রশ্নটি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাসীর বুঝ অনুসারে করেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, দাসী থেকে এটার প্রমাণ গ্রহণ করা যে, সে জমিনের মূর্তি ও পাথরপূজারীদের মধ্য থেকে নয়। আর সেও ঠিক ওই জবাবটি দিয়েছে। 'আয়না' বা 'কোথায়' শব্দটি (আরবী ভাষায়) কোনো স্থান সম্পর্কে জানতে বলা হয়। ফলত আল্লাহর ক্ষেত্রে এর প্রকৃত অর্থের ব্যবহার শুদ্ধ নয়। কেননা, তিনি 'সময়'-এর মতো 'স্থান' থেকেও পবিত্র; বরং তিনি নিজেই এসবের স্রষ্টা। তিনি তো সেই সময়ও ছিলেন, যখন সময়-স্থান বলতে কিছুই ছিল না। আর তিনি এখনো তেমনই আছেন, পূর্বে যেমন ছিলেন।

কাজেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাসী সম্পর্কে এটা জানা উদ্দেশ্য ছিল যে, তার মাবুদ জমিনের মূর্তি কি না? ফলে তাকে এ বলে জিজ্ঞাসা করলেন যে, "আল্লাহ কোথায়?" সে উত্তরে বলল, "আল্লাহ আসমানে।" আর এতেই তিনি সন্দেহমুক্ত হলেন এবং উক্ত দাসীকে মুমিন সাব্যস্ত করলেন।'[৫৩১]

প্রসিদ্ধ মুফাসসির ইমাম কুরতুবী মালেকী রাহ. (মৃ. ৬৭১ হি.) তাঁর শায়খ মুহাদ্দিস কুরতুবী থেকে এটি নকল করার পর লেখেন,

هذا قول المحققين في تأويل هذا الحديث، فتأمله. قلت: هذا هو الصحيح في الباب.

'(মুহাদ্দিস কুরতুবী) বলেছেন, এই হাদীস সম্পর্কে মুহাক্কিকদের মত এটা। (মুফাসসির) কুরতুবী বলেন, এটাই এ বিষয়ে সহীহ কথা।'[৫৩২]

হাদীস-ব্যাখ্যাকার ইমাম মুযহিরী হানাফী রাহ. (মৃ. ৭২৭ হি.) বলেন,

فإن كانت من المشركين يتبين كفرها بأن تشير إلى صنم بلد أو قوم.

'যদি উক্ত দাসী মুশরিক হতো, তাহলে সে শহর বা গোত্রের মূর্তির প্রতি ইশারা করত। আর এতে তার কুফর প্রকাশ পেত।'[৫৩৩]

---

৫৩১. আল-মুফহিম, ২/১৪২-১৪৫

৫৩২. আল-আসনা ফী শারহি আসমাইল্লাহিল হুসনা, কুরতুবী ২/১৩৯-১৪১

৫৩৩. আল-মাফাতীহ শারহুল মাছাবীহ, ৪/১০৮

এ ছাড়া ইমাম বায়হাকী, মাযেরী, ইবনুল আরবী, কাযী ইয়ায, নববী, বায়যাবী, তীবী, ইবনে রাসালান, আইনী, সুয়ূতী, মোল্লা আলী কারী, আব্দুল হক দেহলবী, আমীর ছানআনী রাহ.-সহ অনেক ইমাম এ ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[৫৩৪]

ইমাম নববী রাহ. (মৃ. ৬৭৬ হি.) বলেন,

هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ أَحَادِيثِ الصِّفَاتِ، وَفِيهَا مَذْهَبَانِ: أَحَدُهُمَا: الْإِيمَانُ بِهِ مِنْ غَيْرِ خَوْضٍ فِي مَعْنَاهُ، مَعَ اعْتِقَادِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وَتَنْزِيهِهِ عَنْ سِمَاتِ الْمَخْلُوقَاتِ. وَالثَّانِي: تَأْوِيلُهُ بِمَا يَلِيقُ بِهِ.

'এই হাদীস সিফাত-সংক্রান্ত হাদীসের অন্তর্ভুক্ত। সিফাতের ব্যাপারে দুটি মাযহাব রয়েছে। একটি (তথা তাফবীয) হলো, এর অর্থ নিয়ে নিমগ্ন না হয়ে ঈমান রাখা। সাথে এ আকীদা রাখা যে, আল্লাহ তাআলার মতো কোনো কিছুই নেই এবং তিনি সৃষ্টির সকল সাদৃশ্য থেকে পবিত্র।

দ্বিতীয় মত হলো, আল্লাহর সত্তার উপযোগী এর তাবীল বা ব্যাখ্যা করা।'[৫৩৫]

তৃতীয়ত : সালাফী বন্ধুরা আল্লাহ তাআলা আসমান বা আরশে থাকা বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর বক্তব্য পেশ করেন। তাই এ বিষয়ে তাঁর একটি বক্তব্য উল্লেখ করছি। আবু মুতী' বলখী বলেন, আমি (ইমাম আবু হানীফাকে) বললাম,

قلتُ: أرأيتَ لو قيل: أين الله تعالى؟ فقال: يقال له: كان الله تعالى ولا مكان، كان قبل أن يخلق الخلق، كان الله ولم يكن أين ولا خَلْقَ ولا شيءَ، وهو خالق كل شيء.

'আচ্ছা বলুন তো, যদি প্রশ্ন করা হয়, আল্লাহ কোথায়?

তিনি (আবু হানীফা রাহ.) বললেন, উত্তরে বলা হবে, আল্লাহ তাআলা তখন ছিলেন, যখন কোনো 'স্থান' ছিল না। গোটা সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার আগেও তিনি ছিলেন। এমনকি আল্লাহ তাআলা তখন ছিলেন, যখন 'আয়না' বা 'কোথায়' (বলার মতো কিছু) ছিল না এবং 'সৃষ্টি' ও 'বস্তু' কোনো কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। কারণ, তিনি সবকিছুর স্রষ্টা।'[৫৩৬] এখানে তাঁকে স্থান থেকে মুক্ত বলেছেন।

একই কথা ইমাম আবু মানসুর মাতুরীদী রাহ.-ও বলেছেন। তিনি লেখেন,

---

৫৩৪. দেখুন, মানাকিবুশ শাফেয়ী, বায়হাকী ১/৩৯৭; শারহু মুসলিম, নববী ৫/২৪; আল-মু'লিম, মাযেরী ১/৪১২; আল-মাসালিক, ইবনুল আরবী ৬/৫১৮; ইকমালুল মু'লিম, ইয়ায ২/৪৬৫; শারহু আবী দাউদ, ইবনে রাসালান ৫/১২১; শারহু আবী দাউদ, আইনী ৪/১৮৬; শারহুত তীবী ৭/২৩৫২; তুহফাতুল আবরার, বায়যাবী ২/৩৯৫; আদ-দীবাজ, সুয়ূতী ২/২১৭; মিরকাতুল মাফাতীহ, ৫/২১৫৬; লামাআতুত তানকীহ, ৪/৩৫; আত-তাহবীর, আমীর ছানআনী ৫/৪৯৬

৫৩৫. শারহু মুসলিম, নববী ৫/২৪

৫৩৬. আল-ফিকহুল আকবার, বি-রিওয়াতি আবু মুতী' (প্রচলিত আল-ফিকহুল আবসাত), আকীদা নং ৪৮-সূত্রে মাজমুউ কুতুব ওয়া রাসায়িল ওয়া ওসায়াল ইমামিল আযম, পৃষ্ঠা ৩৩৬

إن الله سبحانه كان ولا مكان، وجائز ارتفاع الأمكنة وبقاؤه على ما كان، فهو على ما كان، وكان على ما عليه الآن، جل عن التغير والزوال والاستحالة والبطلان، إذ ذلك أمارات الحدث التي بها عرف حدث العالم.

'নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা ছিলেন, যখন কোনো স্থান ছিল না। আর সকল স্থান ধ্বংস হওয়া সম্ভব। (কিন্তু) তাঁর বিদ্যমানতা আগের মতোই থাকবে। কাজেই তিনি আগের মতোই (স্থানবিহীন) আছেন এবং বর্তমান যেভাবে আছেন, সেভাবে (আগেও) ছিলেন। তিনি সকল পরিবর্তন ও ধ্বংস ইত্যাদি হওয়া থেকে অতিপবিত্র।'[৫৩৭]

ইমাম তাহাবী রাহ. (মৃ. ৩২১ হি.) তাঁর বিখ্যাত 'আকীদা' গ্রন্থ, যা তিনি ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রাহ.-এর মাসলাক অনুসারে সংকলন করেছেন, তাতে বলেন,

لَا تَحْوِيهِ الْجِهَاتُ السِّتُّ كَسَائِرِ الْمُبْتَدَعَاتِ.

'আল্লাহ্ তাআলাকে জগতের ছয় দিক থেকে কোনো দিক বেষ্টন করতে পারে না, যেভাবে সৃষ্টবস্তুসমূহকে বেষ্টন করে।'

এ কারণেই সৃষ্টি ও মানুষের বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং সাদৃশ্যের দৃশ্যমান দিকগুলো স্রষ্টা থেকে নাকচ করা ও অস্বীকার করা আকীদায়ে তাওহীদের অপরিহার্য অংশ।

ইমাম আহমদ রাহ. (মৃ. ২৪১ হি.)-এরও একই আকীদা ছিল,

لأنه كان ولا مكان، ثم خلق المكان، وهو كما كان قبل خلق المكان.

'তিনি ছিলেন, যখন কোনো স্থান ছিল না। এরপর তিনি স্থান সৃষ্টি করেছেন, আর তিনি এভাবেই আছেন, যেভাবে স্থান সৃষ্টি করার পূর্বে ছিলেন।'[৫৩৮]

এ ধরনের বক্তব্য শুধু এ কয়েকজন ইমাম নয়; বরং আরও অনেকেই সুস্পষ্টভাবে দিয়েছেন। যেমন : ইমাম আবুল হাসান আশআরী, আবু বকর বাকিল্লানী, আবদুল কাহের বাগদাদী, ইবনে বাত্তাল, আবু বকর শীরাযী, গাযালী, আবু বকর কাসানী, মুহাদ্দিস ও মুফাসসির দুই কুরতুবী, ইবনুল মুনায়্যির, নাসাফী, বদরুদ্দীন ইবনে জামাআহ, ইবনে রাসালান ও আবদুল বাকী মাওয়াহিবী হাম্বলী রাহ. প্রমুখ।[৫৩৯]

---

৫৩৭. কিতাবুত তাওহীদ, পৃষ্ঠা ৬৯

৫৩৮. নিহায়াতুল মুবতাদিয়ীন, পৃষ্ঠা ৩১

৫৩৯. দেখুন, তাবয়ীনু কাযিবিল মুফতারী, ইবনে আসাকির; আল-ইনসাফ ফীমা ইয়াজিবু ই'তিকাদুহু ওয়া লা-ইয়াজুযুল জাহলু বিহী; আল-ফারকু বাইনাল ফিরাক; শারহুল বুখারী; শারহুল লাম'; ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন; আল-মু'তামাদ মিনাল মু'তাকাদ; আল-মুফহিম; তাফসীরে কুরতুবী; আল-মুতাওয়ারী; আল-ই'তিমাদ ফীল ই'তিকাদ; ঈযাহুদ দলীল; শারহে ইবনে রাসালান; আল-আইনু ওয়াল আসার ইত্যাদি।

৩. প্রসঙ্গ : দুআর সময় ওপরের দিকে হাত তোলা ও মেরাজে যাওয়া

প্রশ্ন : আল্লাহ্ তাআলা যদি ওপরের দিকে না থাকেন, তাহলে দুআর সময় ওপরের দিকে হাত তোলা হয় কেন?

উত্তর :

ইমাম আবুল ইউসর বাযদাবী হানাফী রাহ. (মৃ. ৪৯৩ হি.) চমৎকারভাবে বলেন,

أهل السنّة والجماعة ليس الله تعالى على المكان، لا على العرش ولا على غيره، وهو ليس فوق العرش، وليس له جهة من الجهات. وقالت الحنابلة والكرامية واليهود ومن يقول إنه جسم: إنه تعالى مستقر على العرش. لكن بعضهم قالوا: له ست جهات كما لسائر الأجسام. وقال بعضهم: له جهة واحدة لا غير استقر بها على العرش... ليس لله تعالى مكان، بل هو على الصفة التي كان عليها قبل خلق المكان...

وأما إعراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وفوقها ما كان؛ لأن الله تعالى فوق العالم، ولكن كان ذلك تشريفا له، وليرى آثار قدرته. فإن موسى عليه السلام ما عرج به إلى السماء بل أمر بصعود الطور، ولم يكن الله تعالى عندهم فوق الطور، ولا على الطور، ولكن خص له مكانا تشريفا له. فكذا في حق المصطفى عليه السلام.

وكذا الناس أمروا بأن يزوروا الكعبة، وليس الله عندهم عند الكعبة ولكن أمروا بأن يزوروها تعظيما لله تعالى. وأما رفع الناس الأيدى إلى السماء: إنما كان لأن السماء موضع نزول الرحمة، على أنهم يؤمرون بذلك تعبدا، كما أمروا بالتوجه إلى الكعبة تعبدا في الصلاة.

'আহলুস সুন্নাহর মতে আল্লাহ্ কোনো স্থানের ওপর নন, আরশ বা অন্য কোনো বস্তুর ওপর নন। তাঁর জন্য কোনো দিক নেই। (কতিপয়) হাম্বলী, কাররামিয়া, ইহুদী এবং আল্লাহকে শরীরবিশিষ্ট মনেকারীরা বলে, আল্লাহ্ আরশের ওপর 'অবস্থান' গ্রহণ করেছেন। তাদের কারও মতে অন্য সবকিছুর মতো আল্লাহরও ছয় দিক রয়েছে। কারও মতে, ছয় দিক নয়, কেবল এক দিক (তথা ওপর) রয়েছে।

অথচ আল্লাহ্ কোনো স্থানে নন; বরং তিনি স্থান সৃষ্টির আগে যেমন ছিলেন, এখনো তেমন। কারণ, তিনি সকল পরিবর্তন ও স্থানান্তর থেকে ঊর্ধ্বে...।

আল্লাহ তাআলা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মেরাজের রাতে ঊর্ধ্বজগতে নিয়ে যাওয়ার কারণ এটা নয় যে, তিনি সেখানে থাকেন; বরং তাঁর কুদরত দেখানোর জন্য একটি জায়গা নির্ধারণ করে তাঁকে সম্মানিত করেছেন। যেভাবে মুসা আ.-কে তিনি সম্মানিত করার জন্য তুর পাহাড়ে যেতে বলেছেন, অথচ তিনি তুর পাহাড়ে থাকেন না। একইভাবে তিনি কাবা যিয়ারত করতে বলেছেন, অথচ তিনি কাবার সেখানে নন। আর দুআর সময় ওপরের দিকে হাত তোলার কারণ হলো,

আসমান রহমত অবতরণের স্থান এবং আমাদেরকে দুআর সময় এভাবে ইবাদতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যেভাবে নামাজের সময় কাবার দিকে ফিরে ইবাদতের আদেশ করা হয়েছে।'[৫৪০]

অথচ কোনো কোনো বক্তা মেরাজের ঘটনাকে এমনভাবে বর্ণনা করে, যেন আরশ আল্লাহ তাআলার থাকার জায়গা এবং তিনি তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের ঘরে দাওয়াত করেছেন। নাউযুবিল্লাহ!

ইমাম নববী রাহ. (মৃ. ৬৭৬ হি.) বলেন,

وَهُوَ الَّذِي إِذَا دَعَاهُ الدَّاعِي اسْتَقْبَلَ السَّمَاءَ، كَمَا إِذَا صَلَّى الْمُصَلِّي اسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُنْحَصِرٌ فِي السَّمَاءِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ مُنْحَصِرًا فِي جِهَةِ الْكَعْبَةِ، بَلْ ذَلِكَ لِأَنَّ السَّمَاءَ قِبْلَةُ الدَّاعِينَ، كَمَا أَنَّ الْكَعْبَةَ قِبْلَةُ الْمُصَلِّينَ.

'মুসল্লী যেমন কাবামুখী হয়ে নামাজ আদায় করে, দুআ প্রার্থনাকারীও তেমন আসমানমুখী হয়ে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে। (তবে) এর মানে এটা নয় যে, তিনি আসমানে আছেন, যেভাবে তিনি কিবলার দিকেও নেই; বরং এগুলোর অভিমুখী হওয়ার কারণ হচ্ছে, কাবা যেমন মুসল্লীদের কিবলা, আসমান তেমনই দুআ প্রার্থনাকারীদের কিবলা।'

এ বিষয়ে ইমাম মাতুরীদী রাহ.-সহ অনেক ইমামের বক্তব্য রয়েছে।[৫৪১]

বলাবাহুল্য, কেউ কেউ আসমান দুআ প্রার্থনাকারীদের কিবলা হওয়ার কোনো দলীল না থাকার দাবি করে থাকেন। অথচ সহীহ মুসলিমের হাদীসে এসেছে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى، فَأَشَارَ بِظَهْرِ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ.

আনাস রাযি. বলেন, 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃষ্টির জন্য দুআ করলেন এবং হাতের দুই পিঠ দ্বারা আসমানের দিকে ইশারা করলেন।'[৫৪২]

এই হাদীস থেকে প্রমাণ গ্রহণ করে উলামায়ে কেরাম বলেছেন,

قَالَ الْعُلَمَاءُ: السُّنَّةُ لِكُلِّ مَنْ دَعَا لِدَفْعِ بَلَاءٍ أَنْ يَجْعَلَ ظَهْرَ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ وَإِنْ دَعَا لطلب شئ جَعَلَ بَطْنَ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ.

'সুন্নাহ হলো, (অনাবৃষ্টির মতো বড়) বালা-মুসীবত দূর হওয়ার জন্য দুআ প্রার্থনাকারী হাতের দুই পিঠকে আসমানমুখী করবে, আর কোনো কিছু পাওয়ার

---

৫৪০. উসূলুদ্দীন, পৃষ্ঠা ৪০, ৪২

৫৪১. দেখুন, শারহু মুসলিম, নববী ৫/২৪; কিতাবুত তাওহীদ, মাতুরীদী, পৃষ্ঠা ৫৮; আল-মু'লিম, মাযেরী ১/৪১২; ইকমালুল মু'লিম, ইয়ায ২/৪৬৫; শারহু আবী দাউদ, আইনী ৪/১৮৬; আদ-দীবাজ, সুয়ূতী ২/২১৭; ইরশাদুস সারী, আত-তাহবীর, আমীর ছানআনী ৫/৪৯৬

৫৪২. মুসলিম, হাদীস নং ৮৯৫

জন্য দুআ প্রার্থনাকারী হাতের দুই পেটকে আসমানমুখী করবে।'[৫৪৩]

তা ছাড়া দুআর সময় ওপরের দিকে হাত তোলা, হাতকে আসমানমুখী করা 'আমলে মুতাওয়ারাছ' তথা রাসূলের যুগ থেকে উম্মাহর অবিচ্ছিন্ন আমল দ্বারা প্রমাণিত।

৪. প্রসঙ্গ : 'সর্বত্র বিরাজমান' বলা

প্রশ্ন : আল্লাহ তাআলা যেহেতু স্থান থেকে পবিত্র, তাহলে তাঁকে 'সর্বত্র বিরাজমান' বলা যাবে কি না?

উত্তর : 'সর্বত্র বিরাজমান' শব্দটির দুটি অর্থ হতে পারে :

১. সব জায়গায় সকল স্থানে সত্তাগতভাবে হাযির ও উপস্থিত। এটা কুফরী আকীদা। কেননা, তিনি জায়গা ও স্থান থেকে পবিত্র। তাই এই অর্থে আল্লাহ তাআলাকে 'সর্বত্র বিরাজমান' বলা কুফর।

২. তিনি জায়গা ও স্থান থেকে সত্তাগতভাবে পবিত্র। তবে তাঁর ইলম, কুদরত, পরিচালনা ইত্যাদি সর্বত্র তথা সব জায়গায় সকল স্থানে হাযির ও উপস্থিত। এই অর্থে বাহ্যিকভাবে যদিও আল্লাহ তাআলাকে 'সর্বত্র বিরাজমান' বলা যেতে পারে, কিন্তু ভ্রান্ত ফেরকা মুতাযিলারাও একই অর্থে আল্লাহ তাআলাকে 'সর্বত্র বিরাজমান' বলার পরও আকীদার ইমামগণ তাদের খণ্ডন করেছেন।

মাতুরীদী আকীদার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার ছিলেন ইমাম আবুল মুঈন নাসাফী হানাফী রাহ. (মৃ. ৫০৮ হি.)। ইমাম আবু মানসুর মাতুরীদীর কিতাবসমূহের পর তাঁর কিতাবগুলোকে মাতুরীদী আকীদার মৌলিক কিতাব মনে করা হয়। ইমাম গাযালী রাহ. ও ইমাম বাকিল্লানী রাহ. যেমন আশআরী আকীদার ব্যাখ্যাকার ছিলেন, একই পর্যায়ের ইমাম ছিলেন আবুল মুঈন নাসাফী রাহ.। সহীহ আকীদার দলীল ও যৌক্তিকতা বর্ণনা এবং ভ্রান্ত আকীদাসমূহের খণ্ডনে তাঁর অসাধারণ কাজ রয়েছে। তিনি 'সর্বত্র বিরাজমান' বিষয়ে লেখেন,

وما يقوله المعتزلة وعامة النجّارية إنه تعالى بكل مكان بمعنى العلم والقدرة والتدبير دون الذات، فهذا منهم خلاف في العبارة، فأمّا في المعنى فقد ساعدونا على استحالة تمكّنه في الأمكنة، ونحن ساعدناهم أنه عالم بالأمكنة كلها، وكلّها تحت تدبيره، غير أن بهم غنية عن إطلاق هذه العبارة الوحشية في هذا المراد، ومن الذي اضطرهم إلى إطلاق هذه العبارة التي ظاهرها يوجب ما هو كفر وضلال، وأيّ ضرورة دعتهم إلى ذلك، ولم يرد به نصّ لا في الكتاب ولا في الأحاديث المشهورة؟ فإذا الواجب علينا عند انعدام النص صيانة هذا المعنى عن هذا اللفظ الوحش.

---

৫৪৩. দেখুন, শারহু মুসলিম, নববী ৬/১৯০; ফাতহুল বারী, ২/৫১৮; শারহু আবী দাউদ, আইনী ৫/১৮; সুবুলুস সালাম, আমীর ছানআনী ১/৪৫৫; এ ছাড়া চার মাযহাবের ফিকহের বিভিন্ন কিতাবে বিষয়টি রয়েছে।

'মুতাযিলা ও অধিকাংশ নাজ্জারিয়ার মতে আল্লাহ তাআলা তাঁর ইলম, কুদরত ও পরিচালনা অর্থে 'সর্বত্র বিরাজমান/আছেন', সত্তাগতভাবে নন। কাজেই তাদের সাথে ('সর্বত্র বিরাজমান'—এ ধরনের) বাক্যচয়নে বিরোধ হলেও তারা যেহেতু আমাদের মতো তাঁর জন্য সত্তাগতভাবে 'সর্বত্র বিরাজমান' হওয়াকে অসম্ভব মনে করে এবং ইলম ও পরিচালনা অর্থে 'সর্বত্র বিরাজমান' হওয়ার কথা বলে, তাই অর্থের দিক থেকে তাদের সাথে মতভেদ নেই।

কিন্তু উক্ত অর্থে 'সর্বত্র বিরাজমান/আছেন' এমন (শরীয়তে) অপরিচিত বাক্যটি ব্যবহারের প্রয়োজন নেই। আর তাদেরকে এ ধরনের বাক্যচয়নে কে বাধ্য করল, যার বাহ্যিক অর্থ কুফর ও ভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়। এমন বাক্য বলার প্রতি তাদের কী প্রয়োজন দেখা দিল, যা কুরআনেও আসেনি, মশহুর হাদীসেও বর্ণিত হয়নি। সুতরাং আমাদের জন্য আবশ্যক হলো, উক্ত অর্থে (ইলম ও পরিচালনা অর্থে) 'সর্বত্র বিরাজমান/আছেন' এই অপরিচিত বাক্যটি না বলা।'[৫৪৪]

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম 'কানযুদ দাকায়েক'-সহ অনেক মূল্যবান কিতাবের রচয়িতা আবুল বারাকাত নাসাফী মাতুরীদী রাহ. (মৃ. ৭১০ হি.) বলেন,

وقول المعتزلة وجمهور النجّارية: إنه تعالى بكل مكان بالعلم والقدرة والتدبير دون الذات باطل؛ لأن من يعلم مكانا لا يقال: إنه في ذلك المكان بالعلم.

'মুতাযিলা ও অধিকাংশ নাজ্জারিয়া যে বলে, "আল্লাহ তাআলা সত্তাগতভাবে না; বরং তাঁর ইলম, কুদরত ও পরিচালনা অর্থে সর্বত্র বিরাজমান/আছেন", এমন বক্তব্য বাতিল। কেননা, যে ব্যক্তি কোনো 'স্থান'-এর কথা জানবে, তখন এ কথা বলা যায় না যে, তিনি উক্ত স্থানে ইলমের সাথে আছেন।'[৫৪৫]

অর্থাৎ যিনি 'স্থান' থেকে পবিত্র, তাঁর ব্যাপারে প্রথমে 'স্থান'-এর কথা বলে, পরে উক্ত স্থানে ইলমের সাথে আছেন বলার যৌক্তিকতা নেই।

এ বিষয়ে সবিস্তারে জানার জন্য দেখুন মাওলানা বেলাল দরবেশ হাফিযাহুল্লাহর

معیت باری تعالی علماء اهل السنت والجماعت کی نظر میں

নামের সাড়ে চারশ পৃষ্ঠার কিতাবটি।

মাতুরীদীরা আবু হানীফার আকীদা না মানার বাকি দাবির জবাব

মাতুরীদীরা আমলের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফাকে মেনে নিজেদেরকে 'হানাফী' পরিচয় দিলেও আকীদার ক্ষেত্রে তাঁকে মানে না—এ প্রোপাগান্ডার পক্ষে সালাফী

---

৫৪৪. তাবসিরাতুল আদিল্লাহ ফি উসূলিদ্দীন আলা তরীকাতিল ইমাম আবু মানসুর মাতুরীদী, ১/১৭৪
৫৪৫. আল-ই'তিমাদ ফীল ই'তিকাদ, পৃষ্ঠা ১২৪-১২৫

বন্ধুদের ছয়টি দাবি ছিল। তন্মধ্যে দুটির জবাব ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। আর চারটি দাবি আল্লাহ তাআলার সিফাতের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় সিফাতের আলোচনার শেষে করা হবে বলেছিলাম। এখন সেগুলো উল্লেখ করা হচ্ছে।

প্রথম দাবি : আল্লাহ তাআলা আরশে আছেন না মানলে কাফের হয়ে যাবে।

قَالَ أَبُو مُطِيعٍ البلخي فِي «الْفِقْهِ الْأَكْبَرِ» الْمَشْهُورِ: سَأَلْت أَبَا حَنِيفَةَ عَمَّنْ يَقُولُ: لَا أَعْرِفُ رَبِّي فِي السَّمَاءِ أَوْ فِي الْأَرْضِ. قَالَ: قَدْ كَفَرَ؛ لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} وَعَرْشُهُ فَوْقَ سَبْعِ سَمَوَاتِهِ.

'আবু মুতী' বলখী প্রসিদ্ধ 'আল-ফিকহুল আকবর' গ্রন্থে বলেন, আমি আবু হানীফাকে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, যে এ কথা বলে, "আমি জানি না আল্লাহ তাআলা আসমানে আছেন, নাকি জমিনে আছেন।"

তিনি বললেন, সে ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "তিনি আরশে আছেন।" আর আরশ হলো, সাত আসমানের ওপরে।'[৫৪৬]

সুতরাং এই বক্তব্য দ্বারা বোঝা যায়, আল্লাহ তাআলা আরশে আছেন এবং ওপরের দিকের স্থানে রয়েছেন।

অথচ মাতুরীদীরা বলে, আল্লাহ স্থান ও দিক থেকে পবিত্র। তাহলে মাতুরীদীরা ইমাম আবু হানীফাকে মানল কোথায়? উপরন্তু আবু হানীফা রাহ.-এর বক্তব্য অনুযায়ী কি মাতুরীদীরা কাফের হয়ে যাচ্ছেন?

প্রথম দাবির জবাব :

এর দুটি জবাব উল্লেখ করছি—

১. একই গ্রন্থের কয়েক পৃষ্ঠা পর রয়েছে, আবু মুতী' বলখী বলেন,

قلتُ: أرأيتَ لو قيل: أين الله تعالى؟ فقال: يقال له: كان الله تعالى ولا مكان، كان قبل أن يخلق الخلق، كان الله ولم يكن أين ولا خَلْقَ ولا شيءَ، وهو خالق كل شيء.

'আমি বললাম, আচ্ছা বলুন তো, যদি প্রশ্ন করা হয়, আল্লাহ তাআলা কোথায়?

তিনি (আবু হানীফা রাহ.) বললেন, তাকে উত্তরে বলা হবে, আল্লাহ তাআলা তখন ছিলেন, যখন কোনো 'স্থান' ছিল না। গোটা সৃষ্টিকে সৃষ্টি করার আগেও তিনি ছিলেন। এমনকি আল্লাহ তাআলা তখন ছিলেন, যখন 'আয়না' বা 'কোথায়' (বলার মতো কিছু) ছিল না এবং 'সৃষ্টি' ও 'বস্তু' কোনো কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। কারণ,

---

৫৪৬. দ্র. মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া, ৫/১৮৩; ইজতিমাউল জুয়ূশিল ইসলামিয়া, ইবনুল কায়্যিম, ২/১৩৯-৪০; আল-উলূ, যাহাবী, পৃষ্ঠা ১৩৬; শারহুল আকীদাতিত তাহাবীয়্যাহ, ইবনে আবীল ইয, ২/৩৮৭

তিনি সবকিছুর স্রষ্টা।’[৫৪৭]

এ বক্তব্যে সরাসরি ইমাম আবু হানীফা রাহ.-কে ‘আল্লাহ কোথায়’ প্রশ্ন করা হয়েছে। এর উত্তরে তিনি নিজেই আল্লাহ তাআলাকে ‘স্থান’ থেকে মুক্ত বললেন। তিনি এখানে বলেননি, ‘আল্লাহ আরশে বা আসমানে’; বরং এখানে তিনি ব্যাপকভাবে মূলনীতি আকারে বলে দিলেন, আরশ-আসমানসহ যত ‘স্থান’ আছে এবং ওপরের দিকসহ যত ‘সৃষ্টি’ ও ‘বস্তু’ রয়েছে, এগুলোর কোনো কিছুরই যখন অস্তিত্ব ছিল না, তখনো আল্লাহ ছিলেন। আর তখন যেভাবে তিনি ‘স্থান’ ও ওপরের দিকসহ অন্যান্য ‘সৃষ্টি’ ও ‘বস্তু’ থেকে পবিত্র ছিলেন, এখনো (যখন তুমি প্রশ্ন করছ) তিনি সেগুলো থেকে পবিত্র আছেন।

প্রিয় পাঠক, যারা মাতুরীদী আকীদাকে ইমাম আবু হানীফার আকীদা-বিরোধী দেখাতে গিয়ে প্রশ্নে উল্লেখিত তাঁর বক্তব্যটি পেশ করেন, তারা একই গ্রন্থের কয়েক পৃষ্ঠা পরের তাঁর এ বক্তব্যটি দেখতে পান না কেন?

শায়খ ইবনে তাইমিয়া রাহ., ইবনুল কায়্যিম রাহ. ও ইবনে আবীল ইযসহ বর্তমান সালাফী শায়খ ও বন্ধুরা ইমাম আবু হানীফার প্রথম বক্তব্যটি উল্লেখ করে মাতুরীদী আকীদাকে কুরআন ও আবু হানীফার আকীদা-বিরোধী সাব্যস্ত করার কসরত করেছেন! অথচ একই গ্রন্থের কয়েক পৃষ্ঠা পরের তাঁর বক্তব্যটি দেখলে কোনো বিরোধ থাকে না।

উপরন্তু ইমাম আবু হানীফা রাহ. যেহেতু পরের বক্তব্যে আল্লাহ তাআলাকে ‘স্থান’ থেকে মুক্ত বলেছেন, অথচ প্রথম বক্তব্যে তিনি আল্লাহ আরশ নামক স্থানে থাকা সম্পর্কে অজ্ঞাত ব্যক্তিকে কাফের বলেছেন। তাহলে তো প্রথম বক্তব্য অনুযায়ী তিনি নিজেই নিজেকে কাফের বলা আবশ্যক হয়ে পড়বে!

এ ছাড়া আরশ বিষয়ে অন্যত্র ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর আরও স্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে, তা দেখলেও কোনো বিরোধ থাকে না। তিনি বলেন,

نُقِرُّ بأن الله سبحانه تعالى على العرش استوى، من غير أن يكون له حاجةٌ واستقرارٌ عليه، وهو حافظ العرش وغيرِ العرش من غير احتياج، فلو كان محتاجا: لَمَا قَدَر على إيجاد العالم، والحفظ وتدبيره كالمخلوقين، ولو صار محتاجا إلى الجلوس والقرار: فقَبْلَ خلْقِ العرش أين كان الله تعالى؟ تعالى الله عن ذلك علوًّا كبيرا.

‘আমরা স্বীকার করি, আল্লাহ তাআলা আরশের ওপর ইস্তিওয়া করেছেন। কিন্তু তিনি আরশের প্রতি মুখাপেক্ষী নন এবং আরশের ওপর অবস্থান গ্রহণকারী নন;

---

৫৪৭. আল-ফিকহুল আকবার, বি-রিওয়াতি আবু মুতী’ (প্রচলিত আল-ফিকহুল আবসাত), আকীদা নং ৪৮-সূত্রে মাজমুউ কুতুব ওয়া রাসায়িল ওয়া ওসায়াল ইমামিল আযম, পৃষ্ঠা ৩৩৬, মাকতাবাতুল গানিম

বরং তিনি কোনো প্রয়োজন ছাড়াই আরশ ও অন্য সবকিছুর রক্ষাকর্তা। সৃষ্টির মতো তিনি যদি (আরশ বা অন্য কিছুর প্রতি) মুখাপেক্ষী হতেন, তাহলে মহাবিশ্ব সৃষ্টি, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করতে সক্ষম হতেন না। আর তিনি যদি (আরশে) বসা কিংবা অবস্থানের প্রতি মুখাপেক্ষী হতেন, তাহলে **আরশ সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ তাআলা কোথায় ছিলেন?** আল্লাহ এসব থেকে মহাপবিত্র।'[৫৪৮]

এখানে ইমাম আবু হানীফা রাহ. আল্লাহ আরশে অবস্থানকে স্পষ্টভাবে খণ্ডন করেছেন। আবু হানীফা রাহ. আরও বলেন,

ولقاءُ الله تعالى لأهلِ الجنَّةِ حقٌّ، بلا كيفيَّةٍ ولا تشبيهٍ ولا جِهَةٍ.

'জান্নাতবাসীর জন্য আল্লাহ তাআলার দর্শন সত্য, তবে কোনো ধরন, সাদৃশ্য ও **দিক ব্যতীত**।'[৫৪৯]

এখানে তিনি আল্লাহ তাআলাকে দিক থেকে মুক্ত বলেছেন। এ কথাটাই তো মাতুরীদীরা (এবং আশআরীরাও) সংক্ষেপে বলে, আল্লাহ স্থান ও দিক থেকে পবিত্র।

যেমন : ইমাম মাতুরীদী রাহ. (মৃ. ৩৩৩ হি.) 'কিতাবুত তাওহীদে' বলেন,

إن الله سبحانه كان ولا مكان.

'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তখন ছিলেন, যখন কোনো 'স্থান' ছিল না।'[৫৫০]

লক্ষ করুন, ইমাম মাতুরীদীর আরবী যে বাক্য, ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এরও প্রথম বাক্য একই ছিল তথা **كان الله تعالى ولا مكان**।

প্রসিদ্ধ আশআরী ইমাম আবু বকর বাকিল্লানী মালেকী রাহ. (মৃ. ৪০৩ হি.) বলেন,

إن الله تعالى كان ولا مكان، فلما خلق المكان لم يتغير عما كان.

'আল্লাহ তাআলা তখন ছিলেন, যখন কোনো 'স্থান' ছিল না। অতঃপর যখন 'স্থান' সৃষ্টি করলেন, আগের অবস্থা থেকে পরিবর্তন হননি।'[৫৫১]

অর্থাৎ আগে যেমন স্থানবিহীন ছিলেন, এখনো তেমন স্থানবিহীন আছেন। এভাবে ইমাম তাহাবী রাহ. (মৃ. ৩২১ হি.)-এর বিখ্যাত আকীদাগ্রন্থ—যাতে তিনি ইমাম আবু হানীফার আকীদা সংকলন করেছেন—এ গ্রন্থ থেকেও কাছাকাছি বক্তব্য দেখুন,

---

৫৪৮. কিতাবুল ওসিয়্যাহ, আকীদা নং ৭-এর সূত্রে মাজমুউ কুতুব ওয়া রাসায়িল ওয়া ওসায়াল ইমামিল আযম, পৃষ্ঠা ৪৫৭

৫৪৯. কিতাবুল ওসিয়্যাহ, আকীদা নং ২৪-এর সূত্রে মাজমুউ কুতুব ওয়া রাসায়িল ওয়া ওসায়াল ইমামিল আযম, পৃষ্ঠা ৪৬২

৫৫০. কিতাবুত তাওহীদ, পৃষ্ঠা ৬৯

৫৫১. আল-ইনসাফ ফীমা ইয়াজিবু ই'তিকাদুহু ওয়া-লা ইয়াজূযুল জাহলু বিহী, পৃষ্ঠা ৪০

لا تَحْوِيهِ الْجِهَاتُ السِّتُّ كَسَائِرِ الْمُبْتَدَعَاتِ.

'আল্লাহ তাআলাকে জগতের ছয় দিক (থেকে কোনো দিক) বেষ্টন করতে পারে না, যেভাবে সৃষ্টবস্তুসমূহকে বেষ্টন করে।'

২. প্রশ্নে উল্লেখিত ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর বক্তব্যে যে কাফের বলা হয়েছে, তার কারণ অন্যভাবে এসেছে। আর তা হলো,

من قال: لا أعرف الله أفي السماء أم في الأرض: فقد كفر؛ لأنه بهذا القول يوهم أن يكون له مكان، فكان مشركا.

'যে ব্যক্তি বলল, আমি জানি না আল্লাহ তাআলা আসমানে রয়েছেন নাকি জমিনে রয়েছেন, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। কেননা, তার এই বক্তব্য দ্বারা মনে হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার জন্য কোনো 'স্থান' রয়েছে। কাজেই সে ব্যক্তি (সৃষ্টির মতো আল্লাহর জন্য 'স্থান' সাব্যস্ত করার কারণে) মুশরিক।'

সুতরাং এখানে কাফের বলার মূল কারণ হলো, আল্লাহর জন্য স্থান সাব্যস্ত করা।

'আল্লাহ আসমানে নাকি জমিনে' এ কথার দ্বারা মূলত যেকোনো একটা স্থানকে আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করা হয়। আর আল্লাহর জন্য স্থান সাব্যস্ত করা কুফরী। কাজেই যে বলবে, 'আল্লাহ আসমানে নাকি জমিনে আমি জানি না, সে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য স্থান সাব্যস্ত করার কারণে কাফের হয়ে যাবে।'

উক্ত বক্তব্যটিকে ইমাম আবু হানীফা রাহ. কাফের বলার কারণ হিসেবে অনেকেই উল্লেখ করেছেন। যেমন : আবুল লাইছ সামারকান্দী রাহ. (মৃ. ৩৭৩ হি.) 'শারহুল ফিকহিল আকবার' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ২৫), আবু শাকুর সালেমী রাহ. (মৃ. ৪৬০ হিজরীর পর) 'আত-তামহীদ' কিতাবে (পৃ. ৪২), আহমাদ রেফায়ী রাহ. (মৃ. ৫৭৮ হি.) 'আল-বুরহানুল মুয়ায়্যাদ' গ্রন্থে (পৃ. ৪২), শায়খ ইয ইবনে আব্দুস সালাম রাহ. (মৃ. ৬৭৮ হি.) 'হাল্লুর রুমূয' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ১২১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা), তাকী উদ্দীন হিসনী রাহ. (মৃ. ৮২৯ হি.) 'দাফউ শুবাহি মান শাব্বাহা ওয়া তামাররাদা' কিতাবে (পৃ. ২৯৮), শিহাবুদ্দীন রমালী শাফেয়ী রাহ. (মৃ. ৯৫৭ হি.) তাঁর 'ফাতাওয়া'-তে (৪/২৬৭), নাফরাবী মালেকী রাহ. (মৃ. ১১২৬ হি.) 'আল-ফাওয়াকিহুদ দানী' গ্রন্থে (১/৫১) উল্লেখ করেছেন।

এ বিষয়ে মোল্লা আলী কারী হানাফী রাহ. (মৃ. ১০১৪ হি.) উল্লেখ করেন,

ما روي عن أبي مطيع البلخي أنه سأل أبا حنيفة رحمه الله عمّن قال لا أعرف ربّي في السماء هو أم في الأرض، فقال: قد كفر، لأن الله تعالى يقول: {الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى} وعرشه فوق سبع سماوات. قلت: فإن قال إنه على العرش، ولكن لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال:

هو كافر، لأنه أنكر كونه في السماء، فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر، لأن الله تعالى في أعلى علّيين، وهو يدعى من أعلى لا من أسفل.

والجواب: أنه ذكر الشيخ الإمام ابن عبد السلام في كتاب «حلّ الرموز» أنه قال: «قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: من قال: لا أعرف الله تعالى في السماء هو، أم في الأرض: كفر؛ لأن هذا القول يوهم أن للحق مكانا، ومن توهّم أن للحق مكانا: فهو مشبّه» انتهى. ولا شك أن ابن عبد السلام من أجلّ العلماء وأوثقهم، فيجب الاعتماد على نقله، لا على ما نقله الشارح.

'আবু মুতী' বালখী রাহ. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি ইমাম আবু হানীফা রাহ.-কে জিজ্ঞাসা করেছেন, কেউ যদি বলে, আমি জানি না আল্লাহ তাআলা জমিনে আছেন নাকি আসমানে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আল্লাহ আরশের ওপর ইস্তিওয়া করেছেন। আর আরশ সাত আসমানের ওপরে। এভাবে কেউ যদি বলে, আল্লাহ আরশে আছেন। কিন্তু আমি এটি জানি না আরশ আসমানে নাকি জমিনে। তিনি বলেন, এ ব্যক্তিও কাফের। কেননা, সে আসমানে আরশ থাকাকে অস্বীকার করেছে। আর যে ব্যক্তি আসমানে আরশ থাকাকে অস্বীকার করল, সে কাফের। কেননা, আল্লাহ তাআলা সবকিছুর ঊর্ধ্বে। আর আল্লাহ তাআলাকে ওপরের দিকে ডাকা হয়, নিচের দিকে নয়।'

মোল্লা আলী কারী রাহ. বলেন, 'এর উত্তর হলো, ইমাম ইয ইবনে আব্দুস সালাম (মৃ. ৬৬৮ হি.) রাহ. তাঁর 'হাল্লুর রুমূয' কিতাবে (বক্তব্যটি এভাবে) উল্লেখ করেছেন, ইমাম আবু হানীফা রাহ. বলেন, যে ব্যক্তি বলল আমি জানি না আল্লাহ তাআলা আসমানে রয়েছেন নাকি জমিনে রয়েছেন, তাহলে সে ব্যক্তি কুফরী করল। কেননা, তার এই বক্তব্য দ্বারা মনে হয় যে, আল্লাহ তাআলা কোনো স্থানে রয়েছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য স্থান থাকার ধারণা করল, সে সাদৃশ্যবাদী।'

অতঃপর মোল্লা আলী কারী রাহ. বলেন, 'এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, ইয ইবনে আব্দুস সালাম রাহ. অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বস্ত আলেম। সুতরাং ব্যাখ্যাকার (তথা আকীদাতুত তাহাবীর ব্যাখ্যাকার ইবনে আবীল ইয) যা উদ্ধৃত করেছেন, তার ওপর নির্ভর না করে, তাঁর (ইমাম ইয ইবনে আব্দুস সালামের) উদ্ধৃতির ওপর নির্ভর করা ও আস্থা রাখা উচিত।'[৫৫২]

দ্বিতীয় দাবি : আল্লাহর 'হাত' ইত্যাদি আছে।

ইমাম আবু হানীফা রাহ. বলেছেন,

ولہ يد، ووجه، ونفس، مما ذكر الله تعالى في القرآن.

---

৫৫২. শারহুল ফিকহিল আকবার, পৃষ্ঠা ১৯৭-১৯৮

'কুরআনে এসেছে, আল্লাহ্ তাআলার 'ইয়াদ' তথা 'হাত' ইত্যাদি রয়েছে।'[৫৫৩]

সালাফী ও আহলে হাদীস বন্ধুদের অনেকেই ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর এ বক্তব্যটি নকল করে বলেন, ইমাম আবু হানীফা রাহ. আল্লাহর 'হাত' ইত্যাদি আছে বলেছেন। অথচ মাতুরীদীরা তা মানে না!

দ্বিতীয় দাবির জবাব :

আরবী ভাষায় 'ইয়াদ' শব্দের আভিধানিক/বাহ্যিক ও আক্ষরিক অর্থ হলো, 'হাত' তথা দৈহিক অঙ্গ ও শরীরের অংশ। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার ক্ষেত্রে 'ইয়াদ' শব্দের উক্ত অর্থ তথা অঙ্গ উদ্দেশ্য নেওয়া যাবে না। কাজেই আমাদের 'ইয়াদ' তথা 'হাত' হলো দৈহিক অঙ্গ ও শরীরের অংশ; কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার 'ইয়াদ' তথা 'হাত' অঙ্গ নয়। এ সম্পর্কে স্বয়ং ইমাম আবু হানীফা রাহ. অন্যত্র বলেন,

)يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِم(ليست كأيدي خلقه، وليست جارحة، وهو خالق الأيدي.

'(কুরআনে রয়েছে,) "আল্লাহর হাত তাদের হাতের ওপর", (কিন্তু) তাঁর হাত তাঁর সৃষ্টির হাতের মতো নয় এবং **তাঁর 'হাত' অঙ্গ নয়;** বরং তিনি হস্তসমূহের স্রষ্টা।'[৫৫৪]

একই কথা ইমাম তাহাবী রাহ.-ও (মৃ. ৩২১ হি.) তাঁর বিখ্যাত 'আকীদা'র কিতাবে বলেছেন—যা তিনি ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রাহ.-এর মাসলাক অনুসারে সংকলন করেছেন—তাতে বলেন,

وَتَعَالَى اللهُ عَنِ الْحُدُودِ وَالْغَايَاتِ، وَالْأَرْكَانِ وَالْأَعْضَاءِ وَالْأَدَوَاتِ.

'আল্লাহ্ তাআলা সকল সীমা-প্রান্ত, **দৈহিক সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং সকল উপায়-উপকরণ** থেকে বহু ঊর্ধ্বে।'

এর কারণ হলো, তিনি দেহ-শরীর ও দেহজাতীয় বস্তু থেকে পবিত্র ও বহু ঊর্ধ্বে। যা স্বয়ং ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর নামে প্রচলিত 'আল-ফিকহুল আকবার' গ্রন্থেও রয়েছে[৫৫৫] এবং ইমাম আবু মানসুর মাতুরীদী রাহ.-ও (মৃ. ৩৩৩ হি.) তাঁর তাফসীরের বিভিন্ন জায়গায় বলেছেন।[৫৫৬]

সুতরাং প্রমাণিত হলো, ইমাম আবু হানীফার নামে আল্লাহর 'হাত' ইত্যাদি থাকার

---

৫৫৩. আল-ফিকহুল আকবার, বি-রিওয়াতি হাম্মাদ, আকীদা নং ১৪-সূত্রে মাজমুউ কুতুব ইমামিল আযম, পৃষ্ঠা ২৬০

৫৫৪. আল-ফিকহুল আকবার, বি-রিওয়াতি আবু মুতী' (প্রচলিত আল-ফিকহুল আবসাত), আকীদা নং ৪৭-সূত্রে মাজমুউ কুতুব ওয়া রাসায়িল ওয়া ওসায়াল ইমামিল আযম, পৃষ্ঠা ৩৩৫

৫৫৫. আল-ফিকহুল আকবার, বি-রিওয়াতি হাম্মাদ, আকীদা নং ১২-সূত্রে মাজমুউ কুতুব ওয়া রাসায়িল ওয়া ওসায়াল ইমামিল আযম, পৃষ্ঠা ২৫৯

৫৫৬. তাফসীরে মাতুরীদী, ৪/৪৬৮, আরও দেখুন, ৮/৬৩৬, ৮/৬৪৭, ৯/৫৭৪

কথা বলে তাঁর বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করে মাতুরীদী আকীদাকে ইমাম আবু হানীফার আকীদা-বিরোধী দেখানোর অপচেষ্টা করা হয়।[৫৫৭]

এগুলোর অর্থ কী এবং এগুলোকে কী বলা হবে?

এখন প্রশ্ন হলো, আল্লাহর 'হাত' ইত্যাদির অর্থ যদি শরীরের অংশ ও অঙ্গ না হয়; এভাবে আল্লাহ আরশের ওপর ইস্তিওয়া করার অর্থ যদি স্থান/অবস্থানগ্রহণ, ওপরের দিকে থাকা অথবা আরোহণ করা ও ওপরে ওঠার[৫৫৮] অর্থে না হয়, তাহলে এগুলোর অর্থ কী এবং এগুলোকে কী বলা হবে?

প্রথম পয়েন্টের উত্তর হলো, এ-জাতীয় বিষয়ে তাফবীয বা তাবীল করা।

আর দ্বিতীয় পয়েন্টের উত্তর স্বয়ং ইমাম আবু হানীফা রাহ. দিয়েছেন। তিনি বলেন,

ما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس: فهو له صفات بلا كيف.

'কুরআনে উল্লেখিত 'ইয়াদ' বা 'হাত' ইত্যাদি হলো আল্লাহ তাআলার **সিফাত বা গুণ,** যার কোনো ধরন-স্বরূপ নেই।'[৫৫৯]

অন্যত্র এসেছে, তাঁকে আল্লাহ তাআলার 'নুযূল' বা 'অবতরণ' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন,

---

৫৫৭. সালাফী ও আহলে হাদীসদের অনুসরণীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে শায়খ উসাইমীন-সহ কারও কারো কথা থেকে বোঝা যায়, কুরআনে উল্লিখিত আল্লাহর ইয়াদ হাত ও এ-জাতীয় শব্দ থেকে আভিধানিক ও বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য। তাই আল্লাহর হাত থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে দৈহিক হাত, তবে মাখলূকের সাদৃশ্য নয়। শায়খ উসাইমীন বলেন,

فكل إنسان يشاهد أيدي المخلوقات متفاوتة ومتباينة من كبير وصغير، وضخم ودقيق... فيلزم من تباين أيدي المخلوقين وتفاوتهم مباينة يد الله تعالى لأيدي المخلوقين وعدم مماثلته لهم سبحانه وتعالى من باب أولى. وقال أيضا: لا يلزم من إثبات اليد لله عز وجل أن تكون مماثلة لأيدي المخلوقين، كما لا يلزم من إثبات يد الإنسان أن تكون مماثلة ليد الفيل... فكما يثبتون لأنفسهم أيديا حقيقيةً وللفيلة أيدياً حقيقيةً ولا تتماثل. انتهى ملخصا.

সারমর্ম : 'বিভিন্ন মাখলূকের হাতগুলোর মধ্যে বড়-ছোট ও মোটা-চিকন ইত্যাদিতে পার্থক্য ও ভিন্নতা হয়। কাজেই মাখলূকের হাত থেকে যে আল্লাহর হাত পার্থক্য ও ভিন্ন হবে, তা তো বলাই বাহুল্য। আর যেভাবে হাতির হাত আর মানুষের হাত এক রকম নয়, তেমনই আল্লাহর হাত মাখলূকের হাতের সদৃশ নয়।'
তিনি আরও বলেন,

إن الله عزَّ وجلَّ له وجه، وله عين، وله يد، وله رجل عزَّ وجلَّ، لكن لا يلزم من أن تكون هذه الأشياء مماثلة للإنسان، فهناك شيء من الشبه لكنه ليس على سبيل المماثلة.

'আল্লাহ তাআলার চেহারা আছে, চোখ আছে, হাত আছে, পা আছে, তিনি সুমহান। কিন্তু এগুলো মানুষের অনুরূপ হওয়া আবশ্যক হয় না। এখানে কিছুটা সাদৃশ্যতা আছে, তবে তা অনুরূপ হিসেবে নয়।' (শারহুল আকীদাতিল ওয়াসিতিয়াহ, পৃষ্ঠা ৩০৪, ১১০; শারহুল আকীদাতিস সাফফারীনিয়্যাহ, পৃষ্ঠা ২৬৫)
মানুষের সাথে কিছুটা আল্লাহর সাদৃশ্য আছে! নাউযুবিল্লাহ।

৫৫৮. সালাফী শায়খ আবু বকর যাকারিয়া সাহেব 'রহমান আরশের ওপরে উঠেছেন' নামে একটি বই লিখেছেন।

৫৫৯. আল-ফিকহুল আকবার, বি-রিওয়াতি হাম্মাদ, আকীদা নং ১৪-সূত্রে মাজমুউ কুতুব ওয়া রাসায়িল ওয়া ওসায়াল ইমামিল আযম, পৃষ্ঠা ২৬০

يَنْزِلُ بِلَا كَيْفٍ.

‘তিনি অবতরণ করেন, যার কোনো ধরন-স্বরূপ নেই।’[৫৬০]

উল্লেখ্য, এগুলোর ক্ষেত্রে ইমামগণ কখনো বলেন, (صفات بلا كيف) তথা এমন গুণ, যার কোনো ধরন-স্বরূপ নেই, কখনো শুধু (بلا كيف) বলেন, আবার কখনো শুধু (صفات) বলেন। যেভাবেই বলা হোক না কেন, এগুলোর আভিধানিক ও বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয় এবং তিনি ধরন থেকে মুক্ত।

কাজেই আল্লাহ তাআলার ‘ইয়াদ’ তথা ‘হাত’ আমাদের হাতের মতো নয়। কেননা, আমাদের ‘হাত’ হলো দৈহিক অঙ্গ ও শরীরের অংশ। কিন্তু আল্লাহ তাআলার ‘ইয়াদ’ তথা ‘হাত’ অঙ্গ নয়; বরং এগুলোর সংগত অর্থ সম্পর্কে তিনিই অবগত। তবে আমরা বলব, তাঁর ‘ইয়াদ’ হলো তাঁর সত্তাগত গুণ, যার কোনো ধরন-স্বরূপ নেই।

অনুরূপ তাঁর ‘নুযূল’ তথা ‘অবতরণ’ অথবা ‘ইস্তিওয়া’ আমাদের মতো নয়। কারণ, আমাদের ‘নুযূল’ হলো স্থানান্তর হওয়া, অবতরণ করা, নিচের দিকে নামা; আমাদের ‘ইস্তিওয়া’ হলো অবস্থান করা, আরোহণ করা, ওপরে ওঠা। কিন্তু তাঁর ‘নুযূল’ ও ‘ইস্তিওয়া’ ইত্যাদির সংগত অর্থ সম্পর্কে তিনিই অবগত। তবে আমরা বলব, এ দুইটা তাঁর কর্মগত গুণ, যার কোনো ধরন-স্বরূপ নেই।

মনে রাখতে হবে, দেহ-শরীর, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, স্থানান্তর, অবতারিত ও একীভূত হওয়া, স্থান-কাল-পাত্রবিশিষ্ট হওয়া, আয়তন বা পরিমাপ, আকার-আকৃতি, রূপ-বর্ণ ইত্যাদি সবই সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য; স্রষ্টা এ সবকিছু থেকে মুক্ত ও পবিত্র।

পরের আশআরীদের আকীদা ইমাম আশআরীর আকীদা-বিরোধী?

ইমাম আবুল হাসান আশআরী রাহ. (মৃ. ৩২৪ হি.) বলেন,

وَإِنَّهُ عَلَى الْعَرْشِ كَمَا قَالَ: {الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}، وَلَا نَتَقَدَّمُ بَيْنَ يَدَيِ اللهِ فِي الْقَوْلِ؛ بَلْ نَقُولُ: اسْتَوَى بِلَا كَيْفٍ، وَإِنَّ لَهُ وَجْهًا كَمَا قَالَ: {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ}، وَإِنَّ لَهُ يَدَيْنِ كَمَا قَالَ: {خَلَقْتُ بِيَدَيَّ}، وَإِنَّ لَهُ عَيْنَيْنِ كَمَا قَالَ: {تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا}، وَإِنَّهُ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُوَ وَمَلَائِكَتُهُ كَمَا قَالَ: {وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا}، وَإِنَّهُ يَنْزِلُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ.

‘তিনি আরশের ওপরে যেমনটা তিনি বলেছেন, “রহমান আরশে ইস্তিওয়া করেছেন।” আর আল্লাহর কথার সামনে আমরা কোনো কথাকে প্রাধান্য দিই না; বরং আমরা বলি, তিনি ইস্তিওয়া করেছেন, যার কোনো ধরন নেই। তিনি নূর— যেমনটা তিনি বলেছেন, “আল্লাহ আসমান ও জমিনসমূহের নূর।” তাঁর চেহারা

---

৫৬০. আল-আসমা ওয়াস সিফাত, বায়হাকী ২/৩৭৮

আছে—যেমনটা তিনি বলেছেন, “তোমার রবের চেহারা বাকি থাকবে।” তাঁর দুইটা হাত আছে—যেমনটি তিনি বলেছেন, “আমার দুই হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছি।” তাঁর দুইটি চক্ষু আছে—যেমনটি তিনি বলেছেন, “যা (নৌকা) চলছিল আমার চোখের সামনে।” তিনি নিজে এবং তাঁর ফেরেশতাকুল কিয়ামতের দিন আসবেন—যেমনটি তিনি বলেছেন, “তোমার রব ও সারিবদ্ধ ফেরেশতাগণ আসবেন। তিনি দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন—যেমনটা হাদীসে এসেছে।”'

অনেকেই ইমাম আশআরীর উক্ত বক্তব্য নকল করে বলেন, আশআরী রাহ. আল্লাহর দুই হাত, দুই চোখ এবং আল্লাহ আরশের ওপর আছেন/উঠেছেন, আসমানে অবতরণ করেন ইত্যাদি সাব্যস্ত করেছেন, যা আশআরীরা মানে না। কাজেই পরবর্তী আশআরীদের আকীদা ইমাম আশআরীর আকীদা-বিরোধী।

এটার উত্তরও একই। এখানেও মূলত তাঁর বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করে আশআরীদের আকীদা তাঁর আকীদা-বিরোধী দেখানোর অপচেষ্টা করা হয়েছে।

কেননা, এগুলোর আভিধানিক ও বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়। স্বয়ং তিনি উক্ত আলোচনা শুরু করার আগেই বলেছেন,

[৫৬১]তিনি অন্য কিতাবে বলেন,

وهذا يستحيل عليه أن تكون نفس الباري عز وجل جسما، أو جوهرا، أو محدودا، أو في مكان دون مكان... وأن له تعالى يدين مبسوطتين، وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه من غير أن يكون جوارحا ...وأنه عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، وليس نزوله نقله، لأنه ليس بجسم، ولا جوهر.

‘আল্লাহ তাআলার সত্তা (জিসম) দেহধারী হওয়া বা (জওহর) স্বনির্ভর মৌলপদার্থ হওয়া কিংবা সীমাবদ্ধ হওয়া অথবা **কোনো স্থানে থাকা অসম্ভব**।...

আল্লাহ তাআলার আছে দুই প্রশস্ত হাত। আর গোটা পৃথিবী কিয়ামতের দিন তাঁর মুঠোর ভেতর থাকবে এবং আসমানসমূহ গুটানো অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে। তবে **এ ‘হাত’ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নয়**।... তিনি দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন, তবে তাঁর অবতরণ **স্থানান্তর নয়**। কারণ, তিনি ‘জিসম’ বা ‘জওহর’ নন।’[৫৬২]

সদরুল ইসলাম বাযদাবী রাহ. (মৃ. ৪৯৩ হি.) লেখেন,

وأما اليد فنقول به كما قال الله تعالى ولكن نقول: صفة خاصة، وأما العين فبعض أهل السنة والجماعة أثبتوا العين، وبه قال «الأشعرى»، وبعضهم لم يثبتوا. وكتاب الله تعالى يدل على الثبوت،

---

৫৬১. মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন, পৃষ্ঠা ২১১
৫৬২. রিসালাতুন ইলা আহলিছ-ছাগরি বিবাবিল আবওয়াব, পৃষ্ঠা ১২৪, ১২৭, ১২৯

ولكن عينه ليست بجارحة، بل هي صفة خاصة.

'(আল্লাহ তাআলার) হাতের কথা আমরাও স্বীকার করি, যেভাবে কুরআনে এসেছে। তবে আমরা বলি, (এ 'হাত' অঙ্গ নয়; বরং) বিশেষ সিফাত বা বিশেষণ। এভাবে আহলুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআহর একদল (আল্লাহ তাআলার) চোখের কথা সাব্যস্ত করেছেন, তন্মধ্যে (ইমাম) আশআরীও রয়েছেন। আর কুরআনও তা সাব্যস্ত করে। কিন্তু তাঁর চোখ অঙ্গ নয়; বরং বিশেষ সিফাত বা বিশেষণ।'[৫৬৩]

ইমাম কুরতুবী মালেকী রাহ. (মৃ. ৬৫৬ হি.) এ বিষয়ে মূলনীতি আকারে বলেন,

ثم لو سَلَّمْنَا أن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه: لما كان تصديقا له في المعنى، بل في النقل، أي في نقل ذلك عن كتابه أو عن نبيه، وحينئذ نقطع بأن ظاهره غير مراد.

'অতঃপর যদি মেনে নেওয়া হয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা (আল্লাহ তাআলার 'অঙ্গুলি'র কথা) সত্যায়ন করেছেন, তাহলে সেটা শব্দের সত্যায়ন হবে, অর্থের নয় (তথা এ 'অঙ্গুলি'কে অঙ্গের অর্থে সত্যায়ন করেননি)। সুতরাং আমরা সুনিশ্চিত যে, এর বাহ্যিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়।'[৫৬৪]

ইমাম কুরতুবীর এ বক্তব্যটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইবনে হাজার আসকালানী শাফেয়ী রাহ. (মৃ. ৮৫২ হি.) ও আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হানাফী (মৃ. ৮৫৫ হি.) উভয়ে নকল করে সমর্থন করেছেন। আইনী রাহ. এর সাথে আরও বলেন,

لَا يمْنَع ثُبُوت الإصبع الَّذِي هُوَ غير الجْارِحَة، فَكَمَا ثَبت الْيَد أَنَّهَا غير جارحة فَكَذَلِك الإصبع.

'(আল্লাহ তাআলার) হাত যেভাবে অঙ্গ নয়, তদ্রূপ অঙ্গুলিও অঙ্গ নয়। কাজেই অঙ্গ নয় এমন অঙ্গুলি (আল্লাহ তাআলার জন্য) সাব্যস্ত হতে নিষেধ নেই।'[৫৬৫]

সারকথা, আল্লাহ্ তাআলা যখন দেহধারী-শরীরী নন, তাঁর হাত যখন অঙ্গ নয়, তাঁর আসমানে অবতরণ যেহেতু স্থানান্তর নয় এবং তিনি যেহেতু আরশ বা অন্য কোনো স্থানে থাকা অসম্ভব, তাহলে এ শব্দগুলোর কোনো কিছুই আভিধানিক ও বাহ্যিক অর্থে উদ্দেশ্য নয়।

তৃতীয় দাবি : আল্লাহর সিফাতের তাবীল করা যাবে না।

ইমাম আবু হানীফা রাহ. বলেছেন,

ما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس: فهو له صفات بلا كيف، ولا يقال: إن يده قدرته أو نعمته، لأن فيه إبطال الصفة. وهو قول أهل القدر والاعتزال.

---

৫৬৩. উসূলুদ্দীন, পৃষ্ঠা ৩৯
৫৬৪. আল-মুফহিম, ৭/৩৯০
৫৬৫. দেখুন, ফাতহুল বারী, ১৩/৩৯৯; উমদাতুল কারী, ২৫/১০৮

'কুরআনে উল্লেখিত 'ইয়াদ' (শাব্দিক অর্থ হাত) ইত্যাদি হলো, আল্লাহ তাআলার ধরনহীন সিফাত বা গুণ। সুতরাং এ কথা বলা যাবে না যে, তাঁর 'ইয়াদ' তাঁর কুদরত বা নিয়ামত। কেননা, এতে সিফাতকে বাতিল করা হয়। আর এটা কাদারিয়্যাহ ও মুতাযিলাদের বক্তব্য।'[৫৬৬]

এখানে আবু হানীফা রাহ. বলেছেন, তাবীল করা যাবে না; বরং তাবীল করা কাদারিয়্যাহ ও মুতাযিলাদের মাযহাব। অথচ মাতুরীদীরা তাবীল করেন। কাজেই তাবীল করার কারণে তাঁরা ইমাম আবু হানীফাকে আকীদার ক্ষেত্রে মানেন না।

তৃতীয় দাবির জবাব :

ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর উক্ত বক্তব্যের দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে :

১. 'ইয়াদ'-এর তাবীল হিসেবে সুনিশ্চিত ও অকাট্যভাবে তাঁর কুদরত বা নিয়ামত মনে করা তথা 'ইয়াদ'-এর তাবীল হিসেবে এক/দুটি অর্থ নির্ধারণ করা। অথবা সুনিশ্চিত ও অকাট্যভাবে তাবীল হিসেবে নয়; বরং 'ইয়াদ'-এর কুদরত, শক্তি, অনুগ্রহ, দান ও নিয়ামতসহ অনেকগুলো তাবীল হতে পারে; তবে সম্ভাব্য তাবীল হিসেবে তাঁর কুদরত বা নিয়ামত মনে করা।

এখানে দ্বিতীয়টা তথা সম্ভাব্য তাবীল করা হলো, মাতুরীদী ও আশআরীদের মাযহাব। আর প্রথমটা তথা সুনিশ্চিত তাবীল করা হলো, মুতাযিলাদের মাযহাব। তো ইমাম আবু হানীফা রাহ. মুতাযিলাদের মতো সুনিশ্চিত তাবীল করতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ সে সময়কার বাতিল ফেরকারা বিভিন্ন তাবীলের সম্ভাবনাময় শব্দের এক/দুটি অর্থ নির্ধারণ করত, সেটাকে তিনি নিষেধ করেছেন। আর মাতুরীদীরা যেহেতু সুনিশ্চিত তাবীল করে না, কাজেই এ ক্ষেত্রে তাঁরা ইমাম আবু হানীফাকে না মানার প্রশ্ন আসে না।[৫৬৭]

২. ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর বক্তব্যের আরেক ব্যাখ্যা হলো, সুনিশ্চিত ও সম্ভাব্য উভয় প্রকার তাবীল করতে তিনি নিষেধ করেছেন। তাঁর বক্তব্যের যদি এ ব্যাখ্যা করা হয়, তাহলে মাতুরীদীরা এ ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফাকে না মানার প্রশ্ন আসবে।

তবে এখানে দুটি বিষয় জেনে রাখা দরকার। একটা হচ্ছে, মাতুরীদীরা তাবীলের চেয়ে তাফবীয নিরাপদ মনে করে। তাই মাতুরীদীদের আসল মাযহাব হলো তাফবীযকে প্রাধান্য দেওয়া। তবে প্রয়োজনে তাঁরা তাবীলও করেন।

---

৫৬৬. আল-ফিকহুল আকবার, বি-রিওয়াতি হাম্মাদ, আকীদা নং ১৪-সূত্রে মাজমুউ কুতুব ওয়া রাসায়িল ওয়া ওসায়াল ইমামিল আযম, পৃষ্ঠা ২৬০, মাকতাবাতুল গানিম

৫৬৭. দেখুন, ইশারাতুল মারাম, বায়াযী, পৃষ্ঠা ৩৭৯, দারুস সালেহ; আল-মুসায়ারা, ইবনুল হুমাম, পৃষ্ঠা ৪৮ (আল-মুসামারাসহ)

দ্বিতীয় বিষয় হলো, যেখানে ইমাম আবু হানীফা রাহ. তাবীলের পথে হাঁটা প্রয়োজন মনে করলেন না, সেখানে মাতুরীদীরা প্রয়োজন মনে করল কেন?

উত্তর : সাহাবায়ে কেরাম রাযি. ঈমান-আকীদার ক্ষেত্রে ইলমুল কালাম বা যুক্তির পথে না হাঁটা সত্ত্বেও আমরা হাঁটব কেন? এ প্রশ্নের যে উত্তর ইমাম আবু হানীফা রাহ. দিয়েছিলেন, তো 'প্রয়োজনে তাবীল কেন করা হয়' প্রশ্নটিরও একই উত্তর।

সেই প্রশ্নোত্তরটি আবার দেখুন, আবু মুকাতিল সমরকন্দী আবু হানীফাকে বলেন, অনেকে এসব বিষয়ে (ইলমুল কালাম ইত্যাদিতে) ঢুকতে নিষেধ করেন। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এ পথে হাঁটেননি, তো আমরা হাঁটব কেন?

ইমাম আবু হানীফা রাহ. জবাবে বলেন, 'আমরা যদি সাহাবাদের পর্যায়ে থাকতাম, তাহলে যতটুকু তাঁরা করেছেন, আমাদেরও ততটুকু যথেষ্ট হতো। কিন্তু আমরা এমন লোকের সম্মুখীন হয়েছি, যারা আমাদের আঘাত করে ও যুদ্ধ করে, তাহলে কারা সঠিক, কারা বেঠিক—তা না জেনে বসে থাকা যাবে?

সাহাবা-যুগে ওই যুদ্ধবাজরা ছিল না; ফলে তাঁদের হাতিয়ার হাতে নিতে হয়নি। আমাদের যুগে ওই যুদ্ধবাজরা আছে; কাজেই আমাদের হাতিয়ার হাতে নিতে হবে।'[৫৬৮]

অর্থাৎ ইলমুল কালাম ইত্যাদির পথে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. না হাঁটা সত্ত্বেও প্রয়োজনে আবু হানীফা রাহ. হেঁটেছেন, তো একইভাবে ইমাম আবু হানীফা রাহ. তাবীলের পথে না হাঁটা সত্ত্বেও প্রয়োজনে মাতুরীদীরা তাবীলের পথে হাঁটেন।

চতুর্থ দাবি : তাফবীযুল মা'না নয়, বরং তাফবীযুল কাইফিয়াহ।

ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয়, তিনি তাফবীযুল মা'না নয়, বরং তাফবীযুল কাইফিয়াহর প্রবক্তা। অর্থাৎ আল্লাহর হাত, চেহারা, নুযূল ও আরশে ইস্তিওয়া করা ইত্যাদি গুণাবলির অর্থ জ্ঞাত। ফলে এগুলোর অর্থ 'তাফবীয' তথা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর হাওয়ালা করা হবে না; বরং এসব গুণাবলির ধরন-স্বরূপ (কাইফিয়াহ) রয়েছে, তবে তা অজ্ঞাত হওয়ার ফলে এটাকে হাওয়ালা (তাফবীয) করা হবে।[৫৬৯]

---

৫৬৮. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম, আকীদা নং ২-এর সূত্রে মাজমুউ কুতুব ওয়া রাসায়িল ওয়া ওসায়াল ইমামিল আযম, পৃষ্ঠা ৩৫৪, মাকতাবাতুল গানিম; আল-উসূলুল মুনীফাহ, কামালুদ্দীন বায়াযী, পৃষ্ঠা ৫৩; আত-তামহীদ, আবু শাকুর সালেমী, পৃষ্ঠা ১৯১

৫৬৯. উসূলুদ্দীন ইনদাল ইমাম আবী হানীফা, মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান খুমাইয়িস, পৃষ্ঠায় (৫৮৩, ৬৪০) রয়েছে,

...بل الذي في نصوص الإمام أبي حنيفة تفويض مقيّد بنفي علم الكيفية فقط لا المعنى.

উল্লেখ্য, প্রায় সাতশ পৃষ্ঠার সৌদি সালাফী আলেমের এই কিতাবটা দেখলে মনে হবে, তিনি ইমাম আবু হানীফার আকীদা নিয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, কিতাবটি এমন অপব্যাখ্যায় ভরপুর!

চতুর্থ দাবির জবাব :

ইমাম তাহাবী রাহ. (মৃ. ৩২১ হি.) তাঁর বিখ্যাত 'আকীদা'র কিতাবে ইমাম আবু হানীফা থেকে এ-জাতীয় বিষয়ে কেমন আকীদা রাখবে, তা নকল করে বলেন,

وَنَقُولُ: اللهُ أَعْلَمُ فِيمَا اشْتَبَهَ عَلَيْنَا عِلْمُهُ.

'আমাদের কাছে অস্পষ্ট বিষয়ে আমরা বলি, **আল্লাহই ভালো জানেন।**'

অন্যত্র বলেন,

وَالرُّؤْيَةُ حَقٌّ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ بِغَيْرِ إِحَاطَةٍ وَلَا كَيْفِيَّةٍ، كَمَا نَطَقَ بِهِ كِتَابُ رَبِّنَا: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ () إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾، وَتَفْسِيرُهُ عَلَى مَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى وَعَلِمَهُ. وَكُلُّ مَا جَاءَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَعْنَاهُ عَلَى مَا أَرَادَ.

'জান্নাতবাসীর জন্য আল্লাহর দর্শন সত্য, যার জন্য কোনো রকমের পরিবেষ্টন নেই এবং ধরন-স্বরূপও নেই। যেভাবে কুরআন বলেছে, "সেদিন অনেক চেহারা উজ্জ্বল হবে, যারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।" **আর এর তাফসীর-ব্যাখ্যা তা-ই, যা আল্লাহ তাআলা উদ্দেশ্য নিয়েছেন এবং তিনিই এ বিষয়ে জানেন।**

এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসে যা এসেছে, তিনি যেমনটা বলেছেন তেমনই (বিশ্বাস করি)। আর **এর অর্থ হলো সেটাই, তিনি যা উদ্দেশ্য নিয়েছেন।**'

এখানে ইমাম আবু হানীফার আকীদা হিসেবে সুস্পষ্টভাবে তাফবীযুল মা'নার কথা উল্লেখ হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে ধরন-স্বরূপ নেই বলা হয়েছে।

ইমাম মাতুরীদী রাহ.-ও (মৃ. ৩৩৩ হি.) একই কথা বলেছেন,

فيجب القول بِٱلرَّحۡمَٰنُ عَلَى ٱلۡعَرۡشِ ٱسۡتَوَىٰ على ما جاء به التنزيل... ونؤمن بما أراد الله به.

'কুরআনে যে এসেছে "রহমান আরশের ওপর ইস্তিওয়া করেছেন", তা স্বীকৃতি প্রদান করা অপরিহার্য এবং **এ থেকে আল্লাহ যা উদ্দেশ্য নিয়েছেন,** তার ওপর আমরা ঈমান রাখি।'[৫৭০]

সুতরাং ইমাম আবু হানীফার আকীদার সাথে যেমন ইমাম তাহাবীর আকীদার ফারাক নেই, তেমনই ইমাম মাতুরীদীর আকীদারও পার্থক্য নেই।

এ ছাড়া হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. (মৃ. ৮৫২ হি.) লেখেন,

ومنهم من أجراه على ما ورد، مؤمنا به على طريق الإجمال، منزها الله تعالى عن الكيفية والتشبيه،

---

৫৭০. কিতাবুত তাওহীদ, পৃষ্ঠা ৭৪

وهم جمهور السلف، ونقله البيهقي وغيره عن الأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين والأوزاعي والليث وغيرهم.

'অধিকাংশ সালাফ এগুলো যেভাবে এসেছে সেভাবে রেখে দিতেন, সংক্ষিপ্তভাবে ঈমান আনতেন এবং আল্লাহ তাআলাকে ধরন ও সাদৃশ্য থেকে পবিত্র মনে করতেন। বায়হাকী ও অন্যরা এটি (মাযহাবের প্রসিদ্ধ) চার ইমাম, সুফিয়ান সাওরী, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনাহ, হাম্মাদ বিন সালামাহ (মৃ. ১৬৭ হি.), হাম্মাদ বিন যায়দ (মৃ. ১৭৯ হি.), আওযায়ী ও লাইস রাহ.-সহ আরও অনেক থেকে নকল করেছেন।'[৫৭১]

এ ছাড়া ইমাম খাত্তাবী (মৃ. ৩৮৮ হি.), খতীব বাগদাদী (মৃ. ৪৬৩ হি.), বায়হাকী (মৃ. ৪৫৮ হি.) ও যাহাবী রাহ. (মৃ. ৭৪৮ হি.)-সহ অনেকেই সুস্পষ্টভাবে তাফবীযুল মা'না ও নাফয়ুল কাইফিয়াহর কথা বলেছেন, যা সবিস্তারে উল্লেখ হয়েছে।

হাম্বলী শায়খ আল্লামা মারয়ী কারমী রাহ. (মৃ. ১০৩৩ হি.) বলেন,

وَجُمْهُور أهل السّنة، مِنْهُم السّلف وَأهل الحَدِيث على الْإِيمَان بهَا، وتفويض مَعْنَاهَا المُرَاد مِنْهَا إِلَى الله تَعَالَى، وَلَا نفسرها مَعَ تنزيهنا لَهُ عَن حَقِيقَتهَا.

'অধিকাংশ আহলুস সুন্নাহর মতে—যাদের মধ্যে সালাফ ও মুহাদ্দিসগণও রয়েছেন—সিফাতগুলোর প্রতি ঈমান আনা এবং **এগুলো থেকে যে অর্থ উদ্দেশ্য, তা আল্লাহ তাআলার ওপর 'তাফবীয' বা হাওয়ালা করা ওয়াজিব**। আর আমরা এগুলোর তাফসীর করব না এবং এগুলোর হাকীকত তথা আভিধানিক ও বাহ্যিক অর্থ থেকে আল্লাহ তাআলাকে পবিত্র মনে করব।'

তিনি আরও বলেন,

وهذا المذهب نقل الخطابي وغيره أنه مذهب السلف، ومنهم الأئمة الأربعة، وبهذا المذهب قال الحنفية والحنابلة وكثير من الشافعية وغيرهم، وهو إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها، مع نفي الكيفية والتشبيه عنها.

'সালাফ, (আবু হানীফা-সহ ফিকহের) চার ইমাম, হানাফী, হাম্বলী ও অনেক শাফেয়ীসহ অন্যদের মাযহাব হলো, সিফাতের আয়াত ও হাদীসসমূহকে আপন অবস্থায় রেখে দেওয়া এবং **কাইফিয়াহ-ধরন ও সাদৃশ্যতাকে নফী-নাকচ করা**।'[৫৭২]

সুতরাং প্রমাণিত হলো, ইমাম আবু হানীফা রাহ.-সহ সালাফ ও আহলুস সুন্নাহর অধিকাংশ ব্যক্তি সিফাতের অর্থ ও জ্ঞান 'তাফবীয' করতেন এবং 'কাইফিয়াত' নফী বা নাকচ করতেন।

---

৫৭১. ফাতহুল বারী, ৩/৩০
৫৭২. আকাবীলুছ ছিকাত, পৃষ্ঠা ৬০, ৬৫

তাওহীদুল আফআল সম্পর্কে আলোচনা

তাওহীদের তৃতীয় প্রকার হলো, 'তাওহীদুল আফআল' তথা আল্লাহ তাআলার কর্মসমূহের ও কার্যাবলির একত্ববাদে বিশ্বাসী হওয়া।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ

'আল্লাহ ছাড়া কি কোনো স্রষ্টা আছে?'[৫৭৩]

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা ব্যতীত কোনো স্রষ্টা নেই। তিনি ছাড়া সবাই ও সবই তাঁর মাখলূক ও সৃষ্ট। আলো-আঁধার, আকাশ-নক্ষত্র, চন্দ্র-সূর্য, তারকারাজি, এই পৃথিবী, পাহাড়-পর্বত, সাগর-নদী-বৃক্ষলতা, রকমারি উদ্ভিদ, উপকারী ও অপকারী প্রাণি সব কেবল তাঁরই সৃষ্টি। এসব কোনো উৎস ও পদার্থ কিংবা মৌল ও উপাদান ব্যতীত তিনিই সৃষ্টি করেছেন।

এমনইভাবে জান্নাত-জাহান্নাম, আরশ-কুরসী, কলম ও লাওহে মাহফুজ, জিন-ইনসান, ফেরেশতা ও শয়তান; এমনকি তাদের সমস্ত গুণ তথা নড়াচড়া ও স্থিরতা, একতা ও পৃথকতা, রং-স্বাদ ও ঘ্রাণ, জ্ঞান ও মূর্খতা, সামর্থ্য ও অক্ষমতা, শ্রবণ ও বধিরতা, দর্শন ও অন্ধতা, মূক ও বাক্‌শক্তি, সুস্থতা ও অসুস্থতা, জীবন-মরণ তথা সবকিছু তাঁরই সৃষ্টি। ইরশাদ করেন,

اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

'আল্লাহ সমস্ত জিনিসের সৃষ্টিকর্তা।'[৫৭৪]

অনুরূপ বান্দার সকল কাজ-কর্ম ও অর্জন-প্রাপ্তি, ভালো-মন্দ ও পছন্দ-অপছন্দ যদিও বান্দার ইচ্ছার ওপর হয়ে থাকে, তথাপি এ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তাও তিনিই। ইরশাদ করেন,

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوْنَ

'আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা যা কিছু করো তাও।'[৫৭৫]

বলাবাহুল্য, তাঁর ক্রিয়াপদ্ধতি সৃষ্টির মতো নয়। কারণ সৃষ্টি কর্মসম্পাদনের জন্য অঙ্গ ও উপকরণ ব্যবহারের মুখাপেক্ষী। কিন্তু আল্লাহ তাআলা কোনো অঙ্গ ও উপকরণ ছাড়া এবং কোনো মাধ্যম ছাড়াই সবকিছু করতে সক্ষম। তিনি যখন কিছু করতে চান,

---

৫৭৩. সূরা ফাতির, (৩৫) : ৩

৫৭৪. সূরা রা'দ, (১৩) : ১৬

৫৭৫. সূরা ছাফ্‌ফাত, (৩৭) : ৯৬

তখন তাঁকে কিছুই করতে হয় না; শুধু তিনি বলেন, 'হও' (কুন), অমনি হয়ে যায়। তিনি কোনো কর্ম নিজের প্রয়োজনে বা মুখাপেক্ষিতার জন্য করেন না। এমনইভাবে তিনি কোনো কর্ম অনর্থক করেন না, কারণ তিনি হাকীম ও প্রজ্ঞাময়।

তিনি জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে

কুরআনে কারীমে এসেছে,

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُونَ

'তিনি যা কিছু করেন, সে বিষয়ে (কারও কাছে) তাঁর জবাবদিহি করতে হবে না, কিন্তু সকলকেই (তাঁর কাছে) জবাবদিহি করতে হবে।'[৫৭৬]

প্রতিটি বস্তুর সৃষ্টির পেছনে আল্লাহ তাআলার হেকমত ও তাৎপর্য রয়েছে। সেটা মানুষ অনুধাবন করতে সক্ষম হোক আর না হোক। তিনি যা করেন, সেই ব্যাপারে তিনি কারও কাছে জিজ্ঞাসিত নন। তিনি যা চান, তা-ই করেন এবং যা ইচ্ছা, তা-ই আদেশ করেন।

বান্দার আনুগত্য ও অবাধ্যতা আল্লাহর সিদ্ধান্ত, নির্ধারণ, ইচ্ছা ও অভিলাষ অনুযায়ীই হয়ে থাকে। পার্থক্য এটুকু যে, আনুগত্যে থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি, আর অবাধ্যতায় থাকে তাঁর অসন্তুষ্টি। আল্লাহ যা চান তা-ই হয়, যা চান না তা হয় না; হোক সেটা আনুগত্য কিংবা অবাধ্যতা। বস্তুত বান্দার কাজ-কর্ম আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা নিজস্ব ইলম অনুযায়ী সংঘটিত হয়, আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী নয়। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা নিজস্ব ইলম অনুযায়ী জানেন, কে আনুগত্য করবে আর কে অবাধ্য হবে, কে জান্নাতী আর কে জাহান্নামী। ফলে সে অনুযায়ী তিনি বান্দার কাজ-কর্ম সৃষ্টি করেন।

সুতরাং আল্লাহ হেদায়েত দেন এর অর্থ হবে, তার জন্য হেদায়েত লাভের কর্ম সৃষ্টি করেন এবং তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী সে হেদায়েত লাভ করে। যেমনটি আল্লাহ বলেছেন,

فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ

'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে গোমরাহ করেন, আর যাকে ইচ্ছা তাকে হেদায়েত দেন।'[৫৭৭]

আল্লাহ যা ইচ্ছা দান করেন, চাই সেটা বান্দার জন্য উপকারী হোক কিংবা অপকারী। কারণ, বান্দার জন্য শুধু উপকারী বিষয় নির্ধারণ করা আল্লাহর ওপর আবশ্যক নয়। আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত বস্তু বা বিষয় যদি বান্দার জন্য উপকারী হয়, তাহলে তো সেটা তাঁরই কৃপা ও অনুগ্রহ; অন্যথায় ন্যায় ও সংগত।

---

৫৭৬. সূরা আম্বিয়া, (২১) : ২৩
৫৭৭. সূরা ইবরাহীম, (১৪) : ৪

তাওহীদুল উলূহিয়া সম্পর্কে আলোচনা

যখন আল্লাহ তাআলার সত্তা ও একত্ব সম্পর্কে জানলাম, তাঁর সিফাত-নাম ও কার্যাবলির ব্যাপারে পরিচিত হলাম এবং এসবের ওপর ঈমান আনলাম, তাহলে এখন উক্ত সত্তার প্রাপ্য এবং আমাদের করণীয় কী, তা জানা দরকার। এ বিষয়ে জানার জন্যই তাওহীদুল উলূহিয়া সম্পর্কে আলোচনা।

তাওহীদের চতুর্থ প্রকার হলো, 'তাওহীদুল উলূহিয়া/ইবাদাহ'; তথা সকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য করা।

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা উপাস্য হওয়ার ও ইবাদত লাভের অধিকারেও একক। তিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, আর কেউই ইবাদতের উপযুক্ত নয়, আর কোনো কিছুই উপাসনার যোগ্য নয়। তাই ইবাদতের ক্ষেত্রে আর কাউকেই, কোনো কিছুকেই, কোনোভাবেই শরীক ও অংশীদার বানানো যাবে না।

তাওহীদের এ প্রকার সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, তাওহীদের প্রথম তিন প্রকার জানার ও বিশ্বাসের উদ্দেশ্য ও ফলাফল হচ্ছে, 'তাওহীদুল উলূহিয়া' তথা একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা এবং সকল আমল তাঁর জন্যই করা।

কাজেই তাওহীদের প্রথম তিন প্রকার আর 'তাওহীদুল উলূহিয়া'-এর মাঝে বড় ধরনের পার্থক্য রয়েছে। কেননা, প্রথম তিন প্রকার হলো ইলম ও জ্ঞান অর্জন করার মতো; আর 'তাওহীদুল উলূহিয়া' হচ্ছে আমল ও করণীয় নির্ধারণ করার মতো।

আল্লাহ তাআলা যেহেতু সত্তাগতভাবে ও স্বীয় গুণাবলিতে এবং নিজ কার্যাদিতে একক—যার সাথে কেউই, কোনো কিছুই, কোনোভাবেই শরীক নেই; কাজেই আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্যই কোনো ধরনের উপাসনা ও কোনো রকমের ইবাদত করা অর্থহীন ও অন্যায়।

সুতরাং সকল ইবাদত আল্লাহ তাআলারই করতে হবে, সমস্ত উপাসনা তাঁরই চলবে এবং সকল আমল তাঁর জন্যই করতে হবে।

এ কারণেই কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলাকে একমাত্র মাবুদ হিসেবে মেনে নেওয়ার এবং তাঁকেই উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করার কারণ ও দলীল হিসেবে তাঁর পবিত্র সত্তার একত্ব, গুণাবলির একত্ব এবং কার্যাদির একত্ব তুলে ধরে ইরশাদ হয়েছে,

وَاِلٰـہُکُمۡ اِلٰہٌ وَّاحِدٌ ۚ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّا ہُوَ الرَّحۡمٰنُ الرَّحِیۡمُ اِنَّ فِیۡ خَلۡقِ السَّمٰوٰتِ وَالۡاَرۡضِ وَاخۡتِلَافِ الَّیۡلِ وَالنَّہَارِ وَالۡفُلۡکِ الَّتِیۡ تَجۡرِیۡ فِی الۡبَحۡرِ بِمَا یَنۡفَعُ النَّاسَ وَمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰہُ مِنَ السَّمَآءِ مِنۡ مَّآءٍ فَاَحۡیَا بِہِ الۡاَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِہَا

وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۪ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ

'তোমাদের (সকলের) মাবুদ-উপাস্য এক মাবুদ, তিনি ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই। (তিনি) সকলের প্রতি সীমাহীন দয়াবান, পরম দয়ালু।

নিশ্চয় আসমান ও জমিনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের পরিবর্তনে, মানুষের উপকারী সামগ্রী নিয়ে সাগরে নৌকাসমূহের চলাচলে, আকাশ থেকে আল্লাহর বর্ষণকৃত পানিতে—যার দ্বারা ভূমিকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেছেন ও তাতে সর্বপ্রকার জীব-জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন—আর বায়ুর দিক পরিবর্তনে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে বহু নিদর্শন আছে সেসব লোকের জন্য, যারা নিজেদের জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায়।'[৫৭৮] অর্থাৎ তোমাদের সকলের প্রকৃত মাবুদ একজন, এখানে একাধিক্যের কোনো অবকাশ নেই। অতএব যে ব্যক্তি এই মাবুদের অবাধ্য হলো, সে একেবারে অভিশপ্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো। যদি অন্য কোনো মাবুদ থাকত, তবে তার দ্বারস্থ ও শরণাপন্ন হওয়ার আশা করা যেত।

এ তো আর প্রভু-দাস, রাজা-প্রজা, উস্তাদ-শাগরিদ, পিতা-ছেলে, পীর-মুরীদের সম্পর্ক নয় যে, এক স্থানে সুবিধা না হলে অন্যত্র চলে গেলাম; বরং এ হলো সেই এক মাবুদ, যাঁকে ছাড়া আর কাউকে মাবুদ বানাতে পারো না এবং তাঁকে ছাড়া আর কারও আশ্রয় গ্রহণ করার আশাও করতে পারো না।

এখানের প্রথম (১৬৩ নং) আয়াতটি নাযিল হওয়ার পর মক্কার কাফেররা এ কথা ভেবে আশ্চর্য হলো যে, সমগ্র বিশ্বজগতের মাবুদ ও সকলের কার্যসম্পাদনকারী একজন কী করে হতে পারে? এর প্রমাণ কী? ফলে পরবর্তী আয়াত নাযিল হয়। এতে আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় কার্যাদির প্রমাণ দিয়েছেন।

লক্ষ করুন, وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ 'তোমাদের মাবুদ এক মাবুদ-উপাস্য' বলে আল্লাহ তাআলাকে একমাত্র মাবুদ হিসেবে গ্রহণ করার আহ্বান করেছেন। অতঃপর এর কারণ ও দলীল হিসেবে لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ 'তিনি ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই' কথাটির মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র সত্তার একত্ব এবং الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ 'তিনি সকলের প্রতি সীমাহীন দয়াবান, পরম দয়ালু' বলে তাঁর গুণাবলির একত্বের প্রমাণ ছিল। আর পরবর্তী লম্বা আয়াত দ্বারা বিভিন্ন সুনিপুণ কার্যাদিতে তাঁর একত্ব প্রমাণিত হলো।[৫৭৯]

অন্যত্র আল্লাহ্ তাআলা তাঁর ইবাদত করার আদেশ দেওয়ার সাথে সাথে এর দলীল-প্রমাণ হিসেবে কার্যাদির একত্ব তুলে ধরে বলেন,

---

৫৭৮. সূরা বাকারা, (২) : ১৬৩-১৬৪

৫৭৯. আরও দেখুন, তাফসীরে উসমানী

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَٰشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِۦ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

'হে মানবসমাজ! তোমরা তোমাদের ওই রব-প্রতিপালকের ইবাদত করো, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এতে আশা করা যায়, তোমরা মুত্তাকী হতে পারবে।

(সেই প্রতিপালকের ইবাদত করো,) যিনি তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদস্বরূপ স্থাপন করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করে তোমাদের জন্য ফল-ফসল উৎপাদন করেছেন তোমাদের খাদ্য হিসেবে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর অন্য কোনো শরীক স্থির কোরো না, যখন তোমরা এসব জানো।'[৫৮০]

আরেক জায়গায় তাঁর কার্যাদির একত্ব তুলে ধরে তিনি ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ থাকার ব্যাপারে প্রশ্ন রেখে বলেন,

أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَٰلَهَآ أَنْهَٰرًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَٰسِىَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ . أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ . أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَٰحَ بُشْرًۢا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهِۦٓ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ تَعَٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

'বলো তো, কে পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন এবং তার মাঝে মাঝে নদ-নদী প্রবাহিত করেছেন এবং তাকে স্থিত রাখার জন্য পর্বত স্থাপন করেছেন এবং দুই সমুদ্রের মাঝখানে অন্তরায় রেখেছেন?

অতএব, আল্লাহর সাথে অন্য কোনো মাবুদ আছে কি? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।

বলো তো, কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন, যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে পূর্ববর্তীদের স্থলাভিষিক্ত করেন? সুতরাং আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য আছে কি? তোমরা অতি সামান্যই ধ্যান করো।

বলো তো, কে তোমাদেরকে জলে ও স্থলে অন্ধকারে পথ দেখান এবং যিনি তাঁর অনুগ্রহের পূর্বে সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন? অতএব, আল্লাহর সাথে অন্য কোনো মাবুদ আছে কি? তারা যাকে শরীক করে, আল্লাহ তা থেকে অনেক ঊর্ধ্বে।'[৫৮১]

---

৫৮০. সূরা বাকারা, (২) : ২১-২২
৫৮১. সূরা নামল, (২৭) : ৬১-৬৩

কিন্তু মুশরিকরা একজন মাবুদ হওয়াকে বিস্ময়কর মনে করত এবং এটাকে বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক আখ্যায়িত করত। যেটাকে কুরআন এভাবে তুলে ধরেছে,

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ

'সে কি সমস্ত উপাস্যকে এক মাবুদে পরিণত করেছে? নিশ্চয় এটা তো এক বিস্ময়কর ব্যাপার!

তাদের প্রধান ব্যক্তিরা এ কথা বলে প্রস্থান করে যে, তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের উপাস্যদের পূজায় অবিচল থাকো। নিশ্চয়ই এ বক্তব্য কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত।'[৫৮২]

অথচ তাদের বিস্ময় ও উদ্দেশ্যমূলক বলার স্বপক্ষে কোনো দলীল-প্রমাণ নেই। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ

'যে কেউ আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যকে ডাকে, তার কাছে এর কোনো রকম দলীল-প্রমাণ নেই।'[৫৮৩]

আল্লাহরই ইবাদতের জন্য আমাদের সৃষ্টি

একমাত্র-শুধু-কেবল তাঁরই ইবাদত করার জন্য আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

'আমি জিন ও মানুষকে কেবল এ জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমারই ইবাদত করবে।'[৫৮৪]

অর্থাৎ আমরা খাওয়া-দাওয়া, গাড়ি-বাড়ি, চাকরি-বাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিয়ে-শাদি, পড়া-লেখা ইত্যাদি যা কিছুই করি না কেন, এগুলোর কোনোটাই আমাদেরকে সৃষ্টি করার আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং একমাত্র-শুধু-কেবল তাঁরই ইবাদত করাটাই আমাদেরকে সৃষ্টি করার আসল উদ্দেশ্য।

---

৫৮২. সূরা সোয়াদ, (৩৮) : ৫-৬
৫৮৩. সূরা মুমিনূন, (৪০) : ১১৭
৫৮৪. সূরা যারিয়াত, (৫১) : ৫৬

শুধু এক আল্লাহর ইবাদতের প্রতি নবীগণের প্রধান দাওয়াত

যুগে যুগে আম্বিয়ায়ে কেরামের জীবন-ইতিহাসে দেখতে পাই যে, শুধু এক আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াতই ছিল সর্বযুগে ও সব ধরনের পরিবেশে নবী-রাসূলগণ ও তাঁদের প্রতিনিধিদের প্রধান দাওয়াত এবং তাঁদের সবচেয়ে বড় ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

সর্বযুগে তাঁদের শিক্ষা ছিল, আল্লাহ তাআলাই ইবাদত, প্রার্থনা, মনোযোগ ও কুরবানী ইত্যাদির লক্ষ্যস্থল হওয়ার উপযুক্ত সত্তা।

এটাই ছিল তাঁদের দাওয়াতের ভিত্তি ও তাঁদের কার্যক্রমের অভীষ্ট লক্ষ্য এবং তাঁদের সকল ত্যাগ-তিতিক্ষা ও যাবতীয় প্রয়াসের সর্বশেষ কামনা। তাঁদের জীবন ও তাঁদের মিশনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল এটাই। তাঁদের সকল কর্মব্যস্ততা একে কেন্দ্র করেই ছিল। এখান থেকেই তাঁরা অগ্রসর হয়ে আবার এখানেই ফিরে আসতেন। এ থেকেই তাঁদের সকল কর্মকাণ্ড সূচিত করে আবার এতেই সমাপ্ত করতেন।

কুরআনে কারীম কখনো এর ব্যাপারে সংক্ষেপে এভাবে বলেছে,

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

'আপনার পূর্বে আমি যে রাসূলই প্রেরণ করেছি, তাঁকে এ আদেশই দিয়েছি যে, আমি ব্যতীত অন্য কোনো মাবুদ নেই। সুতরাং তোমরা আমার ইবাদত করো।'[৫৮৫]

আবার কখনো সবিস্তারে একেক নবীর নাম নিয়ে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর আহ্বানের সূচনা বা প্রধান দাওয়াত এটাই হতো।[৫৮৬]

সহীহ হাদীসে আছে, মক্কা শরীফের বাজারে বাজারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ تُفْلِحُوا.

'হে লোকসকল! তোমরা বলো, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই। তাহলে তোমরা সফলকাম হবে।'[৫৮৭]

একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু হুরায়রা রাযি.-কে বললেন,

اذْهَبْ بِنَعْلَيَّ هَاتَيْنِ، فَمَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْحَائِطَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ،

---

৫৮৫. সূরা আম্বিয়া, (২১) : ২৫

৫৮৬. উদাহরণস্বরূপ সূরা হুদের আয়াত নং ২৫, ২৬, ৫০, ৬১ও ৮৪, সুরা আম্বিয়ার ৫১-৫৪ নং আয়াতসমূহ, সূরা ও আবার ৬৯-৮২ নং আয়াতসমূহ, সূরা মারইয়ামের ৪১, সূরা আনকাবুতের ১৬, ১৭ ও ২৫ নং আয়াতসমূহ ও সূর ইউসুফের ৩৭-৪০ নং আয়াতসমূহ সামনে রাখা যেতে পারে।

৫৮৭. মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২৩১৫১; সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ৬৫৬২

فَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ.

'যে ব্যক্তির অন্তর ইয়াকীনের সাথে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য দেবে, তাকে বেহেশতের খোশখবরি দাও।'[৫৮৮]

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম,

مَا نَجَاةُ هَذَا الْأَمْرِ؟

'আখিরাতে মুক্তি লাভের উপায় কী?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

مَنْ قَبِلَ مِنِّي الْكَلِمَةَ الَّتِي عَرَضْتُ عَلَى عَمِّي، فَرَدَّهَا عَلَيَّ، فَهِيَ لَهُ نَجَاةٌ.

'যে ব্যক্তি আমার আনীত কালেমা (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) কবুল করবে, যা আমার চাচার নিকট (তথা আবু তালেবের কাছে তার অন্তিম সময়) পেশ করেছিলাম, কিন্তু তিনি কবুল করেননি; ওই কালেমাই তার জন্য মুক্তির উপায়।'[৫৮৯]

উল্লেখ্য, আরবের মুশরিকরা আল্লাহ তাআলাকে সৃষ্টিকর্তা ইত্যাদি কিছু বিষয় মানলেও তারা একমাত্র আল্লাহর জন্য করণীয় ইবাদত-উপাসনায় নিজেদের দেব-দেবী ও কাল্পনিক উপাস্যদের শরীক করত এবং তাদেরকে হাজত পূরণকারী ও বালা-মুসীবত থেকে উদ্ধারকারী বলে বিশ্বাস করে তাদের কাছে প্রার্থনা করত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন,

مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، ثُمَّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ.

'কোনো বান্দা যদি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, আর এ অবস্থায় তার মৃত্যু হয়, সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[৫৯০]

বলাবাহুল্য, এই হাদীসগুলোর অর্থ এটা মনে করা ঠিক নয় যে, শুধু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে তাওহীদকে স্বীকার করার দ্বারাই কেউ মুক্তির উপযুক্ত ও জান্নাতের হকদার হয়ে যায়। ঈমানের অন্যান্য শর্ত ও দাবি পূরণের আর প্রয়োজন নেই; বরং এই হাদীসগুলোর অর্থ শুধু এই যে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কবুল করা এবং তাওহীদ ইখতিয়ার করা প্রকৃতপক্ষে গোটা দ্বীন কবুল করারই শিরোনাম।

কাজেই 'যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কবুল করবে, সে জান্নাতে যাবে' কথাটির অর্থ

---

৫৮৮. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩১

৫৮৯. মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২০, সহীহ।

৫৯০. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৮২৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৪

হলো, যে ওই দ্বীনকে কবুল করে, যার ভিত্তি ও বুনিয়াদ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, সে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।

তাওহীদের গুরুত্বপূর্ণ দাবি

আমাদের ঈমানের কালেমার প্রথম বাক্যে দুটি অংশ :

১. 'লা-ইলাহা' তথা আল্লাহ ছাড়া অন্যসব উপাস্য, ধর্ম, মতবাদ, রীতিনীতি ও আদর্শকে অস্বীকার করা।

২. 'ইল্লাল্লাহ' তথা একমাত্র আল্লাহকে মাবুদ ও উপাস্য হিসেবে মেনে নেওয়া এবং এর দাবি হিসেবে জীবনের সকল অঙ্গনে ও সর্বাবস্থায় তাঁর হুকুমমতো চলা।

সুতরাং তাওহীদের প্রধান বিষয় পূরণ করতে হলে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাবি পালন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। যেমন : আমাকে একমাত্র আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী চলতে হবে। এর বিপরীতে পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মানবরচিত সংবিধান, ব্রিটিশ/নিজস্ব আইনের বিচারব্যবস্থা, পুঁজিবাদি অর্থনীতি, পশ্চিমা বা হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি, বাপ-দাদার নীতি, গোত্র ও সমাজের রীতি, লোকের মতামত, অন্যদের পছন্দ বা নিজ খেয়াল-খুশি ইত্যাদি দেখার ও গ্রহণ করার সুযোগ নেই; বরং কুরআন-সুন্নাহর বিরোধী হলে এ সকল কিছুকে পশ্চাতে ফেলে কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান ও মর্জি মোতাবেক আমাকে চলতে হবে।

মোটকথা, তাওহীদের প্রধান বিষয়ে পূর্ণতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ দাবি হলো, জীবনের সকল অঙ্গনে আল্লাহর হুকুম মোতাবেক চলার ফয়সালা করা এবং সর্বাবস্থায় তাঁরই দাসত্ব ও আনুগত্যকে জীবনের মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা।

কুরআনে কারীমের অনেক আয়াতে গুরুত্বপূর্ণ এ দাবি পালন করার কথা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

'(হে নবী!) আপনি কি সেই ব্যক্তির অবস্থা দেখেছেন, যে নিজ খেয়াল-খুশিকে আপন মাবুদ-উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে? আর আল্লাহ তাকে (সত্য উপলব্ধির) জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন এবং তার কান ও অন্তরের ওপর মোহর মেরে দিয়েছেন আর তার চোখের ওপর পর্দা ফেলে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ (গোমরাহ করার) পর কে তাকে হেদায়েত করবে? তোমরা কি তবুও বোঝো না?'[৫৯১]

---

৫৯১. সূরা জাছিয়া, (৪৫) : ২৩

বিধর্মীরা কখনোই আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তাদের ধর্মের অনুসরণ করি। তাই আল্লাহ তাআলা প্রকৃত হেদায়েত কী, তা জানিয়ে দিয়ে বলেন,

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

'ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা কখনোই/কিছুতেই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন। আপনি বলে দিন, আল্লাহর হেদায়েতই প্রকৃত হেদায়েত। আর যদি আপনি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করেন আপনার কাছে প্রকৃত ইলম আসার পর, তাহলে আল্লাহ থেকে রক্ষাকারী আপনার কোনো বন্ধুও থাকবে না এবং কোনো সাহায্যকারীও থাকবে না।'[৫৯২]

অন্যত্র এসেছে,

قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ ۙ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

'(হে নবী!) আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের খেয়াল-খুশিমতো চলতে পারি না। চললে আমি বিপথগামী হয়ে যাব এবং আমি সৎপথপ্রাপ্তদের মধ্যে গণ্য হব না।'[৫৯৩]

সুতরাং কোনো মুসলিম দাবিকারীর জন্য আল্লাহর হুকুমের বিপরীতে সমাজ, রাষ্ট্র, পশ্চিমা, নিজ বা অন্য কারও খেয়াল-খুশিমতো চলার সুযোগ নেই।

বরং সব ক্ষেত্রে ও সর্বাবস্থায় আল্লাহর হুকুমের সামনে প্রত্যেক মুসলমানকে আত্মসমর্পণ করতে হবে। ইরশাদ হয়েছে,

قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۖ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

'বলুন, আল্লাহর হেদায়েতই সত্য হেদায়েত। আর আমাদের প্রতি আদেশ হয়েছে, আমরা যেন রাব্বুল আলামীনের (হুকুমের) সামনে আত্মসমর্পণ করি।'[৫৯৪]

'ইসলাম' শব্দের সঠিক অর্থ

প্রাসঙ্গিক কথা হিসেবে সতর্ক করার জন্য বলতে হচ্ছে, অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তি ও বুদ্ধিজীবী ইসলাম শব্দের অর্থ করেন 'শান্তি'। আর কেউ বলেন, 'ইসলাম অর্থ শান্তির ধর্ম, আর মুসলিম শান্তিপ্রিয়'।

এরা জাতির সামনে এ ধরনের ভুল ও বিকৃত বক্তব্য উপস্থাপনের কারণ হচ্ছে, এদের মগজ ধোলাই করা হয়েছে অথবা ইসলাম সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান না থাকার

---

৫৯২. সূরা বাকারা, (২) : ১২০
৫৯৩. সূরা আনআম, (৬) : ৫৬
৫৯৪. সূরা আনআম, (৬) : ৭১

কারণে এমন বলে।

অনেক মুসলমানও সঠিকটা না জানার কারণে ইসলাম অর্থ 'শান্তি' বলে থাকেন। অথচ যারা এমনটা বলেন, তারা কেন এ কথা বলতে পারেন না যে, 'কেবল প্রকৃত ইসলামের ছায়াতলে এলেই শান্তি নিহিত।'

'ইসলাম' শব্দের সঠিক অর্থ 'কারও কাছে নত হওয়া, মান্য করা, আত্মসমর্পণ করা'; আর মুসলিম মানে সব ক্ষেত্রে ও সর্বাবস্থায় আল্লাহর হুকুমের সামনে আত্মসমর্পণকারী। এ অর্থই অভিধান, তাফসীর, আকীদা ও ফাতাওয়ার কিতাবসমূহে লেখা হয়েছে।

হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম সম্বন্ধে কুরআনে এসেছে,

إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ

'যখন তাঁর প্রতিপালক তাঁকে বললেন, "আনুগত্যে নতশির হও", তখন তিনি (সঙ্গে সঙ্গে) বললেন, আমি রাব্বুল আলামীনের (প্রতিটি হুকুমের) সামনে মাথা নত করলাম।'[৫৯৫]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফতী তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ লেখেন, 'এখানে কুরআন মাজীদ 'আনুগত্যে নতশির হওয়া'র জন্য 'ইসলাম' শব্দ ব্যবহার করেছে। 'ইসলাম'-এর শাব্দিক অর্থ মাথা নত করা এবং কারও পরিপূর্ণ আনুগত্য করা। আমাদের দ্বীনের নামও ইসলাম। এ নাম এ জন্যই রাখা হয়েছে যে, এর দাবি হলো, মানুষ তার প্রতিটি কথা ও কাজে আল্লাহ তাআলারই অনুগত হয়ে থাকবে। হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যেহেতু শুরু থেকেই মুমিন ছিলেন, তাই এ স্থলে আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য তাঁকে ঈমান আনার আদেশ দেওয়া ছিল না; বরং আল্লাহ তাআলার হুকুমের প্রতি আনুগত্য করা।'[৫৯৬]

সুতরাং যে সর্বাবস্থায় আল্লাহর হুকুমের সামনে আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য করার জন্য প্রস্তুত হতে পারবে না, সে প্রকৃত মুসলিম দাবি করতে পারে না!

কাজেই আমরা যারা ব্যবসা-বাণিজ্যে, বিবাহ-শাদিতে, উৎসব-সংস্কৃতিতে, শিক্ষা ও রাজনীতিতে আল্লাহর হুকুমের পরোয়া করছি না, তারা কীভাবে নিজেদেরকে প্রকৃত মুসলিম দাবি করছি!

একটু ভেবে দেখার সুযোগ হবে কি?

ড. কবি ইকবাল রাহ. (মৃ. ১৯৩৮ ঈ.) বলেন,

---

৫৯৫. সূরা বাকারা, (২) : ১৩১
৫৯৬. দ্র. তাওযীহুল কুরআন।

وضع میں تم ہو نصاریٰ تو تمدّن میں ہنود　　مسلماں ہیں جنھیں دیکھ کے شرمائیں یہود

یوں تو سیّد بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو　　تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو!

খ্রিষ্টান আর হিন্দু তুমি, চালচলনে বাইরে ঘরে
তোমরা কি হে মুসলমান আর, ইহুদ যারে ঘৃণা করে।
বলতে পারো সৈয়দ তুমি, মির্যা তুমি, পাঠান তুমি
কিন্তু কি হে বলতে পারো, খাঁটি মুসলমান যে তুমি?

আল্লাহ তাআলা তাঁর হুকুমের বিপরীতে কোনোভাবেই কোনোক্রমেই অন্য কারও অনুসরণ না করার আদেশ দিয়ে বলেন,

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ

'(হে মানুষ!) তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের তরফ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তার অনুসরণ করো। আর তাঁকে ছেড়ে অন্য (মনগড়া বা রাষ্ট্রীয়) অভিভাবকদের অনুসরণ কোরো না। (কিন্তু) তোমরা উপদেশ কমই গ্রহণ করো।'[৫৯৭]

আরও বলেন,

ثُمَّ جَعَلْنٰكَ عَلٰى شَرِيْعَةٍ مِّنَ الْاَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ

'(হে রাসূল!) আমি আপনাকে দ্বীনের এক বিশেষ বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং আপনি এর অনুসরণ করুন এবং যারা (দ্বীনের বিধানের) জ্ঞান রাখে না, তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবেন না।'[৫৯৮]

মুমিনদের কাছে এ সকল আয়াতের দাবি হচ্ছে, নিজেদের পুরো জীবনের প্রতিটি আচরণ-উচ্চারণে ও কথা-কর্মে তারা একমাত্র আল্লাহর নির্দেশ ও নির্দেশনার অধীন থাকবে এবং জীবনের সকল অঙ্গনে আল্লাহরই ফরমাবরদারী করবে ও তাঁরই হুকুমের সামনে আত্মসমর্পণ করবে।

সুতরাং ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন, সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গন, ব্যবসা-চাকুরি ও লেনদেন, অর্থনীতি ও শিক্ষানীতি প্রণয়ন, উৎসব ও সংস্কৃতি, আইন ও বিচারব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা-সহ জীবনের সকল ক্ষেত্র ও সব অঙ্গন নামাজ-রোযা ও হজ-যাকাতের মতো একমাত্র আল্লাহর নির্দেশনার অধীন থাকবে এবং তাঁরই অনুমোদিত পদ্ধতিতে পালন করতে হবে।

---

৫৯৭. সূরা আরাফ, (৭) : ৩
৫৯৮. সূরা জাছিয়া, (৪৫) : ১৮

কিন্তু আফসোস! আজকালের অনেক মুসলমান তাওহীদের গুরুত্বপূর্ণ এ দাবি জানেই না। আর কিছু লোক নামাজ-রোযা ও হজ-ওমরার মতো কতিপয় বিষয় পালনের চেষ্টা করলেও অন্য বিষয়গুলোকেও আল্লাহর নির্দেশনার অধীন হিসেবে মানা বা পালনের আবশ্যকীয়তা স্বীকারই করে না। অথচ কোনো সন্দেহ নেই যে, এগুলো মানাও মুসলমানদের কাছে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র দাবি এবং এ ছাড়া তাদের ঈমান ও ইসলাম অপূর্ণাঙ্গ।

কবি বলেন,

جو می گویم مسلمانم بلرزم * کہ دانم مشکلات لاالہ را

যখন বলি, 'আমি মুসলমান' তো কেঁপে উঠি

কারণ, আমি জানি 'লা-ইলাহা'র জটিলতাটি।

সারকথা, এ সবগুলোই 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর গুরুত্বপূর্ণ দাবি। এ সকল বিষয়ে যার যতটুকু কমতি থাকবে, বুঝতে হবে তার তাওহীদ ততটুকু অসম্পূর্ণ। আর যার মধ্যে এ বিষয়গুলো যে পরিমাণ পূর্ণতা পাবে, তার তাওহীদও সেই অনুপাতে পূর্ণাঙ্গ সাব্যস্ত হবে।

এ যুগের উপাস্য ও পূজনীয় বস্তু!

পূর্বেকার মুশরিকরা বুত-মূর্তি, চন্দ্র-সূর্য, গাছ-পাথর অথবা মাজার-কবর ইত্যাদিকে উপাস্য মানত ও পূজা করত এবং এখনো কবর-মাজার ও দরগাহ-পূজা আমাদের চট্টগ্রামসহ অনেক স্থানে রয়েছে। কিন্তু ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়া এ যুগের উপাস্য ভিন্ন এবং পূজার পদ্ধতিও ভিন্ন।

তাই এখানে স্পষ্ট করে ও সাহসিকতার সাথে বলা দরকার যে, ইসলাম 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র আঘাতের মাধ্যমে ওই নতুন উপাস্যদেরও নিধন ও চুরমাচুর করতে চায়, যা ইউরোপ ও পশ্চিমা রাষ্ট্রে এবং আমাদের এ দেশে সংবিধান-পূজা, নেতা-পূজা, দল-পূজা ও মাতৃভূমি-পূজা বা জাতীয়তাবাদ অথবা নারী-উন্নয়ন কিংবা সংস্কৃতি ও বিভিন্ন চেতনার নামে জন্ম হয়েছে ও বিস্তার ঘটেছে।

যেমন : সংবিধান ও নেতা-নেত্রী বা দলের নিঃশর্ত আনুগত্য কিংবা জাতীয় নেতা, জাতির জনক, স্বাধীনতার ঘোষক, দলের প্রতিষ্ঠাতা ইত্যাদির মূর্তি ও ভাস্কর্য তৈরি করে বা তাদের ছবি টাঙিয়ে রেখে কিংবা প্রতিকৃতির সামনে শির অবনত করে অথবা দেশ/দলীয় পতাকা ছুঁয়ে বা সালাম করে সম্মান ও ভক্তির প্রকাশ, পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং বিজয়/জাতীয় দিবসে বিভিন্ন শিরক-মিশ্রিত কর্মকাণ্ড 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র পয়গামে তাওহীদের পরিপন্থী। ইসলামে এগুলো নিঃসন্দেহে হারাম;

বরং ক্ষেত্রবিশেষে শিরক। তাই এগুলো করার কোনো অবকাশ নেই।

আরও অবাক করা কাণ্ড হচ্ছে, এ রাজনীতিবিদরাই আবার নির্বাচন এলে শাহজালাল-শাহপরানের মাজার যিয়ারতের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করে সাধারণ মানুষের আকীদা বিনষ্ট করে এবং মাজার ও দরগাহ-পূজার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে!

ইউরোপ-পশ্চিমা ও তাদের অনুসরণে মুসলমানরাও 'সংবিধান', 'পতাকা', 'জাতি' ও 'মাতৃভূমি'-কে যেভাবে উপাস্যের আসনে আসীন করেছে এবং যেভাবে এসবের শ্রেষ্ঠত্ব ও বন্দনা-গান করে, আর হক-বাতিল ও ন্যায়-অন্যায় থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এ উপাস্যকুলের প্রতি বিশ্বস্ত থাকা যেভাবে এক স্বতন্ত্র ধর্মের রূপ পরিগ্রহ করেছে, এগুলোও তাওহীদের সাথে সাংঘর্ষিক এবং ইসলামের দৃষ্টিতে এক ধরনের শিরক; বরং বাস্তবতা হলো, ইউরোপের তৈরি এই সকল উপাস্য ও পূজনীয় বস্তু (সংবিধান, নেতা, দল, পতাকা, মাতৃভূমি, জাতি ইত্যাদি) একদিক থেকে মাটি-পাথরের প্রাচীন মূর্তির চেয়েও ভয়াবহ।

ড. ইকবাল (মৃ. ১৯৩৮ ঈ.) যথার্থই বলেছেন,

اس دور میں مئے اور ہے جام اور ہے جم اور　　ساقی نے بنائی روش لطف وکرم اور

مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور　　تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور

ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے　　جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے

এ যুগের শরাব আলাদা, পেয়ালা আলাদা, পানকারীও আলাদা

শরাব পরিবেশনকারীর রহম-কৃপার ভঙ্গিমাও আলাদা

মুসলমানরাও নির্মাণ করেছে 'হারাম' আলাদা

সভ্যতার 'আযর' তৈরি করেছে 'মূর্তি' আলাদা

এই নব ইশ্বরকুলের বড়টির নাম 'মাতৃভূমি'

এর পোশাকের মাঝেই দেখবে ধর্মের কাফন তুমি।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এ যুগের নব-উপাস্য ও পূজার কাজসমূহ থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

আমি তাওহীদ-সংক্রান্ত এ আলোচনা হযরত মাওলানা মনযুর নুমানী রাহ.-এর একটি বক্তব্যের মাধ্যমে শেষ করছি। তিনি বলেন, বর্তমান যুগে পশ্চিমের চিন্তাধারা অনেক মানুষকেই সনাতন শিরকের বিষয়ে বিমুখ করেছে। কারণ, ওই শিরকের ভিত্তি যে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার তা অতি স্পষ্ট। এ কারণে পড়ালেখা জানা ব্যক্তিমাত্রই,

যদি তার মধ্যে কিছু চেতনা ও বিচার-বোধও থাকে, প্রতিমাপূজা, বৃক্ষ ও লতাপাতার পূজা, নদ-নদীর পূজা এবং জন্তু-জানোয়ারের পূজাকে চরম নির্বুদ্ধিতাই মনে করে। যদিও প্রথা ও প্রচলনের কারণে কিংবা নিজের 'জাতীয় সংস্কৃতি'র অংশ মনে করে, সেও ওই সকল পূজা-অর্চনায় লিপ্ত হলেও মন থেকে কখনোই এসব বিষয়ে শ্রদ্ধা পোষণ করতে পারে না।

কিন্তু এখন পশ্চিমা চিন্তাধারার প্রভাবে ওই সকল প্রাচীন প্রতিমার স্থলে কিছু নতুন 'প্রতিমা'র আবির্ভাব ঘটেছে এবং বিশ্বব্যাপী তার সংক্রমণ ঘটেছে। এই সকল নতুন প্রতিমার 'পূজা-অর্চনা'ই এখন জোরেসোরে হচ্ছে। ওই সকল প্রতিমা হচ্ছে জাতি, ভূখণ্ড, জাতীয় স্বার্থ, দেশীয় স্বার্থ, উদর, সম্পদ, ক্ষমতা ইত্যাদি।

দেশ ও দেশবাসীর প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততা নিন্দনীয় নয়; বরং তা স্বভাবের এক সাধারণ প্রেরণা। একটা পর্যায় পর্যন্ত তা কাম্যও বটে। তেমনই দেশীয় ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা, সম্পদ উপার্জনের চিন্তা, শান্তি ও সম্মানের সাথে জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষা, এসব বিষয়ে যদি হালাল-হারামের সীমা এবং অন্যের হকের সীমানা লঙ্ঘন না করা হয়, তাহলে কখনো তা নিন্দিত নয়। তেমনই কোনো কল্যাণ-উদ্দেশ্যে, যেমন : সৃষ্টির সেবা, ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির জন্য রাষ্ট্র-ক্ষমতা অর্জনের চিন্তা ও তৎপরতাও কখনো ভুল নয়। নবীগণ কখনো এসব কাজে বাধা দেননি; বরং এসব ক্ষেত্রেও বিধান দান করেছেন।

কিন্তু এ যুগে এই সকল বিষয় স্ব-স্ব গণ্ডি অতিক্রম করে এত ওপরে উঠে গেছে যে, তা এক ধরনের মাবুদ ও তাগূতের স্তরে উপনীত হয়েছে।

এখন তো দেশ ও জাতির 'স্বার্থ' রক্ষার জন্য সবকিছুই বৈধ, তা যতই অন্যায় ও গর্হিত হোক না কেন। এটি এখন নীতি ও বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। তেমন সম্পদ ও ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা ও তৎপরতাকেও আল্লাহর বিধান থেকে মুক্ত-স্বাধীন ধরে নেওয়া হয়েছে, যেন সম্পদ এক দেবতা, যেকোনোভাবে তার 'নৈকট্য' অর্জনই পরম আরাধ্য।

আর ক্ষমতা এক দেবী, যেকোনো মূল্যে তার আশীর্বাদ লাভই জীবনের পরম লক্ষ্য। সুতরাং এদের পদপ্রান্তে ধর্ম ও নৈতিকতার সকল বিধানই জলাঞ্জলি দেওয়া যায়!

এই দেশ-জাতি, অর্থ ও ক্ষমতা এবং উদর ও যৌনতা হচ্ছে এ যুগের নতুন 'প্রতিমা'। আর এসবের 'পূজা-অর্চনা'ই হচ্ছে এ যুগের নতুন (এক প্রকারের) 'শিরক'। তাওহীদের দ্বীন ইসলামে এসবের কোনো স্থান নেই।

সুতরাং নতুন-পুরাতন সকল শিরককে লক্ষ্য করে আমাদের পুনরায় ঘোষণা করতে হবে তাওহীদের ইমাম হযরত ইবরাহীম আ.-এর বজ্রনির্ঘোষ,

إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ

'তোমাদের সাথে আর তোমাদের মনগড়া উপাস্য-দেবতার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই।'[৫৯৯]

এই সকল অনাচারের মূলে রয়েছে প্রবৃত্তির পূজা, অর্থাৎ আল্লাহর বিধানের আনুগত্যের স্থলে মনের চাহিদার অনুগমন। এটাই হচ্ছে সকল শিরক ও অনাচার এবং সকল নাফরমানী ও স্বেচ্ছাচারের জননী। এদিক থেকে যেন সবচেয়ে বড় প্রতিমা মানবের নিজের প্রবৃত্তি।

এ সময়ের কোনো কোনো আল্লাহওয়ালা বুযুর্গকে দেখেছি, কালিমায়ে তাওহীদের ব্যাখ্যায় তারা এ বিষয়েই অধিক জোর দিয়েছেন। তাঁদের নিকটে কালিমায়ে তাওহীদ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর বিশেষ দাবি এই যে, মন যা চায় তা না করা; বরং সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর যা হুকুম তা-ই করা। কুরআন মাজীদের এক জায়গায় মনের কামনা-বাসনা ও প্রবৃত্তি-ইচ্ছাকে 'ইলাহ' ও মাবুদ বলা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُۥ هَوَىٰهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا

'আচ্ছা বলুন তো, যে ব্যক্তি নিজের কামনা-বাসনাকে আপন মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে, (হে নবী!) আপনি কি তার দায়-দায়িত্ব নিতে পারবেন?[৬০০]

অর্থাৎ এ আয়াতে ইসলাম ও শরীয়ত-বিরোধী প্রবৃত্তির অনুসারীকে প্রবৃত্তির পূজারী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

এ থেকে বোঝা যায়, যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধান থেকে বেপরোয়া হয়ে প্রবৃত্তির আনুগত্য করে, সে যেন নিজ প্রবৃত্তির পূজারি; প্রবৃত্তিই তার মাবুদ ও উপাস্য।

সুতরাং 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র মাধ্যমে আমাদেরকে ওই সকল বিষয় অস্বীকার করতে হবে, যেগুলোতে মাবুদ বা তাগূত হওয়ার কিছুমাত্র বর্ণ-গন্ধও রয়েছে। সকল পর্যায়ের ও সকল ধরনের শিরককে ঘৃণা করতে হবে এবং সেসব থেকে সর্বতোভাবে আত্মরক্ষা করতে হবে। আর সকল দিক থেকে নিজের তাওহীদকে পূর্ণ ও খাঁটি করতে হবে। শিরক যেমন আল্লাহর কাছে চরম ঘৃণিত, তাওহীদ তেমন তাঁর কাছে পরম গ্রহণীয়। বস্তুত তাওহীদই গোটা দ্বীন ও ধর্মের প্রাণ।[৬০১]

---

৫৯৯. সূরা মুমতাহিনা, (৬০) : ৪
৬০০. সূরা ফুরকান, (২৫) : ৪৩
৬০১. দ্র. আলকাউসার, জানুয়ারি ২০১৩, ঈষৎ পরিমার্জিত ও সংযোজিত

সালাফীদের তাওহীদের তিন ভাগ পরিচিতি ও পর্যালোচনা

এ অধ্যায়ের তৃতীয় বিষয় হলো, বর্তমান সালাফী বন্ধুদের তাওহীদের তিন ভাগ পরিচিতি ও পর্যালোচনা।

আশআরী-মাতুরীদীগণের নিকট তাওহীদের তিন প্রকার তথা 'তাওহীদুস যাত', 'তাওহীদুস সিফাত' ও 'তাওহীদুল আফআল' এবং এর প্রতিফল হিসেবে 'তাওহীদুল উলূহিয়া' নিয়ে আলোচনার পর বর্তমান সালাফী বন্ধুদের নিকট প্রসিদ্ধ তাওহীদের তিন প্রকার তথা 'তাওহীদুর রুবূবিয়া', 'তাওহীদুল উলূহিয়া' ও 'তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত'-এর পরিচিতি ও পর্যালোচনা তুলে ধরা হলো।

প্রথমে দুটি বিষয় জেনে রাখা দরকার :

১. তাদের তিন প্রকারের এ ভাগ প্রথমে ছিল না; বরং প্রথম দুই প্রকার তথা 'তাওহীদুর রুবূবিয়া' ও 'তাওহীদুল উলূহিয়া' ছিল। প্রথম প্রকারকে বলা হয়, **توحيد المعرفة والإثبات** আর দ্বিতীয় প্রকারকে **توحيد الطلب والقصد** বলা হয়।

পরবর্তী সময়ে প্রথম প্রকারকে দুই ভাগ করে তৃতীয় প্রকার করা হয়।

২. যতটুকু জানা যায়, সালাফের বক্তব্য ও ভাষ্যে প্রথম দুই প্রকার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়া পাওয়া গেলেও সর্বপ্রথম স্পষ্টভাবে এভাবে তিন প্রকারে ভাগ করেছেন শায়খ ইবনে তাইমিয়া রাহ. (মৃ. ৭২৮ হি.)।

বলাবাহুল্য, নতুন পরিভাষা উদ্ভাবন করা বা কোনো কিছুকে ভাগ করা সব ক্ষেত্রে দূষণীয় নয়; বরং উক্ত কাজ কী উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে, এগুলোর মর্ম ও ব্যাখ্যা কী ইত্যাদি বিষয় দেখে ভালো-মন্দ নির্ণীত হবে।

প্রথম দুই প্রকারের সংজ্ঞা

আল্লামা মুরতাযা যাবীদী হানাফী রাহ. (মৃ. ১২০৬ হি.) বলেন,

التَّوْحِيدُ تَوْحِيدَانِ: تَوْحِيد الرُّبُوبِيَّة، وتَوْحِيدُ الإِلاهيَّة.

'তাওহীদ দুই প্রকার : তাওহীদুর রুবূবিয়া ও তাওহীদুল ইলাহিয়া।'[৬০২]

'তাওহীদুর রুবূবিয়া'-এর ব্যাখ্যা হচ্ছে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনকে তাঁর সকল কাজ, ক্ষমতা, সিফাত-গুণাবলি ও পূর্ণতায় একক বিশ্বাস করা।

অর্থাৎ তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা, রব-পালনকর্তা, রিযিকদাতা, বিধানদাতা, জীবনদাতা-মৃত্যুদাতা, বিপদ-আপদ থেকে মুক্তিদাতা, সকল অবস্থায় সাহায্যকারী, সুস্থতা-অসুস্থতার মালিক, নিরাপত্তার মালিক, কর্মসম্পাদনের ব্যবস্থাপনাকারী ইত্যাদি;

---

৬০২. তাজুল আরূস, ৯/২৭৬

এতে কেউ শরীক নেই। তাঁর ইচ্ছা ও আদেশে সবকিছু হয়, অন্যথায় কিছুই হয় না।

'তাওহীদুর রুবূবিয়া' সম্পর্কে কয়েকটি আয়াত দেখুন,

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

'তিনি আল্লাহ্, তোমাদের রব-পালনকর্তা, সবকিছুর স্রষ্টা।'[৬০৩]

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ

'যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সকল সৃষ্টিজগতের পালনকর্তা। যিনি সকলের প্রতি দয়াবান, পরম দয়ালু, যিনি কর্মফল-দিবসের মালিক।'

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ

'আপনার পালনকর্তা যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং পছন্দ করেন। তাদের কোনো ক্ষমতা নেই।'[৬০৪]

وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ

'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে।'[৬০৫]

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُوْنَ

'তুমি জিজ্ঞেস করো, কে রুযী দান করে তোমাদেরকে আসমান থেকে ও জমিন থেকে, কিংবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তা ছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভেতর থেকে বের করেন এবং কেই-বা মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে করেন কর্মসম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ!

তখন তুমি বলো, তারপরেও ভয় করছ না?'[৬০৬]

আর 'তাওহীদুল উলূহিয়া'-এর অর্থ হলো, বান্দার সকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য করা।

অর্থাৎ তিনিই সকল ইবাদতের প্রাপ্য ও অধিকারী বিশ্বাস করে সকল ইবাদত খাঁটি ও খালেস নিয়তে তাঁর জন্যই করা। চাই তা বাহ্যিক/প্রকাশ্য ইবাদত হোক, যেমন

---

৬০৩. সূরা মুমিন, (২৩) : ৬
৬০৪. সূরা কাসাস, (২৮) : ৬৮
৬০৫. সূরা নূর, (২৪) : ৪২
৬০৬. সূরা ইউনুস, (১০) :৩১

: নামাজ, যাকাত ও কুরবানী কিংবা অপ্রকাশ্য/অভ্যন্তরীণ হোক, যেমন : মান্নত, তাওয়াক্কুল, ভয়, আশা ও ভালোবাসা ইত্যাদি। এটাকে 'তাওহীদুল ইবাদাহ'-ও বলা হয়।

'তাওহীদুল উলূহিয়া'-এর বিবরণ-সংবলিত কিছু আয়াত :

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

'(হে আল্লাহ!) আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য চাই।'

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

'অতএব, তোমরা আল্লাহকে খাঁটি বিশ্বাস সহকারে ডাকো, যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।'[৬০৭]

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

'তোমাদের পালনকর্তা বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি সাড়া দেবো।'[৬০৮]

فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ

'অতএব, তাঁরই বন্দেগী করো এবং তাঁর ওপর ভরসা রাখো।'[৬০৯]

সারাংশ : প্রকারদ্বয়ের মাঝে পার্থক্য হলো, 'তাওহীদুর রুবূবিয়া' আল্লাহ্ তাআলার গুণবাচক নাম-গুণাবলি ও কার্যাদির সাথে সংশ্লিষ্ট, আর 'তাওহীদুল উলূহিয়া' বান্দার কাজ ও ইবাদতের সাথে সম্পৃক্ত।

তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত প্রসঙ্গ

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রাহ. পরবর্তীকালে আরেকটি প্রকার বাড়িয়ে তাওহীদের ভাগটাকে তিন প্রকার করেছেন। এটা মূলত প্রথম প্রকারকে দুই ভাগ করে সেখান থেকে তৃতীয় প্রকারকে বের করা হয়েছে। আর এর নাম দিয়েছেন 'তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত'।

অর্থাৎ আল্লাহর গুণবাচক নাম ও সিফাত বা গুণসমূহকে সাদৃশ্যায়ন ব্যতীত একমাত্র তাঁর জন্য নির্দিষ্ট করা ও বিশ্বাস করা।

তাওহীদের এ ভাগ সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত?

এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের অবস্থান তিন রকম পাওয়া যায় :

---

৬০৭. সূরা মুমিন, (২৩) : ১৪
৬০৮. সূরা মুমিন, (২৩) : ৬০
৬০৯. সূরা হুদ, (১১) : ১২৩

১. কিছু উলামা ওপরের ব্যাখ্যামতে তাওহীদের এই ভাগকে সমর্থন করেছেন। যেমন : মুরতাযা যাবীদী রাহ.-এর উদ্ধৃতি ওপরে উল্লেখ হয়েছে, মোল্লা আলী কারী রাহ. (মৃ. ১০১৪ হি.) شرح الفقه الأكبر ও ضوء المعالي গ্রন্থদ্বয়ে এবং শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রাহ. (মৃ. ১৪১৭ হি.) كلمات في كشف الأباطيل কিতাবে (পৃ. ৩৭) সমর্থন করেছেন।

২. অনেকে তাওহীদের এ ভাগের খণ্ডন করে স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছেন। যেমন : উমর আবদুল্লাহ আল-কামেল كلمة هادئة في بيان خطأ التقسيم الثلاثي للتوحيد নামে এবং ড. জামীল হালীম হুসাইনী السهم السديد في ضلالة تقسيم التوحيد নামে লিখেছেন।

৩. যারা তাওহীদের মূল এ ভাগকে অস্বীকার বা খণ্ডন করেননি। কারণ, পরিভাষা নিয়ে কোনো মতানৈক্য নেই। তবে এ ভাগকে কেন্দ্র করে যে সকল ভুল ও ভ্রান্ত দাবি করা হয়, তা খণ্ডন করেছেন।

যেমন : শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ ইয়াফেয়ী التوسل بالصالحين গ্রন্থে এবং শায়খ উসমান নাবলূসী تقسيم التوحيد কিতাবে করেছেন। ভ্রান্তি ও ভুল দাবিগুলো ও তার খণ্ডন সামনে আসছে।

উল্লেখ্য, সাধারণত ভাগ দুই ধরনের হয়ে থাকে। একটা হলো 'শরয়ী ভাগ', যা দলীল দ্বারা প্রমাণিত এবং হুকুম সাব্যস্ত করে। যেমন : আমর বা কোনো কিছুর আদেশের ভাগ এভাবে করা হয় যে, কোনোটার মাধ্যমে ওয়াজিব সাব্যস্ত হয় আর কোনোটার মাধ্যমে মুস্তাহাব সাব্যস্ত হয় ইত্যাদি।

দ্বিতীয় হচ্ছে 'পারিভাষিক ভাগ', যা কোনো হুকুম সাব্যস্ত করে না। তো তাওহীদের এ ভাগ হলো 'পারিভাষিক ভাগ'। আর বলা হয়ে থাকে, পরিভাষা নিয়ে কোনো মতানৈক্য নেই। তা ছাড়া এ ভাগের উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ যেন তাওহীদের বিষয়টা সহজে বুঝতে পারে।

কাজেই তাওহীদের মূল এ ভাগকেই অস্বীকার বা খণ্ডন না করে; বরং এ ভাগকে কেন্দ্র করে যে সকল ভুল ও ভ্রান্ত দাবি করা হয়, তা খণ্ডন করাটা যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

তাওহীদের এ ভাগকে কেন্দ্র করে কিছু ভ্রান্ত দাবি ও তার খণ্ডন

কতিপয় সালাফী দাবিদার ভাই এ ভাগকে কেন্দ্র করে কিছু ভ্রান্ত দাবি ও ভুল চিন্তা প্রকাশ করেন। নিম্নে তা জবাব সহকারে উল্লেখ করা হলো :

ভ্রান্ত দাবি-১

কাফের-মুশরিকরা 'তাওহীদুর রুবূবিয়া'তে বিশ্বাসী ছিলেন, তারা শুধু 'তাওহীদুল উলূহিয়া' অস্বীকার করতেন। আর রাসূলগণকে কেবল 'তাওহীদুল উলূহিয়া'-এর

দাওয়াত দেওয়ার জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে।[৬১০]

দলীল :

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللهُ

'আপনি যদি তাদেরকে (কাফের-মুশরিকদের) জিজ্ঞেস করেন, আসমানসমূহ ও জমিন কে সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ।'[৬১১]

খণ্ডন

তাওহীদের এ ভাগ থেকে সবচেয়ে ভয়ানক বিকৃতি ও ভয়ংকর ফলাফল হলো, কাফের-মুশরিকদেরকে 'তাওহীদুর রুবূবিয়া'তে মুওয়াহহিদ তথা রুবূবিয়াহর ক্ষেত্রে তাওহীদবাদী সাব্যস্ত করা। এমন দাবি সম্ভবত সালাফের যুগে কেউ করেননি।

এর কারণ হচ্ছে, কিছু লোক 'তাওহীদুর রুবূবিয়া' বলতে আল্লাহকে কেবল পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা বুঝেছে। ফলে তারা দাবি করেছে, মক্কার মুশরিকরা 'তাওহীদুর রুবূবিয়া'তে বিশ্বাসী ছিল; বরং দুনিয়ার অধিকাংশ মুশরিকই 'তাওহীদুর রুবূবিয়া'তে বিশ্বাসী। তাই যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ 'তাওহীদুর রুবূবিয়া' প্রতিষ্ঠার জন্য আসেননি; বরং তাঁরা 'তাওহীদুল উলূহিয়া' প্রতিষ্ঠার জন্যই এসেছেন।

তাদের দৃষ্টিতে 'তাওহীদুর রুবূবিয়া'-এর বিশেষ কোনো মূল্য ও গুরুত্ব নেই, 'তাওহীদুল উলূহিয়া'-ই মূল ও আসল।

অথচ 'তাওহীদুর রুবূবিয়া' মানে আল্লাহ কেবল সৃষ্টিকর্তা নন; বরং এককভাবে আল্লাহ তাআলাকে সকল কার্যক্ষমতা এবং গুণাবলির অধিকারী বিশ্বাস করা। যেখানে সৃষ্টি, প্রতিপালন, সাহায্য, রিযিক, রক্ষণাবেক্ষণ, বিধান, জীবন-মৃত্যুদান, যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণকরণ, উপকার-অপকারের ক্ষমতা, জগৎ পরিচালনা, ইহকাল-পরকালের মালিকানা, গোটা সৃষ্টির ওপর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

ফলে কেউ যদি বলে, 'সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ'। তাতেই সে 'তাওহীদুর রুবূবিয়া'-এর স্বীকৃতিকারী মুওয়াহহিদ বা একত্ববাদী হয়ে যাবে, তা কখনো সম্ভব নয়; বরং সর্বোচ্চ বলা যায়, সে তাওহীদের একটা ক্ষুদ্রতম অংশে বিশ্বাস করে।

কিন্তু শায়খ ইবনে তাইমিয়া রাহ. ও সালাফী বন্ধুরা তাওহীদের উপরিউক্ত ভাগ করে এবং মুতাকাল্লিমীনদের খণ্ডন করতে গিয়ে ভয়ংকর ফলাফল ও ভয়ানক বিকৃতির শিকার হয়েছেন।

---

৬১০. দেখুন, আল-ইস্তিকামাহ, ইবনে তাইমিয়া, ১/১৭৯, ২/৩১; মাজমুউল ফাতাওয়া, ৩/১০১, ১০/২৬৪
৬১১. সূরা লুকমান, (৩১) : ২৫

একদিকে দুনিয়ার অধিকাংশ কাফের-মুশরিককে 'তাওহীদুর রুবূবিয়া'তে বিশ্বাসী ও স্বীকৃতিকারী বানিয়ে ফেলেছেন এবং কাফের-মুশরিকদের স্বীকৃত 'তাওহীদুর রুবূবিয়া'কে মুতাকাল্লিমীনরা আসল তাওহীদ মনে করে দাবি করেছেন![৬১২]

অপরদিকে মুসলমানদের চোখে 'তাওহীদুর রুবূবিয়া'কে গুরুত্বহীন করে দিয়েছেন এবং 'তাওহীদুর রুবূবিয়া'কে নাজাত পাওয়ার ক্ষেত্রে মূল্যহীন সাব্যস্ত করেছেন!

অথচ 'তাওহীদুর রুবূবিয়া' ও 'তাওহীদুল উলূহিয়া' দুটো মিলেই তাওহীদ। দুটোই তাওহীদের অবিচ্ছেদ্য ভিত্তি। দুটো একসাথে পাওয়া গেলেই কেবল নাজাত প্রাপ্তি। দুটোর প্রতিষ্ঠার জন্যই সকল নবী-রাসূল এসেছেন এবং তাঁরা দুটোরই দাওয়াত দিয়েছেন। যদিও আম্বিয়ায়ে কেরামকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'তাওহীদুল উলূহিয়া'-এর বিপরীত শিরকের মোকাবিলা করতে হয়েছে।

কাজেই কেউ দুটোর কোনো একটাতেই 'তাওহীদ' বাদ দিলে, সে কোনোভাবেই মুওয়াহহিদ বা একত্ববাদে বিশ্বাসী হতে পারে না; বরং দুটো একসাথে পাওয়া গেলেই কেবল মুওয়াহহিদ হতে পারবে।

কাফের-মুশরিকরা যে 'তাওহীদুর রুবূবিয়া'-এর সকল ক্ষেত্রে মুওয়াহহিদ ছিল না, তার কিছু প্রমাণ কুরআনে কারীম থেকে তুলি ধরছি—

ইরশাদ হয়েছে,

وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ

'তারা আল্লাহর পরিবর্তে অনেক ইলাহ গ্রহণ করেছে, যাতে তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হতে পারে। (অথচ) এসব ইলাহ তাদেরকে সাহায্য করার ক্ষমতা রাখে না।'[৬১৩]

ইমাম ইবনে কাসীর রাহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন,

يقول تعالى منكرًا على المشركين في اتخاذهم الأنداد آلهة مع الله، يبتغون بذلك أن تنصرهم تلك الآلهة، وترزقهم، وتقربهم إلى الله زلفى.

'আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের খণ্ডন করে এটা বলেছেন। কারণ, তারা আল্লাহর সাথে অন্যান্য ইলাহকে শরীক করে আশা পোষণ করে যে, উক্ত ইলাহসমূহ তাদেরকে সাহায্য করবে ও রিযিক দেবে এবং আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে।'[৬১৪]

অন্যত্র এসেছে,

وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا

---

৬১২. দ্র. আল-ফাতাওয়াল কুবরা, ইবনে তাইমিয়া, ৬/৫৬৫
৬১৩. সূরা ইয়াসীন, (৩৬) : ৭৪
৬১৪. দ্র. তাফসীরে ইবনে কাসীর।

'তারা আল্লাহ ব্যতীত ইলাহসমূহ গ্রহণ করেছে, যাতে ওরা তাদের জন্য সাহায্যকারী হয়।'[৬১৫]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবী রাহ. বলেন, 'কুরাইশের মুশরিকরা সাহায্য ও প্রতিরক্ষার জন্য অন্য ইলাহ গ্রহণ করত।'[৬১৬]

সুতরাং এ আয়াতদ্বয় থেকে প্রমাণিত হয় যে, মুশরিকরা অন্য ইলাহসমূহকে সাহায্যকারী, প্রতিরক্ষাকারী ও রিযিকদানকারী মনে করত। কাজেই মুশরিকরা 'তাওহীদুর রুবূবিয়া'তে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী ছিল না।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ

'যদি আপনি তাদেরকে বলেন যে, "নিশ্চয় তোমাদেরকে মৃত্যুর পরে জীবিত উঠানো হবে, তখন কাফেররা অবশ্য বলে, এটা তো স্পষ্ট জাদু!"'[৬১৭]

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা বলেন, হে মুহাম্মাদ! মুশরিকরা জানে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু আপনি যখন তাদেরকে বলবেন, তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করা হবে যেভাবে প্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছে, তখন তারা পুনর্জীবনের অস্বীকার করবে।[৬১৮]

'তাওহীদুর রুবূবিয়া'তে বিশ্বাসী হওয়ার অংশ হলো, পুনর্জীবন স্বীকার করা। অথচ মুশরিকরা তা অস্বীকার করত। তাহলে কীভাবে এ দাবি করা সঠিক হয় যে, মুশরিকরা 'তাওহীদুর রুবূবিয়া'তে বিশ্বাসী ছিল?

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ

'তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবনই তো শেষ; আমরা মরি ও বাঁচি এবং মহাকালই আমাদেরকে ধ্বংস করে। তাদের কাছে এ ব্যাপারে কোনো জ্ঞান নেই। তারা কেবল অনুমান করে কথা বলে।'[৬১৯]

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম তাবারী রাহ. বলেন,

يقول تعالى مخبرًا عن المشركين أنهم قالوا: وما يهلكنا... إنكارًا منهم أن يكون لهم ربٌّ يفنيهم

৬১৫. সূরা মারইয়াম, (১৯) : ৮১
৬১৬. দ্র. তাফসীরে কুরতুবী।
৬১৭. সূরা হুদ, (১১) : ৭
৬১৮. দ্র. তাফসীরে ইবনে কাসীর
৬১৯. সূরা জাছিয়াহ, (৪৫) : ২৪

ويهلكهم.

'আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের সম্বন্ধে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তারা ওই রব—যিনি তাদেরকে মৃত্যু দেবেন ও ধ্বংস করবেন—তাকে অস্বীকার করে বলে, "মহাকালই আমাদেরকে ধ্বংস করে।"'[৬২০]

'তাওহীদুর রুবূবিয়া'তে বিশ্বাসী কেউ আল্লাহ তাআলাকে মৃত্যুদাতা ও ধ্বংসকারী অস্বীকার করতে পারে না। অথচ মুশরিকরা তা অস্বীকার করত। সুতরাং মুশরিকরা 'তাওহীদুর রুবূবিয়া'তে বিশ্বাসী হওয়ার দাবি সঠিক নয়।

দলীলের জবাব

মুশরিকরা 'তাওহীদুর রুবূবিয়া'-এর ক্ষুদ্রতম অংশ তথা স্রষ্টা ও আর কিছু বিষয়ে বিশ্বাসী ছিল। আর এটাই তাদের পেশকৃত আয়াতটিতে উল্লেখ হয়েছে।

মুশরিকরা কখনো 'তাওহীদুর রুবূবিয়া'তে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী ছিল না। আবার সকল মুশরিক 'তাওহীদুর রুবূবিয়া'তে বিশ্বাসী ছিল না।

এ কারণেই সালাফী আলেম শায়খ আব্দুর রাযযাক বিন আব্দুল মুহসিন আল-বদর তার **القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد** কিতাবে এটা স্বীকার করেছেন বা করতে বাধ্য হয়েছেন। তার আরবী পাঠ,

ثم هنا أمر لا بد من تقريره وإيضاحه، وهو أنَّ قول أهل العلم عن المشركين: بأنَّهم يعترفون بتوحيد الربوبية، ليس المراد به أنَّهم اعترفوا بهذا القسم من التوحيد على التمام والكمال... ثم هذا أيضاً ليس حكماً عاماً مطرداً على جميع المشركين؛ إذ منهم: من وجد عنده حتى الشرك في الربوبية.[৬২১]

দলীলের আরেকটি জবাব হচ্ছে, ইমাম আবু হানীফা রাহ. বলেন, 'তারা যদিও বলত আমাদের রব আল্লাহ, কিন্তু তারা এ কথার তাৎপর্য বুঝত না। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

"যদি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, কে সৃষ্টি করেছেন আকাশসমূহ এবং পৃথিবী? তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ তাআলা। আপনি বলুন, সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। তাদের অধিকাংশই জানে না।"[৬২২]

এখানে (তারা যদিও মুখে বলে আল্লাহ তাআলা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, কিন্তু এটা তারা না বুঝেই বলে; তাই) আল্লাহর বাণী "তাদের অধিকাংশই জানে

৬২০. দ্র. তাফসীরে তাবারী
৬২১. দ্র. আল-কাওলুস সাদীদ, পৃষ্ঠা ৭৭ ও ৭৮
৬২২. সূরা লুকমান, (৩১) : ২৫

না”-এর উদাহরণ হলো ওই জন্মান্ধ বাচ্চার মতো, যে দিন-রাতের ব্যাপারে শুনে ও লাল-হলুদ রঙের নাম জানে, কিন্তু এর রূপরেখা সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই। কাফেরদের অবস্থাও ঠিক তা-ই। তারা মুমিনদের কাছ থেকে আল্লাহর নাম শুনে নিজেরাও মুখে বলে, কিন্তু আল্লাহকে তারা বিলকুল চেনে না।’[৬২৩]

প্রথম ভ্রান্ত দাবির আরেকটি অংশ হচ্ছে,

রাসূলগণকে কেবল ‘তাওহীদুল উলূহিয়া’-এর দাওয়াত দেওয়ার জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে; ‘তাওহীদুর রুবূবিয়া’-এর জন্য নয়।

এর জবাবে বলা যায়, কুরআনে কারীমে এসেছে,

اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّیَ الَّذِیْ یُحْیٖ وَیُمِیْتُ قَالَ اَنَا اُحْیٖ وَاُمِیْتُ

‘যখন ইবরাহীম বলল, “তিনি আমার রব, যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান।” সে (নমরুদ) বলল, “আমি জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই।”’[৬২৪]

এখানে ইবরাহীম আ. তাঁর যুগের দেশ-শাসক নমরুদকে ‘তাওহীদুর রুবূবিয়া’-এর পরিচয় দিয়েছেন। আর নমরুদ তা অস্বীকার করে নিজের জন্য দাবি করেছে।

ইবনে কাসীর রাহ. বলেন,

وكانوا – آل فرعون – يجحدون الصانع تعالى، ويعتقدون أنه لا رب لهم سوى فرعون، فلما قال له موسى: ﴿إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، قال له: وَمَنْ هذا الذي تزعم أنه رب العالمين غيري؟

‘ফেরাউনের লোকেরা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলাকে অস্বীকার করত। তারা মনে করত, ফেরাউন ছাড়া তাদের কোনো রব নেই। যখন মুসা আ. বললেন, “আমি রাব্বুল আলামীনের প্রেরিত রাসূল।”[৬২৫]

তখন ফেরাউন বলল, “আমাকে ছাড়া আবার কাকে রব মনে করো?”’[৬২৬]

আল্লামা শাওকানী রাহ. সূরা হুদের ১০১ নং আয়াত

وَمَا زَادُوْهُمْ غَیْرَ تَتْبِیْبٍ

‘তারা ধ্বংস ছাড়া তাদের জন্য আর কিছু বৃদ্ধি করল না’-এর ব্যাখ্যায় লেখেন,

أي: قوم ثمود: أي ما زادتهم الأصنام التي يعبدونها إلا هلاكا وخسرانا، وقد كانوا يعتقدون أنها

---

৬২৩. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম-এর সূত্রে মাজমুউ কুতুব ওয়া রাসায়িল ওয়া ওসায়াল ইমামিল আযম, পৃষ্ঠা ৩৯৯

৬২৪. সূরা বাকারা, (২) : ২৫৮

৬২৫. সূরা যুখরুফ, (৪৩) : ৪৬

৬২৬. দ্র. তাফসীরে ইবনে কাসীর, সূরা শুআরার ২৩ নং আয়াতের তাফসীর

تُعِينهم على تحصيل المنافع.

'কওমে ছামূদের উপাসনার মূর্তিগুলো তাদের জন্য ধ্বংস ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি করল না। অথচ তারা মনে করত, সেগুলো উপকার হাসিলে তাদের সাহায্য করবে।'[৬২৭]

হযরত ইউসুফ আ. তাঁর কারাগারের সঙ্গীদ্বয়কে দাওয়াত দিয়ে বললেন,

أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

'ভিন্ন ভিন্ন রব শ্রেয়, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ?'[৬২৮]

এখানে ইউসুফ আ. তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন রব ছেড়ে দেওয়ার কথা বলে 'তাওহীদুর রুবূবিয়া'-এর দাওয়াত কেন দিলেন?

সুতরাং এ সকল আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়, 'রাসূলগণকে কেবল তাওহীদুল উলূহিয়ার দাওয়াত দেওয়ার জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে; তাওহীদুর রুবূবিয়ার জন্য নয়—এ দাবি সঠিক নয়।

ভ্রান্ত দাবি-২

'রব' শব্দটি কেবল 'তাওহীদুর রুবূবিয়া'-এর জন্য এবং 'ইলাহ' শব্দটি শুধু 'তাওহীদুল উলূহিয়া'-এর জন্য ব্যবহৃত হওয়ার দাবি করা। এ দাবিটি সঠিক ও বাস্তবসম্মত নয়। কেননা, কুরআন ও হাদীসে এ দুই শব্দের ব্যবহারে এমন ভাগ করা হয়নি; বরং যেখানে 'তাওহীদুর রুবূবিয়া'-এর কথা বলেছে, সেখানেই 'তাওহীদুল উলূহিয়া' আবশ্যকভাবে রয়েছে; আবার যেখানে 'তাওহীদুল উলূহিয়া'-এর কথা এসেছে, সেখানেই 'তাওহীদুর রুবূবিয়া' অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

কুরআন আমাদেরকে জানিয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের রূহের জগতে প্রশ্ন করেছিলেন। ইরশাদ করেন,

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَآ

'যখন আপনার রব বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের সন্তানদের বের করলেন এবং নিজের ওপর তাদের প্রতিজ্ঞা করালেন, আমি কি তোমাদের 'রব' নই? তারা বলল, অবশ্যই আমরা অঙ্গীকার করছি।'[৬২৯]

এখানে 'রব' উল্লেখ করার অর্থ এটা নয় যে, তিনি কেবল 'রব' হওয়ার অঙ্গীকার

---

৬২৭. দ্র. তাফসীরে ফাতহুল কাদীর
৬২৮. সূরা ইউসুফ, (১২) : ৩৯
৬২৯. সূরা আ'রাফ, (৭) : ১৭২

নিয়েছেন; বরং তিনি একইভাবে 'ইলাহ' হওয়ারও ওয়াদা নিয়েছেন। কিন্তু 'তাওহীদুর রুবূবিয়া' যেহেতু 'তাওহীদুল উলূহিয়া'-কে আবশ্যক করে, এ জন্য আলাদাভাবে 'ইলাহ' শব্দ দিয়ে প্রশ্ন করা হয়নি।

অনুরূপ তিরমিযী শরীফের সহীহ হাদীসে কবরের তিনটি প্রশ্নের একটির ব্যাপারে বলা হয়েছে, مَنْ رَبُّكَ؟ তথা 'তোমার রব কে?'

এখানে 'তোমার ইলাহ কে?' বলা হয়নি। তাহলে কি এটা বলা যাবে যে, 'তাওহীদুল উলূহিয়া' নিষ্প্রয়োজন? না, কখনো এমন নয়; বরং 'তোমার রব কে?' প্রশ্নের ভেতরে 'তোমার ইলাহ কে?' এমন প্রশ্নও বিদ্যমান।

আবার কুরআনে রবের গুণাবলি ইলাহের ওপর প্রয়োগ করা হয়েছে। তথা 'ইলাহ' শব্দের মাধ্যমে 'রব' বোঝানো হয়েছে। যেমন :

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا

'যদি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে আল্লাহ ব্যতীত অনেক 'ইলাহ' থাকত, তবে উভয় ধ্বংস হয়ে যেত।'[৬৩০]

আরেকটি আয়াত,

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَداً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

'বলুন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ যদি দিনকে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী করেন, তাহলে আল্লাহ ব্যতীত এমন কোনো 'ইলাহ' আছে, যে তোমাদের জন্য রাত এনে দেবে, যাতে তোমরা বিশ্রাম করতে পারো? তবুও কি তোমরা চোখ মেলে দেখবে না?'[৬৩১]

এ দুই আয়াতে 'ইলাহ'-কে মূলত 'রব'-এর জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে। রবের গুণাবলি ইলাহের ওপর প্রয়োগ করা হয়েছে। কারণ, 'তাওহীদুল উলূহিয়া'-এর মাঝে 'তাওহীদুর রুবূবিয়া' অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সুতরাং 'রব' ও 'ইলাহ' এবং 'তাওহীদুল উলূহিয়া' ও 'তাওহীদুর রুবূবিয়া' অবিচ্ছেদ্য, ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

সুতরাং 'তাওহীদুর রুবূবিয়া'-এর জন্য 'রব' এবং 'তাওহীদুল উলূহিয়া'-এর জন্য 'ইলাহ' শব্দকে নির্দিষ্ট হওয়ার দাবি করা দলীলসম্মত নয়।

---

৬৩০. সূরা আম্বিয়া, (২১) : ২২

৬৩১. সূরা কাসাস, (২৮) : ৭২

ভ্রান্ত দাবি-৩

'তাওহীদুল উলূহিয়া'-এর অপর নাম হলো 'তাওহীদুল ইবাদাহ'। তো সালাফী বন্ধুদের অনেকেই তাদের তাওহীদের এ ভাগকে কেন্দ্র করে 'তাওহীদুল উলূহিয়া/ইবাদাহ'-এর ওপর (সঠিক পন্থায় গুরুত্বারোপ না করে, বরং) নিজেদের বুঝ ও বানানো উসূলের আলোকে জোর তাগীদ দিতে গিয়ে কোন কাজ কখন ইবাদত হয় এবং তার জন্য কী কী শর্ত রয়েছে—এগুলোর প্রতি যথাযথ লক্ষ না রেখে 'ইবাদত নয়' এমন অনেক বিষয়কে ইবাদত সাব্যস্ত করে বসেছে। আবার 'শিরক নয়' এমন অনেক কাজকে 'তাওহীদুল উলূহিয়া'-এর সাথে সাংঘর্ষিক মনে করে শিরক আখ্যায়িত করেছে!

যেমন : দুআ করা বা কাউকে ডাকা, সিজদা করা, ভয় করা, ভালোবাসা, সাহায্য চাওয়া ইত্যাদিকে সর্বাবস্থায় ইবাদত মনে করেছে। ফলে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য এগুলো করা হলেই নির্বিচারে এগুলোকে কুফর-শিরকের তকমা দিয়ে দেয়।

এমনকি তাদের একজন লিখেছেন, 'স্ত্রী বা চাকরি ইত্যাদিকে বেশি ভালোবেসে আল্লাহর প্রিয় বস্তুসমূহের ওপর প্রাধান্য দেওয়া মানে তার ইবাদত করা!'

আরেকজন বলেছেন, 'আপনার ঘুমের প্রতি ভালোবাসাটা যদি আল্লাহর ডাকের (তাহাজ্জুদের) চাইতেও বেশি হয়, তাহলে শিরক হবে!'

সালাফী ও আহলে হাদীস আলেমদের অনেকেই বলেছেন, মসজিদের সামনের দেয়ালে যে (বা অন্য কোথাও) 'আল্লাহ' ও 'মুহাম্মাদ' পাশাপাশি লেখা থাকে, এটা নাকি শিরক! এমনকি এ শিরকের অজুহাতে কোনো কোনো মসজিদ থেকে তা ভেঙে খুলে ফেলা হয়েছে!

আবার তারা 'তাওহীদুল উলূহিয়া'-এর সাথে সাংঘর্ষিক মনে করে ঢালাওভাবে সব প্রকারের তাওয়াসসুল (ওসীলাগ্রহণ), তাবাররুক (বরকতগ্রহণ), তাবীয ও ওলীগণের কবর বা মাজার যিয়ারত ইত্যাদি কাজকে শিরক আখ্যায়িত করে কিংবা যিয়ারতকারীকে 'কুবূরী' বলে।

অথচ কোনো বিষয় বা কাজ ইবাদত হিসেবে গণ্য হওয়ার জন্য কিংবা কুফর-শিরকে পরিণত হওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট শর্ত ও উসূল রয়েছে, যা পাওয়া গেলে ইবাদত বা কুফর-শিরক সাব্যস্ত হবে; অন্যথায় হারাম বা অন্য কিছু হবে। যেমন : ইমাম আবু হানীফা রাহ.-কে ইবাদতের ব্যাখ্যা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন,

اسم العبادة اسم جامع يجتمع فيه: الطاعة، والرغبة، والإقرار بالربوبية... فإذا دخل عليه هذه الخصال الثلاث: فقد عبده.

'ইবাদত এমন এক পরিভাষার নাম, যার মাঝে (তিনটি বিষয়) পাওয়া যাবে : ১.

আনুগত্য, ২. আশা ও ৩. রুবূবিয়াহর স্বীকারোক্তি। কাজেই কারও কাছে যদি উক্ত তিনটি বিষয় পাওয়া যায়, তাহলে সে তার রবের ইবাদত করল।'[৬৩২]

সুতরাং আমাদের রবের প্রতি দুআ বা তাঁকে ডাকা, সিজদা করা, ভয় পাওয়া, ভালোবাসা, সাহায্য চাওয়া ইত্যাদিতে যেহেতু এই তিন বিষয় পাওয়া যায়, তাই সেগুলো ইবাদত।

পক্ষান্তরে অন্য কারও জন্য এগুলো করা হলে, তখন যেহেতু এই তিন বিষয় পাওয়া যায় না, বিশেষত রুবূবিয়াহর স্বীকারোক্তি থাকে না, তাই সেগুলো ইবাদতও নয় এবং 'তাওহীদুল উলূহিয়া'-এর সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে কুফর-শিরকও নয়; বরং হারাম বা অন্য কিছু হবে।

এ কারণেই আল্লাহর ভয় ইবাদত, বাঘ বা অন্য কিছুর ভয় ইবাদত বা শিরক নয়; আল্লাহকে ডাকা ইবাদত, অন্য কাউকে ডাকা ইবাদত বা কুফর-শিরক নয়।

যেমন : কুরআনে এসেছে, হযরত মুসা আলাইহিস সালাম বলেছেন,

وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَّقْتُلُوْنِ

'আমার বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগ আছে। অতএব আমি ভয় করি যে, তারা আমাকে হত্যা করবে।'[৬৩৩]

আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কুরআনে এসেছে,

وَّالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِيْٓ أُخْرٰىكُمْ

'রাসূল ডাকছিলেন তোমাদেরকে তোমাদের পেছন দিক থেকে।'[৬৩৪]

এ আয়াতদ্বয়ে মুসা আলাইহিস সালামের গায়রুল্লাহর প্রতি ভয় এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গায়রুল্লাহকে ডাকা কখনো ইবাদত বা কুফর-শিরক নয়।

অনুরূপ আল্লাহর কাছে আশা করা ও চাওয়া ইবাদত কিন্তু মা-বাবা, সরকার, চাকরি ও ব্যবসা থেকে আশা করা ও চাওয়া ইবাদত বা শিরক নয়। এভাবে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা ইবাদত, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া ইবাদত, আল্লাহকে ভালোবাসা ইবাদত, কিন্তু ইহসানকারীর শুকরিয়া জ্ঞাপন করা, খাদেমের কাছে সাহায্য চাওয়া, স্ত্রী ও সন্তানকে ভালোবাসা ইবাদত বা কুফর-শিরক নয়।

ইমাম আবু হানীফা রাহ. বলেন, 'কারও প্রতি ভয়-ভীতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার দুটি

---

৬৩২. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম-সূত্রে মাজমুউ কুতুব ওয়া রাসায়িল ওয়া ওসায়াল ইমামিল আযম, পৃষ্ঠা ৩৯২

৬৩৩. সূরা শুআরা, (২৬) : ১৪

৬৩৪. সূরা আলে ইমরান, (৩) : ১৫৩

স্তর রয়েছে :

প্রথম স্তর : আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে লাভ-ক্ষতির মালিক মনে করে ভয় বা আশা করা। এমন যে করবে, সে কাফের।

দ্বিতীয় স্তর : আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে লাভ-ক্ষতির মালিক মনে না করে কারও কাছে এভাবে আশা বা ভয় করা যে, আল্লাহ্ তাআলা তার ওসীলায় হয়তো কল্যাণকর বিষয় ঘটাবেন, কিংবা অনিষ্টতা থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন। এটা কুফর নয়।

কেননা, স্বভাবতই প্রত্যেক বাবা নিজ সন্তানের কাছে উপকার পাওয়ার, নিজ বাহনে আরোহী হওয়ার, প্রতিবেশী থেকে সদ্ব্যবহারের, বাদশাহ্ ও শাসক থেকে সহায়তার আশা করে। এসব কারণে সে কুফরের গণ্ডিতে যাবে না। কারণ, মুমিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আস্থা আল্লাহ্ তাআলার প্রতি। সেটা বাস্তবায়নের ওসীলা ও মাধ্যম কখনো হয় সন্তানাদি, কখনো হয় প্রতিবেশী। মুমিন এই বিশ্বাসে ওষুধ সেবন করে যে, হয়তো এর মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা আরোগ্য দান করবেন।

বান্দা কখনো ক্ষতিকে ভয় করে তা থেকে থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। এটা কুফর নয়। যেমন : হযরত মুসা আলাইহিস সালাম বলেছেন, "আমি ভয় করছি, তারা আমাকে হত্যা করবে।"

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কার কাফেরদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পেতে 'গুহা'য় আশ্রয় নিয়েছিলেন। এসব কারণে তাঁদেরকে কুফর পেয়ে বসেনি। এমনইভাবে হিংস্র প্রাণী, সাপ, বিচ্ছু, ঘরবাড়ি ধসে পড়া বা বন্যাকে মানুষ ভয় করে। খাবার ও পানীয় জলের ক্ষতি থেকে সতর্ক থাকে। এগুলো কুফর নয়।'[৬৩৫]

কুরআনে একদল সাহাবা সম্পর্কে এসেছে,

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْٓا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ۚ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً

'আপনি কি তাদেরকে দেখেননি, (মক্কী জীবনে) যাদেরকে বলা হতো, তোমরা নিজেদের হাত সংযত রাখো, সালাত কায়েম করো ও যাকাত দাও। অতঃপর যখন তাদের প্রতি জিহাদ ফরজ করা হলো, তখন তাদের মধ্য হতে একটি দল মানুষকে (শত্রুদেরকে) এমন ভয় করতে লাগল, যেমন আল্লাহকে ভয় করা হয়ে থাকে, কিংবা আরও বেশি ভয়।'[৬৩৬]

---

৬৩৫. আল-আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম-সূত্রে মাজমুউ কুতুব ওয়া রাসায়িল ওয়া ওসায়াল ইমামিল আযম, পৃষ্ঠা ৩৯৩

৬৩৬. সূরা নিসা, (৪) : ৭৭

এখানে বলা হয়েছে, একদল সাহাবা মানুষদেরকে আল্লাহর মতো কিংবা আরও বেশি ভয় করেছেন।

অথচ তাঁরা গায়রুল্লাহকে আল্লাহর চেয়ে বেশি ভয় করার পরও শিরকে নিপতিত হননি। কারণ, তাঁদের এই ভয়ের সাথে রুবূবিয়াহর স্বীকারোক্তি নেই। অর্থাৎ মানুষদেরকে তাঁরা আল্লাহর মতো রব মনে করে ভয় পাননি; বরং তাঁদের ভয় ছিল মানবীয় ও প্রকৃতিগত। কাজেই এগুলোতে শিরক হওয়ার জন্য রুবূবিয়াহর স্বীকারোক্তি তথা রব মনে করতে হবে কিংবা রবের বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য আছে বিশ্বাস করতে হবে।

ওপরে উল্লেখ হয়েছে যে, তিন বিষয় পাওয়া না গেলে কোনো বিষয় ইবাদত নয় এবং রুবূবিয়াহর স্বীকারোক্তি না থাকলে 'তাওহীদুল উলূহিয়া'-এর সাথে সাংঘর্ষিক হয়ে কুফর-শিরকও নয়; বরং হারাম বা অন্য কিছু হবে। যেমন : গায়রুল্লাহকে অভিবাদন বা ভক্তি-শ্রদ্ধার উদ্দেশ্যে সিজদা করা পূর্ববর্তী শরীয়তে জায়েয থাকলেও আমাদের শরীয়তে হারাম ও ছোট শিরক।

তবে ইবাদতের উদ্দেশ্যে সিজদা করা কুফর এবং কোনো নিয়ত ছাড়া কাউকে সিজদা করাও অধিকাংশ ইমামের নিকট কুফর।

সুতরাং ভক্তি-শ্রদ্ধার নিয়তে মাজার বা কোনো ব্যক্তিকে সিজদা করা ঈমান ভঙ্গকারী কুফর-শিরক না হলেও সম্পূর্ণ হারাম।[৬৩৭]

উল্লেখ্য, যদি ভক্তি-শ্রদ্ধার নিয়তে মাজার বা কাউকে সিজদা করাকে হারাম মনে না করে; বরং বৈধ মনে করে, তাহলে কুফর হবে। কেননা, অকাট্য কোনো হারামকে হালাল বা বৈধ মনে করা কুফর। কারণ, এতে 'তাওহীদুর রুবূবিয়া' নষ্ট হয়।

চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন মাজারে সিজদার প্রতি ভক্তদের যে আগ্রহ ও আচরণ দেখা যায়, তা বড় শিরকের মতো মনে হয়! আল্লাহ তাআলা সকলকে হেফাজত করুন।

অনুরূপ সিজদার ইবাদতের মতো যদি কারও নৈকট্য লাভের জন্য প্রাণী জবেহ করে, তাহলে কুফর-শিরক। আর যদি প্রাণী জবেহের সময় সম্মানের উদ্দেশ্যে গায়রুল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়, তখন হারাম হবে। তবে মেহমানের সম্মানার্থে, ব্যবসা, ওয়ালিমা বা আকীকা ইত্যাদি উপলক্ষে হলে সুন্নাত বা জায়েয।[৬৩৮]

---

৬৩৭. দেখুন, সূরা বাকারার ৩৪ ও সূরা ইউসুফের ১০০ নং আয়াতের তাফসীর আহকামুল কুরআন, জাসসাস; তাফসীরে সামআনী; তাফসীরে কুরতুবী; তাফসীরে ইবনে কাসীর; তাফসীরে নাসাফীতে; আরো দেখুন, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া, ১৮/২৫৪; ফাতাওয়া শামী, ৯/৬৩২; ফাতাওয়া আলমগীরী, ৫/৩৬৮; ইমদাদুল ফাতাওয়া, ১২/২১১; ইমদাদুল আহকাম, ১/১১৪; কিফায়াতুল মুফতী, ১/১৬৬; ফাতাওয়া মাহমুদিয়া, ১/২৮৫

৬৩৮. দ্র. তাফসীরে কাবীর, রাযী, সূরা বাকারার ১৭৩ নং আয়াতের তাফসীর; ফাতাওয়া শামী, ৯/৫১৫; আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়া কুয়েতিয়া, ২১/১৯৪।

আরেকটা বিষয় হচ্ছে, তাওহীদের এ ভাগকে কেন্দ্র করে তারা ঢালাওভাবে সব প্রকারের তাওয়াসসুলকে (ওসীলাগ্রহণ) শিরক বলে। কেননা, দুআ করার সময় নবী বা ওলীগণের ওসীলাগ্রহণকে 'তাওহীদুল উলূহিয়া'-এর সাথে সাংঘর্ষিক মনে করে। এ ক্ষেত্রে তারা দলীল হিসেবে পেশ করে নিম্নোক্ত দুটি আয়াত,

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖٓ اَوْلِيَآءَ ۘ مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى

'যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে রেখেছে এবং বলে যে, আমরা তাদের ইবাদত এ জন্যই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়।'[৬৩৯]

অর্থাৎ তারা বলে, মক্কার মুশরিকরা যেভাবে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেওয়ার জন্য অন্যকে গ্রহণ করেছে, তেমনই ওসীলা গ্রহণকারীরাও দুআ কবুল হওয়ার জন্য নবী-ওলীগণকে গ্রহণ করেছে!

দ্বিতীয় আয়াত হলো, فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا

'তোমরা আল্লাহ তাআলার সাথে কাউকে ডেকো না।'[৬৪০]

এ আয়াত থেকে প্রমাণ গ্রহণ করে তারা বলে, ওসীলা গ্রহণকারীরা আল্লাহর সাথে নবী-ওলীগণকে ডাকে!

জবাব

এ বিষয়ে লম্বা আলোচনা না করে আমাদের ওই সকল বন্ধুদের অনুসরণীয় একজন ইমামের বক্তব্য উল্লেখ করা যথেষ্ট মনে হচ্ছে।

আল্লামা কাযী শাওকানী রাহ. (মৃ. ১২৫০ হি.) ওপরে উল্লেখিত দলীলদ্বয়ের খণ্ডন করে তাঁর **الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد** রিসালায় লেখেন,

إن ما يورده المانعون من التوسل بالأنبياء والصلحاء من قوله تعالى: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا...﴾ ليس بوارد؛ بل هو من الاستدلال على محل النزاع بما هو أجنبي عنه. فإن قولهم: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا...﴾ مصرَّح بأنهم عبدوهم لذلك، والمتوسِّل بالعالم مثلا لم يعبده؛ بل عَلِم أن له مزية عند الله بحمله العلم، فتوسَّل به لذلك.

'প্রথম আয়াতের মাধ্যমে দলীল পেশ করে যারা নবী-বুযুর্গদের ওসীলাগ্রহণ নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন, তা এখানে উঠে না; বরং এ আয়াতের সাথে ওসীলা গ্রহণের কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা, এই আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মুশরিকরা তাদের

---

৬৩৯. সূরা যুমার, ৩
৬৪০. সূরা জিন, ১৮

ইবাদত করত।

আর কারও ওসীলা গ্রহণকারী তো তার ইবাদত করে না; বরং এটা মনে করে যে, আল্লাহ তাআলার নিকট উক্ত ব্যক্তির বিশেষ সম্মান আছে। তাই সে তার ওসীলা গ্রহণ করে।'

এরপর তিনি দ্বিতীয় আয়াতের দলীল খণ্ডন করে বলেন,

وكذلك قوله تعالى: فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا فإنه نَهْيٌ عن أن يُدعى مع الله غيرُه كأن يقول: يا الله ويا فلان... والمتوسِّل بالعالم مثلا لم يدعُ إلا الله، ولم يدع غيره دونه، ولا دعا غيره معه... وإنما أراد الطالب أن يقدم بين يدي طلبه ما يكون سببا للإجابة ممن هو المنفرد بالعطاء والمنع.

'এখানে আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে না ডাকার কথা বলা হয়েছে, যেমন : ইয়া আল্লাহর সাথে ইয়া নবী ইত্যাদি বলা।

আর ওসীলা গ্রহণকারী তো একমাত্র আল্লাহকেই ডাকে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকে না এবং তাঁর সাথেও অন্য কাউকে ডাকে না। তবে ওসীলা গ্রহণকারী কেবল দুআ কবুলের কারণ হিসেবে দুআর সময় দান ও বারণ করার একচ্ছত্র মালিকের কাছে তাকে পেশ করে।'[৬৪১]

সারকথা, সালাফী বন্ধুদের তাওহীদের এ ভাগ থেকে যদি উল্লিখিত বিভিন্ন ভ্রান্ত দাবি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এ ভাগ গ্রহণযোগ্য নয়।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বাড়াবাড়ি ও প্রান্তিকতা থেকে দূরে থেকে দ্বীনের খেদমত করার তাওফীক দান করুন।

তাওহীদুল হাকিমিয়া পরিচিতি, বিকৃতি ও বিভ্রান্তি

এ অধ্যায়ের চতুর্থ বিষয় হলো, 'তাওহীদুল হাকিমিয়া' পরিচিতি, বিকৃতি ও বিভ্রান্তি বিষয়ে আলোচনা।

আমরা জেনেছি যে, ইমাম আবু হানীফা ও তাহাবী রাহ.-সহ আশআরী-মাতুরীদীগণের নিকট তাওহীদের চার প্রকার ভাগ হচ্ছে, 'তাওহীদুয যাত', 'তাওহীদুস সিফাত', 'তাওহীদুল আফআল' ও 'তাওহীদুল উলূহিয়া'। আর ইবনে তাইমিয়া রাহ. ও সালাফী ভাইদের তাওহীদের ভাগ অনুযায়ী তিন প্রকার হলো : 'তাওহীদুর রুবূবিয়া', 'তাওহীদুল উলূহিয়া' ও 'তাওহীদুল আসমা ওয়াস সিফাত'।

কিন্তু কয়েক যুগ ধরে আরেকটি প্রকার 'তাওহীদুল হাকিমিয়া'-এর নাম শোনা

---

৬৪১. আদ-দুররুন নাদীদ, পৃষ্ঠা ২১-২৩

যাচ্ছে। তাহলে এ প্রকারটি কোথা থেকে এল এবং এর অর্থ ও ব্যাখ্যা কী?

এ বিষয়ে আলাচনায় যাওয়ার আগে প্রথমে 'তাওহীদুল হাকিমিয়া'-এর সঠিক ব্যাখ্যা ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করি।

'তাওহীদুল হাকিমিয়া'-এর সঠিক ব্যাখ্যা হচ্ছে, আইন-কানুন ও বিধি-বিধান প্রণয়নের অধিকার এবং শাসনকর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর। এককথায়, বিধানদাতা একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা, তা মেনে নেওয়া এবং তাঁর দেওয়া বিধান অনুযায়ী দেশ, সমাজ ও অধীনস্থ-সহ সকল বিষয় পরিচালনা জরুরি মনে করা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এটা কি তাওহীদের আলাদা কোনো প্রকার, নাকি পূর্ব থেকেই রয়েছে?

আহলে ইলমের কাছে স্পষ্ট যে, এটা মূলত আলাদা কোনো প্রকার নয়; বরং পূর্ব থেকেই রয়েছে। কারণ, আশআরী-মাতুরীদীদের তাওহীদের ভাগ অনুযায়ী এটি 'তাওহীদুস সিফাত'-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। আর শায়খ ইবনে তাইমিয়া ও সালাফীদের তাওহীদের ভাগমতে এটি 'তাওহীদুর রুবূবিয়া'-তে গণ্য।

কেননা, 'তাওহীদুস সিফাত' ও 'তাওহীদুর রুবূবিয়া'-এর সারকথা হচ্ছে, সকল ক্ষমতা ও পূর্ণতার গুণে তিনি একক। কাজেই এর ব্যাপকতার মধ্যে তিনি স্রষ্টা, প্রভু, স্বত্বাধিকারী, ব্যবস্থাপক, পরিকল্পনাকারী, লালন-পালনকারী, নিরাপত্তাদানকারী, রিযিকদানকারী, জীবন-মৃত্যুদানকারী, গোটা সৃষ্টিজগৎ ও সব বিষয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনাকারী, আইন-কানুন ও বিধি-বিধান প্রণয়নকারী তথা বিধানদাতা, উপকার-অপকারকারী, বিপদ-সংকট থেকে পরিত্রাণকারী ইত্যাদি গুণ ও ক্ষমতা প্রভৃতির অধিকারী। এতে তিনি একক, তাঁর কোনো অংশীদার, সহযোগী, সমকক্ষ বা প্রতিপক্ষ নেই।

সুতরাং তাওহীদুল খালিকিয়া (তিনিই সৃষ্টিকর্তা), তাওহীদুর রায্যাকিয়া (তিনিই রিযিকদাতা), তাওহীদুস সালিমিয়া (তিনিই নিরাপত্তার মালিক) ইত্যাদি যেভাবে 'তাওহীদুস সিফাত' ও 'তাওহীদুর রুবূবিয়া'র মধ্যে অন্তর্ভুক্ত, তেমনইভাবে 'তাওহীদুল হাকিমিয়া'ও অন্তর্ভুক্ত। কাজেই এটি আলাদা কোনো প্রকার নয়।

এ বিষয়ে আল্লাহ্ তাআলা বলেন,

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

'জেনে রাখো, সৃষ্টি তাঁরই এবং বিধানও তাঁরই।'[৬৪২]

অন্যত্র বলেন,

---

৬৪২. সূরা আ'রাফ, (৭) : ৫৪

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

'ইহুদী-খ্রিষ্টানরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের গুরু-পাদরিদের 'রব' হিসেবে গ্রহণ করেছে।'[৬৪৩]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ.

'ইহুদী-খ্রিষ্টান মূলত তাদের গুরু-পাদরিদের ইবাদত বা উপাসনা করত না। তবে ওরা তাদেরকে হালাল-হারাম নির্ধারণের ক্ষমতা দিয়ে রেখেছিল।'[৬৪৪]

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলাই বিধানদাতা তথা হালাল-হারামসহ সকল বিধি-বিধান নির্ধারণের ক্ষমতা ও আইন প্রণয়নের অধিকার একমাত্র তাঁরই। তবে ইহুদী-খ্রিষ্টান যেহেতু আল্লাহর উক্ত ক্ষমতা ও অধিকার তাদের গুরু-পাদরিদের দিয়ে রেখেছে, তাই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "ওরা নিজেদের গুরু-পাদরিদের 'রব' হিসেবে গ্রহণ করেছে"।

এ কারণে যে কেউ আল্লাহপ্রদত্ত শরীয়তের বিপরীতে অন্য কারও জন্য আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ও অধিকার স্বীকার করে, তবে সে সরাসরি শিরকে লিপ্ত হয় এবং গায়রুল্লাহকে নিজের 'রব' হিসেবে গ্রহণ করে।

অনুরূপ গায়রুল্লাহ বা মানবরচিত আইনকে যদি বৈধ বা শ্রেষ্ঠ মনে করে, তাহলেও নিশ্চিত কুফর-শিরক। এ বিষয়ে বিস্তারি আলোচনা 'ঈমান ভঙ্গের আটাশতম কারণ : গণতন্ত্রের মূল কনসেপ্ট বিশ্বাস করা' শিরোনামে করা হয়েছে।

এটা হচ্ছে উসূলভিত্তিক ও স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী 'তাওহীদুল হাকিমিয়া'-এর আলোচনা। এখানে ভিন্ন ব্যাখ্যা ও মত আছে, যা সামনে আসছে।

এখন দুটি প্রশ্ন :

১. 'তাওহীদুল হাকিমিয়া' যদি অন্যগুলোর মতো তাওহীদুস সিফাত বা তাওহীদুর রুবূবিয়ার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে, তাহলে আলাদা প্রকার হিসেবে সর্বপ্রথম কে প্রকাশ করেছেন?

২. 'তাওহীদুল হাকিমিয়া'-কে এখন আলাদা প্রকার হিসেবে সাব্যস্ত করা বা আলাদা করে বলার প্রয়োজনীয়তা কী?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর যেহেতু অনেক লম্বা তাই এটা পরে দিচ্ছি। তাহলে দ্বিতীয় প্রশ্নের

---

৬৪৩. সূরা তাওবা, (৯) : ৩১

৬৪৪. তিরমিযী, হাদীস নং ৩০৯৫, একাধিক সনদের বিচার-বিশ্লেষণে হাসান।

উত্তর নিয়ে আলোচনা করা যাক।

গণতন্ত্রের মূল কনসেপ্ট হচ্ছে, সকল ক্ষমতার উৎস কিংবা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার মালিক জনগণ। যেমন : বাংলাদেশ সংবিধানের ৭ (১) অনুচ্ছেদে রয়েছে, 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ।'

আর জনগণের ক্ষমতা প্রয়োগ তথা নির্বাচনে ভোট প্রদানের মাধ্যমে উক্ত নিরঙ্কুশ ক্ষমতার মালিক হন সংসদ সদস্যগণ।

এখন সাংসদগণ এমন ক্ষমতা পেয়ে আল্লাহর আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে পশ্চিমা বা মানবরচিত আইন প্রণয়ন করেন এবং সংবিধান তৈরি করেন। যে কারণে তারা মদ ও পতিতাবৃত্তি বৈধতার লাইসেন্স দেওয়ার এবং মৃত্যুদণ্ডের আসামিকে রাষ্ট্রপতি ক্ষমা করতে পারার আইন করতে পারেন, যা আল্লাহর আইনে অকাট্যভাবে নিষিদ্ধ। এভাবে ব্যভিচারের শাস্তি ও কিসাস-সহ অনেক কিছু নিষিদ্ধের আইন প্রণীত হয়, যা আল্লাহর আইনে জরুরি। কাজেই জনগণ পরোক্ষভাবে এবং সাংসদগণ প্রত্যক্ষভাবে নিজেদেরকে শরীয়াহ আইনের মোকাবিলায় আইন প্রণয়নের মালিক ও বিধানদাতা সাব্যস্ত করলেন।

যদি এমন আইনকে বৈধ বা শ্রেষ্ঠ মনে করে, তাহলে নিশ্চিত কুফর-শিরক। আর উক্ত কুফর-শিরক গণতন্ত্রের মাধ্যমে মহামারির মতো বিস্তৃত আকার ধারণ করার কারণে সাধারণ জনগণকে বিশেষভাবে সতর্ক করার জন্য আলাদা প্রকার হিসেবে 'তাওহীদুল হাকিমিয়া'-এর প্রয়োজনীয়তা যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

উল্লেখ্য, 'তাওহীদুল হাকিমিয়া'-এর প্রয়োজনীয়তা যেভাবে দেখানো হয়েছে, এটা অধমের একান্ত বক্তব্য। আমি যেভাবে উল্লেখ করেছি, এভাবে আর কেউ করেছেন কি না আমার জানা নেই।

তবে এই ব্যাখ্যার ওপর একটা যৌক্তিক প্রশ্ন থেকে যায় যে, 'তাওহীদুল হাকিমিয়া'-এর চেয়ে 'তাওহীদুল মালিকিয়া' (তথা নিরঙ্কুশ ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ তাআলা) আলাদা প্রকার হিসেবে বলার প্রয়োজনীয়তা প্রাধান্য পাবে। কেননা, আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়নের ক্ষমতাটা মূলত নিরঙ্কুশ ক্ষমতার মালিক হওয়া থেকে প্রাপ্ত। তাই মূল হিসেবে 'তাওহীদুল মালিকিয়া' বলাটা যুক্তিযুক্ত ও প্রণিধানযোগ্য। তবে হয়তো নিরঙ্কুশ ক্ষমতার মালিক হওয়াটার বহিঃপ্রকাশ সাধারণত আইন প্রণয়নের মাধ্যমে হয়ে থাকে, তাই 'তাওহীদুল হাকিমিয়া' বলা হয়ে থাকতে পারে।

এবার প্রথম প্রশ্ন তথা 'তাওহীদুল হাকিমিয়া' পরিভাষাটি আলাদা প্রকার হিসেবে সর্বপ্রথম কে বলেছেন? এর উত্তর নিয়ে আলোচনা করব।

অধমের ক্ষুদ্র পড়াশোনামতে 'তাওহীদুল হাকিমিয়া' পরিভাষার সর্বপ্রথম উচ্চারণকারী ও প্রকাশকারী হচ্ছেন জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট গবেষক, সাহিত্যিক ও বহুগ্রন্থ প্রণেতা মাওলানা আবুল আলা মওদুদী রাহ. (১৯০৩-১৯৭৯ ঈসায়ী)। তিনি এ বিষয়ে তার একাধিক গ্রন্থে বিশেষত 'কুরআন কী চার বুনিয়াদী ইসতিলাহেঁ' (যার অনুবাদ 'কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা') বইয়ে এবং 'তাফহীমুল কুরআন' গ্রন্থে আলোচনা করেছেন।

তবে আমরা ইতিপূর্বে যে অর্থে তাওহীদুল হাকিমিয়া উল্লেখ করেছি, সেই অর্থে নয়; বরং তিনি ভিন্ন অর্থে বলেছেন, যার আলোচনা সামনে আসছে।

বস্তুত মওদুদী সাহেবের 'কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা' নামক বইটি যেমন অদ্ভুত, তেমনই তার উক্ত ব্যাখ্যাটিও অভিনব। আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর আকীদা-মানহাজের বিপরীতে মওদুদী সাহেবের যত লেখা ও বই রয়েছে, তন্মধ্যে এই অদ্ভুত বইটি সবচেয়ে বেশি মারাত্মক এবং 'তাওহীদুল হাকিমিয়া'-এর অভিনব ব্যাখ্যাটি অত্যন্ত খতরনাক।

তিনি মূলত এতে ইসলামের একটা রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর চেষ্টা করেছেন।

বিষয়টির স্পর্শকাতরতা অনুভব করে মওদুদী সাহেবের জীবদ্দশায় অনেকেই কলম ধরেছেন। তন্মধ্যে আমি একজনের নাম উল্লেখ করছি, যিনি জামায়াতে ইসলামের বন্ধুদের কাছেও গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি। তিনি হলেন আরব-আযমের বিশ্বনন্দিত ব্যক্তিত্ব হযরত মাওলানা সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রাহ. (মৃ. ১৯৯৯ ঈসায়ী)।[৬৪৫]

আলী নদবী সাহেব সাধারণত খণ্ডনমূলক বিষয় এড়িয়ে চলতেন, কারো বিরুদ্ধে সহজে কলম ধরতেন না।[৬৪৬] অথচ তাঁর মতো ব্যক্তিত্বও উপরিউক্ত বিষয়ে খণ্ডন করার জন্য কলম ধরতে বাধ্য হয়েছেন। তিনি রচনা করেছেন,

عصر حاضر میں دین کی تفہیم وتشریح

দেওবন্দের আরবী সাহিত্য বিভাগের সাবেক প্রধান মাওলানা নুর আলম খলীল আমিনী সাহেব রাহ. এর আরবী করেছেন التفسير السياسي للإسلام নামে। এর বাংলাও হয়েছে 'ইসলামের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা' নামে।

এ ছাড়া আলী নদবী সাহেব রাহ. 'ইসলামের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা ও নতুন ব্যাখ্যা' বিষয়টির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে তা থেকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সতর্ক করার জন্য মওদুদী সাহেবের নাম উল্লেখ করা ছাড়া আরও চারটি কিতাব লিখেছেন।

---

৬৪৫. মওদুদী সাহেবের জানাযার ইমাম ড. ইউসুফ কারযাভী যার জীবনী লিখেছেন, الشيخ أبو الحسن الندوي كما عرفته নামে। এর বাংলা অনুবাদ হয়েছে 'এমন ছিলেন তিনি' নামে।

৬৪৬. তিনি কাফের কাদিয়ানী সম্প্রদায়ের খণ্ডনে গ্রন্থ রচনা করেছেন।

১. النبوة والأنبياء في ضوء القرآن

যা মূলত তিনি ১৩৮২ হিজরীতে মদীনা ভার্সিটিতে বক্তব্য দিয়েছিলেন।

২. الدعوة إلى الله: حماية المجتمع من الجاهلية وصيانة الدين من التحريف

এটাও সৌদি আরবের সাবেক মুফতি শায়খ আব্দুল আজিজ বিন বায রাহিমাহুল্লাহর সভাপতিত্বে মদীনা শরীফে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে ১৩৯৭ হিজরীর সফর মাসে প্রদত্ত বক্তব্যের সমষ্টি।

৩. ترشيد الصحوة الإسلامية

এটা হচ্ছে মক্কা মুকাররামায় রাবেতা আলমে ইসলামীর ১৪০৮ হিজরীর সফর মাসে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তব্য।

৪. الأركان الأربعة

এ ছাড়াও জামায়াতে ইসলামীর প্রথম নায়েবে আমীর, যিনি আমীর পদের জন্য মওদুদী সাহেবের নাম প্রস্তাব করেছিলেন এবং যার দুআর মাধ্যমে ১৯৪১ সালে জামায়াতের প্রতিষ্ঠা অধিবেশন সমাপ্ত হয়েছিল, সেই মাওলানা মনযুর নুমানী রাহ. (মৃ. ১৯৯৭ ঈসায়ী) একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। যার নাম হলো,

مولانا مودودی سے میری رفاقت کی سرگزشت اور اب میرا موقف

এর বাংলা হয়েছে, 'মাওলানা মওদুদীর সাথে আমার সাহচর্যের ইতিবৃত্ত' নামে।[৬৪৭]

---

৬৪৭. নুমানী সাহেব এতে লিখেছেন, জামায়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠার পরপরই নদবী সাহেব এতে যোগ দিয়ে বছরখানেক থেকে আবার বের হয়ে যান। নদবী ও নুমানী সাহেব-সহ জামায়াতের প্রথম সারির অনেক আলেম ও নেতা কেন বের হয়েছিলেন বইটিতে এর বিবরণ রয়েছে। এই বইটি বিশেষভাবে পড়ার জন্য সবার কাছে আবেদন রইল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মওদুদী সাহেবের এই অবদান কখনো অস্বীকার করা যাবে না যে, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তার অভিজাত পত্রিকা 'তরজমানুল কুরআন' মুসলিম শিক্ষিত সমাজের নজর কাড়তে সক্ষম হয়। তিনি পত্রিকাটিতে পশ্চিমা শিক্ষার প্রভাবে সৃষ্ট উগ্র আধুনিকতার স্রোতধারা এবং সর্বগ্রাসী সাংস্কৃতিক ও মানসিক চিন্তা-চেতনার বিরুদ্ধে সার্থকতার সাথে কলম চালিয়ে যান। সাথে সাথে আধুনিকতার ধারক-বাহকরা ইসলামী শরীয়াহর যেসব মাসআলার যৌক্তিকতার ওপর সংশয় পেশ করে মুসলিম উম্মাহর শিক্ষিত সম্প্রদায়কে ধর্মহীন করার অপচেষ্টা করছিল, সেসব প্রসঙ্গের ওপর তিনি প্রমাণসিদ্ধ প্রবন্ধাবলি রচনা করেন। যেমন : সুদ, পর্দা, জিহাদ, কুরবানী, দাসত্ব, হাদীস ও সুন্নাহ, পারিবারিক আইন প্রভৃতি। মূলত নদবী রাহ. ও নুমানী রাহ.-সহ অনেক আলেম তার উক্ত প্রবন্ধাবলির প্রতি মুগ্ধ হয়ে জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিয়েছিলেন।

তাই আলী নদবী সাহেব আফসোস করে তাঁর গ্রন্থে লেখেন, 'ইসলাম ও মুসলমানদের বড় সৌভাগ্যের ব্যাপার হতো, যদি মওদুদী সাহেব এই কাজকেই তার খোদাপ্রদত্ত প্রতিভার বিকাশের একক ক্ষেত্র এবং নিজের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বানিয়ে রাখতেন। কিন্তু তা না করে তিনি এর পাশাপাশি ইসলামী চিন্তা-চেতনার নতুন মেরুকরণ বা 'ইসলামী ইলাহিয়্যাহ' এর নব রূপ দানের কার্যক্রম শুরু করে দেন এবং এই নতুন মেরুকরণ বা নব রূপ দানকেই মুসলমানদের নবজাগরণ, সুসংবদ্ধকরণ এবং তার প্রতিষ্ঠিত সংগঠন জামায়াতে ইসলামীর চিন্তা-চেতনার মূলভিত্তি বানিয়ে নেন।'

এ বইটির ভূমিকা লিখেছেন আলী নদবী সাহেব। এখানেও তিনি সংক্ষেপে মওদুদী সাহেবের এ ভ্রান্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এভাবে তাঁর একাধিক গ্রন্থ ও লেখায় 'ইসলামের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা ও নতুন ব্যাখ্যা'-এর সমস্যা ও অসারতা দলীলভিত্তিক তুলে ধরেছেন।

মওদুদী সাহেব 'কুরআন কী চার বুনিয়াদী ইসতিলাহেঁ' বইয়ে কুরআনে কারীমের চারটি মৌলিক পরিভাষা তথা 'ইলাহ, রব, দ্বীন ও ইবাদত'-এর বিশ্লেষণ করেছেন, যেগুলোকে ঘিরে ইসলামের গোটা ভিত্তি আবর্তিত হয়, যেগুলো ছাড়া ইসলামের ওপর যথাযথ আমল হয় না, দ্বীনের আহ্বানও সম্পূর্ণ হয় না এবং 'ইকামাতে দ্বীন' বা দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজও হয় না। এমন চারটি মৌলিক পরিভাষা সম্পর্কে তিনি উক্ত বইয়ে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন,

بعد کی صدیوں میں رفتہ رفتہ ان سب الفاظ کے وہ اصلی معنی جو نزول قرآن کے وقت سمجھے جاتے تھے، بدلتے چلے گئے، یہاں تک کہ ہر ایک اپنی پوری وسعتوں سے ہٹ کر نہایت محدود بلکہ مبہم مفہومات کے لیے خاص ہو گیا۔

'কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় এ শব্দগুলোর (ইলাহ, রব, দ্বীন ও ইবাদত) যে মৌল অর্থ প্রচলিত ছিল, পরবর্তী শতকে ধীরে ধীরে তা পরিবর্তিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এক-একটি শব্দ তার সম্পূর্ণ ব্যাপকতা হারিয়ে একান্ত সীমিত, বরং অস্পষ্ট অর্থের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে পড়ে।'

শুধু তা-ই নয়, তিনি এই পরিবর্তনের ফল কী দাঁড়ালো, সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে غلط فہمی کے نتائج তথা 'ভুল বোঝার ফল' শিরোনামে লিখেছেন,

پس یہ حقیقت ہے کہ محض ان چار بنیادی اصطلاحوں کے مفہوم پر پردہ پڑ جانے کی بدولت قرآن کی تین چوتھائی سے زیادہ تعلیم، بلکہ اس کی حقیقی روح نگاہوں سے مستور ہو گئی ہے۔

'এটা সত্য যে, **কেবল এ চারটি মৌলিক পরিভাষার তাৎপর্যে আবরণ পড়ে যাওয়ার কারণে কুরআনের তিন-চতুর্থাংশের চেয়েও বেশি শিক্ষা, বরং তার সত্যিকার স্পিরিটই দৃষ্টি থেকে প্রচ্ছন্ন হয়ে যায়।**'[৬৪৮]

মওদূদী সাহেব মূলত এখানে তিনটি ভয়াবহ দাবি করেছেন:

১. কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পরবর্তী শতাব্দীসমূহে এ মৌলিক পরিভাষাগুলোর মর্মার্থ পরিবর্তিত হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এগুলোর ভাবার্থ অত্যন্ত সীমিত; বরং অস্পষ্ট হয়ে যায়।

---

৬৪৮. দ্র. কুরআন কী চার বুনিয়াদী ইসতিলাহেঁ, পৃষ্ঠা ৮ ও ১০, মাকতাবায়ে ইসলামী দিল্লী, চতুর্থ প্রকাশ ১৯৮৮; কোরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা, পৃষ্ঠা ১২ ও ১৩, আধুনিক প্রকাশনী ঢাকা, ৮ম প্রকাশ জুন ২০০2 উল্লেখ্য, বাংলা অনুবাদটিও আমার নয়, বরং তাদের আধুনিক প্রকাশনীর

২. যুগে যুগে মুফাসসিরগণ ও ইমামগণ শব্দগুলোর সেই সঠিক মর্ম অনুধাবন করতে সক্ষম হননি, যা কুরআন অবতরণকালীন সময়ে বুঝা যেতো।

৩. অবস্থার পরিবর্তনের কারণে কুরআনের তিন চতুর্থাংশ শিক্ষা, বরং তার সত্যিকার স্পিরিটই দৃষ্টি থেকে প্রচ্ছন্ন হয়ে যায়।

এ দাবীগুলোর ভয়াবহতা ও পরিণতি সম্পর্কে এখানে আলোচনা-পর্যালোচনা করার সুযোগ নেই। এ বিষয়ে যথাযথ আলোচনা ও খণ্ডন করেছেন আলী নদবী রাহ. ও মনযুর নুমানী রাহ.-সহ অন্যরা।

মওদূদী সাহেব তার উক্ত বইয়ে এ দাবিগুলোর পর সেই চারটি পরিভাষার যেভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং তার যেই কেন্দ্রীয় পয়েন্ট, মূল স্পিরিট ও আসল চেতনা অভিহিত করে তার ওপর যেভাবে গুরুত্বারোপ করেছেন, এর মাধ্যমে তিনি ইসলাম ও কুরআনের এমন একটি অভিনব ব্যাখ্যা পেশ করেছেন, যার ওপর রাজনৈতিক বর্ণই সবকিছুর ওপর ছাপিয়ে আছে এবং আল্লাহর হাকিমিয়াত বা শাসনকে ঘিরেই ঘুরপাক খাচ্ছে। **যেখানে একমাত্র আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা করাকেই কুরআন নাযিলের ও ইসলামী দাওয়াতের মূল লক্ষ্য সাব্যস্ত করা হয়েছে।৬৪৯**

উল্লেখ্য, আলী নদবী সাহেবের জন্য এটা সৌভাগ্যের বিষয় ছিল যে, তিনি তাঁর গ্রন্থটি লেখার পর মওদুদী সাহেবের মৃত্যুর প্রায় ১০ মাস পূর্বে ব্যক্তিগত চিঠির সাথে তার কাছে পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন। আর মওদুদী সাহেব ২০ জানুয়ারি ১৯৭৯ সালে লেখা ফিরতি চিঠিতে এর জবাবে সুস্পষ্টভাবে লিখেছিলেন, 'আমি কখনো নিজেকে সমালোচনার ঊর্ধ্বে ভাবিনি। এ জন্য কখনো আমি একে মন্দ ভাবব না।'

কিন্তু এর সাথে দুর্ভাগ্যের কথাও বলতে হয় যে, মওদুদী সাহেব বিষয়টি স্বাভাবিকভাবে নিলেও বর্তমানে যেভাবে তার বিরোধিতা করে কিছু লিখলে সমালোচনা ও আক্রমণের শিকার হতে হয়, তখনো নদবী সাহেবের মতো ব্যক্তির দাওয়াহর ভাষায় লেখাটিকেও জামায়াতে ইসলামীর কর্মী ও সমর্থকদের পক্ষ থেকে উগ্র প্রতিবাদের শিকার হতে হয়েছে, যা তিনি বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকাতে উল্লেখ করেছেন।

এদিকে মিশরের প্রথিতযশা লেখক শায়খ সায়্যিদ কুতুব শহীদ রাহ. (মৃ. ১৯৬৬ ঈসায়ী) মওদুদী সাহেবের লিটারেচর ও রচনাবলি পড়ে খুবই প্রভাবিত হন। ফলে তিনি মওদুদী সাহেবের তাওহীদুল হাকিমিয়ার এ চিন্তাধারা আরও ব্যাপক আকারে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ তুলে ধরেন। তিনি অনেকটা মওদুদী সাহেবের ভাষ্যকার ও ব্যাখ্যাকাররূপে আত্মপ্রকাশ করেন। এ কারণেই জামায়াত-শিবিরের বন্ধুদেরকে তার কিতাবাদি অনুবাদ ও প্রচার করতে দেখা যায়।

---

৬৪৯. দেখুন, ইসলামের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা, পৃষ্ঠা ৩২

সায়্যিদ কুতুব তার অনেক রচনায় তাওহীদুল হাকিমিয়ার বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তন্মধ্যে তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'মাআলিম ফীত তরীক'[৬৫০] এবং 'আত-তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন'-এর মাঝে সবচেয়ে বেশি করেছেন।

এরপর 'তাওহীদুল হাকিমিয়া'-এর এ পরিভাষাটি বাংলাদেশ ও আরব-বিশ্বসহ সবখানে ছড়িয়ে পড়ে এবং অনেকেই পরিভাষাটি সঠিক অর্থে ও ভালোভাবে না বুঝে লুফে নেয়। তন্মধ্যে জামায়াত-শিবিরের বন্ধুরা এবং সালাফীদের একটি অংশ তা গ্রহণ করে নেয়। এমনকি কওমী অঙ্গনেরও একটি অংশ এটাকে আন্তরিকভাবে আলিঙ্গন করে বসে!

অথচ 'ইখওয়ানুল মুসলিমীন'-এর প্রতিষ্ঠাতা শায়খ হাসানুল বান্না রাহ. (মৃ. ১৯৪৯ ঈসায়ী)-এর পর যিনি সর্বসম্মতিক্রমে 'ইখওয়ানুল মুসলিমীন'-এর দ্বিতীয় মুর্শিদে আম বা প্রধান আমীর নির্বাচিত হন, যাঁর জ্ঞান ও সততা, একনিষ্ঠতা, দ্বীনী প্রজ্ঞা ও সুদৃঢ়তার ওপর গোটা সংগঠন একমত, তিনি হলেন শায়খ হাসান ইসমাঈল হুদায়বী রাহ. (মৃ. ১৯৭৩ ঈসায়ী)। তিনি মওদুদী সাহেবের 'তাওহীদুল হাকিমিয়া'কে সামনে রেখে সায়্যিদ কুতুবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ফলে মিশরে যে উগ্রতা সৃষ্টি হয়েছিল, তা অপনোদন করার প্রয়োজন অনুভব করেন।

ফলে তিনি 'দুআত লা কুযাত' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। এতে তিনি মওদুদী সাহেবের 'কুরআন কি চার বুনিয়াদী ইস্তেলাহেঁ'-এর জবাবের সাথে সাথে সায়্যিদ কুতুবের 'মাআলিম ফীত তরীক'-এরও জোরালোভাবে খণ্ডন করেন। মোটকথা, তিনি তার বইটিতে এই দুজনের ভ্রান্তির মূল জায়গাটা নিয়ে যুক্তিপূর্ণ ভাষায় চমৎকার আলোচনা করেছেন। পরে এ দুজনের ভ্রান্তির মূল জায়গাটা চিহ্নিত করে এবং এর ভয়াবহ ক্ষতিকর দিকগুলো নিয়ে আবুল হাসান আলী নদবী রাহ. কলম ধরেন এবং 'আসরে হাযের মেঁ দ্বীন কী তাফহীম ওয়া তাশরীহ' বইটি লেখেন।

বই দুটি উলামায়ে কেরাম, তালেবে ইলম, রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, দাঈ ও জিহাদের চেতনায় উজ্জীবিত ব্যক্তি-সহ প্রত্যেকেরই পড়া উচিত বলে মনে করি। এই দুজনের মূল ভ্রান্তি কী, শুধু সেটা জানার জন্য নয়; বরং নিজের চিন্তা-চেতনা পরিশুদ্ধ করার জন্য এবং দ্বীনের প্রকৃত মেজায ও রূহ কী, তা জানার জন্য বই দুটি পড়া উচিত। সাথে মনযুর নুমানীর বইটিও পড়া চাই।

বর্তমানে আমাদের কিছু ভাই ও তরুণ আলেম, যারা মাওলানা মওদুদী সাহেব ও জামায়াতে ইসলামীর সাথে হক্কানী উলামায়ে কেরামের বিরোধ আছে জানেন বা কেউ কেউ তাদেরকে গোমরাহও বলেন ঠিক; কিন্তু মূল যেই ফিকরাহ বা চিন্তাগত ভ্রান্তির

---

৬৫০. **এর ইংরেজি অনুবাদ হয়েছে 'Milestone' নামে এবং ইংরেজি থেকে বাংলা হয়েছে 'ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা' নামে। এখন 'আগামী বিপ্লবের ঘোষণাপত্র' নামে আরেকটি অনুবাদ এসেছে।**

কারণে জামায়াতে ইসলামীর প্রায় সকল প্রতিষ্ঠাতা সদস্য আলেম উক্ত দল থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন,[৬৫১] সেই মূল ভ্রান্তির জায়গাটা জানেন না।

ফলে আমাদের ভাইরাও ঠিক একই মূল ভ্রান্তি ও চিন্তা-চেতনাই লালন করে। এদের চিন্তা-চেতনা আর মওদুদী সাহেবের চিন্তা-চেতনার মাঝে বড় কোনো পার্থক্য দেখা যায় না! এরা ঠিক ওই ফিকরাহই লালন করে, যেই ফিকরাহ সায়্যিদ কুতুব শহীদ তার 'মাআলিম ফীত তরীক' ও তার তাফসীরে পেশ করেছেন।

তাই আমাদের কোনো কোনো দাঈ আলেমকেও দেখা যায়, সায়্যিদ কুতুবের বই ও তাফসীর থেকে এ বিষয়ে দলীল দেন এবং কোনো ধরনের সতর্ক করা ছাড়া তার গ্রন্থসমূহ পড়ার জন্য উৎসাহিত করেন।

মওদুদী সাহেবের 'তাওহীদুল হাকিমিয়া' পরিভাষাটির ভ্রান্তি কী এবং তা ছড়িয়ে পড়ার ফলে লাভ-ক্ষতি কী হলো, তা সামনে তুলে ধরব ইনশাআল্লাহ।

'ইবাদত' ও 'ইতাআত' শব্দদ্বয়ের অর্থ ও ব্যাখ্যা

'ইবাদত' ও 'ইতাআত' দুটি আরবী শব্দ। 'ইতাআত' অর্থ আনুগত্য করা, আদেশ-নিষেধ পালন করা। আরবী ভাষায় 'ইবাদত'-এর অর্থ যদিও 'ইতাআত' ও আনুগত্য করা এবং সকল 'ইবাদত'-ই 'ইতাআত' হিসেবে গণ্য, তবে পারিভাষিক অর্থ এমন নয়; বরং 'ইবাদত' হচ্ছে, শরীয়তের একটি বিশেষ পরিভাষা। যার সারাংশ হলো,

'ইবাদত' সুনির্দিষ্ট কিছু বিশ্বাসসহ গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ কিছু আমলের নাম এবং উক্ত

---

৬৫১. আলী নদবী রাহ. বলেন, 'এ বিষয়টি ভালোভাবে খোলা মনে ও কিছুটা সাহসিকতার সাথে চিন্তা করার প্রয়োজন যে, জামায়াতে ইসলামীর প্রায় সকল প্রতিষ্ঠাতা (রুকন) সদস্যগণ একের পর এক কেন জামায়াতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন? যারা জামাআতের সংবিধান-প্রণেতা, দেশে জামায়াতে ইসলামীর প্রচার-প্রসারকারী ও জামায়াতের জন্য জীবন উৎসর্গকারীদের মধ্যে অগ্রগামী ছিলেন।... বরং মওদুদী সাহেব তাঁদেরকে বিরুদ্ধবাদী ও অভিযোগকারীদের সামনে সনদ হিসেবে পেশ করতেন। এটা স্বাভাবিক যে, মানুষ সংগঠনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে আবার তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। এমনকি তার বিরোধীও হয়ে যায়। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী যে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়, যার কারণে তার প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণ (বিশেষত ওই সমস্ত ব্যক্তিবর্গ, যারা কুরআন-সুন্নাহর সরাসরি আলেম ছিলেন) যে হারে ও ধারাবাহিকতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন, তার নযির অন্য সংগঠনসমূহের ইতিহাসে হয়তো পাওয়াই যাবে না।

এর বিপরীতে আমরা দেখতে পাই যে, নিকট অতীতের দাওয়াত ও রেনেসার সর্ববৃহৎ আন্দোলন এবং জেহাদ ও জান কোরবানীর বৃহত্তম সংগঠন, হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ রাহ.-এর 'জামায়াতে মুজাহিদীনে' যারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন এবং যারা তাঁর হাতে হাত রেখে শপথ নিয়েছিলেন, তাঁরা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর সাথে ছিলেন। তাঁদের অনেকে শাহাদাতে ধন্য হন। আর যারা বালাকোটের ময়দান থেকে গাজী হয়ে ফিরে আসেন তাঁরা মুজাহিদদের দ্বিতীয় কেন্দ্রে স্থানান্তরিত হন অথবা স্বদেশভূমি ভারতে ফিরে আসেন। অতঃপর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত তাঁরা এই দাওয়াত ও আন্দোলনকে চরম পর্যায়ে পৌছানোর কাজে ব্যস্ত থাকেন এবং সায়্যিদ সাহেবের প্রেম ও ভক্তিতে তাঁরা পাগল-পারা ও যুদ্ধের ময়দানের জন্য সদা তৎপর ও প্রস্তুত থাকেন। দুটি আন্দোলনের মধ্যে এই যে পার্থক্য, তা সে সব লোককে চিন্তা-ভাবনা করার আহবান জানায়।.. যারা ইসলামের পুনর্জাগরণের কর্মী ও নেতাদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল।' (মাওলানা মওদুদীর সাথে আমার সাহচর্যের ইতিবৃত্ত বইটির ভূমিকা, পৃষ্ঠা ৫-৬)

আমলসমূহ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য করার অনুমতিই নেই; বরং যে বিশ্বাস নিয়ে উক্ত আমলসমূহ আল্লাহর জন্য করা হয়, একই বিশ্বাস নিয়ে যদি অন্য কারও জন্য হয়, তাহলে নিশ্চিত শিরক হবে।

মাওলানা মুহাম্মাদ মনযুর নুমানী রাহ. বলেন, 'ইবাদত হচ্ছে দ্বীন ও শরীয়তের একটি বিশেষ পরিভাষা। কোনো সত্তাকে গায়বীভাবে ভালো-মন্দের মালিক ও সকল হাজত পুরা করার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বলে বিশ্বাস করে তার সামনে নিজ অনুরাগ ও অসহায়ত্ব এবং নিতান্ত হীনতা ও মুখাপেক্ষিতা প্রকাশের জন্য, তাঁকে রাজি-খুশি করার জন্য এবং তাঁর নৈকট্য অর্জনের জন্য যেসব উপাসনাধর্মী কাজ করা হয়, তাকেই 'ইবাদত' বলে। যেমন : নামাজ, রোযা, হজ, সাদকা, সিজদা, তাওয়াফ, দুআ, নযর-মান্নত, কুরবানী ও নাম জপ করা ইত্যাদি।

এই ইবাদত একান্তভাবে আল্লাহ তাআলারই অধিকার। কেউ যদি আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারও সাথে এই আচরণ করে, তবে সে নিঃসন্দেহে মুশরিক। পৃথিবীর অধিকাংশ মুশরিক কওমের মাঝে এই শিরকই প্রচলিত যে, তারা গায়রুল্লাহকে ভালো-মন্দের মালিক-মুখতার মনে করে থাকে এবং তাদের কৃপা ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য বিভিন্ন উপাসনাধর্মী কাজ করে থাকে। একেই বলা হয় 'শিরক ফিল ইবাদাহ'। আম্বিয়ায়ে কেরামকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই শিরকেরই মোকাবিলা করতে হয়েছে।'[৬৫২]

কিন্তু 'ইতাআত' বা আনুগত্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও হতে পারে; বরং কখনো তা আবশ্যক। যেমন : রাসূলের আনুগত্য করা, বৈধ কাজে সরকারের, পিতা-মাতার ও স্বামীর আনুগত্য করা ইত্যাদি। আর আনুগত্যের হুকুম বিভিন্ন রকম হতে পারে।

আরেকটু বিস্তারিত বললে এভাবে বলা যায় :

১. আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও আনুগত্য যদি আল্লাহর আদেশ ও সন্তুষ্টির কারণ হয়, তাহলে সাওয়াব মিলবে। যেমন : রাসূলের আনুগত্য করা, বৈধ কাজে পিতা-মাতার ও স্বামীর আনুগত্য করা ইত্যাদি।

২. গায়রুল্লাহর আনুগত্য যদি বৈধ কাজে হয়, তাহলে পালন করা বৈধ। যেমন : বৈধ দুনিয়াবি বা সাধারণ বিষয়ে একে অপরের আনুগত্য করা।

৩. গায়রুল্লাহর আনুগত্য যদি নিষিদ্ধ-হারাম ও গুনাহের কাজে হয়, তাহলে হারাম হবে এবং গুনাহগার হবে।

৪. গায়রুল্লাহর আনুগত্য যদি কুফর-শিরক ও ঈমান ভঙ্গের কারণ হয়, তাহলে এমন আনুগত্য কুফর-শিরক হবে এবং এতে ঈমান ভঙ্গ হবে। যেমন : কারও আনুগত্য করে মূর্তিকে সিজদা করা, রাসূলের অবমাননা করা ইত্যাদি। অথবা ছোট-বড় কোনো

---

৬৫২. দেখুন, দ্বীন ও শরীয়ত, মনযুর নুমানী, পৃষ্ঠা ৫৩

হারাম ও গুনাহকে হারাম ও গুনাহ জানা সত্ত্বেও দায়িত্বশীল/সরকারের বা পিতা-মাতার কিংবা স্বামীর আনুগত্য করে, তা হালাল ও বৈধ মনে করা কিংবা গুনাহ মনে না করা।

তবে হালাল ও বৈধ মনে না করে, বরং গুনাহ মনে করে যদি কোনো কারণে (যেমন : আত্মপ্রবৃত্তি বা স্বার্থ হাসিলের জন্য) আনুগত্য করে, তাহলে শুধু গুনাহগার হবে।

শায়খ ইবনে তাইমিয়া রাহ. বলেন, 'যে সকল ইহুদী-খ্রিষ্টান তাদের গুরু-পাদরিদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে তথা আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে হালাল ও হালালকৃত বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে তাদের আনুগত্য করেছে, এর দুই অবস্থা হতে পারে :

১. তারা জানে যে, তাদের গুরুরা আল্লাহর দ্বীন পরিবর্তন করেছে। এরপরও তারা তাদের নেতাদের আনুগত্য করে আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে হালাল ও হালালকৃত বস্তুকে হারাম হিসেবে বিশ্বাস করে। অথচ তারা ভালো করেই জানে যে, তাদের নেতারা রাসূলদের আনীত দ্বীনকে পরিবর্তন করে ফেলেছে। এটা কুফর, এটাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল শিরক হিসেবে ব্যক্ত করেছেন। যদিও তারা নেতাদের জন্য নামাজ পড়ে না এবং সিজদাও করে না।

কাজেই যে এমন বিশ্বাস রেখে দ্বীনের বিপরীত বিষয়ে তা বিপরীত জানা সত্ত্বেও কারও আনুগত্য করে, সে তাদের মতো মুশরিক।

২. তারা হারামকে হারাম ও হালালকে হালাল বিশ্বাস করে, তবে আল্লাহর নাফরমানীতে তাদের নেতাদের আনুগত্য করেছে। যেমন : মুসলমানরা নাফরমানী জেনেও পাপকাজে লিপ্ত হয়ে থাকে। তাদের হুকুম অন্যান্য পাপীদের মতোই (অর্থাৎ শুধু গুনাহগার হবে)।'[৬৫৩]

সুতরাং হারামকে হারাম ও হালালকে হালাল বিশ্বাস করে যদি কেউ আল্লাহর নাফরমানীতে নেতার বা সরকারের আনুগত্য করে, তাহলে কুফর-শিরক হবে না।

মাওলানা মনযুর নুমানী রাহ. বলেন, 'জেনে রাখা ভালো যে, আরবী ভাষায় ইবাদতের অন্য অর্থ ইতাআত ও আনুগত্য। তবে এই দুই অর্থের মাঝে একটি স্পষ্ট ও সর্বজনবোধ্য পার্থক্য এই যে, পারিভাষিক অর্থে ইবাদত আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারও জন্য হতে পারে না। এটা সর্বাবস্থায় শিরক এবং সবচেয়ে বড় শিরক।

পক্ষান্তরে ইতাআত বা আনুগত্য মাখলূকেরও করা যায়; বরং কিছু ক্ষেত্রে স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই এর আদেশ করেছেন। যেমন : রাসূলের আনুগত্যের আদেশ করা হয়েছে, দায়িত্বশীল ও পিতা-মাতার আনুগত্যের আদেশ করা হয়েছে, স্ত্রীর জন্য

---

৬৫৩. মাজমুউল ফাতাওয়া, ৭/৭০

স্বামীর সেবা ও আনুগত্যের আদেশ করা হয়েছে।

অতএব যারা পারিভাষিক অর্থে ইবাদত এবং আনুগত্য অর্থে ইবাদতের মাঝে পার্থক্য করে না এবং একটিকে অন্যটির সাথে গুলিয়ে ফেলে, তারা দ্বীনের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মারাত্মক ভুল করে ফেলে, যার কারণে তাওহীদ ও শিরকের অর্থই পরিবর্তন হয়ে যায়।'[৬৫৪]

উল্লিখিত আলোচনা থেকে এ কথা পরিষ্কার হলো যে, 'ইতাআত'-এর অর্থ ব্যাপক, এতে 'ইবাদত'-সহ সব ধরনের আনুগত্য শামিল। কাজেই সকল 'ইবাদত'-ই 'ইতাআত'। তবে 'ইবাদত' অত ব্যাপক নয়; বরং সুনির্দিষ্ট কিছু বিশ্বাসসহ বিশেষ কিছু আমলের নাম।

সুতরাং সব ইবাদত ইতাআত হলেও সকল ইতাআত ইবাদত নয়। যেমন : রাসূলের আনুগত্য 'ইতাআত' হলেও পারিভাষিক অর্থে 'ইবাদত' নয়। এভাবে দায়িত্বশীল বা সরকারের আনুগত্য করা 'ইবাদত' নয়; বরং 'ইতাআত'।

কাজেই আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যত কাজ করা হয় শরীয়তের পরিভাষায় সব কাজ ইবাদত নয়; বরং কিছু ইবাদত, আর কিছু ইতাআত বা আনুগত্য। ইবাদত আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য হতেই পারে না।

উল্লেখ্য, আমরা কখনো কখনো বলে থাকি, আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যা কিছু করা হয় সবই ইবাদত। এটি আসলে পারিভাষিক অর্থে বলা হয় না; বরং মানুষকে বোঝানোর জন্য ব্যাপক অর্থে বলা হয়।

'ইবাদত' ও 'ইতাআত' কি সমার্থক?

মাওলানা মওদুদী সাহেব মনে করেন 'ইবাদত' ও 'ইতাআত' সমার্থক তথা শব্দদ্বয়ের অর্থ এক। তিনি মূলত রাষ্ট্রীয়ভাবে আল্লাহর আইনের আনুগত্য করার বা খেলাফত প্রতিষ্ঠা ও রাজনৈতিকভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য যে 'ইবাদত' গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ কিছু আমলের নাম ছিল, সেই 'ইবাদত'-কে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ 'ইতাআত'-এর সমার্থক প্রতিপন্ন করেছেন।[৬৫৫]

এ কারণেই সৌদি আরবের শায়খ বিন বায রাহ. মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান থাকাকালীন ২/৪/১৩৯২ হিজরীতে মাওলানা মওদুদীর প্রেরিত এক চিঠির জবাবে

---

৬৫৪. দেখুন, কালেমায়ে তাইয়েবা কী হাকীকত, মনযুর নুমানী, পৃষ্ঠা ৮-৯-এর সূত্রে নির্বাচিত প্রবন্ধ, মাওলানা আব্দুল মালেক, ২/১৫৮, আরও দেখুন, আল-ফুরূক ফীল লুগাহ, আবু হিলাল আসকারী (মৃ. ৩৯৫ হি.) পৃষ্ঠা ৩৮৯; মাজমুউল ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়া, ৩/১০৮, ১০/১৫৪; আল-কুল্লিয়াত, আবুল বাকা, পৃষ্ঠা ৫৮৩।

৬৫৫. দ্র. কুরআন কী চার বুনিয়াদী ইসতিলাহেঁ, পৃষ্ঠা ৮৫, মাকতাবায়ে ইসলামী, দিল্লী, চতুর্থ প্রকাশ ১৯৮৮ ঈ.; ইসলামের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা, পৃষ্ঠা ৭৩

শব্দদ্বয় যে সমার্থক নয়, তা ব্যক্ত করে লেখেন,

أن الطاعة أوسع من العبادة، فكل عبادة لله موافقة لشريعته تسمى طاعة، وليس كل طاعة بالنسبة إلى غير الله تسمى عبادة، بل في ذلك تفصيل...

'ইবাদত' থেকে 'ইতাআত' ব্যাপক। প্রত্যেক 'ইবাদত' শরীয়তসম্মত হলে তা 'ইতাআত' বলা হবে। কিন্তু প্রত্যেক 'ইতাআত' বিশেষত গায়রুল্লাহর আনুগত্য 'ইবাদত' নয়; বরং এতে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ রয়েছে।'[৬৫৬]

এদিকে সায়্যিদ কুতুব মওদুদী সাহেবের রচনাবলি পড়ে বেশ প্রভাবিত হয়ে শব্দদ্বয় সমার্থক হওয়ার ব্যাপারে আরও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ তুলে ধরেন তার 'মাআলিম ফীত তরীক' ও 'আত-তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন'-সহ বিভিন্ন গ্রন্থে।

এ প্রসঙ্গে মাওলানা আবুল হাসান আলী নদবী রাহ. লেখেন, 'আমার প্রিয় বিদগ্ধ বন্ধু মিশরের প্রথিতযশা সাহিত্যিক সায়্যিদ কুতুব শহীদ, যিনি জনাব মওদুদী সাহেবের 'কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা' পড়ে বেশ প্রভাবিত হয়েছেন এবং তার বিশ্লেষণের সাথে ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন, তিনিও সার্বভৌম ক্ষমতাকে উলূহিয়াতের সবচেয়ে খাস বৈশিষ্ট্য অভিহিত করেছেন। তার রচনাবলি থেকেও জাহিলিয়াতের মূর্তিপূজা অথবা গায়রুল্লাহর উপাসনার শনাক্তকরণ কম হয়। তিনি এটাকে অতীত জাহিলিয়াতের এক প্রাথমিক ও সরল (শিরকী) রূপ মনে করেন।'[৬৫৭]

এরপর নদবী রাহ. তার আলোচিত গ্রন্থদ্বয় থেকে এর স্বপক্ষে বেশ-কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরেন। তন্মধ্যে কয়েকটি তুলে ধরছি—

সায়্যিদ কুতুব বলেন,

هذه الجاهلية تقوم على أساس الاعتداء على سلطان الله في الأرض، وعلى أخص خصائص الألوهية: وهي الحاكمية: إنها تسند الحاكمية إلى البشر فتجعل بعضهم لبعض أربابا، لا في الصورة البدائية الساذجة التي عرفتها الجاهلية الأولى، ولكن في صورة ادعاء حق وضع التصورات والقيم والشرائع والقوانين والأنظمة والأوضاع بمعزل عن منهج الله للحياة، وفيما لم يأذن به الله.

'এই (নব্য) জাহিলিয়াত জমিনের ওপর আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও উলূহিয়াতের সবচেয়ে খাস বৈশিষ্ট্য হাকিমিয়াত তথা আল্লাহর শাসন-কর্তৃত্বের ওপর হস্তক্ষেপ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। যা মানুষকে সেই শাসন-কর্তৃত্বের যোগ্য ঘোষণা দিয়ে মানুষকে মানুষের রব স্বীকার করে। এটি অতীত জাহিলী যুগে প্রচলিত সেই প্রাথমিক ও সরল পদ্ধতির নয়; বরং এ জাহিলিয়াত মানুষকে স্বতন্ত্রভাবে আল্লাহপ্রদত্ত জীবন-বিধান ও

---

৬৫৬. মাজমুউ ফাতাওয়া বিন বায, ৫/১৭
৬৫৭. দ্র. ইসলামের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা, পৃষ্ঠা ৭৫

তাঁর সন্তুষ্টির পরিপন্থী চিন্তা-চেতনা ও মূল্যবোধ, সংবিধান ও বিধি-নিষেধ, সংগঠন ও দর্শন তৈরি করার হক দাবি করার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত।'

তিনি মানুষকে মানুষের শাসক এবং মানবরচিত বিধান মেনে চলাকে 'ইবাদত' শব্দেই ব্যক্ত করে লিখেছেন,

فالناس في كل نظام غير النظام الإسلامي يعبد بعضهم بعضا في صورة من الصور، وفي المنهج الإسلامي وحده يتحرر الناس جميعا من عبادة بعضهم لبعض لعبادة الله وحده، والتلقي من الله وحده، والخضوع لله وحده.

'ইসলামী বিধান ছাড়া অন্য সকল বিধানের অধীনে কোনো না কোনোভাবে মানুষ মানুষের ইবাদত করে। একমাত্র ইসলামী বিধানে সকল মানুষ অন্য মানুষের ইবাদত থেকে মুক্ত হয়ে একমাত্র আল্লাহকে নিজের উপাস্য স্বীকার করে, তাঁরই আদেশ-নিষেধ মেনে চলে এবং শুধু তাঁর কাছেই নতশির হয়।'[৬৫৮]

যে সকল আরব কুরআনে কারীমের সূচনাকালীন মূল সম্বোধিত শ্রোতা ছিলেন, তাদের সম্পর্কে কিয়দ্দূর পরে আলোচনায় তিনি লিখেছেন,

كانوا يعرفون أن الألوهية تعني الحاكمية العليا.

'তাঁরা জানত, উলূহিয়াত হচ্ছে সার্বভৌম কর্তৃত্ব।...'

আরেকটু অগ্রসর হয়ে আরও স্পষ্টভাবে লিখেছেন,

كانوا يعلمون أن لا إله إلا الله ثورة على السلطان الأرضي الذي يغتصب أولى خصائص الألوهية، وثورة على الأوضاع التي تقوم على قاعدة من هذا الاغتصاب، وخروج على السلطات التي تحكم بشريعة من عندها لم يأذن بها الله.

'তাঁরা জানত, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হচ্ছে সেই জমিনি শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, যে উলূহিয়াতের সবচেয়ে খাস বৈশিষ্ট্য জবর-দখল করে আছে। তা হচ্ছে সেসব বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, যা এই দখলদারত্বের নীতির আলোকে উদ্ভূত হয়েছে এবং সেই সকল প্রশাসন ও শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, যারা নিজেদের তৈরি খোদাবিরোধী সংবিধান কায়েম করে আছে।'

তিনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেছেন,

لا إله إلا الله كما يدركه العربي العارف بمدلولة لغته: لا حاكمية إلا لله، ولا شريعة إلا من الله، ولا سلطان لأحد على أحد، لأن السلطان كله لله.

'একজন আরব যিনি তার ভাষার শব্দসমূহের অর্থ ও ভাব জানে, তার দৃষ্টিতে

---

৬৫৮. মাআলিম ফীত তরীক, পৃষ্ঠা ৮, ১৩৮৬ হি.-১৯৬৭ ঈ.; ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা, পৃষ্ঠা ২৩

‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর অর্থ হলো, শাসন-কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর, বিধান হবে আল্লাহরই পক্ষ থেকে, কারও ওপর কারও কোনো রাজত্ব নেই। কারণ, রাজত্ব পুরোটাই আল্লাহর।’

তিনি মনে করেন, শাসনক্ষমতাকে আল্লাহর সাথে বিশিষ্ট করা কালেমার শুধু দাবি নয়; বরং এর আসল অর্থ ও প্রকৃত ভাষ্য। সেই গ্রন্থের এক জায়গায় তিনি বলেছেন, যে সমস্ত লোক মুসলমান হওয়ার দাবি করে অথবা যাদের মুসলমান হওয়ার প্রমাণ একমাত্র জন্মনিবন্ধন রেজিস্টারে পাওয়া যায়, তাদের প্রকৃত ইসলাম শিক্ষা করার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি লিখেছেন,

يجب أن يعلموهم أن الإسلام هو – أولا – إقرار عقيدة: لا إله إلا الله بمدلولها الحقيقي، وهو ردّ الحاكمية لله في أمرهم كله، وطرد المعتدين على سلطان الله بادعاء هذا الحق لأنفسهم.

‘তাদেরকে এ শিক্ষা দেওয়া অপরিহার্য যে, ইসলাম হচ্ছে প্রথমত ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর আকীদাকে তার আসল অর্থসহ স্বীকার করা। তা হলো, নিজেদের সকল কর্মকাণ্ডে শাসন-কর্তৃত্ব আল্লাহর কাছে অর্পণ করা এবং যারা এ অধিকার নিজেদের বলে দাবি করার মাধ্যমে সীমালঙ্ঘন করছে, তাদের প্রত্যাখ্যান করা।’[৬৫৯]

বলাবাহুল্য, ‘সকল কর্মকাণ্ডে শাসন-কর্তৃত্ব আল্লাহ তাআলার কাছে অর্পণ করা এবং যারা এ অধিকার নিজেদের বলে দাবি করার মাধ্যমে সীমালঙ্ঘন করছে, তাদের প্রত্যাখ্যান করা’—এটা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর দাবি; এটা তার আসল অর্থ ও প্রকৃত ভাষ্য নয়। এভাবে ‘শাসন-কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর’—তা কালেমার আসল অর্থ নয়, যেভাবে স্রষ্টা ও প্রতিপালক কালেমার আসল অর্থ নয়; বরং ‘মাবুদ’ হলো, কালেমার আসল অর্থ ও প্রকৃত ভাষ্য।

আর ‘মাবুদ’ তো তাঁকেই মানা হয়, যাঁকে স্রষ্টা ও বিধানদাতা বিশ্বাস করা হয়। এখন কেউ যদি আল্লাহকে ‘স্রষ্টা’ মানে ঠিকই; কিন্তু ‘বিধানদাতা’ বিশ্বাস করে না, তাহলে সেটা তার বিশ্বাসের সমস্যা। তাকে এ আয়াত তুলে ধরে বলেন,

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

‘জেনে রাখো, সৃষ্টি তাঁরই এবং বিধানও তাঁরই।’[৬৬০]

দেখো, এখানে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, যেভাবে তিনিই সমস্ত সৃষ্টির মালিক এবং তিনিই সবকিছুর ‘স্রষ্টা’, সেভাবে তিনিই নামাজ-রোযা ও রাষ্ট্র পরিচালনার বিধানেরও মালিক এবং সকল ক্ষেত্রে তিনিই ‘বিধানদাতা’। সুতরাং সৃষ্টির ক্ষেত্রে যেমন কারও কিছু করার ক্ষমতা নেই, তদ্রূপ বিধানের ক্ষেত্রেও কারও হস্তক্ষেপের

---

৬৫৯. মাআলিম ফীত তরীক, পৃষ্ঠা ২২, ২৫, ৩৫; ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা, পৃষ্ঠা ৩৬, ৩৮, ৪৭
৬৬০. সূরা আ'রাফ, (৭) : ৫৪

সুযোগ নেই। কাজেই শাসন-কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই চলবে, অন্য কারও নয়। এ-জাতীয় কথা বলে তার বিশ্বাস পরিশুদ্ধ করা যায়।

এটার জন্য তো কালেমার আসল অর্থ ও প্রকৃত ভাষ্য বিকৃতি করার প্রয়োজন নেই এবং এর অবকাশও নেই। এভাবে শাসন-কর্তৃত্বের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য যদি এর আসল অর্থ ও প্রকৃত ভাষ্য বিকৃতি করা হয়, তাহলে আরেকজন অন্য কিছুর গুরুত্ব তুলে ধরার জন্যও বিকৃতির সুযোগ পাবে, তখন কী অবস্থা দাঁড়াবে!

সায়্যিদ কুতুব তাঁর 'আত-তাফসীর ফী যিলালিল কুরআন'-এর মাঝে সূরা ইউসুফের আয়াতাংশ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ-এর তাফসীরের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন,

وهذا وحده هو «الدين القيم» فلا دين إذن لله ما لم تكن دينونة الناس لله وحده، وما لم يكن الحكم لله وحده. ولا عبادة لله إذن إذا دان الناس لغير الله في شان واحد من شئون الحياة. فتوحيد الألوهية يقتضي توحيد الربوبية والربوبية تتمثل في أن يكون الحكم لله أو أن تكون العبادة لله، فهما مترادفان أو متلازمان. والعبادة التي يعتبر بها الناس مسلمين أو غير مسلمين هي الدينونة والخضوع والاتباع لحكم الله دون سواه .

'এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ একমাত্র আল্লাহর অনুসারী হবে না এবং শাসনক্ষমতা কেবল তাঁরই হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর জন্য কোনো 'দ্বীন'-ই হবে না। আর যদি মানুষ জীবনের কোনো ক্ষেত্রে গায়রুল্লাহর অনুগত থেকে যায়, তাহলে আল্লাহর ইবাদতের কোনো অর্থই থাকে না।

কাজেই তাওহীদুল উলূহিয়া তাওহীদুর রুবূবিয়াকে আবশ্যক করে। আর রুবূবিয়ার প্রকাশ ঘটে দু-জায়গায়, তথা শাসন-কর্তৃত্ব হবে আল্লাহর এবং ইবাদতও হবে আল্লাহর। এ দুটি শব্দ (হাকিমিয়াত ও ইবাদত) একই অর্থবোধক বা একটি অপরটির জন্য আবশ্যক।

আর যে 'ইবাদত'-এর ভিত্তিতে মানুষ মুসলিম ও অমুসলিম চিহ্নিত হবে তা হলো, একমাত্র আল্লাহর হাকিমিয়াত বা শাসন-কর্তৃত্বের পূর্ণ তাঁবেদারি করা, আনুগত্য করা এবং অনুসরণ করা।'

অতিরঞ্জন ও আল্লাহর হাকিমিয়াত বা শাসন-কর্তৃত্বের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য এ ধরনের বিকৃতি ও বিভ্রান্তিমূলক বাড়াবাড়ি বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। শাসনক্ষমতা কেবল তাঁরই না হলে কোনো 'দ্বীন'-ই হবে না এবং জীবনের কোনো ক্ষেত্রে গায়রুল্লাহর অনুগত হলে আল্লাহর ইবাদতের কোনো অর্থই থাকে না? আর হাকিমিয়াত ও ইবাদত শব্দদ্বয় কি একই অর্থবোধক বা একটি অপরটির জন্য আবশ্যক?

‘ইবাদত’ ও ‘ইতাআত’ সমার্থকের প্রতিফল

মওদুদী সাহেব ও সায়্যিদ কুতুব দুজনই যেহেতু রাষ্ট্রীয়ভাবে আল্লাহর আইনের আনুগত্য করার কিংবা রাজনৈতিকভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য ‘ইবাদত’ ও ‘ইতাআত’ শব্দদ্বয় সমার্থক বা এক অর্থ মনে করেন, কাজেই আল্লাহর আইন ছাড়া গায়রুল্লাহ তথা দায়িত্বশীল বা সরকারের আনুগত্য করা মানে তাদের ‘ইবাদত’ করা। আর যেভাবে নামাজ-রোযার ক্ষেত্রে গায়রুল্লাহর ‘ইবাদত’ করা শিরক, তেমনই আল্লাহর আইনের ক্ষেত্রে গায়রুল্লাহর (দায়িত্বশীল বা সরকারের) আনুগত্য করাও শিরক। কেননা, উভয়ের মতে ওটা যেমন ‘ইবাদত’, এটাও তেমনই ‘ইবাদত’। সুতরাং ওই ক্ষেত্রে শিরক হলে বা ইসলাম থেকে খারেজ হয়ে গেলে, এ ক্ষেত্রেও শিরক হবে বা ইসলাম থেকে খারেজ হয়ে যাবে।

মাওলানা মওদুদী রাহ. লিখেছেন,

اگر کوئی شخص اللہ کے حکم کی سند کے بغیر کسی کے حکم کو واجب الاطاعت سمجھتا ہے، تو وہ ایسا ہی شرک کرتا ہے جیسا ایک غیر اللہ سے مانگنے والا شرک کرتا ہے۔

‘কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহ তাআলার হুকুমের অনুমোদন ছাড়া কারও আনুগত্য আবশ্যক মনে করে, তবে সে তেমনই শিরক করে, যেমনই গায়রুল্লাহর কাছে প্রার্থনাকারী ব্যক্তি শিরক করে।’[৬৬১]

আবুল হাসান আলী নদবী রাহ. এটা উল্লেখ করে বলেন, ‘মওদুদী সাহেবের এ কথার অর্থ হচ্ছে, শাসনক্ষমতার মধ্যে শিরক করা আর উলূহিয়াত বা ইবাদতের মাঝে শিরক করা উভয়টি একই স্তরের শিরক; কোনো পার্থক্য নেই। অনুরূপ কাউকে রাজনৈতিকভাবে শাসক ও নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী মনে করা আর অতিপ্রাকৃতিক অর্থে কাউকে ইবাদতের উপযুক্ত এবং দুআ, মান্নত, কুরবানী, ভয় ও আকাঙ্ক্ষার স্থল বিশ্বাস করা অবিকল একই রকম শিরক।

বরং জনাবের চিন্তা-চেতনার মূল লক্ষ্য ও কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে, কারও প্রতি এই রাজনৈতিক আনুগত্য স্বীকার করা, তার সার্বভৌম ক্ষমতা মেনে নেওয়া, তার আদেশকে শিরোধার্য বিশ্বাস করা, তাকে আইন প্রণয়ন করার অধিকার দেওয়া— এগুলোই হচ্ছে প্রকৃত শিরক। তিনি তার লেখনীশক্তির পুরোটাই এখানে ঢেলে দিয়েছেন।

যদি তারা অন্য কোনো শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও চিন্তাধারার সংস্পর্শ না পান, তাহলে

---

৬৬১. কুরআন কী চার বুনিয়াদী ইসতিলাহেঁ, চতুর্থ প্রকাশ ১৯৮৮ ঈ., মাকতাবায়ে ইসলামী, দিল্লী, পৃষ্ঠা ২৮; কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা, পৃষ্ঠা ৩৩

অতিপ্রাকৃতিক অর্থে কাউকে ইবাদতের উপযুক্ত মনে করা, তাকে সাহায্য প্রার্থনার সত্তা মনে করা, তার কাছে কাকুতি-মিনতি করা ও তাকে সিজদা করা; এভাবে ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মতো শিরকী কাজের প্রতি তাদের ঘৃণা কমে যাবে, তাদের দৃষ্টিতে এগুলো তেমন শিরক বলে চিহ্নিত হবে না।

তারা বড়জোর এ কথা মনে করবে, এগুলো হলো প্রাচীন জাহিলী যুগের শিরক। এটি তখনকার কথা, যখন মানববুদ্ধি তার শৈশবকাল অতিক্রম করছিল এবং জ্ঞান ও সভ্যতা যখন তার প্রাথমিক পর্যায়ে ছিল। এখন তো বিশ্ব অনেক এগিয়ে গেছে। কাজেই সেগুলোর ওপর মনোযোগ নিবদ্ধ করা ও মূলোৎপাটন করার প্রয়াস করা এবং সেগুলো প্রতিহত করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়াটা সময় ও সামর্থ্যের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়; বরং সেটি হবে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছেড়ে গুরুত্বহীন বিষয় নিয়ে ব্যস্ত হওয়া।'

শিরকে জলী আর রাজনৈতিক আনুগত্য ও শাসন-কর্তৃত্বের মাঝে পার্থক্য করা জরুরি

তিনি আরও বলেন, 'জাহিলিয়াতের অপরাপর প্রকাশ, যেমন : গায়রুল্লাহর অনুগত হওয়া, তার শাসনক্ষমতা মেনে নেওয়া, আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারও আইন গ্রহণ করা এবং আল্লাহর খেলাফতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয় এমন প্রশাসনকে স্বীকৃতি দেওয়া ও তার সংবিধান, বিধি-বিধান সন্তুষ্টির সাথে মেনে নেওয়া—এ সবগুলোই হচ্ছে সেই পৌত্তলিকতা ও শিরকের শাখা এবং সেই শিরকের পরই এগুলোর স্তর বা অবস্থান।

এখন যদি প্রাগুক্ত শিরকে জলীর মূল্য কমিয়ে দেওয়া হয় অথবা তাকে আর রাজনৈতিক আনুগত্য ও শাসন-কর্তৃত্বকে একই স্তরের বিবেচনা করা হয় এবং উভয়টির ওপর একই সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়, অথবা এ কথা মনে করা হয় যে, সেই শিরকসর্বস্ব কর্মকাণ্ড ও ইবাদত ছিল বিগত প্রাচীন জাহিলিয়াতের বৈশিষ্ট্য। এখন সেই যুগ অতিক্রান্ত হয়ে গেছে এবং পূর্বেকার জাহিলিয়াতের প্রচলনও উঠে গেছে, তাহলে এ কথা বাস্তবতারও পরিপন্থী বলে গণ্য হবে।

এই শিরক ও গায়রুল্লাহর ইবাদত তার সকল প্রাচীন প্রকার, আকার, আকৃতি ও রূপ সহকারে বর্তমানেও জীবিত ও প্রচলিত আছে। বিভিন্ন ওলী-আউলিয়াদের মাজারে সেই শিরকে জলীর বিভিন্ন রূপ চাক্ষুষ দেখা যায়। গায়রুল্লাহকে অতিমানবীয় শক্তির অধিকারী মনে করা, আভূমি নত হয়ে রুকু-সিজদা করা, তার উদ্দেশে মান্নত-কুরবানী করা, আল্লাহ তাআলাকে যতটা সম্ভ্রম ও লজ্জা করা হয়, ততখানি সম্ভ্রম ও লজ্জা এই কবরস্থ সত্তাকে প্রদর্শন করা ইত্যাকার এমন

কোনো জাহিলিয়াত ও শিরকে জলী বাকি নেই, যা এখানে প্রকাশ্যে অবলীলায় করা হয় না।'[৬৬২]

উগ্রতা ও তার অপনোদন

কিছু পূর্বে সায়্যিদ কুতুবের সূরা ইউসুফের যে আয়াতাংশের তাফসীরের আলোচনা উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি এর একটু সামনে গিয়ে উক্ত তাফসীরের ফলাফল বের করে লেখেন,

فهذا الاعتبار يُعَدُّ من المعلوم من الدين بالضرورة من دان لغير الله وحكّم في أيّ أمر من أمور حياته غير الله: فليس من المسلمين وليس في هذا الدين، ومن أفرد الله سبحانه بالحاكمية ورفض الدينونة لغيره من خلائقه: فهو من المسلمين وفي هذا الدين.

'দ্বীনের' এ সংজ্ঞা থেকে দ্বীনের এক প্রাঞ্জল ও অকাট্য হাকীকত উদ্ভূত হয়। তা হলো, যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর বড়ত্ব স্বীকার করে এবং তার জীবনের কোনো ক্ষেত্রে গায়রুল্লাহকে শাসক মেনে নেয়, সে ব্যক্তি না মুসলমান থাকে এবং না দ্বীনের সাথে তার কোনো সম্পর্ক থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি এককভাবে আল্লাহর শাসন-কর্তৃত্বের ওপর বিশ্বাস রাখে এবং তাঁর কোনো সৃষ্টির আনুগত্যকে প্রত্যাখ্যান করে, সে ব্যক্তি মুসলমান বলে বিবেচিত হবে এবং এই দ্বীনের সাথে তার সম্পর্ক থাকবে।'[৬৬৩]

উল্লেখ্য, সায়্যিদ কুতুবের এ চিন্তাধারা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ফলে মিশরে এতটাই উগ্রতা সৃষ্টি হয়েছিল যে, উস্তাদ হায়দাবী তা অপনোদন করার প্রয়োজন অনুভব করেন। তিনি পূর্বে তার আলোচিত গ্রন্থ 'দুআত লা কুযাত'-এর মাঝে মওদুদী সাহেব কর্তৃক পরিবেশিত 'আল্লাহর হাকিমিয়াত'-এর ব্যাখ্যা করার পর এর অপনোদন করেছেন।[৬৬৪]

আবুল হাসান আলী নদবী রাহ. বলেন, 'জানা যায়, এই বিষয় (তথা 'তাওহীদুল হাকিমিয়া'-এর উক্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের কারণে) কারও কারও মনোভাব এতটাই উগ্র হয়ে যায় যে, যে ব্যক্তি অন্যের কোনো আইন গ্রহণ করবে, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে—এমন মনে করতে শুরু করে।

আবার কেউ কেউ তো এমনও বলতে শুরু করে, এ যুগের মুসলমানদের ঈমান-আকীদা নষ্ট হয়ে গেছে এবং তারা ইসলাম থেকে খারেজ হয়ে গেছে। কারণ হলো, তারা আল্লাহ্ তাআলার দেওয়া রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত অধিকাংশ বিধি-বিধান জানে না।'[৬৬৫]

---

৬৬২. দ্র. ইসলামের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা, পৃষ্ঠা ৭২-৭৪
৬৬৩. দ্র. ইসলামের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা, পৃষ্ঠা ৮৯-৯২ ও ৯৯
৬৬৪. দ্র. দুআত লা কুযাত, পৃষ্ঠা ৭২-৭৯
৬৬৫. দ্র. ইসলামের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা, পৃষ্ঠা ৭২-৭৪

খেলাফত প্রতিষ্ঠাই আসল ইবাদত!

খেলাফত প্রতিষ্ঠা বা রাষ্ট্রীয়ভাবে আল্লাহর আইনের আনুগত্য করার গুরুত্ব বোঝানোর জন্য 'ইবাদত' ও 'ইতাআত' শব্দদ্বয়কে যেহেতু সমার্থক সাব্যস্ত করা হয়েছে, ফলে নামাজ-রোযার ইবাদতের গুরুত্বের মতো ইসলামী বিধানমতে রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুত্ব সাব্যস্ত হয়ে গেল; বরং মওদুদী সাহেবের মতে নামাজ-রোযার চেয়ে খেলাফত প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব বেশি এবং মূল ও আসল ইবাদত এটাই।

জানা কথা, ইবাদতের বিভিন্ন প্রকার ও স্তর রয়েছে, স্থান-কাল-পাত্রভেদে কোনোটার গুরুত্ব বেশ-কম হয়, যা ফিকহের কিতাবাদিতে আছে।

তবে ঈমানের পর ইসলামের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ চারটি রুকন বা বিধান হচ্ছে নামাজ, রোযা, যাকাত ও হজ।

কিন্তু মওদুদী সাহেবের মতে উক্ত চারটি রুকনসহ সকল ইবাদত হচ্ছে রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জন করার মাধ্যম ও মধ্যোপকরণ। তিনি এ সমস্ত ইবাদতকে কেবল ট্রেনিং-কোর্স ও অনুশীলনীর দৃষ্টিতে দেখেন। কেননা, খেলাফত প্রতিষ্ঠা বা রাষ্ট্রক্ষমতা অর্জনই হচ্ছে মূল ইবাদত ও আসল উদ্দেশ্য। তিনি তার রচনাবলিতে বারংবার সবিশ্লেষিতভাবে এই আহ্বান প্রকাশ করে গেছেন। এক স্থানে তিনি লিখেছেন,

یہی غرض ہے جس کے لئے اسلام میں نماز، روزہ، زکوۃ اور حج کی عبادتیں فرض کی گئی ہیں، انہیں عبادت کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس یہی عبادت ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس اصلی عبادت کے لئے آدمی کو تیار کرتی ہیں، یہ اس کے لئے لازمی ٹریننگ کورس ہیں۔

'এটাই উদ্দেশ্য, যার জন্য ইসলামে নামাজ, রোযা, যাকাত ও হজের ইবাদতসমূহ ফরজ করা হয়েছে। এগুলোকে ইবাদত বলার অর্থ এ নয় যে, স্রেফ এগুলোই ইবাদত; বরং এর উদ্দেশ্য হলো, এসব ইবাদত সেই আসল বা মূল ইবাদতের জন্য মানুষকে প্রস্তুত করে। এগুলো তার জন্য আবশ্যিক ট্রেনিং-কোর্স।'[৬৬৬]

অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন,

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ

'তারা এমন লোক, যাদেরকে আমি দুনিয়ায় ক্ষমতা দান করলে তারা নামাজ কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, মানুষকে সৎকাজের আদেশ করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে। সব কাজের পরিণতি আল্লাহরই ইখতিয়ারে।'[৬৬৭]

---

৬৬৬. ইসলামী ইবাদত পর এক তাহকীকী নযর, পৃষ্ঠা ১৪; এর অনুবাদ, ইসলামী ইবাদতের মর্মকথা, পৃষ্ঠা ১৪
৬৬৭. সূরা হজ, (২২) : ৪১

ব্যাখ্যা :

এ সকল লোক পৃথিবীতে ক্ষমতা লাভ করতে সক্ষম হলে নিজেদের জান-মাল ব্যয় করে ইবাদত-বন্দেগীর আবহ তৈরি করবে। তারা নিজেরাও ইবাদত করবে, অন্যদেরকেও তা করার জন্য প্রস্তুত করবে। তারা সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের দায়িত্ব পালন করবে। এভাবে এ আয়াতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বলে দেওয়া হয়েছে।

কাজেই খেলাফত বা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে নামাজ ও যাকাতের মতো মূল ইবাদতসমূহের আবহ তৈরি করা ও প্রতিষ্ঠা করা।

মওদুদী সাহেব অন্যত্র বলেন,

‘আপনারা তাদের মুখে মাপমতো লম্বা দাড়ি দেখে, তাদের পায়জামা পায়ের গিরার দুই ইঞ্চি ওপরে দেখে, তাদের কপালে নামাজের কালো দাগ দেখে এবং তাদের লম্বা লম্বা নামাজ ও মোটা মোটা দানার তাসবীহ দেখে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন, এদেরকে বড় দ্বীনদার ও ইবাদতকারী বলে মনে করেন!

এই ভুল শুধু এ জন্য যে, ইবাদত ও দ্বীনদারীর ভুল অর্থই আপনাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে।

আপনি হয়তো মনে করেন, হাত বেঁধে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ানো, সিজদা করা এবং কয়েকটি নির্দিষ্ট শব্দ উচ্চারণ করা—শুধু এ কয়টি কাজই প্রকৃত ইবাদত।

হয়তো আপনি মনে করেন, রমজানের প্রথম দিন হতে প্রত্যেকদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পানাহার বন্ধ রাখার নাম ইবাদত। আপনি হয়তো এটাও মনে করেন যে, কুরআন শরীফের কয়েকটি রুকু পাঠ করার নামই ইবাদত। আপনি বুঝে থাকেন, মক্কা শরীফে গিয়ে কাবা ঘরের চারদিকে তাওয়াফ করার নামই ইবাদত। মোটকথা, এ ধরনের কিছু বাহ্যিক রূপকে আপনারা ইবাদত মনে করে নিয়েছেন।...

কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, আল্লাহ যে ইবাদতের জন্য আপনাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যে ইবাদত করার আদেশ আপনাকে দেওয়া হয়েছে, তা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস।’

আরও কিছুদূর এগিয়ে তিনি বলেন, ‘আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যে, তাহলে এই নামাজ, রোযা, হজ ও যাকাত ইত্যাদিকে কী বলা যায়?

উত্তরে আমি বলব, প্রকৃতপক্ষে এই ইবাদতগুলোকে আপনার ওপর ফরজ করা হয়েছে শুধু এ জন্য যে, আপনাকে ওই বড় ইবাদতের জন্য প্রস্তুত করা, যা আপনার জীবনে প্রতিটি মুহূর্তে আদায় করা প্রয়োজন।...

এসব বিভিন্ন ইবাদত আদায় করার পর আপনার সমগ্র জীবন যদি আল্লাহর ইবাদতে

পরিণত হওয়ার উপযুক্ত হয়, তবেই আপনার নামাজ প্রকৃত নামাজ হবে, রোযা খাঁটি রোযা হবে, যাকাত সত্যিকার যাকাত এবং হজ আসল হজ হবে, এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই উদ্দেশ্য হাসিল না হলে কেবল রুকু-সিজদা, অনাহার-উপবাস, হজের অনুষ্ঠান পালন করা এবং যাকাতের নামে টাকা ব্যয় করলে আপনার কিছুই লাভ হবে না।'[৬৬৮]

মওদুদী সাহেবের উল্লিখিত বক্তব্যগুলো পড়ে নিশ্চয় আপনার মনে হয়েছে যে, আমরা যা ইবাদত করি এগুলো আসল ও মূল ইবাদত না; বরং এগুলো করে তেমন লাভ হবে না, যদি শাসনক্ষমতা অর্জন ও খেলাফত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা না হয়। কারণ, ওটাই মূল ইবাদত ও আসল উদ্দেশ্য।

এরই ধারাবাহিকতায় আরও একধাপ এগিয়ে জামায়াতে ইসলামীর বর্তমান একজন প্রবীণ দায়িত্বশীল এক আলোচনায় সূরা বাকারার প্রসিদ্ধ আয়াত

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

পড়ে বলেছেন, 'আমাদেরকে সৃষ্টিই করা হয়েছে রাজনীতি ও খেলাফত প্রতিষ্ঠা করার জন্য; তাসবীহ ইত্যাদি পড়ার জন্য তো ফেরেশতারা আছে!'

এ ছাড়া কিছু ভাই, যারা জিহাদ নিয়ে অতি ফ্যান্টাসিতে ভোগেন, তারাও মনে করেন যে, খেলাফত প্রতিষ্ঠা করাই মানুষকে সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য।

এখানে তাদের অন্য বিষয় বাদ দিলেও বড় একটা ভুল হচ্ছে, ফেরেশতার সাথে তুলনার বিষয়টা। কেননা, ফেরেশতারা তো সর্বদা ইবাদতের মধ্যে লিপ্ত। তাদের গুনাহের কোনো সুযোগ নেই। তারা নিষ্পাপ ও নূরের তৈরি, তারা আল্লাহর আদেশের নাফরমানী করে না, তারা যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়, তা-ই পালন করে।[৬৬৯]

পক্ষান্তরে মানুষের সৃষ্টি ও প্রকৃতি ভিন্ন। তাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাদের দেওয়া হয়েছে গুনাহ-সাওয়াব উভয়টা করার সুযোগ ও শক্তি। আর এ দুনিয়া হলো তাদের জন্য পরীক্ষার হল, তিনি দেখবেন কে উত্তম আমল নিয়ে হাযির হয়।[৬৭০]

শুধু এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেও তো ফেরেশতার সৃষ্টি-ইবাদত এবং মানুষের সৃষ্টি-ইবাদতের মধ্যে বড় পার্থক্য দেখা যায়। এরপরও তারা কীভাবে বলেন যে, ইবাদতের জন্য তো ফেরেশতা রয়েছে?!

---

৬৬৮. খুতবাত, পৃষ্ঠা ১০৬-১০৮ ১০৯-১১০, এর বাংলা অনুবাদ, ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা, পৃষ্ঠা ১০৪-১০৫, ১০৬-১০৭, আধুনিক প্রকাশনী, ২৪ তম প্রকাশ মার্চ ২০১৪

৬৬৯. সূরা তাহরীম ৬; আম্বিয়া ১৯; আরাফ ১০৫; শারহুল মাকাসিদ, তাফতাযানী, ৩/৩১৯

৬৭০. সূরা বালাদ, (৯০) : ১০; দাহর, (৭৬) : ৩; শামস, (৯১) : ৮; সূরা মুলক, (৬৭) :২

খেলাফতের অর্থ

বিশ্বনন্দিত স্কলার মুফতী তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ বলেন, 'কুরআনে কারীমে খেলাফত বা খলীফা শব্দ বহু জায়গায় এসেছে। মুফাসসিরীনে কেরাম বলেছেন, খেলাফতে ইলাহিয়ার দুটি অর্থ :

১. প্রত্যেক ব্যক্তি, যে আল্লাহ্ তাআলার ওপর ঈমান রাখে, সে আল্লাহ্ তাআলার খলীফা। উক্ত ব্যক্তির কাছে প্রত্যাশা হচ্ছে এই যে, সে আল্লাহ্ তাআলার বিধিবিধানের আনুগত্য ও পাবন্দী করবে এবং আল্লাহ জাল্লা শানুহুর আখলাকের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, যাকে বলা হয় "আল্লাহর বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট" হওয়া।

এই অর্থের বিচারে প্রত্যেক মুসলমান আল্লাহ্ তাআলার খলীফা এবং এই অর্থেই সে আল্লাহ্ তাআলার প্রতিনিধিত্ব বা খেলাফত গ্রহণ করবে, এটাই তার কাছে প্রত্যাশা।

কাজেই কুরআন মাজীদে যে বলা হয়েছে, إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً তা এই অর্থে বলা হয়েছে। অনেক মুফাসসিরের অভিমত এমনই।

এ হচ্ছে ঐকিক খেলাফত, এর মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির পুরো জীবন আল্লাহ্ তাআলার হুকুমের অধীন হওয়া এবং আল্লাহর বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট হওয়ার অর্থ রয়েছে।

২. খেলাফতের আরেক অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তাআলার যে কর্তৃত্বগুণের বৈশিষ্ট্য আছে, তা দুনিয়াতে কার্যকর করার জন্য কেউ তাঁর প্রতিনিধি হওয়া এবং আল্লাহ তাআলার প্রতিনিধিত্ব ও খেলাফতের অধীন হয়ে মানুষের ওপর হুকুমত পরিচালনা করা। কাজেই হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের কথা উল্লেখ করে কুরআন মাজীদে যে বলা হয়েছে, "আমি তোমাকে ভূপৃষ্ঠে খলীফা নিযুক্ত করেছি"—এ কথা এই দ্বিতীয় অর্থেই বলা হয়েছে।

আমরা যখন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নীতি হিসেবে 'খেলাফত'-এর কথা উল্লেখ করি, তখন এই দ্বিতীয় অর্থই আমাদের উদ্দেশ্য থাকে। এই দ্বিতীয় অর্থের বিচারে ইসলামে যিনি শাসক নিযুক্ত হন, তার ব্যাপারে মূলনীতি হচ্ছে, তিনি সত্তাগতভাবে শাসক নন; বরং আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর খলীফা।

আর যখন তিনি খলীফা, তখন এর আবশ্যিক ফল হচ্ছে, তিনি হুকুমতের ক্ষেত্রে ঐশী বিধি-বিধানের অনুগত।

এখান থেকেই ইসলাম ও অন্যান্য রাজনৈতিক মতাদর্শের মাঝে একটি স্পষ্ট সীমারেখা সৃষ্টি হয়ে যায়। অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থাপনায় শাসক নিজেকে ঐশী বিধি-বিধানের অনুগত সাব্যস্ত করে না; কিন্তু খলীফার জন্য আবশ্যক ঐশী বিধানের অনুগত হয়ে

আইন-কানুন জারি করা।'[৬৭১]

আর খেলাফত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে—এটা কুরআনের একাধিক আয়াত ও নবীগণের ইতিহাসের সাথেও সাংঘর্ষিক, যা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তা ছাড়া আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'তাঁরই ইবাদতের জন্য জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে।'[৬৭২] আর 'ইবাদত'-এর মধ্যে নামাজ-রোযা, দাওয়াহ, জিহাদ ও খেলাফত ইত্যাদি অনেক কিছু রয়েছে। অথচ আপনারা যে জিহাদ ও খেলাফতের কথা বলছেন, তা তো ইবাদতের একটি অংশ মাত্র!

যা হোক, মওদুদী সাহেবের এ ধরনের ভ্রান্তিতে পতিত হওয়ার কারণ কী, তা আবুল হাসান আলী নদবীর ভাষায় পড়ুন। তিনি বলেন,

'মওদুদী সাহেবের মতে যখন উলূহিয়াতের প্রকৃত স্পিরিট হচ্ছে ক্ষমতা এবং উলূহিয়াত ও ক্ষমতা অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত ও ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এমনকি তার ভাষ্যমতে, স্পিরিট ও তাৎপর্যের দিক থেকে উভয়ই এক জিনিস। আর কুরআন রুবূবিয়াতকে সার্বভৌমত্বের সম্পূর্ণ সমর্থক (Sovereignty) বলে প্রতিপন্ন করছে, তাহলে এখন এই ইবাদত (যা বান্দার কাজ)-এর একমাত্র অর্থ গিয়ে দাঁড়াচ্ছে আনুগত্য, মান্যতা, বশ্যতা ও বিশ্বস্ততা (Loyalty = লয়লটি)। এগুলোই তার প্রকৃত নিগূঢ়ার্থ।

রুবূবিয়াত ও উলূহিয়াতের এই কেন্দ্রীয় ধারণা অর্থাৎ সার্বভৌম ক্ষমতা এবং ইবাদতের এই একমাত্র নিগূঢ়ার্থ অর্থাৎ আনুগত্য (Loyalty) মওদুদী সাহেবের মন ও মস্তিস্কের ওপর এমনভাবে জেঁকে বসে যে, তার দৃষ্টিতে (অথবা অধিকতর সতর্ক শব্দে তার রচনাবলির মাঝে) শরীয়তের অন্যান্য ইবাদত-আমলের গুরুত্ব নিজ থেকেই কমে যায়, যা দ্বীনের ক্ষেত্রে কাম্য ও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অতিপ্রিয়। এ সকল ইবাদতের ওপর উৎসাহিত করে অসংখ্য আয়াত-হাদীসে এর ফযীলত খুলে খুলে বলা হয়েছে এবং এগুলোতে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার ওপর উদ্দীপ্ত করা হয়েছে। যারা এসব ইবাদত বেশি বেশি করে আদায় করেন, তাদের প্রশংসা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে উদাসীনতা প্রদর্শনকারীদের নিন্দা করা হয়েছে।

অথচ মওদুদী সাহেব এ সমস্ত ইবাদত-আমলকে দ্বিতীয় সারির বিষয় হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং এ-জাতীয় কাজে মনোযোগ নিবন্ধ করা ও ব্যাপৃত থাকাকে তিনি

---

৬৭১. ইসলাম আওর সিয়াসী নাযরিয়াত, পৃষ্ঠা ১৭৮; এর অনুবাদ ইসলাম ও রাজনীতি, পৃষ্ঠা ১৯০-১৯১
৬৭২. সূরা যারিয়াত, (৫১) : ৫৬

দ্বীনের সত্যিকার স্পিরিট সম্পর্কে অজ্ঞতার ফলাফল ও এ ধরনের মানসিকতাকে পতনযুগের স্মারক মনে করেন।

তার এ ধরনের চিন্তাধারা ও আহ্বান এতটাই উগ্র রূপ ধারণ করেছে যে, এ সমস্ত শরীয়তসম্মত ইবাদত ও নামাজ-জিকিরের আধিক্যতার ব্যাপারে প্রচণ্ডরকম অবজ্ঞা ও ভর্ৎসনাপূর্ণ কটাক্ষ ফুটে ওঠে, যা তার সাধারণ রচনাবলি হতে সম্পূর্ণ আলাদা।'

এমনকি মওদুদী সাহেব লিখেছেন, 'ইবাদত শব্দের এ অর্থ আপনি স্মরণ রাখুন এবং আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে থাকুন। একটি চাকর যদি মনিবের নির্ধারিত কর্তব্য পালন না করে, বরং তার সামনে কেবল হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে, লক্ষ বার কেবল তার নাম জপে (তথা জিকির করে), তবে এ চাকরটি সম্পর্কে আপনি কী বলবেন?

মনিব তাকে অন্যান্য মানুষের প্রাপ্য আদায় করতে বলেন। কিন্তু সে কেবল সেখানেই দাঁড়িয়ে থেকে মনিবের সামনে মাথা নত করে দশবার সালাম করে এবং আবার হাত বেঁধে দাঁড়ায়। মনিব তাকে অনিষ্টকর কাজগুলো বন্ধ করতে আদেশ করেন। কিন্তু সে সেখান থেকে একটুও নড়ে না; বরং সে কেবল সিজদা করতে থাকে।

মনিব তাকে চোরের হাত কাটতে বলেন। কিন্তু সে দাঁড়িয়ে থেকে সুললিত কণ্ঠে বিশবার পড়তে বা উচ্চারণ করতে থাকে "চোরের হাত কাট" (তথা কুরআন তিলাওয়াত করা)। কিন্তু সে একবারও এমন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করে না, যার অধীনে চোরের হাত কাটা সম্ভব হবে। এমন চাকর সম্পর্কে কী মন্তব্য করবেন?

আপনি কি বলতে পারেন যে, সে প্রকৃতপক্ষে মনিবের বন্দেগী ও ইবাদত করছে? আপনার কোনো চাকর এরূপ করলে আপনি তাকে কী বলবেন, তা আমি জানি না; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আল্লাহর যে চাকর (?) এরূপ আচরণ করে, তাকে আপনি বড় আবেদ (ইবাদতকারী, বুযুর্গ ইত্যাদি) নামে অভিহিত করেন।

এরা সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কুরআন শরীফে আল্লাহ তাআলার কত শত হুকুম পাঠ করে, কিন্তু সেগুলো পালন ও কাজে পরিণত করার জন্য একটু চেষ্টাও করে না; বরং কেবল নফলের পর নফল পড়তে থাকে, আল্লাহর নামে হাজার দানা তাসবীহ জপতে থাকে এবং মধুর কণ্ঠে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতে থাকে।

আপনি তার এ ধরনের কার্যাবলি দেখে বিস্মিত হয়ে বলেন, "ওহে! লোকটা কত বড় আবেদ আর কত বড় পরহেযগার।" আপনাদের এই ভুল ধারণার কারণ এই যে, আপনারা 'ইবাদত' শব্দটির প্রকৃত অর্থ মোটেই জানেন না।'[৬৭৩]

যে ব্যক্তি দ্বীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী উলামায়ে কেরামের রচনাবলি

---

৬৭৩. খুতবাত, পৃষ্ঠা ১০৬; ইসলামের বুনিয়াদি শিক্ষা, পৃষ্ঠা ১০৩

পড়েছেন বা তাঁদের আলোচনা শুনেছেন, তিনি অবশ্যই জেনে থাকবেন, তাঁরা সব সময় নামাজ ও জিকিরের মাঝে প্রাণ ও সতেজতা সৃষ্টি করার এবং এ সমস্ত ইবাদতের সাথে সাথে শরীয়তের অন্যান্য বিধি-বিধানের ওপর আমল করার, সেগুলোকে নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করার এবং এরপর আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টির ওপর সেগুলোকে প্রয়োগ ও বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টার দিকে দাওয়াত দিয়ে গেছেন।

যে জীবনের মাঝে 'ভেতর' ও 'বাহির' এবং 'দেহ' ও 'মন'-এর মাঝে সামঞ্জস্য নেই, সেই জীবনকে তাঁরা 'মুনাফিকির জীবন' আর এ ধরনের কাজকে 'নেফাক বা মুনাফিকি' বলে অভিহিত করে গেছেন।

মওদুদী সাহেব লক্ষ্য ও মাধ্যম প্রসঙ্গে যে নব-আবিষ্কৃত অবস্থান গ্রহণ করেছেন এবং ইবাদত ও জিকির প্রসঙ্গে যেসব অভিমত ও নতুন বিশ্লেষণ প্রকাশ করেছেন, এতে আশঙ্কা জাগে যে, শুধু এসব বিশ্লেষণ ও চিন্তাধারার আলোকে যে প্রজন্ম গড়ে উঠবে, তাদের মাঝে নতুন এমন এক ধর্মীয় চেতনা সৃষ্টি হবে, যে চেতনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও আদর্শ এবং সাহাবায়ে কেরাম রাযি.-এর অনুসরণের আলোকে গড়ে ওঠা সেই দ্বীনী চেতনার সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক হবে; যে চেতনা উত্তরাধিকারসূত্রে অক্ষুণ্ণভাবে চৌদ্দশ বছর ধরে এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে চলে এসেছে।

সেই চেতনা ও প্রচেষ্টার গাড়ি রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম রাযি. তাবিয়ীন ও তাবে-তাবিয়ীনের পথ ছেড়ে অন্য পথে গিয়ে পড়বে।'[৬৭৪]

এ আলোচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য

আমার এ আলোচনা থেকে এটা মোটেও উদ্দেশ্য না যে, খেলাফত প্রতিষ্ঠা বা রাষ্ট্রীয়ভাবে আল্লাহর আইনের আনুগত্য করাকে গুরুত্বহীন করে দেওয়া এবং এর জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা না করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা; বরং প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে, এটাকে কেন্দ্র করে যে বিকৃতি ও ভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে, তা অপনোদন করা। এখন খেলাফত প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু আলোচনা তুলে ধরা হলো।

ইসলাম চিরবিজয়ী ধর্ম

দুনিয়ার মধ্যে ইসলাম অন্য সব ধর্ম-মতবাদের ওপর বিজয় লাভ করার জন্য এসেছে। ইরশাদ হয়েছে,

هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ

---

৬৭৪. দেখুন, ইসলামের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা, পৃষ্ঠা ১০২ ও ৩২-৩৩

'তিনিই নিজ রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্ম দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যাতে একে (ইসলামকে) সব ধর্মের ওপর বিজয়ী করে দেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করে।'[৬৭৫]

কাজেই ইসলাম চিরবিজয়ী ধর্ম। তবে ইসলামের বিজয় দুভাবে হয়। একটা হলো দলীল-প্রমাণ দিয়ে। আলহামদুলিল্লাহ, দলীল-প্রমাণের ময়দানে ইসলাম সর্বদা বিজয়ীই আছে এবং থাকবেও। কোনো বাতিল কখনো দলীল-প্রমাণে ইসলামকে পরাস্ত করতে পারেনি, পারবেও না।

আরেকটা হলো, বাহ্যিক শক্তিতে ও রাজনৈতিক ক্ষমতার দিক দিয়ে বিজয়ী হওয়া। এদিক থেকে মুসলিমদের বিজয়ী হওয়ার বিষয়টা বিভিন্ন শর্তের সাথে যুক্ত। সে সকল শর্ত বিদ্যমান থাকায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খোলাফায়ে রাশেদীন এবং তারপরও কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহ সকলের ওপর বিজয়ী ছিল। অতঃপর তাদের দ্বারা সেসব শর্ত পূরণ না হওয়ার কারণে বিজয়ও তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়।

আবার যখন শর্ত পূরণ হবে, তো পুনরায় রাজনৈতিকভাবেও মুসলিমরা বিজয়ী হবে। এ ছাড়া মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক শেষ জমানায় আবার ইসলাম ও মুসলিম-জাতি সারা বিশ্বে বিজয় লাভ করবে। তাই আমাদের উচিত সেই ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়নে মেহনত করা ও চেষ্টা করা।

সত্য ধর্ম একমাত্র ইসলাম। নাজাত শুধু ইসলামেই। অন্য কোনো ধর্মের মাঝে নাজাত নেই। অন্য ধর্ম, মতবাদ সব বাতিল। তাই ইসলামকে সর্বস্তরে বিজয়ী করা ঈমানের দাবি। কাজেই ঈমানের দাবি একমাত্র সত্য ধর্ম ইসলামকে বিজয়ী করা। রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাশালী করা। আল্লাহর আইন বাস্তবায়ন করা।

আর যেটা সত্য, যেটা দলীলসিদ্ধ ও যৌক্তিক, সেটাই বিজয়ী হবে; আর যেটা বাতিল, যেটা মিথ্যা, যেটা গোমরাহী, যেটা অন্ধকার, সেটা পরাজিত হবে। এটাই নিয়ম, এটাই বাস্তবতা। কাজেই দ্বীন ইসলামের বিজয়, দ্বীন ইসলামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা, আল্লাহর আইনের হুকুমত প্রতিষ্ঠা—এটা ঈমানের দাবি।

বাহ্যিক শক্তি অর্জন ও ইসলামকে বিজয়ী করার গুরুত্ব

ইরশাদ হয়েছে,

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ

৬৭৫. সূরা আস-সাফ, (৬১) : ৯

‘(হে মুসলিমগণ!) তোমরা তাদের (মোকাবিলার) জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-ছাউনি প্রস্তুত করো, যা দ্বারা তোমরা আল্লাহর শত্রু ও নিজেদের (বর্তমান) শত্রুদের সন্ত্রস্ত করে রাখবে এবং তাদের ছাড়া সেই সব লোককেও, যাদেরকে তোমরা এখনো জানো না; (কিন্তু) আল্লাহ তাদেরকে জানেন।’[৬৭৬]

মুফতী তাকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ এর তাফসীরে বলেন, ‘গোটা মুসলিম উম্মাহর প্রতি এটা এক স্থায়ী নির্দেশ যে, তারা যেন ইসলাম ও মুসলিমদের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত রাখার লক্ষ্যে সব রকম প্রতিরক্ষা-শক্তি গড়ে তোলে। কুরআন মাজীদ সাধারণভাবে ‘শক্তি’ শব্দ ব্যবহার করে বোঝাচ্ছে যে, রণপ্রস্তুতি বিশেষ কোনো অস্ত্রের ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং যখন যে ধরনের প্রতিরক্ষা-শক্তি কাজে আসে, তখন সেই রকম শক্তি অর্জন করা মুসলিমদের জন্য অবশ্যকর্তব্য।

সুতরাং সর্বপ্রকার আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রও এর অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া মুসলিমদের জাতীয়, সামাজিক ও সামরিক উন্নতির জন্য যত রকমের আসবাব-উপকরণ দরকার হয়, সেসবও এর মধ্যে পড়ে।

আফসোস, আজকের মুসলিম-বিশ্ব এ ফরজ আদায়ে চরম অবহেলা প্রদর্শন করেছে। ফলে আজ তারা অন্যান্য জাতির আশ্রিত ও বশীভূত জাতিতে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এ সূরতহাল থেকে পরিত্রাণ দিন।’[৬৭৭]

রাজনৈতিকভাবে ইসলামকে বিজয়ী করার চেষ্টা করা মুসলমানদের দায়িত্ব

সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী রাহ. ‘আছরে হাযের মেঁ দ্বীন কী তাফহীম ওয়া তাশরীহ’ গ্রন্থে লেখেন, ‘যে শক্তি ও ক্ষমতার মাধ্যমে মানব সম্প্রদায়ের ওপর আল্লাহ তাআলার শাসন কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠা করা যাবে এবং তাঁর নির্দেশিত বিধি-বিধান সমাজে প্রয়োগ করা যাবে, তা অর্জন করার জন্য সংগ্রাম ও সাধনার প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে আমাদের জানামতে উলামায়ে কেরামের কারও কোনো দ্বিমত নেই।

এদিকে ইশারা করেই এ আয়াত নাযিল হয়েছে,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকুন, যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায় এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত না হয়ে যায়। তারপর তারা যদি বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করেন।”[৬৭৮]

---

৬৭৬. সূরা আনফাল, (৮) : ৬০

৬৭৭. দ্র. তাওযীহুল কুরআন

৬৭৮. সূরা আনফাল, (৮) : ৩৯

কুরআনের অসংখ্য আয়াতের মাঝে এ ধরনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অর্জন করা এবং এর জন্য সংগ্রাম ও সাধনা চালিয়ে যেতে আহ্বান করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে শিথিলতা বা উদাসীনতা প্রদর্শন করা কোনোভাবে জায়েয নয় বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এই দায়িত্ব ত্যাগ করলে কী পরিণতি নেমে আসবে তার আলোচনায় বলে দেওয়া হয়েছে যে, এর ফলে ইসলাম অসহায়, মুসলমানগণ নিপীড়িত, আল্লাহ্ তাআলার বিধি-বিধান ও দণ্ডবিধি অকার্যকর হয়ে যাবে। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে জীবনে অব্যবস্থাপনা ও বিশৃঙ্খলা এবং খোদায়ী নানাবিধ মদদসহ দ্বীনী-দুনিয়াবি বরকতসমূহ হতে বঞ্চিত হতে হবে।

এ কারণেই খেলাফত ও ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাকে এতটাই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে, এর থেকে শূন্য জীবনকে 'জাহেলী জীবন' এবং এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তাকে 'জাহেলী মরণ' ঘোষণা করা হয়েছে।

তাই সাহাবায়ে কেরাম নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর এ কাজকে প্রাধান্য দিয়ে অন্য সকল কাজের ওপর তা অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এ কাজকে তার বিশুদ্ধ পদ্ধতির ওপর নিয়ে আসার জন্য হযরত আলী মুরতাযা রাযি. সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও সাধনা করেছেন। হযরত হুসাইন রাযি. আত্মবিসর্জন দিয়েছেন। সর্বযুগেই উলামায়ে কেরাম ও সংগ্রামী সাধকগণ জীবনপণ প্রয়াস চালিয়ে গেছেন। আর আজ এ বিষয়ের প্রতি গাফলত প্রদর্শন ও এই নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হওয়ার শাস্তিস্বরূপ সমগ্র ইসলামী বিশ্ব অপমান, লাঞ্ছনা ও অবমাননার শিকার হয়ে আছে।

কিন্তু এ সবকিছু করা হবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অনিবার্য মাধ্যম হিসেবে। এটা পরিপূর্ণ দ্বীন বা দ্বীনের সার্বিক পরিপূরক ও সবকিছুর ওপর প্রণিধানযোগ্য হওয়ার মর্যাদায় সমাসীন হয়নি।'

মাধ্যমকে লক্ষ্য বানানোর বিচ্যুতি

আলী নদবী রাহ. এরপর বলেন, 'গভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ উলামায়ে কেরাম, যাঁরা কিতাব ও সুন্নাহর যথোপযুক্ত মুখপাত্রের দায়িত্ব প্রতিপালন করেছেন, যাঁরা কুরআন-হাদীসের ব্যাপক, বিস্তৃত ও গভীর অধ্যয়ন এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামগ্রিক জীবন ও সাহাবায়ে কেরামের সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে গভীর অনুধাবনের ভিত্তিতে দ্বীনকে পরিপূর্ণরূপে বুঝেছেন এবং যাঁদের জ্ঞানগত মানসিকতা, চিন্তাধারার কাঠামো এবং দাওয়াতের পদ্ধতি একমাত্র নববী জ্ঞানের পাঠশালায় প্রস্তুত কারিকুলামের ওপরই নির্মিত ছিল, কোনো বহিরাগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রভাব যাদের ওপর পড়েনি, যাঁরা কোনো সমকালীন বিভ্রান্তি অথবা কোনো পথচ্যুত আন্দোলন বা আহ্বানের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ফলে গড়ে ওঠেননি।

এ ধরনের গভীর প্রজ্ঞাপূর্ণ উলামায়ে কেরাম যখন এই দ্বীন কায়েমের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত করতে চান, অথবা এ কাজ না থাকা এবং মুসলমানদের এ ক্ষেত্রে অনীহার ওপর দুঃখ প্রকাশ করে রক্তকান্না কাঁদেন, তখন তাঁদের ভাষা, বর্ণনাভঙ্গি এবং এ কাজের দিকে আহ্বানের সময় তাঁদের তেজোদীপ্ত আকর্ষণ ও উৎসাহ-উদ্দীপনা সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়ে থাকে।

লক্ষ্য ও মাধ্যমের মধ্যকার সুস্পষ্ট অথচ নাযুক যে সম্পর্ক রয়েছে, তা তাদের লেখনীর প্রতিটি ছত্র হতে ঝরে পড়ে। যার থেকে সুস্পষ্টতই বুঝে আসে, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অর্জন করার সংগ্রাম ও সাধনা, ইসলামী খেলাফত ও আইনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস ও আহ্বান হবে একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ, সত্য দ্বীনের প্রণিধান, ইসলামের আরকানসমূহের প্রতিষ্ঠা, ধর্মীয় জ্ঞানমূহের পুনরুজ্জীবন এবং আমর বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুনকারের প্রয়োজনে।

হাকীমুল ইসলাম হযরত শাহ ওলীউল্লাহ দেহলবী রাহ. (মৃ. ১১৭৬ হি.) তাঁর কালজয়ী অদ্বিতীয় গ্রন্থ 'ইযালাতুল খাফা আন খিলাফাতিল খুলাফা'-এর মাঝে খেলাফতের সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন,

هي الرئاسة العامة في التصدي لإقامة الدين بإحياء العلوم الدينية وإقامة أركان الإسلام، والقيام بالجهاد وما يتعلق به من ترتيب الجيوش، والفرض للمقاتلة، وإعطائهم من الفيء، والقيام بالقضاء وإقامة الحدود، ورفع المظالم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

"খেলাফত হচ্ছে সেই ব্যাপক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব, যার মাধ্যমে দ্বীন কায়েমের উদ্যোগ নেওয়া যাবে এভাবে যে, দ্বীনী ইলমসমূহকে পুনরুজ্জীবিত করা যাবে, ইসলামের আরকানসমূহকে প্রতিষ্ঠা করা যাবে, জিহাদ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়াবলি, যেমন : সেনাবাহিনী সুসংগঠিত করা, তাদেরকে লড়াইয়ের জন্য গড়ে তোলা এবং তাদের মাঝে গনীমতলব্ধ সম্পদ বণ্টন করা ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা পালন করা যাবে, শরয়ী বিচারব্যবস্থা ও তার দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা যাবে, নিপীড়ন ও শোষণের যাবতীয় পথ রুদ্ধ করা যাবে, সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে বাধা প্রদান করা যাবে। আর এ সবকিছু সম্পাদিত হবে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে।"

অতঃপর তিনি এ কথাগুলোর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন, "খেলাফতের এ সকল লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও শাখাসমূহকে যদি একটি বাক্যে প্রকাশ করতে হয়, যা তার সকল অংশকে অন্তর্ভুক্তকারী একটি ব্যাপ, তবে একক নীতির মতো শোনাবে এবং তার সকল অনুষঙ্গের ও প্রকারের জন্য জাতিবাচক প্রধানবিশেষ্য হবে, তাহলে তা

হচ্ছে 'ইকামাতে দ্বীন'।"

এরপর তিনি আরও লিখেছেন, **"এই খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী সকল মুসলমানের জন্য ফরজে কিফায়া।"**

এরপর তিনি এ রায়ের স্বপক্ষে অনেকগুলো শরয়ী প্রমাণ পেশ করেন।

অতঃপর লেখেন, "আল্লাহ তাআলা জিহাদ ও ইসলামী বিচারব্যবস্থা, দ্বীনী ইলমসমূহকে প্রবর্তন করা, ইসলামের আরকানসমূহকে প্রতিষ্ঠা করা, কাফেরদের আধিপত্য হতে ইসলাম ও মুসলমানদের সুরক্ষিত রাখাকে 'ফরজে কিফায়া' বলে ঘোষণা করেছেন। আর এ সমুদয় কাজ কাউকে 'ইমাম' নির্বাচিত করে তার অধীনে করা ছাড়া সম্ভব নয়। আর একটি সর্বস্বীকৃত মূলনীতি রয়েছে, তা হলো, আবশ্যক কাজ যার ওপর নির্ভরশীল, তাও আবশ্যক হয়ে যায়।"'

ইকামাতে দ্বীনের সঠিক ব্যাখ্যা

এখানে একটি বাস্তব ও সত্য কথা স্পষ্ট করে দেওয়া দরকার যে, 'ইকামাতে দ্বীন' শব্দকে শুধু আল্লাহ তাআলার শাসন প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম করার সমার্থবোধক বানিয়ে ফেললে তা ভুল হবে। জামায়াতে ইসলামীর রচনাবলির মাঝে তা যে অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেই অর্থ হতে 'ইকামাতে দ্বীন' শব্দটি আরও ব্যাপক, গভীর ও বিস্তৃত অর্থ ও বোধ ধারণ করে আছে।

'ইকামাতে দ্বীন'-এর মাঝে সে সকল অনুষঙ্গ চলে আসে, যা হযরত শাহ ওলীউল্লাহ রাহ. তাঁর আরবী বাক্যের মাঝে ব্যক্ত করেছেন।

أَقِيمُوا الدِّينَ বাক্যটি সমগ্র কুরআনুল কারীমে মাত্র একবার এসেছে। সূরা শূরার ১৩ নং আয়াতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

'তিনি তোমাদের জন্য দ্বীনের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারিত করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে, যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মুসা ও ঈসাকে; এই মর্মে যে, তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি কোরো না।'[৬৭৯]

উক্ত আয়াতে এই أَقِيمُوا الدِّينَ বাক্যটির পূর্বাপর এ কথা দ্ব্যর্থহীনভাবে বুঝিয়ে দেয় যে, এর দ্বারা সম্পূর্ণ দ্বীন ও তার শিক্ষা (আকীদা, ইবাদত ও মুআমালা প্রভৃতি)

---

৬৭৯. সূরা আশ-শূরা, (৪২) : ১৩

উদ্দেশ্য। শুধু খেলাফত ও রাজত্ব এবং ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অর্জন করাই উদ্দেশ্য নয়।

আল্লামা আলূসী রাহ. তাঁর প্রসিদ্ধ তাফসীরগ্রন্থ 'রুহুল মাআনী'-এর মাঝে এর ব্যাখ্যা করে লিখেছেন,

أي دين الإسلام الذي هو توحيد الله تعالى وطاعته، والإيمان بكتبه ورسله وبيوم الجزاء وسائر ما يكون العبد به مؤمنا، والمراد بإقامته: تعديل أركانه وحفظه من أن يقع فيه زيغ والمواظبة عليه.

'এখানে দ্বীন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, দ্বীনে ইসলাম তথা আল্লাহর একত্ব স্বীকার করা, তাঁর আনুগত্য মেনে নেওয়া; আর তাঁর সমস্ত কিতাব, সকল রাসূল, প্রতিদান দিবস এবং সে সকল বিষয়ের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা, যেগুলোর মাধ্যমে একজন বান্দা মুমিন হতে পারে। আর দ্বীন কায়েম করার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তার আরকানসমূহকে স্থিতিশীল করা এবং তার মাঝে কোনো ধরনের বক্রতা ও বিভ্রান্তি ঘটে যাওয়া থেকে সুরক্ষিত রাখা। সাথে সাথে এই দ্বীনের ওপর সদাসর্বদা অবিচল থাকা।'[৬৮০]

সুতরাং 'ইকামাতে দ্বীন' ইসলামের একটি পরিভাষা। এর অর্থ যথাযথভাবে দ্বীনের ওপর আমল করা, সর্বদা দ্বীনের ওপর অটল-অবিচল থাকা, যাবতীয় অপব্যাখ্যা ও গোমরাহী থেকে দ্বীনকে সংরক্ষণ করা, যখন যার কাছে দ্বীনের যা চাহিদা, তা পূরণ করা। আর দ্বীন বলতে প্রধানত ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোকে বোঝায়। যে বিষয়গুলো সব আসমানী ধর্মে এক ও অভিন্ন। শরীয়ত পরিবর্তনের কারণে যেগুলোর মাঝে কোনো পরিবর্তন হয় না। মৌলিক আকীদা, যথা : তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস; মৌলিক ইবাদত, যথা : নামাজ, রোযা, হজ, যাকাত, জিকির ও দুআ। মৌলিক আখলাক, যথা : ইনসাফ করা, ইহসান করা, ক্ষমা করা, সত্য বলা, ওয়াদা পূর্ণ করা, আমানত রক্ষা করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, মিথ্যা না বলা, ধোঁকা না দেওয়া, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা না করা, যিনা না করা, চুরি না করা, জুলুম না করা, কাউকে কষ্ট না দেওয়া, অহংকার না করা—এগুলো সবই দ্বীন। সব নবী-রাসূলের দ্বীন এক ও অভিন্ন ছিল। তাঁরা সকলে একই দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। তবে সকল নবী-রাসূলের শরীয়ত ও বিধি-বিধান এক ছিল না। যেমন : নামাজের হুকুম সব উম্মতের ওপর ছিল। তবে নামাজের রূপ ও এর বিধি-বিধান সব শরীয়তে একরকম ছিল না।

কাজেই আয়াতটির সারমর্ম হলো, ইবরাহীম, মুসা ও ঈসাকে এই আদেশ দিয়েছিলাম যে, 'তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করো'; আর সেই দ্বীন হলো তাওহীদ, নামাজ-রোযাসহ সকল নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা, ওয়াদা পূরণ করা, আমানত রক্ষা করা, সৃষ্টিজীবকে কষ্ট না দেওয়া—এটাই সব নবী-রাসূলের

---

৬৮০. দ্র. ইসলামের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা, পৃষ্ঠা ১২৩-১২৯

দ্বীন। এতে কোনো বিভিন্নতা নেই। এই ‘ইকামাতে দ্বীন’ বা ‘দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা’র কথাই আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে বলেছেন, أَقِيمُوا الدِّينَ বলে।

সুতরাং খেলাফত প্রতিষ্ঠার বিষয়টি অবশ্যই ‘ইকামাতে দ্বীন’-এর অংশ, তবে স্টেট কায়েম করা বা খেলাফত প্রতিষ্ঠা করাই কেবল ‘ইকামাতে দ্বীন’ নয়।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে বিকৃতি ও বিভ্রান্তি থেকে হেফাজত করুন এবং ‘সীরাতে মুস্তাকীম’-এর ওপর পরিচালিত করুন।

আলহামদুলিল্লাহ, দ্বিতীয় খণ্ড এখানে সমাপ্ত।
শিরক ও তার প্রকারের আলোচনার মাধ্যমে
তৃতীয় খণ্ড শুরু হবে, ইনশাআল্লাহ।

দ্বিতীয় খণ্ডে যা আছে

আকীদা বিষয়ে মৌলিক কথা, আকীদার বিভিন্ন ধারা ও তাদের কিতাব পরিচিতি, ইমাম আবু হানীফার আকীদা ও মাতুরিদী আকীদার পার্থক্যের দাবি ও বাস্তবতা, সালাফের আকীদা ও সালাফী আকীদার পার্থক্য, জাদীদ ইলমুল কালাম, আল্লাহ তাআলা ও তাঁর সিফাতের বিভিন্ন প্রকার ও বিধান এবং আরশ সম্পর্কে আকীদা।

এতে আরও আলোচিত হয়েছে : তাওহীদুর রুবূবিয়া, তাওহীদুল উলূহিয়া, তাওহীদুল হাকিমিয়া সহ তাওহীদের বিভিন্ন প্রকার নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা।